দশ খণ্ডে সমাপ্ত স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র রচনাবলীর নবম খণ্ড

স্বামী বিবেকানন্দের
বাণী ও রচনা

জন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

নবম খণ্ড

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

'স্বামীজীর বাণী ও রচনা'র নবম খণ্ডে প্রধানতঃ কথোপকথন-মূলক বিষয়গুলি—স্বামীজীর সহিত দেশে ও বিদেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের যে-সব কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা সন্নিবেশিত হইল। এগুলি তাঁহার বক্তৃতা ও লেখার মতোই জীবনপ্রদ, উপরন্তু জাতিগত ব্যক্তিগত নানা সমস্যার সমাধানের সুচিন্তিত ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ।

স্বামীজীর শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' (পূর্ব ও উত্তর) দুই খণ্ডে স্বামীজীর উদ্দীপনাময় বহু কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, দীর্ঘকাল ধরিয়া এই গ্রন্থ বহু দেশসেবক ও আধ্যাত্মিক সাধককে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে। দুই খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটি এখানে সর্বাগ্রে ক্রমিক অধ্যায়-অনুসারে—যথাসম্ভব তারিখ ও ঘটনার অনুক্রমে সাজানো হইয়াছে। কথোপকথনের পটভূমিকার জন্য যতটুকু বর্ণনা প্রয়োজন, ততটুকুই রাখা হইয়াছে; মূল পুস্তকের অধ্যায়মুখে লিখিত বিষয়সূচী ও মাঝে মাঝে লিখিত লেখকের মন্তব্য বর্জিত হইয়াছে।

ভগিনী নিবেদিতা লিখিত 'Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda'—'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' নামে বাংলায় প্রকাশিত; এ পুস্তকখানির অধ্যায়-শিরোনামা সব ঠিক রাখা হইয়াছে, কিন্তু মূল পুস্তকের বর্ণনা- ও সমালোচনা-মূলক অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে, শুধু স্বামীজীর মতামত ও কথাগুলিই নির্বাচিত হইয়াছে। প্রয়োজনীয় পটভূমিকা ও ধারাবাহিকতা যথাসম্ভব রাখা হইয়াছে।

'স্বামীজীর কথা' অংশটি স্মৃতিকথা-মূলক। স্মৃতিকথা যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে স্বামীজীর শিষ্য—যথা স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্য, হরিপদ মিত্র গৃহস্থ শিষ্য, প্রিয়নাথ সিংহ একাধারে তাঁহার বাল্যবন্ধু ও শিষ্য। এই লেখাগুলিতে স্বামীজীর বিভিন্ন ভাবের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানেও বর্ণনাংশ কিছু বাদ দিয়া স্বামীজীর কথাবার্তাই চয়ন করা হইয়াছে। সমগ্র রস আস্বাদনের জন্য পাঠকগণ মূল পুস্তক-পাঠে আকৃষ্ট হইবেন, আশা করি।

সর্বশেষে 'কথোপকথন' পুস্তকটি সন্নিবেশিত হইল। এটি প্রধানত দেশের ও বিদেশের সংবাদপত্র-প্রতিনিধিগণের সাক্ষাৎকারের প্রকাশিত বিবৃতি।

এখানেও বর্ণনা—বিশেষত সমালোচনা সংক্ষিপ্ত করিয়া কথোপকথনে স্বামীজী কর্তৃক প্রকাশিত মতামতের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। শেষের দিকে কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

এই গ্রন্থাবলীর অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ড ছাপাইবার আংশিক ব্যয় ভারত- ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বহন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

তথ্যপঞ্জী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া এই খণ্ড মুদ্রণযোগ্য করিতে যাঁহারা আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রকাশক

সূচীপত্র

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রকাশিত হইল। দেশ, সমাজ, আচার, নীতি, ধর্ম প্রভৃতি যে-সকল বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্য অনুধাবন এবং মীমাংসা করিতে যাইয়া মানব-মন সন্দেহে দোলায়মান হইয়া দিঙ্‌নির্ণয়ে অক্ষম হয়, তত্তদ্বিষয় সম্বন্ধে পূজ্যপাদাচার্য শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীর অলৌকিক দূরদৃষ্টি এবং অসাধারণ বহুদর্শিতা তাঁহাকে কি মীমাংসায় উপনীত করাইয়াছিল, গ্রন্থকার[১] এই পুস্তকে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার প্রযত্ন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যে শক্তিমান পুরুষের অদ্ভুত প্রতিভা এবং দিব্য চরিত্রবলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় জগতের মনীষিগণই স্তম্ভিত হইয়া অনতিকালপূর্বে তাঁহাকে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মহামহিম স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে, মঠে সর্বদা কিরূপ উচ্চভাবে কালক্ষেপ করিতেন, কিরূপ স্নেহে তাঁহার শিষ্যবর্গকে সর্বদা শিক্ষাদীক্ষাদি প্রদান করিতেন, নিজ গুরুভ্রাতৃগণকে কিরূপ উচ্চ সম্মান প্রদান করিতেন এবং সর্বোপরি নিজ গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জীবনে-মরণে কিরূপ ভাবে অনুসরণ করিতেন, মধ্যে মধ্যে তদ্বিষয়ের পরিচয়ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান করা হইয়াছে। আবার স্বামীজীর মতামত লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবার গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিয়া গ্রন্থকার পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত স্বামীজীর বেলুড়-মঠস্থ গুরুভ্রাতৃগণের দ্বারা সংশোধিত করাইয়া লইয়াছেন। গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয়সকলের স্থানকালাদির নির্ণয়ও যথাসাধ্য বিভাগ করিয়া পুস্তকখানিকে দুই খণ্ডে[২] বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।…

বিনীত নিবেদক—

শ্রীসারদানন্দ

১ শিষ্য—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী।

২ বর্তমান সংগ্রহে দুই খণ্ডের অধ্যায়গুলি একই ক্রমিক সংখ্যানুসারে নিবদ্ধ হইল।

দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদন হইতে

গত সাত বৎসর যাবৎ 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' 'উদ্বোধন' পত্রে ধারাবাহিকক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদিনে পুস্তকাকারে 'উদ্বোধন' আফিস হইতে প্রকাশিত হইল।

স্বামীজী যখন প্রথমবার বিলাত হইতে আসিয়া কলিকাতা বাগবাজার ৺বলরাম বসুর বাড়িতে অবস্থান করেন, তখন হইতে শিষ্যের সহিত স্বামীজীর নানারূপ বিচার ও শাস্ত্রপ্রসঙ্গ হইত। পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ঐ সময়ে একদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন তিনি শিষ্যকে বলেন যে, স্বামীজীর সহিত যে-সব প্রসঙ্গ হয়, তাহা যেন সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। মাস্টার মহাশয়ের আদেশে শিষ্য সেই-সকল প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—তাহাতেই বিস্তৃত আকারে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' লিখিত হইয়াছে।......

মাঘ, ১৩১৯

১

স্থান—কলিকাতা, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটী, বাগবাজার
কাল—ফেব্রুআরি (শেষ সপ্তাহ), ১৮৯৭

প্রথমবার বিলাত হইতে ভারতে ফিরিবার পর তিন চারদিন হইল স্বামীজী কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। আজ মধ্যাহ্নে বাগবাজারের রাজবল্লভ-পাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে স্বামীজীর নিমন্ত্রণ। সংবাদ পাইয়া বহু ভক্ত আজ তাঁহার বাড়িতে সমাগত হইতেছেন। শিষ্যও লোকমুখে সংবাদ পাইয়া মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়িতে বেলা প্রায় ২॥টার সময় উপস্থিত হইল। স্বামীজীর সঙ্গে শিষ্যের এখনও আলাপ হয় নাই। শিষ্যের জীবনে স্বামীজীর দর্শনলাভ এই প্রথম।

শিষ্য উপস্থিত হইবামাত্র স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহাকে স্বামীজীর নিকটে লইয়া যাইয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। স্বামীজী মঠে আসিয়া শিষ্যরচিত একটি 'শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র' পাঠ করিয়া ইতঃপূর্বেই তাহার বিষয় শুনিয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগরিষ্ঠ নাগ-মহাশয়ের[১] কাছে তাহার যে যাতায়াত আছে—ইহাও স্বামীজী জানিয়াছিলেন।

শিষ্য স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী তাহাকে সংস্কৃতে সম্ভাষণ করিয়া নাগ-মহাশয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার অমানুষিক ত্যাগ, উদ্দাম ভগবদনুরাগ ও দীনতার বিষয় উল্লেখ করিতে করিতে বলিলেন—'বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতাঃ মধুকর ত্বং খলু কৃতী'[২]। কথাগুলি নাগ-মহাশয়কে লিখিয়া জানাইতে শিষ্যকে আদেশ করিলেন। পরে বহু লোকের ভিড়ে আলাপ করিবার সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া, তাহাকে ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে পশ্চিমের ছোট ঘরে লইয়া গিয়া শিষ্যকে 'বিবেকচূড়ামণি'র এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন :

মা ভৈষ্ট বিদ্বন্ তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যুপায়ঃ।

---

১ শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী-ভক্ত দুর্গাচরণ নাগ

২ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—কালিদাস

যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি ॥[১]

এবং তাহাকে আচার্য শঙ্করের 'বিবেকচূড়ামণি' নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আদেশ করিলেন।

নানাপ্রসঙ্গ চলিতেছে এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল যে, 'মিরর'[২]-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী বলিলেন, 'তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।' নরেন্দ্রবাবু ছোট ঘরে আসিয়া বসিলেন এবং আমেরিকা ও ইংলণ্ড সম্বন্ধে স্বামীজীকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। উত্তরে স্বামীজী বলিলেন:

আমেরিকাবাসীর মতো এমন সহৃদয়, উদারচিত্ত, অতিথিসেবাপরায়ণ, নব নব ভাবগ্রহণে একান্ত সমুৎসুক জাতি জগতে আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। আমেরিকায় যা কিছু কাজ হয়েছে, তা আমার শক্তিতে হয়নি; আমেরিকার লোক এত সহৃদয় বলেই তাঁরা বেদান্তভাব গ্রহণ করেছেন।

ইংলণ্ডের কথায় বলিলেন: ইংরেজের মতো conservative (প্রাচীন রীতিনীতির পক্ষপাতী) জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নেই। তারা কোন নূতন ভাব সহজে গ্রহণ করতে চায় না, কিন্তু অধ্যবসায়ের সহিত যদি তাদের একবার কোন ভাব বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তবে তারা কিছুতেই তা আর ছাড়ে না। এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা অন্য কোন জাতিতে মেলে না। সেইজন্য তারা সভ্যতায় ও শক্তি-সঞ্চয়ে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

উপযুক্ত প্রচারক পাইলে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডেই বেদান্ত-প্রচারকার্য স্থায়ী হইবার অধিকতর সম্ভাবনা, ইহা জানাইয়া স্বামীজী বলিলেন:

আমি কেবল কাজের পত্তন মাত্র ক'রে এসেছি। পরবর্তী প্রচারকগণ ঐ পন্থা অনুসরণ করলে কালে অনেক কাজ হবে।

নরেন্দ্রবাবু। এইরূপ ধর্মপ্রচার দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের কি আশা আছে?

১ 'হে বিদ্বন্! ভয় পাইও না, তোমার বিনাশ নাই; সংসার-সাগর পার হইবার উপায় আছে। যে পথ অবলম্বন করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব যোগিগণ এই সংসার-সাগর পার হইয়াছেন; সেই পথ আমি তোমায় নির্দেশ করিয়া দিতেছি।'

২ 'Indian Mirror' পত্রিকা

স্বামীজী। আমাদের দেশে আছে মাত্র এই বেদান্তধর্ম। পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় আমাদের এখন আর কিছু নেই বললেই হয়। কিন্তু এই সার্বভৌম বেদান্তবাদ—যা সকল মতের, সকল পথের লোককেই ধর্মলাভে সমান অধিকার প্রদান করে—এর প্রচারের দ্বারা পাশ্চাত্য সভ্য জগৎ জানতে পারবে, ভারতবর্ষে এক সময়ে কি আশ্চর্য ধর্মভাবের স্ফুরণ হয়েছিল এবং এখনও রয়েছে। এই মতের চর্চায় পাশ্চাত্য জাতির আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হবে—অনেকটা এখনই হয়েছে। এইরূপে যথার্থ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করতে পারলে আমরা তাদের নিকট ঐহিক জীবনের বিজ্ঞানাদি শিক্ষা ক'রে জীবন-সংগ্রামে অধিকতর পটু হবো। পক্ষান্তরে তারা আমাদের নিকট এই বেদান্তমত শিক্ষা ক'রে পারমার্থিক কল্যাণলাভে সমর্থ হবে।

নরেন্দ্রবাবু। এই আদান-প্রদানে আমাদের রাজনৈতিক কোন উন্নতির আশা আছে কি?

স্বামীজী। ওরা (পাশ্চাত্যেরা) মহাপরাক্রান্ত বিরোচনের[১] সন্তান; ওদের শক্তিতে পঞ্চভূত ক্রীড়াপুত্তলিকার মতো কাজ করছে; আপনারা যদি মনে করেন, আমরা এদের সঙ্গে সংঘর্ষে ঐ স্থূল পাঞ্চভৌতিক শক্তি-প্রয়োগ করেই একদিন স্বাধীন হবো, তবে আপনারা নেহাত ভুল বুঝছেন। হিমালয়ের সামনে সামান্য উপলখণ্ড যেমন, ওদের ও আমাদের ঐ শক্তি-প্রয়োগকুশলতায় তেমনি প্রভেদ। আমার মত কি জানেন? আমরা এইরূপে বেদান্তোক্ত ধর্মের গূঢ় রহস্য পাশ্চাত্য জগতে প্রচার ক'রে, ঐ মহাশক্তিধরগণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ ক'রে ধর্মবিষয়ে চিরদিন ওদের গুরুস্থানীয় থাকব এবং ওরা ইহলৌকিক অন্যান্য বিষয়ে আমাদের গুরু থাকবে। ধর্ম জিনিসটা ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভারতবাসী যেদিন পাশ্চাত্যের পদতলে ধর্ম শিখতে বসবে, সেইদিন এ অধঃপতিত জাতির জাতিত্ব একেবারে ঘুচে যাবে। দিনরাত চীৎকার ক'রে ওদের—'এ দেও, ও দেও' বললে কিছু হবে না। আদান-প্রদানরূপ কাজের দ্বারা যখন উভয়পক্ষের ভিতর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির একটা টান দাঁড়াবে, তখন আর চেঁচামেচি করতে হবে না। ওরা আপনা হতেই সব করবে।

১ অসুর, দেহাত্মবাদী, ভোগবাদী—দ্রষ্টব্য: ছান্দোগ্য উপ, ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ

আমার বিশ্বাস—এইরূপে, ধর্মের চর্চায় ও বেদান্তধর্মের বহুল প্রচারে এদেশ ও পাশ্চাত্য দেশ—উভয়েরই বিশেষ লাভ। রাজনীতিচর্চা এর তুলনায় আমার কাছে গৌণ (secondary) উপায় ব'লে বোধ হয়। আমি এই বিশ্বাস কাজে পরিণত করতে জীবনক্ষয় ক'রব। আপনারা ভারতের কল্যাণ অন্যভাবে সাধিত হবে বুঝে থাকেন তো অন্যভাবে কাজ ক'রে যান।

নরেন্দ্রবাবু স্বামীজীর কথায় সম্মতি প্রকাশ করিয়া কিছুক্ষণ বাদে উঠিয়া গেলেন। শিষ্য স্বামীজীর পূর্বোক্ত কথাগুলি শুনিয়া অবাক হইয়া তাঁহার দীপ্ত মূর্তির দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

নরেন্দ্রবাবু চলিয়া গেলে পর, গোরক্ষিণী সভার জনৈক উদ্যোগী প্রচারক স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে উপস্থিত হইলেন। পুরা না হইলেও ইঁহার বেশভূষা অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো—মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি বাঁধা, দেখিলেই বুঝা যায় ইনি হিন্দুস্থানী। গোরক্ষা-প্রচারকের আগমন-বার্তা পাইয়া স্বামীজী বাহিরের ঘরে আসিলেন। প্রচারক স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া গোমাতার একখানি ছবি তাঁহাকে উপহার দিলেন। স্বামীজী উহা হাতে লইয়া নিকটবর্তী অপর এক ব্যক্তির হাতে দিয়া তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত আলাপ করিয়াছিলেন :

স্বামীজী। আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কি?

প্রচারক। আমরা দেশের গোমাতাগণকে কসাইয়ের হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকি। স্থানে স্থানে পিঁজরাপোল স্থাপন করা হইয়াছে। সেখানে রুগ্ন, অকর্মণ্য এবং কসাইয়ের হাত হইতে ক্রীত গোমাতাগণ প্রতিপালিত হন।

স্বামীজী। এ অতি উত্তম কথা। আপনাদের আয়ের পন্থা কি?

প্রচারক। দয়াপরবশ হইয়া আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ যাহা কিছু দেন, তাহা দ্বারাই সভার ঐ কার্য নির্বাহ হয়।

স্বামীজী। আপনাদের গচ্ছিত কত টাকা আছে?

প্রচারক। মারোয়াড়ী বণিকসম্প্রদায় এ কার্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা এই সৎকার্যে বহু অর্থ দিয়াছেন।

স্বামীজী। মধ্য-ভারতে এবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ভারত গভর্নমেণ্ট নয় লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করেছেন। আপনাদের সভা এই দুর্ভিক্ষকালে কোন সাহায্যদানের আয়োজন করেছে কি?

প্রচারক। আমরা দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য করি না। কেবলমাত্র গোমাতাগণের রক্ষাকল্পেই এই সভা স্থাপিত।

স্বামীজী। যে দুর্ভিক্ষে আপনাদের জাতভাই লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল, সামর্থ্য সত্ত্বেও আপনারা এই ভীষণ দুর্দিনে তাদের অন্ন দিয়ে সাহায্য করা উচিত মনে করেননি?

প্রচারক। না। লোকের কর্মফলে—পাপে এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' হইয়াছে।

প্রচারকের কথা শুনিয়া স্বামীজীর বিশাল নয়নপ্রান্তে যেন অগ্নিকণা স্ফুরিত হইতে লাগিল, মুখ আরক্তিম হইল; কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া বলিলেন:

যে সভা-সমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না, নিজের ভাই অনশনে মরছে দেখেও তার প্রাণরক্ষার জন্য এক মুষ্টি অন্ন না দিয়ে পশুপক্ষিরক্ষার জন্য রাশি রাশি অন্ন বিতরণ করে, তার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই; তার দ্বারা সমাজের বিশেষ কিছু উপকার হয় ব'লে আমার বিশ্বাস নেই। কর্মফলে মানুষ মরছে—এরূপে কর্মের দোহাই দিলে জগতে কোন বিষয়ের জন্য চেষ্টাচরিত্র করাটাই একেবারে বিফল ব'লে সাব্যস্ত হয়। আপনাদের পশুরক্ষার কাজটাও বাদ যায় না। ঐ কাজ সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে—গোমাতারা নিজ নিজ কর্মফলেই কসাইদের হাতে যাচ্ছেন ও মরছেন, আমাদের ওতে কিছু করবার প্রয়োজন নেই।

প্রচারক। (একটু অপ্রতিভ হইয়া) হাঁ, আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য; কিন্তু শাস্ত্র বলে—গরু আমাদের মাতা।

স্বামীজী। (হাসিতে হাসিতে) হাঁ, গরু আমাদের যে মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি—তা না হ'লে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন?

হিন্দুস্থানী প্রচারক ঐ বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া (বোধ হয় স্বামীজীর বিষম বিদ্রূপ তিনি বুঝিতেই পারিলেন না) স্বামীজীকে বলিলেন যে, সেই সমিতির উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার কাছে কিছু ভিক্ষাপ্রার্থী।

স্বামীজী। আমি তো সন্ন্যাসী ফকির লোক। আমি কোথায় অর্থ পাবো, যাতে আপনাদের সাহায্য ক'রব? তবে আমার হাতে যদি কখনও অর্থ হয়, আগে মানুষের সেবায় ব্যয় ক'রব; মানুষকে আগে বাঁচাতে হবে—অন্নদান, বিদ্যাদান, ধর্মদান করতে হবে। এ-সব ক'রে যদি অর্থ বাকী থাকে, তবে আপনাদের সমিতিতে কিছু দেওয়া যাবে।

কথা শুনিয়া প্রচারক মহাশয় স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন স্বামীজী আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন:

কি কথাই বললে! বলে কিনা—কর্মফলে মানুষ মরছে, তাদের দয়া ক'রে কি হবে? দেশটা যে অধঃপাতে গেছে, এই তার চূড়ান্ত প্রমাণ। তোদের হিন্দুধর্মের কর্মবাদ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখলি? মানুষ হয়ে মানুষের জন্যে যাদের প্রাণ না কাঁদে, তারা কি আবার মানুষ?

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর সর্বাঙ্গ যেন ক্ষোভে দুঃখে শিহরিয়া উঠিল। পরে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন:

আবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রো।

শিষ্য। আপনি কোথায় থাকিবেন? হয়তো কোন বড় মানুষের বাড়িতে থাকিবেন। আমাকে তথায় যাইতে দিবে তো?

স্বামীজী। সম্প্রতি আমি কখন আলমবাজার মঠে, কখন কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে থাকব। তুমি সেখানে যেও।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার সঙ্গে নির্জনে কথা কহিতে বড় ইচ্ছা হয়।

স্বামীজী। তাই হবে—একদিন রাত্রিতে যেও। খুব বেদান্তের কথা হবে।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার সঙ্গে কতকগুলি ইংরেজ ও আমেরিকান আসিয়াছে শুনিয়াছি, তাহারা আমার বেশভূষা ও কথাবার্তায় রুষ্ট হইবে না তো?

স্বামীজী। তারাও সব মানুষ—বিশেষতঃ বেদান্তধর্মনিষ্ঠ। তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে তারা খুশী হবে।

শিষ্য। মহাশয়, বেদান্তে অধিকারীর যে-সব লক্ষণ আছে, তাহা আপনার পাশ্চাত্য শিষ্যদের ভিতরে কিরূপে আসিল? শাস্ত্রে বলে—অধীতবেদ-বেদান্ত, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠানকারী, আহার-বিহারে পরম সংযত, বিশেষতঃ চতুঃসাধনসম্পন্ন না হইলে বেদান্তের অধিকারী হয়

না। আপনার পাশ্চাত্য শিষ্যেরা একে অব্রাহ্মণ, তাহাতে অশন-বসনে অনাচারী; তাহারা বেদান্তবাদ বুঝিল কি করিয়া?

স্বামীজী। তাদের সঙ্গে আলাপ করেই বুঝতে পারবে, তারা বেদান্ত বুঝেছে কি না।

অনন্তর স্বামীজী কয়েকজন ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া বাগবাজারের শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে গেলেন। শিষ্য বটতলায় একখানা 'বিবেক-চূড়ামণি' গ্রন্থ ক্রয় করিয়া দরজীপাড়ায় নিজ বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

২

স্থান—কলিকাতা হইতে কাশীপুর যাইবার পথে ও
গোপাললাল শীলের বাগানে

কাল—ফেব্রুআরি বা মার্চ, ১৮৯৭ খৃঃ

স্বামীজী আজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ[১] মহাশয়ের বাটীতে মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিতেছিলেন। শিষ্য সেখানে আসিয়া প্রণাম করিয়া দেখিল, স্বামীজী তখন গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে যাইবার জন্য প্রস্তুত। গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। শিষ্যকে বলিলেন, 'চল্ আমার সঙ্গে।' শিষ্য সম্মত হইলে স্বামীজী তাহাকে সঙ্গে লইয়া গাড়িতে উঠিলেন; গাড়ি ছাড়িল। চিৎপুরের রাস্তায় আসিয়া গঙ্গাদর্শন হইবামাত্র স্বামীজী আপন মনে সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, 'গঙ্গা-তরঙ্গ-রমণীয়-জটা-কলাপং'[২] ইত্যাদি। শিষ্য মুগ্ধ হইয়া সে অদ্ভুত স্বরলহরী নিঃশব্দে শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইলে একখানা রেলের ইঞ্জিন চিৎপুর 'হাইড্রলিক ব্রিজের' দিকে যাইতেছে দেখিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'দেখ্ দেখি কেমন সিঙ্গির মতো যাচ্ছে।' শিষ্য বলিল:

ইহা তো জড়। ইহার পশ্চাতে মানুষের চেতনশক্তি ক্রিয়া করিতেছে,

---

১ বিখ্যাত নট ও নাট্যকার শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ

২ ব্যাসকৃত 'বিশ্বনাথস্তবঃ'

তবে তো ইহা চলিতেছে। ঐরূপে চলায় ইহার নিজের বাহাদুরি আর কি আছে?

স্বামীজী। বল্ দেখি চেতনের লক্ষণ কি?

শিষ্য। কেন মহাশয়, যাহাতে বুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়া দেখা যায়, তাহাই চেতন।

স্বামীজী। যা nature-এর againstএ rebel (প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ) করে, তাই চেতন; তাতেই চৈতন্যের বিকাশ রয়েছে। দেখ্ না, একটা সামান্য পিঁপড়েকে মারতে যা, সেও জীবনরক্ষার জন্য একবার rebel (লড়াই) করবে। যেখানে struggle (চেষ্টা বা পুরুষকার), যেখানে rebellion (বিদ্রোহ), সেখানেই জীবনের চিহ্ন—সেখানেই চৈতন্যের বিকাশ।

শিষ্য। মানুষের ও মনুষ্যজাতিসমূহের সম্বন্ধেও কি ঐ নিয়ম খাটে?

স্বামীজী। খাটে কি না একবার জগতের ইতিহাসটা পড়ে দেখ্ না। দেখ্‌বি, তোরা ছাড়া আর সব জাতি সম্বন্ধেই ঐ কথা খাটে। তোরাই কেবল জগতে আজকাল জড়বৎ পড়ে আছিস্। তোদের hypnotise (বিমোহিত) ক'রে ফেলেছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে অন্যে বলেছে—তোরা হীন, তোদের কোন শক্তি নেই। তোরাও তাই শুনে আজ হাজার বচ্ছর হ'তে চ'লল ভাবছিস—আমরা হীন, সব বিষয়ে অকর্মণ্য! ভেবে ভেবে তাই হয়ে পড়েছিস। (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ দেহও তো তোদের দেশের মাটি থেকেই জন্মেছে। আমি কিন্তু কখনও ওরূপ ভাবিনি। তাই দে ্ না, তাঁর (ঈশ্বরের) ইচ্ছায়, যারা আমাদের চিরকাল হীন মনে করে, তারাই আমাকে দেবতার মতো খাতির করেছে ও করছে। তোরাও যদি ঐরূপ ভাবতে পারিস—'আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ আছে' এবং অনন্তের ঐ শক্তি জাগাতে পারিস তো তোরাও আমার মতো হ'তে পারিস।

শিষ্য। ঐরূপ ভাবিবার শক্তি কোথায়, মহাশয়? বাল্যকাল হইতেই ঐ কথা শোনায় ও বুঝাইয়া দেয়, এমন শিক্ষক বা উপদেষ্টাই বা কোথায়? লেখাপড়া করা আজকাল কেবল চাকরিলাভের জন্য,—এই কথাই আমরা সকলের নিকট হইতে শুনিয়াছি ও শিখিয়াছি।

স্বামীজী। তাই তো আমরা এসেছি তদ্রূপ শেখাতে ও দেখাতে। তোরা আমাদের কাছ থেকে ঐ তত্ত্ব শেখ্, বোঝ্, অনুভূতি কর্—তারপর নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ঐ ভাব ছড়িয়ে দে। সকলকে গিয়ে বল্—'ওঠ, জাগো, আর ঘুমিও না; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, এ কথা বিশ্বাস করো, তা হলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে।' ঐ কথা সকলকে বল্ এবং সেই সঙ্গে সাদা কথায় বিজ্ঞান দর্শন ভূগোল ও ইতিহাসের মূল কথাগুলি mass-এর (সাধারণের) ভেতর ছড়িয়ে দে। আমি অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে একটি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) তৈয়ার ক'রব—প্রথম তাদের শেখাব, তারপর তাদের দিয়ে এই কাজ করাবো, মতলব করেছি।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ঐরূপ করা তো অনেক অর্থসাপেক্ষ। টাকা কোথায় পাইবেন?

স্বামীজী। তুই কি বলছিস? মানুষেই তো টাকা করে। টাকায় মানুষ করে, এ কথা কবে কোথায় শুনেছিস? তুই যদি মন মুখ এক করতে পারিস, কথায় ও কাজে এক হ'তে পারিস তো জলের মতো টাকা আপনা-আপনি তোর পায়ে এসে পড়বে।

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, না হয় স্বীকারই করিলাম যে, টাকা আসিল এবং আপনি ঐরূপে সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিলেন। তাহাতেই বা কি? ইতঃপূর্বেও কত মহাপুরুষ কত ভাল ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন। সে-সকল এখন কোথায়? আপনার প্রতিষ্ঠিত কার্যেরও সময়ে ঐরূপ দশা হইবে নিশ্চয়। তবে ঐরূপ উদ্যমের আবশ্যকতা কি?

স্বামীজী। পরে কি হবে সর্বদা এ কথাই যে ভাবে, তার দ্বারা কোন কাজই হ'তে পারে না। যা সত্য ব'লে বুঝেছিস, তা এখনি ক'রে ফেল্; পরে কি হবে না হবে, সে কথা ভাববার দরকার কি? এতটুকু তো জীবন—তার ভেতর অত ফলাফল খতালে কি কোন কাজ হ'তে পারে? ফলাফলদাতা একমাত্র তিনি (ঈশ্বর) যা হয় করবেন। সে কথায় তোর কাজ কি? তুই ওদিকে না দেখে কেবল কাজ ক'রে যা।

বলিতে বলিতে গাড়ি বাগানবাড়িতে পঁহুছিল। কলিকাতা হইতে অনেক লোক স্বামীজীকে দর্শন করিতে সেদিন বাগানে আসিয়াছেন। স্বামীজী গাড়ি হইতে নামিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া বসিলেন এবং তাঁহাদিগের সকলের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন; স্বামীজীর বিলাতী শিষ্য গুডউইন সাহেব সাক্ষাৎ 'সেবা'র মতো অনতিদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন; ইতঃপূর্বে তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়ায় শিষ্য তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইল এবং উভয়ে মিলিয়া স্বামীজী সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথোপকথনে নিযুক্ত হইল।

সন্ধ্যার পর স্বামীজী শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুই কি কঠোপনিষদ কণ্ঠস্থ করেছিস?'

শিষ্য। না মহাশয়, শাঙ্করভাষ্যসমেত উহা পড়িয়াছি মাত্র।

স্বামীজী। উপনিষদের মধ্যে এমন সুন্দর গ্রন্থ আর দেখা যায় না। ইচ্ছা হয় তোরা এ-খানা কণ্ঠে ক'রে রাখিস। নচিকেতার মতো শ্রদ্ধা সাহস বিচার ও বৈরাগ্য জীবনে আনবার চেষ্টা কর্। শুধু পড়লে কি হবে?

শিষ্য। কৃপা করুন, যাহাতে দাসের ঐ-সকল অনুভূতি হয়।

স্বামীজী। ঠাকুরের কথা শুনেছিস তো? তিনি বলতেন, 'কৃপা-বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।' কেউ কাকেও কিছু ক'রে দিতে পারে কি রে বাপ? নিজের নিয়তি নিজের হাতে—গুরু এইটুকু কেবল বুঝিয়ে দেন মাত্র। বীজের শক্তিতেই গাছ হয়, জল ও বায়ু কেবল তার সহায়ক মাত্র।

শিষ্য। বাহিরের সহায়তারও আবশ্যক আছে, মহাশয়?

স্বামীজী। তা আছে। তবে কি জানিস—ভেতরে পদার্থ না থাকলে শত সহায়তায়ও কিছু হয় না। তবে সকলেরই আত্মানুভূতির একটা সময় আসে, কারণ সকলেই ব্রহ্ম। উচ্চনীচ-প্রভেদ করাটা কেবল ঐ ব্রহ্মবিকাশের তারতম্যে। সময়ে সকলেরই পূর্ণ বিকাশ হয়। তাই শাস্ত্র বলেছেন, 'কালেনাত্মনি বিন্দতি'।

শিষ্য। কবে আর ঐরূপ হবে মহাশয়? শাস্ত্রমুখে শুনি, কত জন্ম আমরা অজ্ঞানতায় কাটাইয়াছি!

স্বামীজী। ভয় কি? এবার যখন এখানে এসে পড়েছিস, তখন এবারেই

হয়ে যাবে। মুক্তি, সমাধি—এ-সব কেবল ব্রহ্মপ্রকাশের পথের প্রতিবন্ধগুলি দূর ক'রে দেওয়া। নতুবা আত্মা-সূর্যের মতো সর্বদা জ্বলছেন। অজ্ঞানমেঘ তাঁকে ঢেকেছে মাত্র। সেই মেঘকেও সরিয়ে দেওয়া আর সূর্যেরও প্রকাশ হওয়া। তখনি 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ'[১] ইত্যাদি অবস্থা হওয়া; যত পথ দেখছিস, সবই এ পথের প্রতিবন্ধ দূর করতে উপদেশ দিচ্ছে। যে যে-ভাবে আত্মানুভব করেছে, সে সেইভাবে উপদেশ দিয়ে গিয়েছে। উদ্দেশ্য সকলেরই কিন্তু আত্মজ্ঞান—আত্মদর্শন। এতে সর্ব জাতি—সর্ব জীবের সমান অধিকার। এটাই সর্ববাদিসম্মত মত।

শিষ্য। মহাশয়, শাস্ত্রের ঐ কথা যখন পড়ি বা শুনি, তখন আজও আত্মবস্তুর প্রত্যক্ষ হইল না ভাবিয়া প্রাণ যেন ছটফট করে।

স্বামীজী। এরই নাম ব্যাকুলতা। ঐটে যত বেড়ে যাবে, ততই প্রতিবন্ধ-রূপ মেঘ কেটে যাবে, ততই শ্রদ্ধা দৃঢ়তর হবে। ক্রমে আত্মা 'করতলামলকবৎ' প্রত্যক্ষ হবেন। অনুভূতিই ধর্মের প্রাণ। কতকগুলি আচার-নিয়ম সকলেই মেনে চলতে পারে, কতকগুলি বিধি-নিষেধ সকলেই পালন করতে পারে; কিন্তু অনুভূতির জন্য ক-জন লোক ব্যাকুল হয়? ব্যাকুলতা—ঈশ্বরলাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্য উন্মাদ হওয়াই যথার্থ ধর্মপ্রাণতা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্য গোপীদের যেমন উদ্দাম উন্মত্ততা ছিল, আত্মদর্শনের জন্যও সেইরূপ ব্যাকুলতা চাই। গোপীদের মনেও একটু একটু পুরুষ-মেয়ে-ভেদ ছিল। ঠিক ঠিক আত্মজ্ঞানে ঐ ভেদ একেবারেই নেই।

('গীতগোবিন্দ' সম্বন্ধে কথা তুলিয়া বলিতে লাগিলেন)

জয়দেবই সংস্কৃত ভাষার শেষ কবি। তবে জয়দেব ভাবাপেক্ষা অনেক স্থলে jingling of words (শ্রুতিমধুর বাক্যবিন্যাসের) দিকে বেশী নজর রেখেছেন। দেখ্ দেখি গীতগোবিন্দের 'পততি পতত্রে'[২] ইত্যাদি শ্লোকে অনুরাগ-ব্যাকুলতার কি culmination (পরাকাষ্ঠা) কবি

---

১ মুণ্ডক উপনিষদ্ ২।২।৮

২ পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্।

দেখিয়েছেন! আত্মদর্শনের জন্য ঐরূপ অনুরাগ হওয়া চাই, প্রাণের ভেতরটা ছটফট করা চাই। আবার বৃন্দাবনলীলার কথা ছেড়ে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কেমন হৃদয়গ্রাহী তাও দেখ্! অমন ভয়ানক যুদ্ধকোলাহলেও কৃষ্ণ কেমন স্থির, গম্ভীর, শান্ত! যুদ্ধক্ষেত্রেই অর্জুনকে গীতা বলছেন, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম—যুদ্ধ করতে লাগিয়ে দিচ্ছেন! এই ভয়ানক যুদ্ধের প্রবর্তক হয়েও নিজে শ্রীকৃষ্ণ কেমন কর্মহীন—অস্ত্র ধরলেন না! যে দিকে চাইবি, দেখবি শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র perfect (সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ)। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ—তিনি যেন সকলেরই মূর্তিমান্ বিগ্রহ! শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটিরই আজকাল বিশেষভাবে আলোচনা চাই। এখন বৃন্দাবনের বাঁশীবাজানো কৃষ্ণকেই কেবল দেখলে চলবে না, তাতে জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা; ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা-কালী এঁদের পূজা। তবে তো লোকে মহা উদ্যমে কর্মে লেগে শক্তিমান্ হয়ে উঠবে। আমি বেশ ক'রে বুঝে দেখেছি, এদেশে এখন যারা ধর্ম ধর্ম করে, তাদের অনেকেই full of morbidity—cracked brains অথবা fanatic (মজ্জাগত দুর্বলতা-সম্পন্ন, বিকৃত-মস্তিষ্ক অথবা বিচারশূন্য ধর্মোন্মাদ)। মহা রজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন এখন তোদের না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল। দেশ ঘোর তমো-তে ছেয়ে ফেলেছে। ফলও তাই হচ্ছে—ইহজীবনে দাসত্ব, পরলোকে নরক।

শিষ্য। পাশ্চাত্যদেশীয়দের রজোভাব দেখিয়া আপনার কি আশা হয়, তাহারা ক্রমে সাত্ত্বিক হইবে?

স্বামীজী। নিশ্চয়। মহারজোগুণসম্পন্ন তারা এখন ভোগের শেষ সীমায় উঠেছে। তাদের যোগ হবে না তো কি পেটের দায়ে লালায়িত তোদের হবে? তাদের উৎকৃষ্ট ভোগ দেখে আমার 'মেঘদূতে'র 'বিদ্যুত্বন্তং ললিতবসনাঃ'[১] ইত্যাদি চিত্র মনে প'ড়ত। আর তোদের ভোগের ভেতর হচ্ছে কি না—স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে বছরে বছরে শোরের মতো বংশবৃদ্ধি—begetting a band of famished beggars and

১ বিদ্যুত্বন্তং ললিতবসনাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।—কালিদাস

slaves (একপাল ক্ষুধাতুর ভিক্ষুক ও ক্রীতদাসের জন্ম দেওয়া)! তাই বলছি এখন মানুষকে রজোগুণে উদ্দীপিত ক'রে কর্মপ্রাণ করতে হবে। কর্ম—কর্ম—কর্ম। এখন 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'—এ ছাড়া উদ্ধারের আর অন্য পথ নেই।

শিষ্য। মহাশয়, আমাদের পূর্বপুরুষগণ কি রজোগুণসম্পন্ন ছিলেন?

স্বামীজী। ছিলেন না? এই তো ইতিহাস বলছে, তাঁরা কত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন—তিব্বত, চীন, সুমাত্রা, সুদূর জাপানে পর্যন্ত ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছেন। রজোগুণের ভেতর দিয়ে না গেলে উন্নতি হবার জো আছে কি?

কথায় কথায় রাত্রি হইল। এমন সময় মিস মূলার (Miss Muller) আসিয়া পঁহুছিলেন। ইনি একজন ইংরেজ মহিলা, স্বামীজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্না। স্বামীজী ইঁহার সহিত শিষ্যের পরিচয় করাইয়া দিলেন। অল্পক্ষণ বাক্যালাপের পরেই মিস মূলার উপরে চলিয়া গেলেন।

স্বামীজী। দেখছিস কেমন বীরের জাত এরা! কোথায় বাড়ি-ঘর, বড় মানুষের মেয়ে, তবু ধর্মলাভের আশায় কোথায় এসে পড়েছে!

শিষ্য। হাঁ মহাশয়, আপনার ক্রিয়াকলাপ কিন্তু আরও অদ্ভুত। কত সাহেব-মেম আপনার সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত! এ কালে এটা বড়ই আশ্চর্যের কথা।

স্বামীজী। (নিজের দেহ দেখাইয়া) শরীর যদি থাকে, তবে আরও কত দেখবি; উৎসাহী ও অনুরাগী কতকগুলি যুবক পেলে আমি দেশটাকে তোলপাড় ক'রে দেব। মান্দ্রাজে জন-কতক আছে। কিন্তু বাঙলায় আমার আশা বেশী। এমন পরিষ্কার মাথা অন্য কোথাও প্রায় জন্মে না। কিন্তু এদের muscles-এ (মাংসপেশীতে) শক্তি নেই। Brain ও muscles (মস্তিষ্ক ও মাংসপেশী) সমানভাবে developed (সুগঠিত, পরিপুষ্ট) হওয়া চাই। Iron nerves with a well intelligent brain and the whole world is at your feet (লোহার মতো শক্ত স্নায়ু ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকলে সমগ্র জগৎ পদানত হয়)।

সংবাদ আসিল, স্বামীজীর খাবার প্রস্তুত হইয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'চল্, আমার খাওয়া দেখবি।' আহার করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, 'মেলাই তেল-চর্বি খাওয়া ভাল নয়। লুচি হ'তে রুটি ভাল। লুচি রোগীর আহার। মাছ, মাংস, fresh vegetable (তাজা তরিতরকারি) খাবি, মিষ্টি কম।' বলিতে বলিতে প্রশ্ন করিলেন, 'হ্যাঁরে, ক-খানা রুটি খেয়েছি? আর কি খেতে হবে?' কত খাইয়াছেন তাহা স্বামীজীর স্মরণ নাই। ক্ষুধা আছে কিনা তাহাও বুঝিতে পারিতেছেন না!

আরও কিছু খাইয়া স্বামীজী আহার শেষ করিলেন। শিষ্যও বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিল। গাড়ি না পাওয়ায় পদব্রজে চলিল; চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, কাল আবার কখন স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিবে।

৩

স্থান—কাশীপুর, ৺গোপাললাল শীলের বাগান

কাল—মার্চ, ১৮৯৭

প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া স্বামীজী কয়েক দিন কাশীপুরে ৺গোপাললাল শীলের বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন, শিষ্য তখন প্রতিদিন সেখানে যাতায়াত করিত। স্বামীজীর দর্শনমানসে তখন বহু উৎসাহী যুবকের সেখানে ভিড় হইত। কেহ ঔৎসুক্যের বশবর্তী হইয়া, কেহ তত্ত্বান্বেষী হইয়া, কেহ বা স্বামীজীর জ্ঞান-গরিমা পরীক্ষা করিবার জন্য তখন স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিত। প্রশ্নকর্তারা স্বামীজীর শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত; স্বামীজীর কণ্ঠে বীণাপাণি যেন সর্বদা অবস্থান করিতেন।

কলিকাতা বড়বাজারে বহু পণ্ডিতের বাস। ধনী মারোয়াড়ী বণিকগণের অন্নেই ইঁহারা প্রতিপালিত। স্বামীজীর সুনাম অবগত হইয়া কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত স্বামীজীর সঙ্গে তর্ক করিবার জন্য একদিন এই বাগানে উপস্থিত হন। শিষ্য সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল।

আগন্তুক পণ্ডিতগণের সকলেই সংস্কৃতভাষায় অনর্গল কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। তাঁহারা আসিয়াই মণ্ডলীপরিবেষ্টিত স্বামীজীকে সম্ভাষণ করিয়া সংস্কৃতভাষায় কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। স্বামীজীও সংস্কৃতেই তাঁহাদিগকে উত্তর দিতে লাগিলেন। পণ্ডিতেরা সকলেই প্রায় এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া সংস্কৃতে স্বামীজীকে দার্শনিক কূট প্রশ্নসমূহ করিতেছিলেন এবং স্বামীজী প্রশান্ত গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে ঐ-বিষয়ক নিজ মীমাংসাদ্যোতক সিদ্ধান্তগুলি বলিতেছিলেন। ইহাও বেশ মনে আছে যে, স্বামীজীর সংস্কৃত-ভাষা পণ্ডিতগণের ভাষা অপেক্ষা শ্রুতিমধুর ও সুললিত হইতেছিল। পণ্ডিতগণও ঐ কথা পরে স্বীকার করিয়াছিলেন।

সংস্কৃতভাষায় স্বামীজীকে ঐরূপে অনর্গল কথাবার্তা বলিতে দেখিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণও সেদিন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কারণ, গত ছয় বৎসর কাল ইওরোপ ও আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বামীজী যে সংস্কৃত-আলোচনার তেমন সুবিধা পান নাই, তাহা সকলেরই জানা ছিল। শাস্ত্রদর্শী এই সকল পণ্ডিতের সঙ্গে ঐরূপ তর্কালাপে সেদিন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল, স্বামীজীর মধ্যে অদ্ভুত শক্তির স্ফুরণ হইয়াছে। সেদিন ঐ সভায় রামকৃষ্ণানন্দ, শিবানন্দ, যোগানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও নির্মলানন্দ মহারাজগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাদে স্বামীজী সিদ্ধান্তপক্ষ এবং পণ্ডিতগণ পূর্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। শিষ্যের মনে পড়ে, বিচারকালে স্বামীজী এক স্থলে 'অস্তি' স্থলে 'স্বস্তি' প্রয়োগ করায় পণ্ডিতগণ হাসিয়া উঠেন; তাহাতে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বলেন, 'পণ্ডিতানাং দাসোঽহং ক্ষন্তব্যমেতৎ স্খলনম্'। পণ্ডিতেরাও স্বামীজীর এইরূপ দীন ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যান। অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর সিদ্ধান্তপক্ষের মীমাংসা পর্যাপ্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিলেন এবং প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। দুই-চারি জন আগন্তুক ভদ্রলোক ঐ সময় তাঁহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়গণ, স্বামীজীকে কিরূপ বোধ হইল?' তদুত্তরে বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিত বলিলেন, 'ব্যাকরণে গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও স্বামীজী শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদ্রষ্টা, মীমাংসা করিতে অদ্বিতীয় এবং স্বীয় প্রতিভাবলে বাদখণ্ডনে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন।'

পণ্ডিতগণ চলিয়া গেলে স্বামীজী শিষ্যকে বলেন যে, পূর্বপক্ষকারী উক্ত পণ্ডিতগণ পূর্বমীমাংসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। স্বামীজী উত্তরমীমাংসা-পক্ষ অবলম্বনে

তাঁহাদিগের নিকট জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতগণও তাঁহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ব্যাকরণগত একটি ভুল ধরিয়া পণ্ডিতগণ যে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্বামীজী বলেন যে, অনেক বৎসর যাবৎ সংস্কৃতে কথাবার্তা না বলায় তাঁহার ঐরূপ ভ্রম হইয়াছিল। পণ্ডিতগণের উপর সেজন্য তিনি কিছুমাত্র দোষারোপ করেন নাই। ঐ বিষয়ে স্বামীজী ইহাও কিন্তু বলিয়াছিলেন :

পাশ্চাত্যদেশে বাদের মূল বিষয় ছেড়ে ঐভাবে ভাষার সামান্য ভুল ধরা প্রতিপক্ষের পক্ষে মহা অসৌজন্য। সভ্যসমাজ ঐরূপ স্থলে ভাবটাই নেয়—ভাষার দিকে লক্ষ্য করে না। তোদের দেশে কিন্তু খোসা নিয়েই মারামারি চলছে—ভেতরকার শস্যের সন্ধান কেউ করে না।

পরে স্বামীজী শিষ্যের সঙ্গে সেদিন সংস্কৃতে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যও ভাঙা ভাঙা সংস্কৃতে জবাব দিতে লাগিল, তিনি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐদিন হইতে শিষ্য স্বামীজীর অনুরোধে তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে দেবভাষায় কথাবার্তা কহিত।

'সভ্যতা' কাহাকে বলে, ইহার উত্তরে সেদিন স্বামীজী বলেন :

যে সমাজ বা যে জাতি আধ্যাত্মিক ভাবে যত অগ্রসর, সে সমাজ ও সে জাতি তত সভ্য। নানা কল-কারখানা ক'রে ঐহিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে পারলেই যে জাতিবিশেষ সভ্য হয়েছে, তা বলা চলে না। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা লোকের হাহাকার ও অভাবই দিন দিন বৃদ্ধি ক'রে দিচ্ছে, পরন্তু ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা সর্বসাধারণকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা প্রদর্শন ক'রে লোকের ঐহিক অভাব এককালে দূর করতে না পারলেও নিঃসন্দেহে অনেকটা কমাতে সমর্থ হয়েছিল। ইদানীন্তন কালে ঐ উভয় সভ্যতার একত্র সংযোগ করতেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেছেন। একালে একদিকে যেমন লোককে কর্মতৎপর হ'তে হবে, অপরদিকে তাদের তেমনি গভীর অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। এরূপে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যোন্য-সংমিশ্রণে জগতে এক নবযুগের অভ্যুদয় হবে।

এ-কথা স্বামীজী সেদিন বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন; ঐ কথা বুঝাইতে বুঝাইতে একস্থলে বলিয়াছিলেন :

আর এক কথা—ওদেশের লোকেরা ভাবে, যে যত ধর্মপরায়ণ হবে, সে বাইরের চালচলনে তত গম্ভীর হবে, মুখে অন্য কথাটি থাকবে না। একদিকে আমার মুখে উদার ধর্মকথা শুনে ওদেশের ধর্মযাজকেরা যেমন অবাক হয়ে যেত, বক্তৃতার শেষে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি করতে দেখে আবার তেমনি অবাক হয়ে যেত। মুখের উপর কখন কখন বলেও ফেলত, 'স্বামীজী, আপনি একজন ধর্মযাজক; সাধারণ লোকের মতো এরূপ হাসি-তামাসা করা আপনার উচিত নয়। আপনার ও-রকম চপলতা শোভা পায় না।' তার উত্তরে আমি বলতাম, We are children of bliss—why should we look morose and sombre (আমরা আনন্দের সন্তান, বিরস মুখে থাকব কেন)? ঐ কথা শুনে তারা মর্ম গ্রহণ করতে পারত কি না সন্দেহ।

সেদিন স্বামীজী ভাবসমাধি ও নির্বিকল্পসমাধি সম্বন্ধেও বলিয়াছিলেন :

মনে কর, একজন হনুমানের মতো ভক্তিভাবে ঈশ্বরের সাধনা করছে। ভাবের যত গাঢ়তা হ'তে থাকবে, ঐ সাধকের চলন-বলন ভাবভঙ্গী এমন কি শারীরিক গঠনাদিও ঐরূপ হয়ে আসবে। 'জাত্যন্তরপরিণাম'[১]—ঐরূপেই হয়। ঐরূপ একটা ভাব নিয়ে সাধক ক্রমে 'তদাকারাকারিত' হয়ে যায়। কোন প্রকার ভাবের চরমাবস্থার নামই ভাবসমাধি। আর আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই—এইরূপে 'নেতি, নেতি' করতে করতে জ্ঞানী সাধক চিন্মাত্রসত্তায় অবস্থিত হ'লে নির্বিকল্প-সমাধিলাভ হয়। এক একটা ভাব নিয়েই সিদ্ধ হ'তে বা ঐ ভাবের চরমাবস্থায় পৌঁছতে কত জন্মের চেষ্টা লাগে! ভাবরাজ্যের রাজা আমাদের ঠাকুর কিন্তু আঠারটি ভাবে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ভাব-মুখে না থাকলে তাঁর শরীর থাকত না—এ-কথাও ঠাকুর বলতেন।

·

কথায় কথায় শিষ্য ঐদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মহাশয়, ঐদেশে কিরূপ আহারাদি ক'রতেন?' উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, 'ওদেশের মতোই খেতাম। আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের কিছুতেই জাত যায় না।'

১ দ্রষ্টব্য : যোগসূত্র—৪।২

এদেশে কি প্রণালীতে কার্য করিবেন, সে সম্বন্ধে স্বামীজী ঐদিন বলেন :

মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় দুইটি কেন্দ্র ক'রে সর্ববিধ লোককল্যাণের জন্ত নূতন ধরনে সাধুসন্ন্যাসী তৈরি করতে হবে। Destruction (ধ্বংস) দ্বারা বা প্রাচীন রীতিগুলি অযথা ভেঙে সমাজ বা দেশের উন্নতি করা যায় না। সর্বকালে সর্বদিকে উন্নতিলাভ constructive process-এর (গঠনমূলক প্রণালী) দ্বারা অর্থাৎ প্রাচীন রীতিগুলিকে নূতনভাবে পরিবর্তিত করেই গড়া হয়েছে। ভারতবর্ষের ধর্মপ্রচারক-মাত্রই পূর্ব পূর্ব যুগে ঐভাবে কাজ ক'রে গেছেন। একমাত্র বুদ্ধদেবের ধর্ম destructive (ধ্বংসমূলক) ছিল। সেজন্য ঐ ধর্ম ভারত থেকে নির্মূল হয়ে গিয়েছে।

স্বামীজী ঐভাবে কথা কহিতে কহিতে বলিতে লাগিলেন :

একটি জীবের মধ্যে ব্রহ্মবিকাশ হ'লে হাজার হাজার লোক সেই আলোকে পথ পেয়ে অগ্রসর হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরাই একমাত্র লোকগুরু—এ-কথা সর্বশাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়। অবৈদিক অশাস্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথা স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরাই এদেশে প্রচলন করেছে। সেজন্য সাধন করেও লোক এখন সিদ্ধ বা ব্রহ্মজ্ঞ হ'তে পাচ্ছে না। ধর্মের এ-সকল গ্লানি দূর করতেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীর ধারণ ক'রে বর্তমান যুগে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর প্রদর্শিত সার্বভৌম মত জগতে প্রচারিত হ'লে জগতের এবং জীবের মঙ্গল হবে। এমন অদ্ভুত মহাসমন্বয়াচার্য বহুশতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেননি।

স্বামীজীর একজন গুরুভ্রাতা এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ওদেশে সর্বদা সর্বসমক্ষে ঠাকুরকে অবতার বলিয়া প্রচার করিলে না কেন?'

স্বামীজী। ওরা দর্শন-বিজ্ঞানের বড় বড়াই করে। তাই যুক্তি তর্ক দর্শন বিজ্ঞান দিয়ে ওদের জ্ঞানগরিমা চূর্ণ ক'রে দিতে না পারলে কোন কিছু করা যায় না। তর্কে থেই হারিয়ে যারা যথার্থ তত্ত্বান্বেষী হয়ে আমার কাছে আসত, তাদের কাছে ঠাকুরের কথা কইতুম। নতুবা একেবারে অবতারবাদের কথা বললে ওরা ব'লত, 'ও আর তুমি নূতন কি ব'লছ? আমাদের প্রভু ঈশাই তো রয়েছেন।'

তিন-চারি ঘণ্টা কাল ঐরূপে মহানন্দে অতিবাহিত করিয়া শিষ্য সেদিন অন্যান্য আগন্তুকদের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল।

৪

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার
কাল—১৮৯৭ (?)

কয়েক দিন হইল স্বামীজী বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। প্রাতে, দ্বিপ্রহরে বা সন্ধ্যায় তাঁহার কিছুমাত্র বিরাম নাই; কারণ বহু উৎসাহী যুবক, কলেজের বহু ছাত্র—তিনি এখন যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া থাকে। স্বামীজী সকলকেই সাদরে ধর্ম ও দর্শনের জটিল তত্ত্বগুলি সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেন; স্বামীজীর প্রতিভার নিকট তাহারা সকলেই যেন অভিভূত হইয়া নীরবে অবস্থান করে।

আজ সূর্যগ্রহণ—সর্বগ্রাসী গ্রহণ। জ্যোতির্বিদ্গণও গ্রহণ দেখিতে নানাস্থানে গিয়াছেন। ধর্মপিপাসু নরনারীগণ গঙ্গাস্নান করিতে বহুদূর হইতে আসিয়া উৎসুক হইয়া গ্রহণবেলা প্রতীক্ষা করিতেছেন। স্বামীজীর কিন্তু গ্রহণসম্বন্ধে বিশেষ কোন উৎসাহ নাই। শিষ্য আজ স্বামীজীকে নিজহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইবে—স্বামীজীর আদেশ। মাছ, তরকারি ও রন্ধনের উপযোগী অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া বেলা ৮টা আন্দাজ সে ৺বলরামবাবুর বাড়ি উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'তোদের দেশের মতো রান্না করতে হবে; আর গ্রহণের পূর্বেই খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়া চাই।'

বলরামবাবুদের বাড়িতে মেয়েছেলেরা কেহই এখন কলিকাতায় নাই। সুতরাং বাড়ি একেবারে খালি। শিষ্য বাড়ির ভিতরে রন্ধন-শালায় গিয়া রন্ধন আরম্ভ করিল। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা যোগীন-মা নিকটে দাঁড়াইয়া শিষ্যকে রন্ধন-সম্বন্ধীয় সকল বিষয় যোগাড় দিতে ও সময়ে সময়ে দেখাইয়া দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং স্বামীজী মধ্যে মধ্যে ভিতরে আসিয়া রান্না দেখিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; আবার কখনও বা 'দেখিস মাছের 'জুল' যেন ঠিক বাঙালদিশি ধরনে হয়' বলিয়া রঙ্গ করিতে লাগিলেন।

ভাত, মুগের দাল, কই মাছের ঝোল, মাছের টক ও মাছের সুক্তনি রান্না প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় স্বামীজী স্নান করিয়া আসিয়া নিজেই পাতা

করিয়া খাইতে বসিলেন। এখনও রান্নার কিছু বাকি আছে বলিলেও শুনিলেন না, আবদেরে ছেলের মতো বলিলেন, 'যা হয়েছে শীগগীর নিয়ে আয়, আমি আর বসতে পাচ্ছিনে, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।' শিষ্য কাজেই তাড়াতাড়ি আগে স্বামীজীকে মাছের সুক্তনি ও ভাত দিয়া গেল, স্বামীজীও তৎক্ষণাৎ খাইতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর শিষ্য বাটিতে করিয়া স্বামীজীকে অন্য সকল তরকারি আনিয়া দিবার পর যোগানন্দ প্রেমানন্দ প্রমুখ অন্যান্য সন্ন্যাসী মহারাজগণকে অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে লাগিল। শিষ্য কোন-কালেই রন্ধনে পটু ছিল না; কিন্তু স্বামীজী আজ তাহার রন্ধনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কলিকাতার লোক মাছের সুক্তনির নামে খুব ঠাট্টা তামাসা করে, কিন্তু তিনি সেই সুক্তনি খাইয়া খুশী হইয়া বলিলেন, 'এমন কখনও খাই নাই। কিন্তু মাছের 'জুল'টা যেমন ঝাল হয়েছে, এমন আর কোনটাই হয় নাই।' টকের মাছ খাইয়া স্বামীজী বলিলেন, 'এটা ঠিক যেন বর্ধমানী ধরনের হয়েছে।' অনন্তর দধি সন্দেশ গ্রহণ করিয়া স্বামীজী ভোজন শেষ করিলেন এবং আচমনান্তে ঘরের ভিতর খাটের উপর উপবেশন করিলেন। শিষ্য স্বামীজীর সম্মুখের দালানে প্রসাদ পাইতে বসিল। স্বামীজী তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, 'যে ভাল রাঁধতে পারে না, সে ভাল সাধু হ'তে পারে না—মন শুদ্ধ না হ'লে ভাল সুস্বাদু রান্না হয় না।'

কিছুক্ষণ পরে চারিদিকে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্ত্রীকণ্ঠের উলুধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন, 'ওরে গেরন লেগেছে—আমি ঘুমোই; তুই আমার পা টিপে দে।' এই বলিয়া একটুকু তন্দ্রা অনুভব করিতে লাগিলেন। শিষ্যও তাঁহার পদসেবা করিতে করিতে ভাবিল, 'এই পুণ্যক্ষণে গুরুপদসেবাই আমার গঙ্গাস্নান ও জপ।' এই ভাবিয়া শিষ্য শান্ত মনে স্বামীজীর পদসেবা করিতে লাগিল। গ্রহণে সর্বগ্রাস[১] হইয়া ক্রমে চারিদিক সন্ধ্যাকালের মতো তমসাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

১ ১৮৯৮ খৃঃ ২২শে জানুআরি মধ্যাহ্নের পর পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল

গ্রহণ ছাড়িয়া যাইতে যখন ১৫।২০ মিনিট বাকি আছে, তখন স্বামীজী উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া তামাক খাইতে খাইতে শিষ্যকে পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'লোকে বলে, গেরনের সময় যে যা করে, সে নাকি তাই কোটিগুণে পায়; তাই ভাবলুম মহামায়া এ শরীরে সুনিদ্রা দেননি, যদি এই সময় একটু ঘুমুতে পারি তো এর পর বেশ ঘুম হবে, কিন্তু তা হ'ল না; জোর ১৫ মিনিট ঘুম হয়েছে।'

অনন্তর সকলে স্বামীজীর নিকট আসিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী শিষ্যকে উপনিষদ্ সম্বন্ধে কিছু বলিতে আদেশ করিলেন। শিষ্য ইতঃপূর্বে কখনও স্বামীজীর সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই। তাহার বুক দুরদুর করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীজী ছাড়িবার পাত্র নহেন। সুতরাং শিষ্য উঠিয়া 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ' মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, পরে 'গুরুভক্তি' ও 'ত্যাগের' মহিমা বর্ণন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানই যে পরম পুরুষার্থ, ইহা মীমাংসা করিয়া বসিয়া পড়িল। স্বামীজী পুনঃ পুনঃ করতালি দ্বারা শিষ্যের উৎসাহ-বর্ধনার্থ বলিতে লাগিলেন, 'আহা! সুন্দর বলেছে।'

অনন্তর শুদ্ধানন্দ, প্রকাশানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী) প্রভৃতি শিষ্যকে স্বামীজী কিছু বলিতে আদেশ করিলেন। শুদ্ধানন্দ ওজস্বিনী ভাষায় 'ধ্যান' সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ এক বক্তৃতা করিলেন। অনন্তর প্রকাশানন্দ প্রভৃতিও ঐরূপ করিলে স্বামীজী উঠিয়া বাহিরের বৈঠকখানায় আগমন করিলেন। তখনও সন্ধ্যা হইতে প্রায় এক ঘণ্টা বাকি আছে। সকলে ঐ স্থানে আসিলে স্বামীজী বলিলেন, 'তোদের কার কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল্।'

শুদ্ধানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, ধ্যানের স্বরূপ কি?'

স্বামীজী। কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীকরণের নামই ধ্যান। এক বিষয়ে একাগ্র করতে পারলে সেই মন যে-কোন বিষয়ে হোক না কেন, একাগ্র করতে পারা যায়।

শিষ্য। শাস্ত্রে যে সবিষয় ও নির্বিষয়-ভেদে দ্বিবিধ ভাবের ধ্যান দৃষ্ট হয়, উহার অর্থ কি?—এবং উহার মধ্যে কোন্‌টি বড়?

স্বামীজী। প্রথম কোন একটি বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়। এক সময় আমি একটা কালো বিন্দুতে মনঃসংযম করতাম। ঐ সময়ে শেষে আর বিন্দুটাকে দেখতে পেতুম না, বা সামনে যে রয়েছে তা বুঝতে

পারতুম না, মন নিরোধ হয়ে যেত, কোন বৃত্তির তরঙ্গ উঠত না—যেন নিবাত সাগর। ঐ অবস্থায় অতীন্দ্রিয় সত্যের ছায়া কিছু কিছু দেখতে পেতুম। তাই মনে হয়, যে-কোন সামান্য বাহ্য বিষয় ধরে ধ্যান অভ্যাস করলেও মন একাগ্র বা ধ্যানস্থ হয়। তবে যাতে যার মন বসে, সেটা ধরে ধ্যান অভ্যাস করলে মন শীঘ্র স্থির হয়ে যায়। তাই এদেশে এত দেবদেবীমূর্তির পূজা। এই দেবদেবীর পূজা থেকে আবার কেমন art develop (শিল্পের উন্নতি) হয়েছিল! যাক্ এখন সে কথা। এখন কথা হচ্ছে যে, ধ্যানের বহিরালম্বন সকলের সমান বা এক হ'তে পারে না। যিনি যে বিষয় ধরে ধ্যানসিদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি সেই বহিরালম্বনেরই কীর্তন ও প্রচার ক'রে গেছেন। তারপর কালে তাতে মনঃস্থির করতে হবে, এ-কথা ভুলে যাওয়ায় সেই বহিরালম্বনটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপায়টা (means) নিয়েই লোকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, উদ্দেশ্যটার (end) দিকে লক্ষ্য কমে গেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে বৃত্তিশূন্য করা—তা কিন্তু কোন বিষয়ে তন্ময় না হ'লে হবার জো নেই।

শিষ্য। মনোবৃত্তি বিষয়াকারা হইলে তাহাতে আবার ব্রহ্মের ধারণা কিরূপে হইতে পারে?

স্বামীজী। বৃত্তি প্রথমতঃ বিষয়াকারা বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ের জ্ঞান থাকে না; তখন শুদ্ধ 'অস্তি' এই মাত্র বোধ থাকে।

শিষ্য। মহাশয়, মনের একাগ্রতা হইলেও কামনা বাসনা উঠে কেন?

স্বামীজী। ওগুলি পূর্বের সংস্কারে হয়। বুদ্ধদেব যখন সমাধিস্থ হ'তে যাচ্ছেন, তখন 'মার'-এর অভ্যুদয় হ'ল। 'মার' বলে একটা কিছু বাইরে ছিল না, মনের প্রাক্‌সংস্কারই ছায়ারূপে বাইরে প্রকাশ হয়েছিল।

শিষ্য। তবে যে শুনা যায়, সিদ্ধ হইবার পূর্বে নানা বিভীষিকা দেখা যায়, তাহা কি মনঃকল্পিত?

স্বামীজী। তা নয় তো কি? সাধক অবশ্য তখন বুঝতে পারে না যে, এগুলি তার মনেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু বাইরে কিছুই নেই। এই যে জগৎ দেখছিস, এটাও নেই। সকলই মনের কল্পনা। মন যখন বৃত্তিশূন্য হয়, তখন তাতে ব্রহ্মাভাস দর্শন হয়, তখন 'যং যং লোকং মনসা

সংবিভাতি' সেই সেই লোক দর্শন করা যায়। যা সঙ্কল্প করা যায়, তাই সিদ্ধ হয়। ঐরূপ সত্যসঙ্কল্প অবস্থা লাভ হলেও যে সমনস্ক থাকতে পারে এবং কোন আকাঙ্ক্ষার দাস হয় না, সে-ই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। আর ঐ অবস্থা লাভ ক'রে যে বিচলিত হয়, সে নানা সিদ্ধি লাভ ক'রে পরমার্থ হ'তে ভ্রষ্ট হয়।

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজী পুনঃ পুনঃ 'শিব' 'শিব' নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আবার বলিলেন, 'ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর জীবন-সমস্যার রহস্যভেদ কিছুতেই হবার নয়। ত্যাগ—ত্যাগ—ত্যাগ, এ-ই যেন তোদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়। 'সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম'[1]।'

৫

স্থান—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি ও আলমবাজার মঠ

কাল—মার্চ (১ম সপ্তাহ), ১৮৯৭

স্বামীজী যখন দেশে ফিরিয়া আসেন, মঠ তখন আলমবাজারে ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব। দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে এবার উৎসবের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। স্বামীজী তাঁহার কয়েকজন গুরুভ্রাতাসহ বেলা ৯টা-১০টা আন্দাজ সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার নগ্ন পদ, শীর্ষে গৈরিকবর্ণের উষ্ণীষ। জনসঙ্ঘ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে—তাঁহার সেই অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ দর্শন করিবে, পাদপদ্ম স্পর্শ করিবে এবং শ্রীমুখের সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখাসম বাণী শুনিয়া ধন্য হইবে বলিয়া। স্বামীজী শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শির অবনত হইল। পরে ৺রাধাকান্তকে প্রণাম করিয়া তিনি এইবার ঠাকুরের গৃহে আগমন করিলেন। সে প্রকোষ্ঠে

১ বৈরাগ্যশতকম্—ভর্তৃহরি

এখন আর তিলমাত্র স্থান নাই। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে কালীবাড়ির চতুর্দিক মুখরিত হইতেছে। শত সহস্র দর্শক লইয়া কলিকাতা হইতে হোরমিলার কোম্পানির জাহাজ বার বার যাতায়াত করিতেছে। নহবতের তানতরঙ্গে সুরধুনী নৃত্য করিতেছেন। উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা, ধর্মপিপাসা ও অনুরাগ মূর্তিমান্ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণরূপে ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছে।

স্বামীজীর সহিত আগত দুইটি ইংরেজ মহিলাও উৎসবে আসিয়াছেন। স্বামীজী তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া পবিত্র পঞ্চবটী ও বিল্বমূল দর্শন করাইতেছেন। শিষ্য উৎসবসম্বন্ধীয় স্বরচিত একটি সংস্কৃত স্তব স্বামীজীর হস্তে প্রদান করিল। স্বামীজীও উহা পড়িতে পড়িতে পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যের দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন, 'বেশ হয়েছে, আরও লিখবে।'

পঞ্চবটীর একপার্শ্বে ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের সমাবেশ হইয়াছিল। গিরিশবাবু[১] পঞ্চবটীর উত্তরে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-গুণগানে ও কথাপ্রসঙ্গে আত্মহারা হইয়া বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে বহু লোকের সঙ্গে স্বামীজী গিরিশবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া 'এই যে ঘোষজ!' বলিয়া গিরিশবাবুকে প্রণাম করিলেন। গিরিশবাবুও তাঁহাকে করজোড়ে প্রতিনমস্কার করিলেন। গিরিশ-বাবুকে পূর্ব কথা স্মরণ করাইয়া স্বামীজী বলিলেন, 'ঘোষজ, সেই একদিন আর এই একদিন।' গিরিশবাবুও স্বামীজীর কথায় সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, 'তা বটে; তবু এখনও সাধ যায় আরও দেখি।' এইরূপে উভয়ের মধ্যে যে-সকল কথা হইল, তাহার মর্ম বাহিরের লোকের অনেকেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর স্বামীজী পঞ্চবটীর উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত বিল্ববৃক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সেদিন দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ির সর্বত্রই একটা দিব্যভাবের বন্যা ঐরূপে বহিয়া যাইতেছিল। এইবার সেই বিরাট জনসঙ্ঘ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে উদ্গ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও স্বামীজী লোকের

১ মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ

কলরবের অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতে পারিলেন না। অগত্যা বক্তৃতার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া তিনি আবার ইংরেজ মহিলা দুইটিকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের সাধনস্থান দেখাইতে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত ও অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে লাগিলেন।

বেলা তিনটার পর স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'একখানা গাড়ি দেখ,—মঠে যেতে হবে।' অনন্তর আলমবাজার পর্যন্ত যাইবার ভাড়া দুই আনা ঠিক করিয়া শিষ্য গাড়ি লইয়া উপস্থিত হইলে স্বামীজী স্বয়ং গাড়ির একদিকে বসিয়া এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শিষ্যকে অন্যদিকে বসাইয়া আলমবাজার মঠের দিকে আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন :

কেবল abstract idea (শুদ্ধ ভাব মাত্র) নিয়ে পড়ে থাকলে কি হবে? এ-সব উৎসব প্রভৃতিরও দরকার ; তবে তো mass (জনসাধারণ)-এর ভেতর এ-সকল ভাব ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে। এই যে হিন্দুদের বার মাসে তের পার্বণ—এর মানেই হচ্ছে ধর্মের বড় বড় ভাবগুলি ক্রমশঃ লোকের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। ওর একটা দোষও আছে। সাধারণ লোকে ঐ সকলের প্রকৃত ভাব না বুঝে ঐ সকলে মত্ত হয়ে যায়, আর ঐ উৎসব-আমোদ থেমে গেলেই আবার যা, তাই হয়। সেজন্য ওগুলি ধর্মের বহিরাবরণ—প্রকৃত ধর্ম ও আত্মজ্ঞানকে ঢেকে রেখে দেয়, এ কথা সত্য।

কিন্তু যারা ধর্ম কি, আত্মা কি, এ-সব কিছুমাত্র বুঝতে পারে না, তারা ঐ উৎসব-আমোদের মধ্য দিয়ে ক্রমে ধর্ম বুঝতে চেষ্টা করে। মনে কর, এই যে আজ ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়ে গেল, এর মধ্যে যারা সব এসেছে তারা ঠাকুরের বিষয় একবারও ভাববে। যাঁর নামে এত লোক একত্র হয়েছিল, তিনি কে, তাঁর নামেই বা এত লোক এল কেন—এ কথা তাদের মনে উদিত হবে। যাদের তাও না হবে, তারাও এই কীর্তন দেখতে ও প্রসাদ পেতেও অন্ততঃ বছরে একবার আসবে আর ঠাকুরের ভক্তদের দেখে যাবে। তাতে তাদের উপকার বই অপকার হবে না।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ঐ উৎসব-কীর্তনই যদি সার বলিয়া কেহ বুঝিয়া লয়, তবে সে আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে কি? আমাদের দেশে

ষষ্ঠীপূজা, মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রভৃতি যেমন নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাও সেইরূপ একটা হইয়া দাঁড়াইবে। মরণ পর্যন্ত লোকে ঐসব করিয়া যাইতেছে, কিন্তু কই এমন লোক তো দেখিলাম না, যে ঐসকল পূজা করিতে করিতে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া উঠিল!

স্বামীজী। কেন? এই যে ভারতে এত ধর্মবীর জন্মেছিলেন, তাঁরা তো সকলে ঐগুলিকে ধরে উঠেছেন এবং অত বড় হয়েছেন। ঐগুলিকে ধরে সাধন করতে করতে যখন আত্মার দর্শনলাভ হয়, তখন আর ঐ-সকলে আঁট থাকে না। তবু লোকসংগ্রহের জন্য অবতারকল্প মহাপুরুষেরাও ঐগুলি মেনে চলেন।

শিষ্য। লোক-দেখানো মানিতে পারেন—কিন্তু আত্মজ্ঞের কাছে যখন এ সংসারই ইন্দ্রজালবৎ অলীক বোধ হয়, তখন তাঁহাদের কি আবার ঐ-সকল বাহ্য লোকব্যবহারকে সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে?

স্বামীজী। কেন পারবে না? সত্য বলতে আমরা যা বুঝি তাও তো relative (আপেক্ষিক)—দেশকালপাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অতএব সকল ব্যবহারেরই প্রয়োজন আছে অধিকারিভেদে। ঠাকুর যেমন বলতেন, মা কোন ছেলেকে পোলাও-কালিয়া রেঁধে দেন, কোন ছেলেকে বা সাগুপথ্য দেন, সেইরূপ।

দেখিতে দেখিতে গাড়ি আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইল। শিষ্য গাড়িভাড়া দিয়া স্বামীজীর সঙ্গে মঠের ভিতরে চলিল এবং স্বামীজীর পিপাসা পাওয়ায় জল আনিয়া দিল। স্বামীজী জল পান করিয়া জামা খুলিয়া ফেলিলেন এবং মেজেতে পাতা শতরঞ্জির উপর অর্ধশায়িত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ পার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এমন ভিড় উৎসবে আর কখন হয়নি। যেন কলকাতাটা ভেঙে এসেছিল!'

স্বামীজী। তা হবে না? এর পর আরও কত কী হবে!

শিষ্য। মহাশয়, প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়েই দেখা যায়—কোন-না-কোন বাহ্য উৎসব-আমোদ আছেই। কিন্তু কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল নাই। এমন যে উদার মহম্মদের ধর্ম, তাহার মধ্যেও ঢাকা শহরে দেখিয়াছি শিয়া-সুন্নিতে লাঠালাঠি হয়!

স্বামীজী। সম্প্রদায় হলেই ওটা অল্পাধিক হবে। তবে এখানকার ভাব কি

জানিস?—সম্প্রদায়বিহীনতা। আমাদের ঠাকুর ঐটেই দেখাতে জন্মেছিলেন। তিনি সব মানতেন—আবার বলতেন, ব্রহ্মজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখলে ও-সকলই মিথ্যা মায়ামাত্র।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না; মধ্যে মধ্যে আমার মনে হয়, আপনারাও এইরূপে উৎসব-প্রচারাদি করিয়া ঠাকুরের নামে আর একটা সম্প্রদায়ের সূত্রপাত করিতেছেন। আমি নাগ-মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুর কোন দলভুক্ত ছিলেন না। শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের ধর্মকেই তিনি বহুমান দিতেন।

স্বামীজী। তুই কি ক'রে জানলি, আমরা সকল ধর্মমতকে ঐরূপে বহুমান দিই না?

এই বলিয়া স্বামীজী নিরঞ্জন মহারাজকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ওরে, এ বাঙাল বলে কি?'

শিষ্য। মহাশয়, কৃপা করিয়া ঐ কথা আমায় বুঝাইয়া দিন।

স্বামীজী। তুই তো আমার বক্তৃতা পড়েছিস। কই, কোথায় ঠাকুরের নাম করেছি? খাঁটি উপনিষদের ধর্মই তো জগতে বলে বেড়িয়েছি।

শিষ্য। তা বটে। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিতেছি, আপনার রামকৃষ্ণগত প্রাণ। যদি ঠাকুরকে ভগবান্ বলিয়াই জানিয়া থাকেন, তবে কেন সর্বসাধারণকে তাহা একেবারে বলিয়া দিন না।

স্বামীজী। আমি যা বুঝেছি তা বলছি। তুই যদি বেদান্তের অদ্বৈতমতটিকে ঠিক ধর্ম ব'লে থাকিস, তা হ'লে লোককে তা বুঝিয়ে দে না কেন?

শিষ্য। আগে অনুভব করিব, তবে তো বুঝাইব। ঐ মত আমি পড়িয়াছি মাত্র।

স্বামীজী। তবে আগে অনুভূতি কর্। তারপর লোককে বুঝিয়ে দিবি। এখন লোকে প্রত্যেকে যে এক একটা মতে বিশ্বাস ক'রে চলেছে—তাতে তোর তো বলবার কিছু অধিকার নেই। কারণ তুইও এখন তাদের মতো একটা ধর্মমতে বিশ্বাস ক'রে চলেছিস বই তো নয়।

শিষ্য। হাঁ, আমিও একটা বিশ্বাস করিয়া চলিয়াছি বটে; কিন্তু আমার প্রমাণ—শাস্ত্র। আমি শাস্ত্রের বিরোধী মত মানি না।

স্বামীজী। শাস্ত্র মানে কি? উপনিষদ্ প্রমাণ হ'লে বাইবেল জেন্দাবেস্তাই বা প্রমাণ হবে না কেন?

শিষ্য। এই সকল গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও বেদের মতো উহারা তো আর প্রাচীন গ্রন্থ নয়। আবার আত্মতত্ত্ব-সমাধান বেদে যেমন আছে, এমন তো আর কোথাও নাই।

স্বামীজী। বেশ, তোর কথা না হয় মেনেই নিলুম। কিন্তু বেদ ভিন্ন আর কোথাও যে সত্য নেই, এ কথা বলবার তোর কি অধিকার?

শিষ্য। বেদ ভিন্ন অন্য সকল ধর্মগ্রন্থে সত্য থাকিতে পারে, তদ্বিষয়ের বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিতেছি না; কিন্তু আমি উপনিষদের মতই মানিয়া যাইব। আমার ইহাতে খুব বিশ্বাস।

স্বামীজী। তা কর্, তবে আর কারও যদি ঐরূপ কোন মতে খুব বিশ্বাস হয়, তবে তাকেও ঐ বিশ্বাসে চলে যেতে দিস। দেখবি—পরে তুই ও সে একই জায়গায় পৌঁছবি। মহিম্নস্তবে পড়িসনি?—'ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব'[১]।

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥
—শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্

৬

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার

কাল—মার্চ, ১৮৯৭

স্বামীজী কয়েকদিন যাবৎ কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছেন। বাগবাজারের বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়িতেই রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে পরিচিত ব্যক্তিদিগের বাটীতেও ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আজ প্রাতে শিষ্য স্বামীজীর কাছে আসিয়া দেখিল, স্বামীজী ঐরূপে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। শিষ্যকে বলিলেন, 'চল্, আমার সঙ্গে যাবি'। বলিতে বলিতে স্বামীজী নীচে নামিতে লাগিলেন; শিষ্যও পিছু পিছু চলিল। একখানি ভাড়াটিয়া গাড়িতে তিনি শিষ্য-সঙ্গে উঠিলেন; গাড়ি দক্ষিণমুখে চলিল।

শিষ্য। মহাশয়, কোথায় যাওয়া হইবে?

স্বামীজী। চল্ না, দেখবি এখন।

এইরূপে কোথায় যাইতেছেন সে বিষয়ে শিষ্যকে কিছুই না বলিয়া গাড়ি বিডন স্ট্রীটে উপস্থিত হইলে কথাচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, 'তোদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোরা লেখাপড়া ক'রে মানুষ হচ্ছিস, কিন্তু যারা তোদের সুখদুঃখের ভাগী, সকল সময়ে প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাদের শিক্ষা দিতে—তাদের উন্নত করতে তোরা কি করছিস?'

শিষ্য। কেন মহাশয়, আজকাল মেয়েদের জন্য কত স্কুল কলেজ হইয়াছে। কত স্ত্রীলোক এম-এ, বি-এ পাস করিতেছে।

স্বামীজী। ও তো বিলাতি ঢংএ হচ্ছে। তোদের ধর্মশাস্ত্রানুশাসনে, তোদের দেশের মতো চালে কোথায় কটা স্কুল হয়েছে? দেশে পুরুষদের মধ্যেও তেমন শিক্ষার বিস্তার নেই, তা আবার মেয়েদের ভেতর। গবর্নমেণ্টের statisticsএ (সংখ্যাসূচক তালিকায়) দেখা যায়, ভারতবর্ষে শতকরা ১০।১২ জন মাত্র শিক্ষিত, তা বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে one per cent (শতকরা একজন)ও হবে না। তা না হ'লে কি দেশের এমন দুর্দশা হয়? শিক্ষার বিস্তার—জ্ঞানের উন্মেষ—এ-সব না হ'লে দেশের উন্নতি কি ক'রে হবে? তোরা দেশে যে কয়জন লেখা পড়া

শিখেছিস—দেশের ভাবী আশার স্থল—সেই কয়জনের ভেতরেও ঐ বিষয়ে কোন চেষ্টা উদ্যম দেখতে পাই না। কিন্তু জানিস, সাধারণের ভেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হ'লে কিছু হবার জো নেই। সেজন্য আমার ইচ্ছা, কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈরি ক'রব। ব্রহ্মচারীরা কালে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে mass-এর (জনসাধারণের) মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নপর হবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে। কিন্তু দেশী ধরনে ঐ কাজ করতে হবে। পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) করতে হবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র করতে হবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা ঐসকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার নেবে। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করতে হবে। কালে যাতে তারা ভাল গিন্নী তৈরী হয়, তাই করতে হবে। এই সকল মেয়েদের সন্তানসন্ততিগণ পরে ঐসকল বিষয়ে আরও উন্নতি লাভ করতে পারবে। যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাঁদের ঘরেই বড় লোক জন্মায়। মেয়েদের তোরা এখন যেন কতকগুলি manufacturing machine (উৎপাদন-যন্ত্র) ক'রে তুলেছিস। রাম রাম! এই কি তোদের শিক্ষার ফল হ'ল? মেয়েদের আগে তুলতে হবে, massকে (জনসাধারণকে) জাগাতে হবে; তবে তো দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ।

গাড়ি এইবার কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীটের ব্রাহ্মসমাজ ছাড়াইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন, 'চোরবাগানের রাস্তায় চল্।' গাড়ি যখন ঐ রাস্তায় প্রবেশ করিল, তখন স্বামীজী শিষ্যের নিকট প্রকাশ করিলেন, 'মহাকালী পাঠশালা'র স্থাপয়িত্রী তপস্বিনী মাতা তাঁহার পাঠশালা দর্শন করিতে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছেন। ঐ পাঠশালা তখন চোরবাগানে একটা দোতলা ভাড়াটিয়া বাড়িতে ছিল। গাড়ি থামিলে দুই-চারিজন ভদ্রলোক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপরে লইয়া গেলেন এবং তপস্বিনী মাতা দাঁড়াইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তপস্বিনী

মাতা স্বামীজীকে সঙ্গে করিয়া একটি ক্লাসে লইয়া গেলেন। কুমারীরা দাঁড়াইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিল এবং মাতাজীর আদেশে প্রথমতঃ 'শিবের ধ্যান' সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। কিরূপ প্রণালীতে পাঠশালায় পূজাদি শিক্ষা দেওয়া হয়, মাতাজীর আদেশে কুমারীগণ পরে তাহাই করিয়া দেখাইতে লাগিল। স্বামীজীও উৎফুল্ল-মনে ঐ সকল দর্শন করিয়া অন্য এক শ্রেণীর ছাত্রীদিগকে দেখিতে চলিলেন। বৃদ্ধা মাতাজী স্বামীজীর সঙ্গে সকল ক্লাস ঘুরিতে পারিবেন না বলিয়া স্কুলের দুই-তিনটি শিক্ষককে আহ্বান করিয়া সকল ক্লাস ভাল করিয়া স্বামীজীকে দেখাইবার জন্য বলিয়া দিলেন। অনন্তর স্বামীজী সকল ক্লাস ঘুরিয়া পুনরায় মাতাজীর নিকটে ফিরিয়া আসিলে মাতাজী একজন কুমারীকে তখন ডাকিয়া আনিলেন এবং রঘুবংশের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। ছাত্রীটিও উহার সংস্কৃতে ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজীকে শুনাইল। স্বামীজী শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারকল্পে মাতাজীর অধ্যবসায় ও যত্নপরতার এতদূর সাফল্য দর্শন করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মাতাজী তাহাতে বিনীতভাবে বলিলেন, 'আমি ভগবতী-জ্ঞানে ছাত্রীদের সেবা করিয়া থাকি, নতুবা বিদ্যালয় করিয়া যশোলাভ করিবার বা অপর কোন উদ্দেশ্য নাই।'

বিদ্যালয়-সম্বন্ধীয় কথাবার্তা সমাপন করিয়া স্বামীজী বিদায় লইতে উদ্যোগ করিলে মাতাজী স্কুলসম্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ করিতে দর্শকদিগের জন্য নির্দিষ্ট খাতায় (Visitors' Book) স্বামীজীকে মতামত লিখিতে বলিলেন। স্বামীজীও ঐ পরিদর্শক-পুস্তকে নিজ মত বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিলেন। লিখিত বিষয়ের শেষ ছত্রটি শিষ্যের এখনও মনে আছে—'The movement is in the right direction' (স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টাটি ঠিক পথে চলেছে)।

অনন্তর মাতাজীকে অভিবাদন করিয়া স্বামীজী পুনরায় গাড়িতে উঠিলেন এবং শিষ্যের সহিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিতভাবে কথোপকথন করিতে করিতে বাগবাজার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন :

স্বামীজী। এঁর (মাতাজীর) কোথায় জন্ম! সর্বস্ব-ত্যাগী—তবু লোকহিতের জন্য কেমন যত্নবতী! স্ত্রীলোক না হ'লে কি ছাত্রীদের এমন ক'রে শিক্ষা দিতে পারে? সবই ভাল দেখলুম; কিন্তু ঐ যে কতকগুলি

গৃহী পুরুষ মাস্টার রয়েছে—ঐটে ভাল বোধ হ'ল না। শিক্ষিতা বিধবা ও ব্রহ্মচারিণীগণের ওপরই স্কুলের শিক্ষার ভার সর্বথা রাখা উচিত। এদেশে স্ত্রীবিদ্যালয়ে পুরুষ-সংস্রব একেবারে না রাখাই ভাল।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, গার্গী খনা লীলাবতীর মতো গুণবতী শিক্ষিতা স্ত্রীলোক দেশে এখন পাওয়া যায় কই?

স্বামীজী। দেশে কি এখনও ঐরূপ স্ত্রীলোক নেই? এ সীতা সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র সেবাভাব স্নেহ দয়া তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখলুম না। ওদেশে (পাশ্চাত্যে) মেয়েদের দেখে আমার অনেক সময় স্ত্রীলোক বলেই বোধ হ'ত না—ঠিক যেন পুরুষ মানুষ! গাড়ি চালাচ্ছে, অফিসে বেরুচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, প্রফেসরি করছে! একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি দেখে চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পেয়েও তোরা এদের উন্নতি করতে পারলিনি। এদের ভেতরে জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা করলিনে। ঠিক ঠিক শিক্ষা পেলে এরা ideal (আদর্শ) স্ত্রীলোক হ'তে পারে।

শিষ্য। মহাশয়, মাতাজী ছাত্রীদিগকে যেভাবে শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে কি ঐরূপ ফল হইবে? এই সকল ছাত্রীরা বড় হইয়া বিবাহ করিবে, এবং উহার অল্পকাল পরেই অন্য সকল স্ত্রীলোকের মতো হইয়া যাইবে। মনে হয়, ইহাদিগকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করাইতে পারিলে ইহারা সমাজের এবং দেশের উন্নতিকল্পে জীবনোৎসর্গ করিতে এবং শাস্ত্রোক্ত উচ্চ আদর্শ লাভ করিতে পারিত।

স্বামীজী। ক্রমে সব হবে। দেশে এমন শিক্ষিত লোক এখনও জন্মায়নি, যারা সমাজ-শাসনের ভয়ে ভীত না হয়ে নিজের মেয়েদের অবিবাহিতা রাখতে পারে। এই দেখ্ না—এখনও মেয়ে বার-তের বৎসর পেরুতে না পেরুতে লোকভয়ে—সমাজভয়ে বে দিয়ে ফেলে। এই সেদিন consent (সম্মতিসূচক) আইন করবার সময় সমাজের নেতারা লাখো লোক জড়ো ক'রে চেঁচাতে লাগলো 'আমরা আইন চাই না'। অন্য দেশ হ'লে সভা ক'রে চেঁচানো দূরে থাকুক, লজ্জায় মাথা গুঁজে লোক ঘরে বসে থাকত ও ভাবত আমাদের সমাজে এখনও এ-হেন কলঙ্ক রয়েছে!

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, সংহিতাকারগণ একটা কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া কি আর বাল্যবিবাহের অনুমোদন করিয়াছিলেন? নিশ্চয় উহার ভিতর একটা গূঢ় রহস্য আছে।

স্বামীজী। কি রহস্যটা আছে?

শিষ্য। এই দেখুন, অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দিলে তাহারা স্বামিগৃহে আসিয়া কুলধর্মগুলি বাল্যকাল হইতে শিখিতে পারিবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া গৃহকর্ম-নিপুণা হইতে পারিবে। আবার পিতৃগৃহে বয়স্থা কন্যার উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা; বাল্যকালে বিবাহ দিলে তাহার আর উচ্ছৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা থাকে না; অধিকন্তু লজ্জা, নম্রতা, সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতা প্রভৃতি ললনা-সুলভ গুণগুলি তাহাতে বিকশিত হইয়া উঠে।

স্বামীজী। অন্যপক্ষে আবার বলা যেতে পারে যে, বাল্যবিবাহে মেয়েরা অকালে সন্তান প্রসব ক'রে অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাদের সন্তান সন্ততিগণও ক্ষীণজীবী হয়ে দেশে ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কারণ, পিতামাতার শরীর সম্পূর্ণ সমর্থ ও সবল না হ'লে সবল ও নীরোগ সন্তান জন্মাবে কেমন ক'রে? লেখাপড়া শিখিয়ে একটু বয়স হ'লে বে দিলে সেই মেয়েদের যে সন্তান-সন্ততি জন্মাবে, তাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হবে। তোদের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা তার কারণ হচ্ছে—এই বাল্য-বিবাহ। বাল্য-বিবাহ কমে গেলে বিধবার সংখ্যাও কমে যাবে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আমার মনে হয়, অধিক বয়সে বিবাহ দিলে মেয়েরা গৃহকার্যে তেমন মনোযোগী হয় না। শুনিয়াছি, কলিকাতার অনেক স্থলে শাশুড়ীরা রাঁধে ও শিক্ষিতা বধূরা পায়ে আলতা পরিয়া বসিয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গাল দেশে ঐরূপ কখনও হইতে পায় না।

স্বামীজী। ভাল মন্দ সব দেশেই আছে। আমার মতে সমাজ সকল দেশেই আপনা আপনি গড়ে। অতএব বাল্য-বিবাহ তুলে দেওয়া, বিধবাদের পুনরায় বে দেওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে স্ত্রী পুরুষ—সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া। সেই শিক্ষার ফলে তারা নিজেরাই কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ

সব বুঝতে পারবে এবং নিজেরা মন্দটা করা ছেড়ে দেবে। তখন আর জোর ক'রে সমাজের কোন বিষয় ভাঙতে গড়তে হবে না।

শিষ্য। মেয়েদের এখন কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন?

স্বামীজী। ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীরপালন—এ-সব বিষয়ের স্থূল মর্মগুলিই মেয়েদের শেখানো উচিত। নভেল-নাটক ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়। মহাকালী পাঠশালাটি অনেকটা ঠিক পথে চলছে; তবে কেবল পূজাপদ্ধতি শেখালেই হবে না; সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্রগুলি ছাত্রীদের সামনে সর্বদা ধরে উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা এঁদের জীবনচরিত্র মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের জীবন ঐরূপে গঠিত করতে হবে।

—গাড়ি এইবার বাগবাজারে ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়িতে পৌঁছিল। স্বামীজী অবতরণ করিয়া উপরে উঠিলেন এবং তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে মহাকালী পাঠশালার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিতে লাগিলেন।

পরে 'রামকৃষ্ণ মিশনের' সভ্যদের কি কি কাজ করা কর্তব্য, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে বিদ্যাদান ও জ্ঞানদানের শ্রেষ্ঠত্ব বহুধা প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'Educate, educate (শিক্ষা দে, শিক্ষা দে), নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় (এ ছাড়া অন্য পথ নেই)।' শিক্ষাদানের বিরোধী দলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, 'যেন পেহ্লাদের দলে যাসনি।' ঐ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, 'শুনিসনি? ক-অক্ষর দেখেই প্রহ্লাদের চোখে জল এসেছিল—তা আর পড়াশুনো কি ক'রে হবে? অবশ্য প্রহ্লাদের চোখে প্রেমে জল এসেছিল, আর মূর্খদের চোখে জল ভয়ে এসে থাকে। ভক্তদের ভেতরেও অনেকে ঐ রকমের আছে।' সকলে ঐকথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। স্বামী যোগানন্দ ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, 'তোমার যখন যে দিকে ঝোঁক উঠবে—তার একটা হেস্তনেস্ত না হ'লে তো আর শান্তি নেই; এখন যা ইচ্ছা হচ্ছে, তাই হবে।'

৭

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার
কাল—(মার্চ ?), ১৮৯৭

আজ দশ দিন হইল শিষ্য স্বামীজীর নিকটে ঋগ্বেদের সায়নভাষ্য পাঠ করিতেছে। স্বামীজী বাগবাজারের ৺বলরাম বসুর বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। ম্যাক্সমূলর (MaxMuller)-এর মুদ্রিত বহু সংখ্যায় সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ গ্রন্থখানি কোন বড়লোকের বাড়ি হইতে আনা হইয়াছে। নূতন গ্রন্থ, তাহাতে আবার বৈদিক ভাষা, শিষ্যের পড়িতে পড়িতে অনেক স্থলে বাধিয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া স্বামীজী সস্নেহে তাহাকে কখন কখন 'বাঙাল' বলিয়া ঠাট্টা করিতেছেন এবং ঐ স্থলগুলির উচ্চারণ ও পাঠ বলিয়া দিতেছেন। বেদের অনাদিত্ব প্রমাণ করিতে সায়ন যে অদ্ভুত যুক্তিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বামীজী তাহার ব্যাখ্যা করিতে করিতে কখনও ভাষ্যকারের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন, আবার কখনও বা প্রমাণপ্রয়োগে ঐ পদের গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে স্বয়ং ভিন্নমত প্রকাশ করিয়া সায়নের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন।

ঐরূপে কিছুক্ষণ পাঠ চলিবার পর স্বামীজী ম্যাক্সমূলর-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন :

মনে হ'ল কি জানিস—সায়নই নিজের ভাষ্য নিজে উদ্ধার করতে ম্যাক্সমূলর-রূপে পুনরায় জন্মেছেন। আমার অনেক দিন হতেই ঐ ধারণা। ম্যাক্সমূলরকে দেখে সে ধারণা আরও যেন বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এমন অধ্যবসায়ী, এমন বেদবেদান্তসিদ্ধ পণ্ডিত এ দেশে দেখা যায় না! তার উপর আবার ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) প্রতি কি অগাধ ভক্তি! তাঁকে অবতার ব'লে বিশ্বাস করে রে! বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম—কি যত্নটাই করেছিল! বুড়ো-বুড়ীকে দেখে মনে হ'ত, যেন বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর মতো দুটিতে সংসার করছে!—আমায় বিদায় দেওয়ার কালে বুড়োর চোখে জল পড়ছিল!

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, সায়নই যদি ম্যাক্সমূলর হইয়া থাকেন তো পুণ্যভূমি ভারতে না জন্মিয়া ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মিলেন কেন?

স্বামীজী। অজ্ঞান থেকেই মানুষ 'আমি আর্য, উনি ম্লেচ্ছ' ইত্যাদি অনুভব ও বিভাগ করে। কিন্তু যিনি বেদের ভাষ্যকার, জ্ঞানের জ্বলন্ত মূর্তি, তাঁর পক্ষে আবার বর্ণাশ্রম, জাতিবিভাগ কি?—তাঁর কাছে ও-সব একেবারে অর্থশূন্য। জীবের উপকারের জন্য তিনি যথা ইচ্ছা জন্মাতে পারেন। বিশেষতঃ যে দেশে বিদ্যা ও অর্থ উভয়ই আছে, সেখানে না জন্মালে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছাপাবার খরচই বা কোথায় পেতেন? শুনিসনি?—East India Company (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি) এই ঋগ্বেদ ছাপাতে নয়লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছিল। তাতেও কুলোয়নি। এদেশের (ভারতের) শত শত বৈদিক পণ্ডিতকে মাসোহারা দিয়ে এ কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য এইরূপ বিপুল অর্থব্যয়, এইরূপ প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা এ দেশে এ যুগে কেউ কি কখন দেখেছে? ম্যাক্সমূলর নিজেই ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি ২৫ বৎসর কাল কেবল manuscirpt (পাণ্ডুলিপি) লিখেছেন; তারপর ছাপতে ২০ বৎসর লেগেছে! ৪৫ বৎসর একখানা বই নিয়ে এইরূপ লেগে পড়ে থাকা সামান্য মানুষের কাজ নয়। এতেই বোঝ্; সাধে কি আর বলি, তিনি সায়ন!

ম্যাক্সমূলর সম্বন্ধে ঐরূপ কথাবার্তা চলিবার পর আবার গ্রন্থপাঠ চলিতে লাগিল। এইবার 'বেদকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে'—সায়নের এই মত স্বামীজী সর্বথা সমর্থন করিয়া বলিলেন:

'বেদ' মানে অনাদি সত্যের সমষ্টি; বেদপারগ ঋষিগণ ঐসকল সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন; অতীন্দ্রিয়দর্শী ভিন্ন আমাদের মতো সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে সে-সকল প্রত্যক্ষ হয় না; তাই বেদে ঋষি শব্দের অর্থ মন্ত্রার্থ-দ্রষ্টা;—পৈতা গলায় ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণাদি জাতিবিভাগ পরে হয়েছিল। বেদ শব্দাত্মক অর্থাৎ ভাবাত্মক বা অনন্ত ভাবরাশির সমষ্টি মাত্র। 'শব্দ' পদের বৈদিক প্রাচীন অর্থ হচ্ছে সূক্ষ্মভাব, যা পরে স্থূলাকার গ্রহণ ক'রে নিজেকে প্রকাশিত করে। সুতরাং যখন প্রলয় হয়, তখন ভাবী সৃষ্টির সূক্ষ্ম বীজসমূহ বেদেই সম্পুটিত থাকে। তাই পুরাণে প্রথমে মীনাবতারে বেদের উদ্ধার দৃষ্ট হয়। প্রথমাবতারেই বেদের উদ্ধার-সাধন হ'ল। তারপর সেই বেদ থেকে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হ'তে লাগল; অর্থাৎ বেদনিহিত

শব্দাবলম্বনে বিশ্বের সকল স্থূল পদার্থ একে একে তৈরী হ'তে লাগল। কারণ, সকল স্থূল পদার্থেরই সূক্ষ্ম রূপ হচ্ছে শব্দ বা ভাব। পূর্ব পূর্ব কল্পেও এরূপে সৃষ্টি হয়েছিল। এ-কথা বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্রেই আছে 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।' বুঝলি ?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, কোন জিনিস না থাকিলে কাহার উদ্দেশে শব্দ প্রযুক্ত হইবে ? আর পদার্থের নামসকলই বা কি করিয়া তৈয়ারী হইবে ?

স্বামীজী। আপাততঃ তাই মনে হয় বটে। কিন্তু বোঝ্—এই ঘটটা ভেঙে গেলে ঘটত্বের নাশ হয় কি ? না। কেন না, ঘটটা হচ্ছে স্থূল; কিন্তু ঘটত্বটা হচ্ছে ঘটের সূক্ষ্ম- বা শব্দাবস্থা। ঐরূপে সকল পদার্থের শব্দাবস্থাটি হচ্ছে ঐসকল জিনিসের সূক্ষ্মাবস্থা। আর আমরা দেখি শুনি ধরি ছুঁই যে জিনিসগুলো, সেগুলো হচ্ছে ঐরূপ সূক্ষ্ম- বা শব্দাবস্থায় অবস্থিত পদার্থসকলের স্থূল বিকাশ। যেমন কার্য আর তার কারণ। জগৎ ধ্বংস হয়ে গেলেও জগদ্বোধাত্মক শব্দ বা স্থূল পদার্থসকলের সূক্ষ্ম স্বরূপসমূহ ব্রহ্মে কারণরূপে থাকে। জগদ্বিকাশের প্রাক্কালে প্রথমেই সূক্ষ্ম স্বরূপসমূহের সমষ্টীভূত ঐ পদার্থ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং তারই প্রকৃতস্বরূপ শব্দগর্ভাত্মক অনাদি নাদ 'ওঁ'কার আপনা আপনি উঠতে থাকে। ক্রমে ঐ সমষ্টি হ'তে এক একটি বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রথমে সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি বা শাব্দিক রূপ ও পরে স্থূলরূপ প্রকাশ পায়। ঐ শব্দই ব্রহ্ম—শব্দই বেদ। ইহাই সায়নের অভিপ্রায়। বুঝলি ?

শিষ্য। মহাশয়, ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামীজী। জগতে যত ঘট আছে, সবগুলো নষ্ট হলেও ঘটশব্দ থাকতে যে পারে, তা তো বুঝেছিস ? তবে জগৎ ধ্বংস হলেও বা যে-সব জিনিসগুলোকে নিয়ে জগৎ, সেগুলো সব ভেঙে চুরে গেলেও তত্তদ্বোধাত্মক শব্দগুলি কেন না থাকতে পারবে ? আর তা থেকে পুনঃসৃষ্টি কেনই বা না হ'তে পারবে ?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, 'ঘট' 'ঘট' বলিয়া চীৎকার করিলেই তো ঘট তৈরী হয় না।

স্বামীজী। তুই আমি ঐরূপে চীৎকার করলে হয় না; কিন্তু সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মে ঘটস্মৃতি হবামাত্র ঘট প্রকাশ হয়। সামান্য সাধকের ইচ্ছাতেই যখন নানা অঘটন-ঘটন হ'তে পারে—তখন সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মের কা কথা। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম প্রথম শব্দাত্মক হন, পরে 'ওঁ'কারাত্মক বা নাদাত্মক হয়ে যান। তারপর পূর্ব পূর্ব কল্পের নানা বিশেষ বিশেষ শব্দ, যথা—'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ' বা 'গো মানব ঘট পট' ইত্যাদি ঐ 'ওঁ'কার থেকে বেরুতে থাকে। সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মে ঐ ঐ শব্দ ক্রমে এক একটা ক'রে হবামাত্র ঐ ঐ জিনিসগুলো অমনি তখনি বেরিয়ে ক্রমে বিচিত্র জগতের বিকাশ হয়ে পড়ে। এইবার বুঝলি—শব্দ কিরূপে সৃষ্টির মূল?

শিষ্য। হাঁ, একপ্রকার বুঝিলাম বটে। কিন্তু ঠিক ঠিক ধারণা হইতেছে না।

স্বামীজী। ধারণা হওয়া—প্রত্যক্ষ অনুভব করাটা কি সোজা রে বাপ? মন যখন ব্রহ্মাবগাহী হ'তে থাকে, তখন একটার পর একটা ক'রে এই সব অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়ে শেষে নির্বিকল্পে উপস্থিত হয়। সমাধিমুখে প্রথম বুঝা যায়—জগৎটা শব্দময়, তারপর গভীর 'ওঁ'কার ধ্বনিতে সব মিলিয়ে যায়।—তারপর তাও শুনা যায় না। তাও আছে কি নেই—এরূপ বোধ হয়। ঐটেই হচ্ছে অনাদি নাদ, তারপর প্রত্যক্-ব্রহ্মে মন মিলিয়ে যায়। বস্—সব চুপ।

স্বামীজীর কথায় শিষ্যের পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল, স্বামীজী ঐ-সকল অবস্থার ভিতর দিয়া অনেকবার স্বয়ং সমাধি-ভূমিতে গমনাগমন করিয়াছেন, নতুবা এমন বিশদভাবে এ-সকল কথা কিরূপে বুঝাইয়া বলিতেছেন? শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে ও ভাবিতে লাগিল,—নিজের দেখা-শুনা জিনিস না হইলে কখনও কেহ এরূপে বলিতে বা বুঝাইতে পারে না।

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন: অবতারকল্প মহাপুরুষেরা সমাধিভঙ্গের পর আবার যখন 'আমি-আমার' রাজত্বে নেমে আসেন, তখন প্রথমেই অব্যক্ত নাদের অনুভব করেন; ক্রমে নাদ সুস্পষ্ট হয়ে 'ওঁ'কার অনুভব করেন, 'ওঁ'কার থেকে পরে শব্দময় জগতের প্রতীতি করেন, তারপর সর্বশেষে স্থূল ভূত-জগতের প্রত্যক্ষ করেন। সামান্য সাধকের কিন্তু অনেক কষ্টে কোনরূপ নাদের পারে গিয়ে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারলে

পুনরায় স্থূল জগতের প্রত্যক্ষ হয় যে নিম্নভূমিতে—সেখানে আর নামতে পারে না। ব্রহ্মেই মিলিয়ে যায়—'ক্ষীরে নীরবৎ'।

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময় মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া পুনরায় শিষ্যকে পাঠ দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবুও তাহা নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলেন এবং স্বামীজীর ঐরূপে অপূর্ব বিশদভাবে বেদব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পূর্ব বিষয়ের অনুসরণ করিয়া স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন :

বৈদিক ও লৌকিক ভেদে শব্দ আবার দ্বিধা বিভক্ত। 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকায়'[১] এ বিষয়ের বিচার দেখেছি। বিচারগুলি খুব চিন্তার পরিচায়ক বটে, কিন্তু Terminologyর (পরিভাষার) চোটে মাথা গুলিয়ে ওঠে।

এইবার গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া স্বামীজী বলিলেন—'কি জি. সি, এ-সব তো কিছু পড়লে না, কেবল কেষ্ট-বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে।'

গিরিশবাবু। কি আর প'ড়ব ভাই? অত অবসরও নেই, বুদ্ধিও নেই যে ওতে সেঁধুব। তবে ঠাকুরের কৃপায় ও-সব বেদবেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারব। তোমাদের দিয়ে তাঁর ঢের কাজ করাবেন ব'লে ও-সব পড়িয়ে নিয়েছেন, আমার ও-সব দরকার নেই।

এই কথা বলিয়া গিরিশবাবু সেই প্রকাণ্ড ঋগ্বেদ গ্রন্থখানিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে ও বলিতে লাগিলেন—'জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়'।

স্বামীজী অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, ইতোমধ্যে গিরিশবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'হাঁ, হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? ঐ অমুকের বাড়ির গিন্নি, এককালে যার বাড়িতে রোজ পঞ্চাশখানি পাতা প'ড়ত, সে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায়নি; ঐ অমুকের বাড়ির কুলস্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার ক'রে মেরে ফেলেছে; ঐ অমুকের বাড়িতে

১ ন্যায়দর্শনের গ্রন্থবিশেষ

ভ্রূণহত্যা হয়েছে, অমুক জোচ্চোরি ক'রে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে—এ-সকল রহিত করবার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি?' গিরিশবাবু এইরূপে সমাজের বিভীষিকাপ্রদ ছবিগুলি উপর্যুপরি অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্বামীজী নির্বাক হইয়া রহিলেন। জগতের দুঃখকষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজীর চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহার মনের ঐরূপ ভাব আমাদের জানিতে দিবেন না বলিয়াই যেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে গিরিশবাবু শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'দেখলি বাঙ্গাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব'লে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল।'

শিষ্য। মহাশয়, আমাদের বেশ বেদ পড়া হইতেছিল; আপনি মায়ার জগতের কি কতকগুলো ছাইভস্ম কথা তুলিয়া স্বামীজীর মন খারাপ করিয়া দিলেন।

গিরিশবাবু। জগতে এই দুঃখকষ্ট, আর উনি সে দিকে একবার না চেয়ে চুপ ক'রে বসে কেবল বেদ পড়ছেন! রেখে দে তোর বেদ-বেদান্ত।

শিষ্য। আপনি কেবল হৃদয়ের ভাষা শুনিতেই ভালবাসেন, নিজে হৃদয়বান্ কি না! কিন্তু এই সব শাস্ত্র, যাহার আলোচনায় জগৎ ভুল হইয়া যায়, তাহাতে আপনার আদর দেখিতে পাই না। নতুবা এমন করিয়া আজ রসভঙ্গ করিতেন না।

গিরিশবাবু। বলি জ্ঞান আর প্রেমের পৃথক্‌ত্বটা কোথায় আমায় বুঝিয়ে দে দেখি। এই দেখ না, তোর গুরু (স্বামীজী) যেমন পণ্ডিত তেমনি প্রেমিক। তোর বেদও বলছে না 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' তিনটে একই জিনিস? এই দেখ না, স্বামীজী অত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করছিলেন, কিন্তু যাই জগতের দুঃখের কথা শোনা ও মনে পড়া, অমনি জীবের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। জ্ঞান আর প্রেমে যদি বেদবেদান্ত বিভিন্নতা প্রমাণ ক'রে থাকেন তো অমন বেদ-বেদান্ত আমার মাথায় থাকুন।

শিষ্য নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, 'সত্যই তো গিরিশবাবুর সিদ্ধান্তগুলি বেদের অবিরোধী।'

ইতোমধ্যে স্বামীজী আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'কি রে তোদের কি কথা হচ্ছিল ?'

শিষ্য। এই সব বেদের কথাই হইতেছিল। ইনি এ-সকল গ্রন্থ পড়েন নাই, কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি বেশ ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন—বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।

স্বামীজী। গুরুভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়—পড়বার শুনবার দরকার হয় না। তবে এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে দুর্লভ। ওর (গিরিশবাবুর) মতো যাঁদের ভক্তি বিশ্বাস, তাঁদের শাস্ত্র পড়বার দরকার নেই। কিন্তু ওকে (গিরিশবাবুকে) imitate (অনুকরণ) করতে গেলে অন্যের সর্বনাশ উপস্থিত হবে। ওর কথা শুনে যাবি, কিন্তু কখন ওর দেখাদেখি কাজ করতে যাবি না।

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী। আজ্ঞে হাঁ নয়। যা বলি সে-সব কথাগুলি বুঝে নিবি, মূর্খের মতো সব কথায় কেবল সায় দিয়ে যাবি না। আমি বললেও বিশ্বাস করবিনি। বুঝে তবে নিবি। আমাকে ঠাকুর তাঁর কথা সব বুঝে নিতে সর্বদা বলতেন। সদ্‌যুক্তি, তর্ক ও শাস্ত্রে যা বলেছে, এই সব নিয়ে পথে চলবি। বিচার করতে করতে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে যাবে, তবে তাইতে ব্রহ্ম reflected (প্রতিফলিত) হবেন। বুঝলি ?

শিষ্য। হাঁ। কিন্তু নানা লোকের নানা কথায় মাথা ঠিক থাকে না। এই একজন (গিরিশবাবু) বলিলেন, 'কি হবে ও-সব পড়ে ?' আবার এই আপনি বলিতেছেন বিচার করিতে। এখন করি কি ?

স্বামীজী। আমাদের উভয়ের কথাই সত্যি। তবে দুই standpoint (দিক) থেকে আমাদের দু-জনের কথাগুলি বলা হচ্ছে—এই পর্যন্ত। একটা অবস্থা আছে, যেখানে যুক্তি তর্ক সব চুপ হয়ে যায় 'মূকাস্বাদনবৎ'। আর একটা অবস্থা আছে, যাতে বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা পঠন-পাঠন করতে করতে সত্যবস্তু প্রত্যক্ষ হয়। তোকে এসব পড়ে শুনে যেতে হবে, তবে তোর সত্য প্রত্যক্ষ হবে। বুঝলি ?

নির্বোধ শিষ্য স্বামীজীর ঐরূপ আদেশলাভে গিরিশবাবুর হার হইল মনে করিয়া গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, 'মহাশয়, শুনিলেন তো স্বামীজী আমায় বেদবেদান্ত পড়িতে ও বিচার করিতেই বলিলেন।'

গিরিশবাবু। তা তুই করে যা। স্বামীজীর আশীর্বাদে তোর তাই করেই সব ঠিক হবে।

স্বামী সদানন্দ এই সময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, 'ওরে, এই জি. সি-র মুখে দেশের দুর্দশার কথা শুনে প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছে। দেশের জন্য কিছু করতে পারিস্?'

সদানন্দ। মহারাজ! যো হুকুম—বান্দা তৈয়ার হ্যায়।

স্বামীজী। প্রথমে ছোটখাট scale-এ (হারে) একটা relief centre (সেবাশ্রম) খোল্, যাতে গরীব-দুঃখীরা সব সাহায্য পাবে, রোগীদের সেবা করা হবে, যাদের কেউ দেখবার নেই—এমন অসহায় লোকদের জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সেবা করা হবে। বুঝলি?

সদানন্দ। জো হুকুম মহারাজ!

স্বামীজী। জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়—'মুক্তিঃ করফলায়তে'।

এইবার গিরিশবাবুকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন:

দেখ, গিরিশবাবু, মনে হয় এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমার যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা ক'রব। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে। কেন বলো দেখি এমন ভাব ওঠে?

গিরিশবাবু। তা না হ'লে আর তিনি (ঠাকুর) তোমায় সকলের চেয়ে বড় আধার বলতেন!

এই বলিয়া গিরিশবাবু কার্যান্তরে যাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

৮

স্থান—আলমবাজার মঠ, কলিকাতা

কাল—এপ্রিল, ১৮৯৭

প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া স্বামীজী যখন কিছুদিন কলিকাতায় ছিলেন, তখন বহু উৎসাহী যুবক তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত। দেখা গিয়াছে, সেই সময় স্বামীজী অবিবাহিত যুবকগণকে ব্রহ্মচর্য ও ত্যাগের বিষয় সর্বদা উপদেশ দিতেন এবং সন্ন্যাস অথবা আপনার মোক্ষ ও জগতের কল্যাণার্থ সর্বস্ব ত্যাগ করিতে বহুধা উৎসাহিত করিতেন। আমরা তাঁহাকে অনেক সময় বলিতে শুনিয়াছি, সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে কাহারও যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না; কেবল তাহাই নহে—বহুজনহিতকর, বহুজনসুখকর কোন ঐহিক কার্যের অনুষ্ঠান এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভ করাও সন্ন্যাস ভিন্ন হয় না। তিনি সর্বদা ত্যাগের উচ্চাদর্শ উৎসাহী যুবকদের সমক্ষে স্থাপন করিতেন এবং কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাহাকে সমধিক উৎসাহ দিতেন ও কৃপা করিতেন। এই সময় কতিপয় ভাগ্যবান্ যুবক সংসার-আশ্রম ত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারাই সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যে চারিজনকে[১] স্বামীজী প্রথম সন্ন্যাস দেন, তাহাদের সন্ন্যাসব্রতগ্রহণের দিন শিষ্য আলমবাজার মঠে উপস্থিত ছিল।

ইহাদের মধ্যে একজনকে যাহাতে সন্ন্যাস না দেওয়া হয়, সেজন্য স্বামীজীর গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বহুধা অনুরোধ করেন। স্বামীজী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আমরা যদি পাপী তাপী দীন দুঃখী পতিতের উদ্ধারসাধনে পশ্চাৎপদ হই, তা হ'লে কে আর তাকে দেখবে? তোমরা এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদী হইও না।' স্বামীজীর বলবতী ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। অনাথশরণ স্বামীজী নিজ কৃপাগুণে তাহাকে সন্ন্যাস দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

শিষ্য আজ দুই দিন হইতে মঠেই রহিয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'তুই তো ভটচায বামুন; আগামী কাল তুই-ই এদের শ্রাদ্ধ[২] করিয়ে দিবি,

১ নিত্যানন্দ, বিরজানন্দ, প্রকাশানন্দ ও নির্ভয়ানন্দ

২ শাস্ত্রমতে যাঁহারা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে নিজেদের শ্রাদ্ধ ঐ সময়ে করিয়া লইতে হয়, কারণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে লৌকিক বা বৈদিক কোন বিষয়ে আর অধিকার থাকে না।

পরদিন এদের সন্ন্যাস দিব। আজ পাঁজি-পুঁথি সব পড়ে-শুনে দেখে নিস্।' শিষ্য স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইল।

শ্রাদ্ধান্তে যখন ব্রহ্মচারিচতুষ্টয় নিজ নিজ পিণ্ড অর্পণ করিয়া পিণ্ডাদি লইয়া গঙ্গায় চলিয়া গেলেন, তখন স্বামীজী শিষ্যের মনের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'এ-সব দেখে শুনে তোর মনে ভয় হয়েছে—না রে?' শিষ্য নতমস্তকে সম্মতি জ্ঞাপন করায় স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন :

সংসারে আজ থেকে এদের মৃত্যু হ'ল, কাল থেকে এদের নূতন দেহ, নূতন চিন্তা, নূতন পরিচ্ছদ হবে—এরা ব্রহ্মবীর্যে প্রদীপ্ত হয়ে জলন্ত পাবকের মতো অবস্থান করবে। ন ধনেন ন চেজ্যয়া···ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।[১]

স্বামীজীর কথা শুনিয়া শিষ্য নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসের কঠোরতা স্মরণ করিয়া তাহার বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া গেল, শাস্ত্রজ্ঞানের আস্ফালন দূরীভূত হইল।

কৃতশ্রাদ্ধ ব্রহ্মচারিচতুষ্টয় ইতোমধ্যে গঙ্গাতে পিণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন :

তোমরা মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হয়েছ; ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ, ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী—'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'।

সেইদিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজী কেবল সন্ন্যাসধর্ম বিষয়েই কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসব্রতগ্রহণোৎসুক ব্রহ্মচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন :

'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস না হ'লে কেউ কখনও ব্রহ্মজ্ঞ হ'তে পারে না—এ কথা বেদ-বেদান্ত ঘোষণা করছে। যারা বলে—এ সংসারও ক'রব, ব্রহ্মজ্ঞও হবো—তাদের কথা আদপেই শুনবিনি। ও-সব প্রচ্ছন্নভোগীদের স্তোকবাক্য। এতটুকু সংসারের ভোগেচ্ছা যার রয়েছে, এতটুকু কামনা যার রয়েছে, এ কঠিন পন্থা ভেবে তার ভয়; তাই আপনাকে প্রবোধ দেবার জন্য ব'লে বেড়ায়, 'একুল

---

১ 'উপনিষদ'

ওকূল দুকূল রেখে চলতে হবে'। ও পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ, অশাস্ত্রীয় অবৈদিক মত। ত্যাগ ছাড়া মুক্তি নেই। ত্যাগ ছাড়া পরাভক্তি লাভ হয় না। ত্যাগ—ত্যাগ। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। গীতাতেও আছে—'কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ'[১]।

সংসারের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে না দিলে কারও মুক্তি হয় না। সংসারাশ্রমে যে রয়েছে, একটা না একটা কামনার দাস হয়েই যে সে ঐরূপে বদ্ধ রয়েছে, ওতেই তা প্রমাণ হচ্ছে। নৈলে সংসারে থাকবে কেন? হয় কামিনীর দাস, নয় অর্থের দাস, নয় মান যশ বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের দাস। এ দাসত্ব থেকে বেরিয়ে পড়লে তবে মুক্তির পন্থায় অগ্রসর হ'তে পারা যায়। যে যতই বলুক না কেন, আমি বুঝেছি, এ-সব ছেড়ে-ছুড়ে না দিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ না করলে কিছুতেই জীবের পরিত্রাণ নেই, কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নেই।

শিষ্য। মহাশয়, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি সিদ্ধিলাভ হয়?

স্বামীজী। সিদ্ধ হয় কি না হয় পরের কথা। তুই যতক্ষণ না এই ভীষণ সংসারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়তে পারছিস—যতক্ষণ না বাসনার দাসত্ব ছাড়তে পারছিস—ততক্ষণ তোর ভক্তি মুক্তি কিছুই লাভ হবে না। ব্রহ্মজ্ঞের কাছে সিদ্ধি ঋদ্ধি অতি তুচ্ছ কথা।

শিষ্য। মহাশয়, সন্ন্যাসের কোনরূপ কালাকাল বা প্রকার-ভেদ আছে কি?

স্বামীজী। সন্ন্যাসধর্ম-সাধনের কালাকাল নেই। শ্রুতি বলছেন, 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—যখনি বৈরাগ্যের উদয় হবে, তখনি প্রব্রজ্যা করবে। যোগবাশিষ্ঠেও রয়েছে—

যুবৈব ধর্মশীলঃ স্যাদ্ অনিত্যং খলু জীবিতং।
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি॥

—জীবনের অনিত্যতাবশতঃ যুবকালেই ধর্মশীল হবে। কে জানে কার কখন দেহ যাবে? শাস্ত্রে চতুর্বিধ সন্ন্যাসের বিধান দেখতে পাওয়া যায় —বিদ্বৎ সন্ন্যাস, বিবিদিষা সন্ন্যাস, মর্কট সন্ন্যাস এবং আতুর সন্ন্যাস। হঠাৎ ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হ'ল, তখনি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়লে—

১ গীতা, ১৮।২

এটি পূর্ব জন্মের সংস্কার না থাকলে হয় না। এরই নাম 'বিদ্বৎ সন্ন্যাস'। আত্মতত্ত্ব জানবার প্রবল বাসনা থেকে শাস্ত্রপাঠ ও সাধনাদি দ্বারা স্ব-স্বরূপ অবগত হবার জন্য কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে স্বাধ্যায় ও সাধন ভজন করতে লাগলো—একে 'বিবিদিষা সন্ন্যাস' বলে। সংসারের তাড়না, স্বজনবিয়োগ বা অন্য কোন কারণে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়ে সন্ন্যাস নেয়; কিন্তু এ বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না, এর নাম 'মর্কট সন্ন্যাস'। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'বৈরাগ্য নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে আবার একটা চাকরি বাগিয়ে নিলে; তারপর চাই কি পরিবার আনলে বা আবার বে ক'রে ফেললে।' আর এক প্রকার সন্ন্যাস আছে, যেমন মুমূর্ষু, রোগশয্যায় শায়িত, বাঁচবার আশা নেই, তখন তাকে সন্ন্যাস দেবার বিধি আছে। সে যদি মরে তো পবিত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ ক'রে মরে গেল—পর জন্মে এই পুণ্যে ভাল জন্ম হবে। আর যদি বেঁচে যায় তো আর গৃহে না গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের চেষ্টায় সন্ন্যাসী হয়ে কালযাপন করবে। তোর কাকাকে শিবানন্দ স্বামী 'আতুর সন্ন্যাস' দিয়েছিলেন। সে মরে গেল, কিন্তু ঐরূপে সন্ন্যাসগ্রহণে তার উচ্চ জন্ম হবে। সন্ন্যাস না নিলে কিন্তু আত্মজ্ঞানলাভের আর উপায়ান্তর নেই।

শিষ্য। মহাশয়, গৃহীদের তবে উপায়?

স্বামীজী। সুকৃতিবশতঃ কোন-না-কোন জন্মে তাদের বৈরাগ্য হবে। বৈরাগ্য এলেই হয়ে গেল—জন্ম-মৃত্যু-প্রহেলিকার পারে যাবার আর দেরী হয় না। তবে সকল নিয়মেরই দু-একটা exception (ব্যতিক্রম) আছে। ঠিক ঠিক গৃহীর ধর্ম পালন করেও দু-একজন মুক্ত পুরুষ হ'তে দেখা যায়; যেমন আমাদের মধ্যে 'নাগ-মহাশয়'।

শিষ্য। মহাশয়, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস বিষয়ে উপনিষদাদি গ্রন্থেও বিশদ উপদেশ পাওয়া যায় না।

স্বামীজী। পাগলের মতো কি বলছিস? বৈরাগ্যই উপনিষদের প্রাণ। বিচারজনিত প্রজ্ঞাই উপনিষদ্‌-জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। তবে আমার বিশ্বাস, ভগবান বুদ্ধদেবের পর থেকেই ভারতবর্ষে এই ত্যাগব্রত বিশেষরূপে প্রচারিত হয়েছে এবং বৈরাগ্য ও বিষয়বিতৃষ্ণাই ধর্মের চরম লক্ষ্য ব'লে বিবেচিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের সেই ত্যাগ-বৈরাগ্য হিন্দুধর্ম absorb

(নিজের ভিতর হজম) ক'রে নিয়েছে। ভগবান বুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর জন্মায়নি।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, বুদ্ধদেব জন্মাইবার পূর্বে দেশে ত্যাগ-বৈরাগ্যের অল্পতা ছিল এবং দেশে সন্ন্যাসী ছিল না ?

স্বামীজী। তা কে বললে ? সন্ন্যাসাশ্রম ছিল, কিন্তু উহাই জীবনের চরমলক্ষ্য ব'লে সাধারণের জানা ছিল না, বৈরাগ্যে দৃঢ়তা ছিল না, বিবেক-নিষ্ঠা ছিল না। সেই জন্য বুদ্ধদেব কত যোগী, কত সাধুর কাছে গিয়ে শান্তি পেলেন না। তারপর 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং'[১] ব'লে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য নিজেই বসে পড়লেন এবং প্রবুদ্ধ হয়ে তবে উঠলেন। ভারতবর্ষের এই যে সব সন্ন্যাসীর মঠ-ফঠ দেখতে পাচ্ছিস—এ-সব বৌদ্ধদের অধিকারে ছিল, হিন্দুরা সেই সকলকে এখন তাদের রঙে রঙিয়ে নিজস্ব ক'রে বসেছে। ভগবান বুদ্ধদেব হতেই যথার্থ সন্ন্যাসাশ্রমের সূত্রপাত হয়েছিল। তিনিই সন্ন্যাসাশ্রমের মৃতকঙ্কালে প্রাণসঞ্চার ক'রে গেছেন।

স্বামীজীর গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, 'বুদ্ধদেব জন্মাবার আগেও ভারতে আশ্রম-চতুষ্টয় যে ছিল, সংহিতা-পুরাণাদি তার প্রমাণস্থল।'

স্বামীজী। মন্বাদি সংহিতা, পুরাণসকলের অধিকাংশ এবং মহাভারতের অনেকটাও সেদিনকার শাস্ত্র। ভগবান্ বুদ্ধ তার ঢের আগে।

রামকৃষ্ণানন্দ। তা হ'লে বেদে, উপনিষদে, সংহিতায়, পুরাণে বৌদ্ধধর্মের সমালোচনা নিশ্চয় থাকত ; কিন্তু এই সকল প্রাচীন গ্রন্থে যখন বৌদ্ধ-ধর্মের আলোচনা দেখা যায় না, তখন তুমি কি ক'রে বলবে বুদ্ধদেব তার আগেকার লোক ? দু-চারখানি প্রাচীন পুরাণাদিতে বৌদ্ধমতের আংশিক বর্ণনা রয়েছে, তা দেখে কিন্তু বলা যায় না যে, হিন্দুর সংহিতা পুরাণাদি আধুনিক শাস্ত্র।

স্বামীজী। History (ইতিহাস) পড়ে দেখ। দেখতে পাবি, হিন্দুধর্ম বুদ্ধদেবের সব ভাবগুলি absorb (হজম) ক'রে এত বড় হয়েছে।

রামকৃষ্ণানন্দ। আমার বোধ হয়, ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতি জীবনে ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান ক'রে বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মের ভাবগুলি সজীব ক'রে গেছেন মাত্র।

---

১ ললিতবিস্তর

স্বামীজী। ঐ কথা কিন্তু প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বুদ্ধদেব জন্মাবার আগেকার কোন History (প্রামাণ্য ইতিহাস) পাওয়া যায় না। Historyকে (ইতিহাসকে) authority (প্রমাণ) ব'লে মানলে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, পুরাকালের ঘোর অন্ধকারে ভগবান বুদ্ধদেবই একমাত্র জ্ঞানালোকপ্রদীপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।

(পুনরায় সন্ন্যাসধর্মের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল।)

সন্ন্যাসের origin (উৎপত্তি) যখনই হোক না কেন, মানব-জন্মের goal (উদ্দেশ্য) হচ্ছে এই ত্যাগব্রত অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া। সন্ন্যাস-গ্রহণই হচ্ছে পরম পুরুষার্থ। বৈরাগ্য উপস্থিত হবার পর যারা সংসারে বীতরাগ হয়েছে, তারাই ধন্য।

শিষ্য। মহাশয়, আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের ব্যাবহারিক উন্নতির পক্ষে ক্ষতি হইয়াছে। গৃহস্থের মুখাপেক্ষী হইয়া সাধুরা নিষ্কর্মা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান বলিয়া ইহারা বলেন, সন্ন্যাসীরা সমাজ ও স্বদেশের উন্নতিকল্পে কোনরূপ সহায়ক হন না।

স্বামীজী। লৌকিক বা ব্যাবহারিক উন্নতি কথাটার মানে কি, আগে আমায় বুঝিয়ে বল্ দেখি।

শিষ্য। পাশ্চাত্য যেমন বিদ্যাসহায়ে দেশে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে, বিজ্ঞানসহায়ে দেশে বাণিজ্য-শিল্প পোশাক-পরিচ্ছদ রেল-টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নানাবিষয়ের উন্নতিসাধন করিতেছে, সেইরূপ করা।

স্বামীজী। মানুষের মধ্যে রজোগুণের অভ্যুদয় না হ'লে এ-সব হয় কি? ভারতবর্ষ ঘুরে দেখলুম, কোথাও রজোগুণের বিকাশ নেই। কেবল তমো—তমো—ঘোর তমোগুণে ইতরসাধারণ সকলে পড়ে রয়েছে। কেবল সন্ন্যাসীদের ভেতরেই দেখেছি রজঃ ও সত্ত্বগুণ রয়েছে; এরাই ভারতের মেরুদণ্ড, যথার্থ সন্ন্যাসী—গৃহীদের উপদেষ্টা। তাদের উপদেশ ও জ্ঞানালোক পেয়েই পূর্বে অনেক সময়ে গৃহীরা জীবনসংগ্রামে কৃতকার্য হয়েছিল। সন্ন্যাসীদের বহুমূল্য উপদেশের বিনিময়ে গৃহীরা তাদের অন্নবস্ত্র দেয়। এই আদান-প্রদান না থাকলে ভারতবর্ষের লোক এতদিনে আমেরিকার Red Indianদের (আদিম অধিবাসীদের) মতো

প্রায় extinct (উজাড়) হয়ে যেত। সন্ন্যাসীদের গৃহীরা দুমুঠো খেতে দেয় ব'লে গৃহীরা এখনও উন্নতির পথে যাচ্ছে। সন্ন্যাসীরা কর্মহীন নয়। তারাই হচ্ছে কর্মের fountain-head (উৎস)। উচ্চ আদর্শ-সকল তাদের জীবনে বা কাজে পরিণত করতে দেখে এবং তাদের কাছ থেকে ঐ সব idea (উচ্চ ভাব) নিয়েই গৃহীরা কর্মক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে সমর্থ হয়েছে ও হচ্ছে। পবিত্র সন্ন্যাসীদের দেখেই গৃহস্থেরা পবিত্র ভাব-গুলি জীবনে পরিণত করছে এবং ঠিক ঠিক কর্মতৎপর হচ্ছে। সন্ন্যাসীরা নিজ জীবনে ঈশ্বরার্থে ও জগতের কল্যাণার্থে সর্বস্ব-ত্যাগরূপ তত্ত্ব প্রতিফলিত ক'রে গৃহীদের সব বিষয়ে উৎসাহিত করছে, আর বিনিময়ে তারা তাদের দুমুঠো অন্ন দিচ্ছে। দেশের লোকের সেই অন্ন জন্মাবার প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতাও আবার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদেই বর্ধিত হচ্ছে। না বুঝেই লোকে সন্ন্যাস institution (আশ্রম)-এর নিন্দা করে। অন্য দেশ যাই হোক না কেন, এদেশে কিন্তু সন্ন্যাসীরা হাল ধরে আছে বলেই সংসারসাগরে গৃহস্থদের নৌকা ডুবছে না।

শিষ্য। মহাশয়, লোক-কল্যাণে তৎপর যথার্থ সন্ন্যাসী কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়?

স্বামীজী। হাজার বৎসর অন্তর যদি ঠাকুরের ন্যায় একজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ আসেন তো ভরপুর। তিনি যে-সকল উচ্চ আদর্শ ও ভাব দিয়ে যাবেন, তা নিয়ে তাঁর জন্মাবার হাজার বৎসর পর অবধি লোকে চলবে। এই সন্ন্যাস institution (আশ্রম) দেশে ছিল বলেই তো তাঁর ন্যায় মহাপুরুষেরা এদেশে জন্মগ্রহণ করছেন। দোষ সব আশ্রমেই আছে, তবে অল্পাধিক। দোষ সত্ত্বেও এতদিন পর্যন্ত যে এই আশ্রম সকল আশ্রমের শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার কারণ কি? যথার্থ সন্ন্যাসীরা নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত উপেক্ষা করেন, জগতের ভাল করতেই তাঁদের জন্ম। এমন সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি যদি তোরা কৃতজ্ঞ না হ'স্ তো তোদের ধিক—শত ধিক।

—বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসাশ্রমের গৌরবপ্রসঙ্গে স্বামীজী যেন মূর্তিমান্ 'সন্ন্যাস'রূপে শিষ্যের চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ আশ্রমের গৌরব তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে করিতে যেন অন্তর্মুখ হইয়া আপনা আপনি মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন :

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥[১]

পরে আবার বলিতে লাগিলেন :

বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে যারা এই ideal (উচ্চ লক্ষ্য) ভুলে যায় 'বৃথৈব তস্য জীবনং'। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগ-বিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।

গুরুভ্রাতাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন :

'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' আমাদের জন্ম ; কি করছিস সব বসে বসে ? ওঠ,—জাগ্, নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্, নরজন্ম সার্থক ক'রে চলে যা। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

১ কৌপীনপঞ্চকম্—শঙ্করাচার্য

৯

স্থান—আলমবাজার মঠ

কাল—মে, ১৮৯৭

দার্জিলিঙ হইতে স্বামীজী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আলমবাজার মঠেই অবস্থান করিতেছেন। গঙ্গাতীরে কোন স্থানে মঠ উঠাইয়া লইবার জল্পনা হইতেছে। শিষ্য আজকাল প্রায়ই মঠে তাঁহার নিকটে যাতায়াত করে এবং মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে অবস্থানও করিয়া থাকে। দীক্ষাগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শিষ্য স্বামীজীকে দার্জিলিঙে ইতঃপূর্বে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিল। স্বামীজী তদুত্তরে লিখেন, 'নাগ-মশায়ের আপত্তি না হ'লে তোমাকে অতি আনন্দের সহিত দীক্ষিত ক'রব।'

১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ। স্বামীজী আজ শিষ্যকে দীক্ষা দিবেন বলিয়াছেন। আজ শিষ্যের জীবনে সর্বাপেক্ষা বিশেষ দিন। শিষ্য প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানান্তে কতকগুলি লিচু ও অন্য দ্রব্যাদি কিনিয়া বেলা ৮টা আন্দাজ আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইয়াছে। শিষ্যকে দেখিয়া স্বামীজী রহস্য করিয়া বলিলেন: আজ তোকে 'বলি' দিতে হবে—না?

স্বামীজী শিষ্যকে ঐ কথা বলিয়া আবার হাস্যমুখে সকলের সঙ্গে আমেরিকার নানা প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ধর্মজীবন গঠন করিতে হইলে কিরূপ একনিষ্ঠ হইতে হয়, গুরুতে কিরূপ অচল বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তিভাব রাখিতে হয়, গুরুবাক্যে কিরূপ আস্থা স্থাপন করিতে হয় এবং গুরুর জন্য কিরূপে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হয়—এ-সকল প্রসঙ্গও সঙ্গে সঙ্গে হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি শিষ্যকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাহার হৃদয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন: 'আমি তোকে যখন যে কাজ করতে ব'লব, তখনি তা যথাসাধ্য করবি তো? যদি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে বা ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লে তোর মঙ্গল হবে বুঝে তাই করতে বলি, তা হ'লে তাও নির্বিচারে করতে পারবি তো? এখনও ভেবে দেখ্; নতুবা সহসা গুরু ব'লে গ্রহণ করতে এগোসনি।'—এইরূপে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া স্বামীজী শিষ্যের বিশ্বাসের দৌড়টা বুঝিতে লাগিলেন। শিষ্যও নতশিরে 'পারিব' বলিয়া প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল।

স্বামীজী। যিনি এই সংসার-মায়ার পারে নিয়ে যান, যিনি কৃপা ক'রে সমস্ত মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ গুরু। আগে শিষ্যেরা 'সমিৎপাণি' হয়ে গুরুর আশ্রমে যেত। গুরু অধিকারী ব'লে বুঝলে তাকে দীক্ষিত ক'রে বেদপাঠ করাতেন এবং কায়মনোবাক্যদণ্ড-রূপ ব্রতের চিহ্নস্বরূপ ত্রিরাবৃত্ত মৌঞ্জিমেখলা তার কোমরে বেঁধে দিতেন। ঐটে দিয়ে শিষ্যেরা কৌপীন এঁটে বেঁধে রাখত। সেই মৌঞ্জিমেখলার স্থানে পরে যজ্ঞসূত্র বা পৈতে পরার পদ্ধতি হয়।

শিষ্য। তবে কি, মহাশয়, আমাদের মতো সূতার পৈতা পরাটা বৈদিক প্রথা নয়?

স্বামীজী। বেদে কোথাও সূতোর পৈতের কথা নেই। স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনও লিখেছেন, 'অস্মিন্নেব সময়ে যজ্ঞসূত্রং পরিধাপয়েৎ।' সূতোর পৈতের কথা গোভিল গৃহ্যসূত্রেও নেই। গুরুসমীপে এই প্রথম বৈদিক সংস্কারই শাস্ত্রে 'উপনয়ন' বলে উক্ত হয়েছে। কিন্তু আজকাল দেশের কি দুরবস্থাই না হয়েছে! শাস্ত্রপথ পরিত্যাগ ক'রে কেবল কতকগুলো দেশাচার, লোকাচার, ও স্ত্রী-আচারে দেশটা ছেয়ে ফেলেছে। তাই তো তোদের বলি, তোরা প্রাচীন কালের মতো শাস্ত্রপথ ধরে চল্। নিজেরা শ্রদ্ধাবান্ হয়ে দেশে শ্রদ্ধা নিয়ে আয়। নচিকেতার মতো শ্রদ্ধা হৃদয়ে আন্। নচিকেতার মতো যমলোকে চলে যা—আত্মতত্ত্ব জানবার জন্য, আত্ম-উদ্ধারের জন্য, এই জন্ম-মরণ-প্রহেলিকার যথার্থ মীমাংসার জন্য যমের মুখে গেলে যদি সত্যলাভ হয়, তা হ'লে নির্ভীক হৃদয়ে যমের মুখে যেতে হবে। ভয়ই তো মৃত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হবে। আজ থেকে ভয়শূন্য হ। যা চলে—আপনার মোক্ষ ও পরার্থে দেহ দিতে। কি হবে কতকগুলো হাড়মাসের বোঝা বয়ে? ঈশ্বরার্থে সর্বস্বত্যাগরূপ মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ ক'রে দধীচি মুনির মতো পরার্থে হাড়মাস দান কর্। শাস্ত্রে বলে, যাঁরা অধীত-বেদবেদান্ত, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁরা অপরকে অভয়ের পারে নিতে সমর্থ, তাঁরাই যথার্থ গুরু; তাঁদের পেলেই দীক্ষিত হবে—'নাত্র কার্যবিচারণা।' এখন সেটা কেমন দাঁড়িয়েছে জানিস—'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।'[১]

---

১ কঠ উপ, ১।২।৫

বেলা প্রায় নয়টা হইয়াছে। স্বামীজী আজ গঙ্গায় না গিয়া ঘরেই স্নান করিলেন। স্নানান্তে নূতন একখানি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া মৃদুপদে ঠাকুরঘরে প্রবেশপূর্বক পূজার আসনে উপবেশন করিলেন। শিষ্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল; স্বামীজী ডাকিলে তবে যাইবে। এইবার স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন—মুক্তপদ্মাসন, ঈষন্মুদ্রিতনয়ন, যেন দেহমনপ্রাণ সকল স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে। ধ্যানান্তে স্বামীজী শিষ্যকে 'বাবা, আয়' বলিয়া ডাকিলেন। শিষ্য স্বামীজীর সস্নেহ আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া যন্ত্রবৎ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। ঠাকুরঘরে প্রবেশমাত্র স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'দোরে খিল দে।' এইরূপ করা হইলে বলিলেন, 'স্থির হয়ে আমার বাম পাশে বোস্।' স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া শিষ্য আসনে উপবেশন করিল। তাহার হৃৎপিণ্ড তখন কি এক অনির্বচনীয় অপূর্বভাবে দুরদুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অনন্তর স্বামীজী তাঁহার পদ্মহস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপন করিয়া শিষ্যকে কয়েকটি গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শিষ্য ঐ বিষয়ের যথাসাধ্য উত্তর দিলে পর মহাবীজমন্ত্র তাহার কর্ণমূলে তিনবার উচ্চারণ করিলেন এবং পরে শিষ্যকে তিনবার উহা উচ্চারণ করিতে বলিলেন। অনন্তর সাধনা সম্বন্ধে সামান্য উপদেশ প্রদান করিয়া স্থির হইয়া অনিমেষনয়নে শিষ্যের নয়নপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। …কতকক্ষণ এভাবে কাটিল, শিষ্য তাহা বুঝিতে পারিল না। অনন্তর স্বামীজী বলিলেন, 'গুরুদক্ষিণা দে।' শিষ্য বলিল, 'কি দিব?' শুনিয়া স্বামীজী অনুমতি করিলেন, 'যা, ভাণ্ডার থেকে কোন ফল নিয়ে আয়। শিষ্য দৌড়িয়া ভাণ্ডারে গেল এবং ১০।১৫টা লিচু লইয়া পুনরায় ঠাকুরঘরে আসিল। স্বামীজীর হস্তে সেগুলি দিবামাত্র তিনি একটি একটি করিয়া সেইগুলি সমস্ত খাইয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, 'যা, তোর গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয়ে গেল।'

দীক্ষাগ্রহণ করিয়া শিষ্য ঠাকুরঘর হইতে নির্গত হইবামাত্র স্বামী শুদ্ধানন্দ ঐ ঘরে স্বামীজীর নিকটে উপস্থিত হইয়া দীক্ষার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দের[১] আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া স্বামীজীও তাঁহাকে দীক্ষাদান করিলেন।

১ তখন ব্রহ্মচারী সুধীর

অনন্তর স্বামীজী কতক্ষণ পরে বাহিরে আসিলেন এবং আহারান্তে শয়ন করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শিষ্যও ইতিমধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত স্বামীজীর পাত্রাবশেষ সাহ্লাদে গ্রহণ করিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে উপবেশন করিল এবং ধীরে ধীরে তাঁহার পাদসংবাহনে নিযুক্ত হইল।

বিশ্রামান্তে স্বামীজী উপরের বৈঠকখানাঘরে আসিয়া বসিলেন, শিষ্যও এই সময়ে অবসর বুঝিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, পাপপুণ্যের ভাব কোথা হইতে আসিল?'

স্বামীজী। বহুত্বের ভাব থেকেই এই সব বেরিয়েছে। মানুষ একত্বের দিকে যত এগিয়ে যায়, তত 'আমি-তুমি' ভাব—যা থেকে এই সব ধর্মাধর্ম-দ্বন্দ্বভাব এসেছে, কমে যায়। 'আমা থেকে অমুক ভিন্ন'—এই ভাবটা মনে এলে তবে অন্য সব দ্বন্দ্বভাবের বিকাশ হ'তে থাকে এবং একত্বের সম্পূর্ণ অনুভবে মানুষের আর শোক-মোহ থাকে না—'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।'[১]

যত প্রকার দুর্বলতার অনুভবকেই পাপ বলা যায় (weakness is sin)। এই দুর্বলতা থেকেই হিংসাদ্বেষাদির উন্মেষ হয়। তাই দুর্বলতা বা weakness-এরই নাম পাপ। ভেতরে আত্মা সর্বদা জ্বল জ্বল করছে—সে দিকে না চেয়ে হাড়মাসের কিম্ভূতকিমাকার খাঁচা এই জড় শরীরটার দিকেই সবাই নজর দিয়ে 'আমি আমি' করছে! ঐটেই হচ্ছে সকল প্রকার দুর্বলতার গোড়া। ঐ অভ্যাস থেকেই জগতে ব্যাবহারিক ভাব বেরিয়েছে। পরমার্থভাব ঐ দ্বন্দ্বের পারে বর্তমান।

শিষ্য। তাহা হইলে এই সকল ব্যাবহারিক সত্তা কি সত্য নহে?

স্বামীজী। যতক্ষণ 'আমি' জ্ঞান আছে, ততক্ষণ সত্য। আর যখনই 'আমি আত্মা' এই অনুভব, তখনই এই ব্যাবহারিক সত্তা মিথ্যা। লোকে যে 'পাপ পাপ' বলে, সেটা weakness (দুর্বলতা)-এর ফলে—'আমি দেহ' এই অহং-ভাবেরই রূপান্তর। যখন 'আমি আত্মা' এই ভাবে মন নিশ্চল হবে, তখন তুই পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের অতীত হয়ে যাবি। ঠাকুর বলতেন, 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।'

১ ঈশোপনিষদ, ৭

শিষ্য। মহাশয়, 'আমি'-টা যে মরিয়াও মরে না! এইটাকে মারা বড় কঠিন।

স্বামীজী। এক ভাবে খুব কঠিন, আবার আর এক ভাবে খুব সোজা। 'আমি' জিনিসটা কোথায় আছে, বুঝিয়ে দিতে পারিস? যে জিনিসটে নেই, তাকে আবার মারামারি কি? আমিত্বরূপ একটা মিথ্যা ভাবে মানুষ hypnotised (সম্মোহিত) হয়ে আছে মাত্র। ঐ ভূতটা ছাড়লেই সব স্বপ্ন ভেঙে যায় ও দেখা যায়—এক আত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলের মধ্যে রয়েছেন। এইটি জানতে হবে, প্রত্যক্ষ করতে হবে। যত কিছু সাধনভজন—এ আবরণটা কাটাবার জন্য। ওটা গেলেই চিৎ-সূর্য নিজের প্রভায় নিজে জলছে দেখতে পাবি। কারণ, আত্মাই একমাত্র স্বয়ংজ্যোতিঃ—স্বসংবেদ্য। যে জিনিসটে স্বসংবেদ্য, তাকে অন্য কিছুর সহায়ে কি ক'রে জানতে পারা যাবে? শ্রুতি তাই বলছেন, 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।'[১] তুই যা কিছু জানছিস, তা মনরূপ কারণসহায়ে। মন তো জড়; তার পেছনে শুদ্ধ আত্মা থাকাতেই মনের দ্বারা কার্য হয়। সুতরাং মন দ্বারা সে আত্মাকে কিরূপে জানবি? তবে এইটে মাত্র জানা যায় যে, মন শুদ্ধাত্মার নিকট পৌঁছতে পারে না, বুদ্ধিটাও পৌঁছতে পারে না। জানাজানিটা এই পর্যন্ত। তারপর মন যখন বৃত্তিহীন হয়, তখনই মনের লোপ হয় এবং তখনি আত্মা প্রত্যক্ষ হন। ঐ অবস্থাকেই ভাষ্যকার শঙ্কর 'অপরোক্ষানুভূতি' ব'লে বর্ণনা করেছেন।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মনটাই তো 'আমি'। সেই মনটার যদি লোপ হয়, তবে 'আমি'টাও তো আর থাকিবে না।

স্বামীজী। তখন যে অবস্থা, সেটাই যথার্থ 'আমিত্বের' স্বরূপ। তখন যে 'আমিটা' থাকবে, সেটা সর্বভূতস্থ, সর্বগ—সর্বান্তরাত্মা। যেন ঘটাকাশ ভেঙে মহাকাশ—ঘট ভাঙলে তার ভিতরকার আকাশেরও কি বিনাশ হয় রে? যে ক্ষুদ্র আমিটাকে তুই দেহবদ্ধ মনে করছিলি, সেটাই ছড়িয়ে এইরূপে সর্বগত আমিত্ব বা আত্মারূপে প্রত্যক্ষ হয়। অতএব মনটা রইল বা গেল, তাতে যথার্থ 'আমি' বা আত্মার কি?

যা বলছি, তা কালে প্রত্যক্ষ হবে—'কালেনাত্মনি বিন্দতি'। শ্রবণ-মনন

[১] বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ৪।৫।১৫

করতে করতে কালে এই কথা ধারণা হয়ে যাবে,—আর মনের পারে চলে যাবি। তখন আর এ প্রশ্ন করবার অবসর থাকবে না।

শিষ্য শুনিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। স্বামীজী আস্তে আস্তে ধূমপান করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন :

এ সহজ বিষয়টা বুঝাতে কত শাস্ত্রই না লেখা হয়েছে, তবু লোকে তা বুঝতে পারছে না!—আপাতমধুর কয়েকটা রূপার চাকতি আর মেয়েমানুষের ক্ষণভঙ্গুর রূপ নিয়ে দুর্লভ মানুষ-জন্মটা কেমন কাটিয়ে দিচ্ছে! মহামায়ার আশ্চর্য প্রভাব! মা! মা!!

১০

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার
কাল—মে (১ম সপ্তাহ), ১৮৯৭

স্বামীজী কয়েক দিন বাগবাজারে ৺বলরামবাবুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। পরমহংসদেবের গৃহী ভক্তদিগকে তিনি একত্র হইতে আহ্বান করায় (১লা মে) ৩টার পর বৈকালে ঠাকুরের বহু ভক্ত ঐ বাটীতে সমবেত হইয়াছেন। স্বামী যোগানন্দও তথায় উপস্থিত আছেন। স্বামীজীর উদ্দেশ্য একটি সমিতি গঠিত করা। সকলে উপবেশন করিলে পর স্বামীজী বলিতে লাগিলেন :

নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হ'তে পারে না। তবে আমাদের মতো দেশে প্রথম হ'তে সাধারণতন্ত্রে সংঘ তৈরি করা বা সাধারণের সম্মতি (ভোট) নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক ব'লে মনে হয় না। ও-সব দেশের (পাশ্চাত্যের) নরনারী সমধিক শিক্ষিত—আমাদের মতো দ্বেষপরায়ণ নয়। তারা গুণের সম্মান করতে শিখেছে। এই দেখুন না কেন, আমি একজন নগণ্য লোক, আমাকে ওদেশে কত আদর-যত্ন করেছে! এদেশে শিক্ষাবিস্তারে যখন সাধারণ লোক সমধিক সহৃদয় হবে, যখন মত-ফতের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে, তখন সাধারণতন্ত্রমতে সংঘের কাজ চালাতে পারবে। সেই জন্য এই সংঘে

একজন dictator বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। তারপর কালে সকলের মত ল'য়ে কাজ করা হবে।

আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ ক'রে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সংঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা এ কাজে সহায় হোন।

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহী-ভক্তগণ এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলে রামকৃষ্ণসংঘের ভাবী কার্যপ্রণালী আলোচিত হইতে লাগিল। সংঘের নাম রাখা হইল—'রামকৃষ্ণ-প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশন।' উহার উদ্দেশ্য প্রভৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।[১]

উদ্দেশ্য: মানবের হিতার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কার্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রচার এবং মনুষ্যের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই 'প্রচারের' (মিশনের) উদ্দেশ্য।

ব্রত: জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্মের রূপান্তরমাত্র-জ্ঞানে সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আত্মীয়তা-স্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনাই এই 'প্রচারের' (মিশনের) ব্রত।

কার্যপ্রণালী: মনুষ্যের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহবর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে যেরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।

ভারতবর্ষীয় কার্য: ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্যব্রত-গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার জন্য আশ্রমস্থাপন এবং যাহাতে তাঁহারা দেশ-

১ ১লা মে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সমিতি বা সংঘ স্থাপিত হয়, ৫ই মে দ্বিতীয় অধিবেশনে ইহার কার্যপ্রণালী আলোচিত হইয়া গৃহীত হয়।

দেশান্তরে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার উপায়-অবলম্বন।

বিদেশীয় কার্যবিভাগ: ভারত-বহির্ভূত প্রদেশসমূহে 'ব্রতধারী' প্রেরণ এবং তত্তৎদেশে স্থাপিত আশ্রমসকলের সহিত ভারতীয় আশ্রমসকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতিবর্ধন এবং নূতন নূতন আশ্রম-সংস্থাপন।

স্বামীজী স্বয়ং উক্ত সমিতির সাধারণ সভাপতি হইলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা-কেন্দ্রের সভাপতি এবং স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারী হইলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র এটর্নী মহাশয় ইহার সেক্রেটারি, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ ও বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার সহকারী সেক্রেটারি এবং শিষ্য শাস্ত্রপাঠকরূপে নির্বাচিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়মটিও বিধিবদ্ধ হইল যে, প্রতি রবিবার ৪টার পর বলরামবাবুর বাটীতে সমিতির অধিবেশন হইবে। পূর্বোক্ত সভার পরে তিন বৎসর পর্যন্ত 'রামকৃষ্ণ মিশন'-সমিতির অধিবেশন প্রতি রবিবারে বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য স্বামীজী যতদিন না পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছিলেন, ততদিন সুবিধামত সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া কখনও উপদেশদান এবং কখনও বা কিন্নরকণ্ঠে গান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন।

সভাভঙ্গের পর সভ্যগণ চলিয়া গেলে যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'এভাবে কাজ তো আরম্ভ করা গেল; এখন দেখ্, ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর হয়ে দাঁড়ায়।'

স্বামী যোগানন্দ। তোমার এ-সব বিদেশী ভাবে কাজ করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এ-রকম ছিল?

স্বামীজী। তুই কি ক'রে জানলি এ-সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ ক'রে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজা-পাঠ প্রবর্তনা করতে কখনও উপদেশ দেন-নি। তিনি সাধনভজন, ধ্যানধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্মভাব সম্বন্ধে যে-সব উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি ক'রে জীবকে শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে

আর একটি নূতন সম্প্রদায় তৈরি ক'রে যেতে আমার জন্ম হয়নি। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাব দিতেই আমাদের জন্ম।

যোগানন্দ স্বামী প্রতিবাদ না করায় স্বামীজী বলিতে লাগিলেন :

প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ এ জীবনে পেয়েছি। তিনি পেছনে দাঁড়িয়ে এ-সব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে গাছতলায় পড়ে থাকতুম, যখন কৌপীন আঁটবার বস্ত্রও ছিল না, যখন কপর্দকশূন্য হয়ে পৃথিবীভ্রমণে কৃতসংকল্প, তখনও ঠাকুরের দয়ায় সর্ববিষয়ে সহায়তা পেয়েছি। আবার যখন এই বিবেকানন্দকে দর্শন করতে চিকাগোর রাস্তায় লাঠালাঠি হয়েছে, যে সম্মানের শতাংশের একাংশ পেলে সাধারণ মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়, ঠাকুরের কৃপায় তখন সে সম্মানও অক্লেশে হজম করেছি—প্রভুর ইচ্ছায় সর্বত্র বিজয়! এবার এদেশে কিছু কাজ ক'রে যাব, তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কাজে সাহায্য কর্, দেখবি—তাঁর ইচ্ছায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে।

স্বামী যোগানন্দ। তুমি যা ইচ্ছে করবে, তাই হবে। আমরা তো চিরদিন তোমারই আজ্ঞানুবর্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এ-সব করছেন, মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে পাচ্ছি। তবু কি জানো, মধ্যে মধ্যে কেমন খটকা আসে—ঠাকুরের কার্যপ্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কি না; তাই মনে হয়, আমরা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চলছি না তো? তাই তোমায় অন্যরূপ বলি ও সাবধান ক'রে দিই।

স্বামীজী। কি জানিস, সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় তো প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নেই। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনি তৈরী হ'তে পারে। তবে তিনি তা না ক'রে ইচ্ছা ক'রে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র ক'রে এরূপ করাচ্ছেন—তা আমি কি ক'রব—বল্?

—এই বলিয়া স্বামীজী কার্যান্তরে অন্যত্র গেলেন। স্বামী যোগানন্দ শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, 'আহা, নরেনের বিশ্বাসের কথা শুনলি? বলে কি না ঠাকুরের কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ তৈরী হ'তে পারে! কি গুরুভক্তি! আমাদের ওর শতাংশের একাংশ ভক্তি যদি হ'ত তো ধন্য হতুম।'

শিষ্য। মহাশয়, স্বামীজীর সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলিতেন?

যোগানন্দ। তিনি বলতেন, 'এমন আধার এ যুগে জগতে আর আসেনি।' কখনও বলতেন, 'নরেন পুরুষ, আমি প্রকৃতি; নরেন আমার শ্বশুরঘর।' কখনও বলতেন, 'অখণ্ডের থাক।' কখনও বলতেন, 'অখণ্ডের ঘরে—যেখানে দেবদেবীসকলও ব্রহ্ম হ'তে নিজের নিজের অস্তিত্ব পৃথক্ রাখতে পারেননি, লীন হয়ে গেছেন—সাত জন ঋষিকে আপন আপন অস্তিত্ব পৃথক্ রেখে ধ্যানে নিমগ্ন দেখেছি; নরেন তাঁদেরই একজনের অংশাবতার।' কখন বলতেন, 'জগৎপালক নারায়ণ নর ও নারায়ণ-নামে যে দুই ঋষিমূর্তি পরিগ্রহ ক'রে জগতের কল্যাণের জন্য তপস্যা করেছিলেন, নরেন সেই নর-ঋষির অবতার।' কখন বলতেন, 'শুক-দেবের মতো তাকে মায়া স্পর্শ করতে পারেনি।'

শিষ্য। ঐ কথাগুলি কি সত্য, না—ঠাকুর ভাবমুখে এক এক সময়ে এক এক রূপ বলিতেন?

যোগানন্দ। তাঁর কথা সব সত্য। তাঁর শ্রীমুখে ভ্রমেও মিথ্যা কথা বেরুত না।

শিষ্য। তাহা হইলে সময় সময় ঐরূপ ভিন্নরূপ বলিতেন কেন?

যোগানন্দ। তুই বুঝতে পারিসনি। নরেনকে ঐ সকলের সমষ্টি-প্রকাশ বলতেন। নরেনের মধ্যে ঋষির বেদজ্ঞান, শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, শুকদেবের মায়ারাহিত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ এক সঙ্গে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছিস না? ঠাকুর তাই মধ্যে মধ্যে ঐরূপ নানা ভাবে কথা কইতেন। যা বলতেন, সব সত্য।

স্বামীজী ফিরিয়া আসিয়া শিষ্যকে বলিলেন, 'তোদের ওদেশে' ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে লোকে জানে কি?'

শিষ্য। মহাশয়, এক নাগ-মহাশয়ই ওদেশ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিয়াছিলেন; তাঁহার কাছে শুনিয়া এখন অনেকের ঠাকুরের বিষয় জানিতে কৌতূহল হইয়াছে। কিন্তু ঠাকুর যে ঈশ্বরাবতার, এ কথা ওদেশের লোকেরা এখনও জানিতে পারে নাই, কেহ কেহ উহা শুনিলেও বিশ্বাস করে না।

পূর্ববঙ্গে

স্বামীজী। ও-কথা বিশ্বাস করা কি সহজ ব্যাপার? আমরা তাঁকে হাতে নেড়েচেড়ে দেখলুম, তাঁর নিজ মুখে ঐ কথা বারংবার শুনলুম, চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে বসবাস করলুম, তবু আমাদেরও মধ্যে মধ্যে সন্দেহ আসে। তা—অন্যে পরে কা কথা!

শিষ্য। মহাশয়, ঠাকুর যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান, এ কথা তিনি আপনাকে নিজ মুখে কখনও বলিয়াছিলেন কি?

স্বামীজী। কতবার বলেছেন। আমাদের সবাইকে বলেছেন। তিনি যখন কাশীপুরের বাগানে—যখন তাঁর শরীর যায় যায়, তখন আমি তাঁর বিছানার পাশে একদিন মনে মনে ভাবছি, এই সময় যদি বলতে পারো 'আমি ভগবান', তবে বিশ্বাস ক'রব—তুমি সত্যসত্যই ভগবান। তখন শরীর যাবার দু-দিন মাত্র বাকি। ঠাকুর তখন হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ—সে-ই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ, তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।' আমি শুনে অবাক হয়ে রইলুম। প্রভুর শ্রীমুখে বার বার শুনেও আমাদেরই এখনও পূর্ণ বিশ্বাস হ'ল না—সন্দেহে, নিরাশায় মন মধ্যে মধ্যে আন্দোলিত হয়—তা অপরের কথা আর কি ব'লব? আমাদেরই মতো দেহবান এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর ব'লে নির্দেশ করা ও বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ—এ-সব ব'লে ভাবা চলে। তা যাই কেন তাঁকে বল্ না, ভাব্ না—মহাপুরুষ বল্, ব্রহ্মজ্ঞ বল্, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঠাকুরের মতো এমন পুরুষোত্তম জগতে এর আগে আর কখনও আসেননি। সংসারে ঘোর অন্ধকারে এখন এই মহাপুরুষই জ্যোতিঃস্তম্ভ-স্বরূপ। এঁর আলোতেই মানুষ এখন সংসার-সমুদ্রের পারে চলে যাবে।

শিষ্য। মহাশয়, আমার মনে হয়, কিছু না দেখিলে শুনিলে যথার্থ বিশ্বাস হয় না। শুনিয়াছি, মথুরবাবু ঠাকুরের সম্বন্ধে কত কি দেখিয়াছিলেন! তাই ঠাকুরে তাঁর এত বিশ্বাস হইয়াছিল।

স্বামীজী। যার বিশ্বাস হয় না, তার দেখলেও বিশ্বাস হয় না; মনে করে মাথার ভুল, স্বপ্ন ইত্যাদি। দুর্যোধনও বিশ্বরূপ দেখেছিল, অর্জুনও দেখেছিল। অর্জুনের বিশ্বাস হ'ল, দুর্যোধন ভেলকিবাজি ভাবলে। তিনি না বুঝালে কিছু বলবার বা বুঝবার জো নেই। না দেখে না

শুনে কারও ষোল-আনা বিশ্বাস হয়; কেউ বার বৎসর সামনে থেকে নানা বিভূতি দেখেও সন্দেহে ডুবে থাকে। সার কথা হচ্ছে—তাঁর কৃপা; তবে লেগে থাকতে হবে, তবে তাঁর কৃপা হবে।

শিষ্য। কৃপার কি কোন নিয়ম আছে, মহাশয়?

স্বামীজী। হাঁও বটে, নাও বটে।

শিষ্য। কিরূপ?

স্বামীজী। যারা কায়মনোবাক্যে সর্বদা পবিত্র, যাদের অনুরাগ প্রবল, যারা সদসৎ বিচারবান্ ও ধ্যানধারণায় রত, তাদের উপরই ভগবানের কৃপা হয়। তবে ভগবান প্রকৃতির সকল নিয়মের (natural law) বাইরে, কোন নিয়ম-নীতির বশীভূত নন—ঠাকুর যেমন বলতেন, 'তাঁর বালকের স্বভাব'—সেজন্য দেখা যায় কেউ কোটি জন্ম ডেকে ডেকেও তাঁর সাড়া পায় না; আবার যাকে আমরা পাপী তাপী নাস্তিক বলি, তার ভেতরে সহসা চিৎপ্রকাশ হয়ে যায়—তাকে ভগবান অযাচিত কৃপা ক'রে বসেন। তার আগের জন্মের সুকৃতি ছিল, এ কথা বলতে পারিস; কিন্তু এ রহস্য বোঝা কঠিন। ঠাকুর কখনও বলতেন, 'তাঁর প্রতি নির্ভর কর।—ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে যা'; আবার কখনও বলতেন, 'তাঁর কৃপাবাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।'

শিষ্য। মহাশয়, এ তো মহা কঠিন কথা। কোন যুক্তিই যে এখানে দাঁড়ায় না।

স্বামীজী। যুক্তিতর্কের সীমা মায়াধিকৃত জগতে, দেশ-কাল-নিমিত্তের গণ্ডির মধ্যে। তিনি দেশকালাতীত। তাঁর law (নিয়ম)ও বটে, আবার তিনি law (নিয়ম)-এর বাইরেও বটে; প্রকৃতির যা কিছু নিয়ম তিনিই করেছেন, হয়েছেন,—আবার সে-সকলের বাইরেও রয়েছেন। তিনি যাকে কৃপা করেন, সে সেই মুহূর্তে beyond law (নিয়মের গণ্ডির বাইরে) চলে যায়। সেজন্য কৃপার কোন condition (বাঁধাধরা নিয়ম) নেই; কৃপাটা হচ্ছে তাঁর খেয়াল। এই জগৎ-সৃষ্টিটাই তাঁর খেয়াল—'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং।'[১] যিনি খেয়াল

---

১ বেদান্তসূত্র, ২।১।৩৩

ক'রে এমন জগৎ গড়তে-ভাঙতে পারেন, তিনি কি আর কৃপা ক'রে মহাপাপীকেও মুক্তি দিতে পারেন না? তবে যে কারুকে সাধন-ভজন করিয়ে নেন ও কারুকে করান না, সেটাও তাঁর খেয়াল—তাঁর ইচ্ছা।

শিষ্য। মহাশয়, বুঝিতে পারিলাম না।

স্বামীজী। বুঝে আর কি হবে? যতটা পারিস তাঁতে মন লাগিয়ে থাক্। তা হলেই এই জগৎভেলকি আপনি-আপনি ভেঙে যাবে। তবে লেগে থাকতে হবে। কাম-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে, সদসৎবিচার সর্বদা করতে হবে, 'আমি দেহ নই'—এইরূপ বিদেহ-ভাবে অবস্থান করতে হবে, 'আমি সর্বগ আত্মা'—এইটি অনুভব করতে হবে। এরূপে লেগে থাকার নামই পুরুষকার। ঐরূপে পুরুষকারের সহায়ে তাঁতে নির্ভর আসবে—সেটাই হ'ল পরমপুরুষার্থ।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন: তাঁর কৃপা তোদের প্রতি না থাকলে তোরা এখানে আসবি কেন? ঠাকুর বলতেন, 'যাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয়েছে, তারা এখানে আসবেই আসবে; যেখানে-সেখানে থাক বা যাই করুক না কেন, এখানকার কথায়, এখানকার ভাবে সে অভিভূত হবেই হবে।' তোর কথাই ভেবে দেখ না, যিনি কৃপাবলে সিদ্ধ—যিনি প্রভুর কৃপা সম্যক্ বুঝেছেন, সেই নাগ-মহাশয়ের সঙ্গলাভ কি ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হয়? 'অনেক-জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্'[১]—জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি থাকলে তবে অমন মহাপুরুষের দর্শনলাভ হয়। শাস্ত্রে উত্তমা ভক্তির যে-সকল লক্ষণ দেখা যায়, নাগ-মহাশয়ের সেগুলি সব ফুটে বেরিয়েছে। ঐ যে বলে 'তৃণাদপি সুনীচেন',[২] তা একমাত্র নাগ-মহাশয়েই প্রত্যক্ষ করা গেল। তোদের বাঙাল দেশ ধন্য, নাগ-মহাশয়ের পাদস্পর্শে পবিত্র হয়ে গেছে।'

বলিতে বলিতে স্বামীজী মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ি বেড়াইয়া আসিতে চলিলেন। সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ ও শিষ্য। গিরিশবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন:

জি. সি., মনে আজকাল কেবল উঠছে—এটা করি, সেটা করি, তাঁর কথা জগতে ছড়িয়ে দিই, ইত্যাদি। আবার ভাবি—এতে বা ভারতে আর একটা

১ গীতা, ৬।৪৫

২ শিক্ষাষ্টকম্—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে পড়ে। তাই অনেক সামলে চলতে হয়। কখনও ভাবি—সম্প্রদায় হোক। আবার ভাবি—না, তিনি কারও ভাব কদাচ নষ্ট করেননি; সমদর্শিতাই তাঁর ভাব। এই ভেবে মনের ভাব অনেক সময় চেপে চলি। তুমি কি বলো?

গিরিশবাবু। আমি আর কি ব'লব? তুমি তাঁর হাতের যন্ত্র। যা করাবেন, তাই তোমাকে করতে হবে। আমি অত শত বুঝি না। আমি দেখছি প্রভুর শক্তি তোমায় দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে; সাদা চোখে দেখছি।

স্বামীজী। আমি দেখছি, আমরা নিজের খেয়ালে কাজ ক'রে যাচ্ছি। তবে বিপদে, আপদে, অভাবে, দারিদ্র্যে তিনি দেখা দিয়ে ঠিক পথে চালান, guide (পরিচালনা) করেন—ঐটি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু প্রভুর শক্তির কিছুমাত্র ইয়ত্তা করে উঠতে পারলুম না।

গিরিশবাবু। তিনি বলেছিলেন, 'সব বুঝলে এখনি সব ফাঁকা হয়ে পড়বে। কে করবে, কারেই বা করাবে?'

এইরূপ কথাবার্তার পর আমেরিকার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। গিরিশবাবু ইচ্ছা করিয়াই যেন স্বামীজীর মন প্রসঙ্গান্তরে ফিরাইয়া দিলেন। ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় গিরিশবাবু অন্য সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনেছি—ঐরূপ কথা বেশী কইতে কইতে ওর সংসারবৈরাগ্য ও ঈশ্বরোদ্দীপনা হয়ে যদি একবার স্বস্বরূপের দর্শন হয়, সে যে কে—এ-কথা যদি জানতে পারে, তবে আর এক মুহূর্তও তার দেহ থাকবে না।' তাই দেখিয়াছি, সর্বদা ঠাকুরের কথাবার্তা কহিতে আরম্ভ করিলে স্বামীজীর সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতৃগণও প্রসঙ্গান্তরে তাঁহার মনোনিবেশ করাইতেন। সে যাহা হউক, আমেরিকার প্রসঙ্গ করিতে করিতে স্বামীজী তাহাতেই মাতিয়া গেলেন। ওদেশের সমৃদ্ধি, স্ত্রী-পুরুষের গুণাগুণ, ভোগবিলাস ইত্যাদি নানা কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন।

১১

স্থান—শ্রীনবগোপাল ঘোষের বাটী, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া
কাল—৬ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৮—(মাঘীপূর্ণিমা)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত নবগোপাল ঘোষ মহাশয় ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হাওড়ার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুরে নূতন বসতবাটী নির্মাণ করিয়াছেন। নবগোপালবাবু ও তাঁহার গৃহিণীর একান্ত ইচ্ছা—স্বামীজী দ্বারা বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করিবেন। স্বামীজীও এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। নবগোপালবাবুর বাটীতে আজ তদুপলক্ষ্যে উৎসব। ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ সকলেই আজ তথায় ঐ জন্য সাদরে নিমন্ত্রিত। বাটীখানি আজ ধ্বজপতাকায় পরিশোভিত, সামনের ফটকে পূর্ণঘট, কদলীবৃক্ষ, দেবদারুপাতার তোরণ এবং আম্রপত্রের ও পুষ্পমালার সারি। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে রামকৃষ্ণপুর আজ প্রতিধ্বনিত।

মঠ হইতে তিনখানি ডিঙ্গি ভাড়া করিয়া স্বামীজীর সঙ্গে মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজীর পরিধানে গেরুয়া রঙের বহির্বাস, মাথায় পাগড়ি—খালি পা। রামকৃষ্ণপুরের ঘাট হইতে তিনি যে পথে নবগোপালবাবুর বাটীতে যাইবেন, সেই পথের দুই-ধারে অগণিত লোক তাঁহাকে দর্শন করিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘাটে নামিয়াই স্বামীজী 'দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো ক'রে! কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীরঘরে!' গানটি ধরিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইলেন; আর দুই-তিন খানা খোলও সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল এবং সমবেত ভক্তগণের সকলেই সমস্বরে ঐ গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উদ্দাম নৃত্য ও মৃদঙ্গধ্বনিতে পথ-ঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল। লোকে যখন দেখিল, স্বামীজী অন্যান্য সাধুগণের মতো সামান্য পরিচ্ছদে খালি পায়ে মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছেন, তখন অনেকে তাঁহাকে প্রথম চিনিতেই পারে নাই এবং অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচয় পাইয়া বলিতে লাগিল, 'ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!' স্বামীজীর এই দীনতা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিতে লাগিল; 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে গ্রাম্য পথ মুখরিত হইতে লাগিল।

গৃহীর আদর্শস্থল নবগোপালবাবুর প্রাণ আজ আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। ঠাকুর ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের সেবার জন্ম বিপুল আয়োজন করিয়া তিনি চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে 'জয় রাম, জয় রাম' বলিয়া উল্লাসে চীৎকার করিতেছেন।

ক্রমে দলটি নবগোপালবাবুর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র গৃহমধ্যে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামীজী মৃদঙ্গ নামাইয়া বৈঠকখানা-ঘরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরঘর দেখিতে উপরে চলিলেন। ঠাকুরঘরখানি মর্মরপ্রস্তরে মণ্ডিত। মধ্যস্থলে সিংহাসন, তদুপরি ঠাকুরের পোর্সিলেনের মূর্তি। ঠাকুরপূজার যে যে উপকরণের আবশ্যক, আয়োজনে তাহার কোন অঙ্গে কোন ত্রুটি নাই। স্বামীজী দেখিয়া বিশেষ প্রসন্ন হইলেন।

নবগোপালবাবুর গৃহিণী অপরাপর কুলবধূগণের সহিত স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন এবং পাখা লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

স্বামীজীর মুখে সকল বিষয়ের সুখ্যাতি শুনিয়া গৃহিণীঠাকুরানী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আমাদের সাধ্য কি যে ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করি? সামান্য ঘর, সামান্য অর্থ। আপনি আজ নিজে কৃপা করিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের ধন্য করুন।'

স্বামীজী তদুত্তরে রহস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'তোমাদের ঠাকুর তো এমন মার্বেলপাথর-মোড়া ঘরে চৌদ্দপুরুষে বাস করেননি; সেই পাড়াগাঁয়ে খোড়ো ঘরে জন্ম, যেন-তেন ক'রে দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে এমন উত্তম সেবায় যদি তিনি না থাকেন তো আর কোথায় থাকবেন?' সকলেই স্বামীজীর কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিল। এইবার বিভূতিভূষাঙ্গ স্বামীজী সাক্ষাৎ মহাদেবের মতো পূজকের আসনে বসিয়া ঠাকুরকে আহ্বান করিলেন।

পরে স্বামী প্রকাশানন্দ স্বামীজীর কাছে বসিয়া মন্ত্রাদি বলিয়া দিতে লাগিলেন। পূজার নানা অঙ্গ ক্রমে সমাধা হইল এবং নীরাজনের শাঁক-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামী প্রকাশানন্দই পূজা করিলেন।

নীরাজনান্তে স্বামীজী পূজার ঘরে বসিয়া বসিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণতিমন্ত্র মুখে মুখে এইরূপ রচনা করিয়া দিলেন :

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

সকলেই এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলে শিষ্য ঠাকুরের একটি স্তব পাঠ করিল। এইরূপে পূজা সম্পন্ন হইল। উৎসবান্তে শিষ্যও স্বামীজীর সঙ্গে গাড়িতে রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে পৌঁছিয়া নৌকায় উঠিল এবং আনন্দে নানা কথা কহিতে কহিতে বাগবাজারের দিকে অগ্রসর হইল।

১২

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী
কাল—ফেব্রুআরি, ১৮৯৮

বেলুড়ে গঙ্গাতীরে নীলাম্বরবাবুর বাগানে স্বামীজী মঠ উঠাইয়া আনিয়াছেন[১]। আলমবাজার হইতে এখানে উঠিয়া আসা হইলেও জিনিসপত্র এখনও সব গুছানো হয় নাই। ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। স্বামীজী নূতন বাড়িতে আসিয়া খুব খুশী হইয়াছেন। শিষ্য উপস্থিত হইলে বলিলেন, 'দেখ্ দেখি কেমন গঙ্গা, কেমন বাড়ি! এমন স্থানে মঠ না হ'লে কি ভাল লাগে?' তখন অপরাহ্ণ।

সন্ধ্যার পর শিষ্য স্বামীজীর সহিত দোতলার ঘরে সাক্ষাৎ করিলে নানা প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। ঘরে আর কেহই নাই; শিষ্য মধ্যে মধ্যে উঠিয়া স্বামীজীকে তামাক সাজিয়া দিতে লাগিল এবং নানা প্রশ্ন করিতে করিতে অবশেষে কথায় কথায় স্বামীজীর বাল্যকালের বিষয় জানিতে চাহিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'অল্প বয়স থেকেই আমি ডানপিটে ছিলুম, নইলে কি নিঃসম্বলে দুনিয়া ঘুরে আসতে পারতুম রে?'

—ছেলেবেলায় তাঁর রামায়ণগান শুনিবার বড় ঝোঁক ছিল। পাড়ার নিকট যেখানে রামায়ণগান হইত, স্বামীজী খেলাধূলা ছাড়িয়া তথায় উপস্থিত হইতেন; বলিলেন—রামায়ণ শুনিতে শুনিতে এক একদিন তন্ময় হইয়া তিনি বাড়িঘর ভুলিয়া যাইতেন এবং রাত হইয়াছে বা বাড়ি যাইতে

---

১ ১৩ই ফেব্রুআরি

হইবে ইত্যাদি কোন বিষয়ে খেয়াল থাকিত না। একদিন রামায়ণ-গানে শুনিলেন—হনুমান কলাবাগানে থাকে। অমনি এমন বিশ্বাস হইল যে, সে রাত্রি রামায়ণগান শুনিয়া ঘরে আর না ফিরিয়া বাড়ির নিকটে কোন এক বাগানে কলাগাছতলায় অনেক রাত্রি পর্যন্ত হনুমানের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

হনুমানের প্রতি স্বামীজীর অগাধ ভক্তি ছিল। সন্ন্যাসী হইবার পরেও মধ্যে মধ্যে মহাবীরের কথাপ্রসঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন এবং অনেক সময় মঠে শ্রীমহাবীরের একটি প্রস্তরমূর্তি রাখিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেন।

ছাত্রজীবনে দিনের বেলায় তিনি সমবয়স্কদের সহিত কেবল আমোদপ্রমোদ করিয়াই বেড়াইতেন। রাত্রে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া পড়াশুনা করিতেন। কখন যে তিনি পড়াশুনা করিতেন, তাহা কেহ জানিতে পারিত না।

শিষ্য। মহাশয়, স্কুলে পড়িবার কালে আপনি কখন কোনরূপ vision দেখিতেন (দিব্যদর্শন হইত) কি?

স্বামীজী। স্কুলে পড়বার সময় একদিন রাত্রে দোর বন্ধ ক'রে ধ্যান করতে করতে মন বেশ তন্ময় হয়েছিল। কতক্ষণ ঐ ভাবে ধ্যান করেছিলাম, বলতে পারি না। ধ্যান শেষ হ'ল, তখনও বসে আছি, এমন সময় ঐ ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ভেদ ক'রে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি বাহির হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ, অথচ যেন কোন ভাব নাই। মহাশান্ত সন্ন্যাসী-মূর্তি—মুণ্ডিত মস্তক, হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু। আমার প্রতি একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, যেন আমায় কিছু বলবেন—এরূপ ভাব। আমিও অবাক হয়ে তাঁর পানে চেয়ে ছিলাম। তারপর মনে কেমন একটা ভয় এল, তাড়াতাড়ি দোর খুলে ঘরের বাইরে গেলাম। পরে মনে হ'ল, কেন এমন নির্বোধের মতো ভয়ে পালালুম, হয়তো তিনি কিছু বলতেন। আর কিন্তু সে মূর্তির কখনও দেখা পাইনি। কতদিন মনে হয়েছে—যদি ফের তাঁর দেখা পাই তো এবার আর ভয় ক'রব না—তাঁর সঙ্গে কথা কইব। কিন্তু আর তাঁর দেখা পাইনি।

শিষ্য। তারপর এ বিষয়ে কিছু ভেবেছিলেন কি ?

স্বামীজী। ভেবেছিলাম, কিন্তু ভেবে চিন্তে কিছু কূল-কিনারা পাইনি। এখন বোধ হয়, ভগবান্ বুদ্ধদেবকে দেখেছিলুম।

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী বলিলেন: মন শুদ্ধ হ'লে, কামকাঞ্চনে বীতস্পৃহ হ'লে কত vision (দিব্যদর্শন) দেখা যায়—অদ্ভুত অদ্ভুত! তবে ওতে খেয়াল রাখতে নেই। ঐ-সকলে দিনরাত মন থাকলে সাধক আর অগ্রসর হ'তে পারে না। শুনিসনি, ঠাকুর বলতেন—'কত মণি পড়ে আছে (আমার) চিন্তামণির নাচদুয়ারে!' আত্মাকে সাক্ষাৎ করতে হবে—ও-সব খেয়ালে মন দিয়ে কি হবে ?

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী তন্ময় হইয়া কোন বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কিছুক্ষণ মৌনভাবে রহিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন:

দেখ, আমেরিকায় অবস্থানকালে আমার কতকগুলি অদ্ভুত শক্তির স্ফুরণ হয়েছিল। লোকের চোখের ভেতর দেখে তার মনের ভেতরটা সব বুঝতে পারতুম মুহূর্তের মধ্যে। কে কি ভাবছে না ভাবছে 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ হয়ে যেত। কারুকে কারুকে বলে দিতুম। যাদের যাদের বলতুম, তাদের মধ্যে অনেকে আমার চেলা হয়ে যেত; আর যারা কোনরূপ মতলব পাকিয়ে আমার সঙ্গে মিশতে আসত, তারা ঐ শক্তির পরিচয় পেয়ে আর আমার দিকেও মাড়াত না।

যখন চিকাগো প্রভৃতি শহরে বক্তৃতা শুরু করলুম, তখন সপ্তাহে ১২।১৪টা, কখনও আরও বেশী লেকচার দিতে হ'ত; অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক শ্রমে মহা ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। যেন বক্তৃতার বিষয় সব ফুরিয়ে যেতে লাগলো। ভাবতুম—কি করি, কাল আবার কোথা থেকে কি নূতন কথা ব'লব ? নূতন ভাব আর যেন জুটত না। একদিন বক্তৃতার পরে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, তাইতো এখন কি উপায় করা যায় ? ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রার মতো এল। সেই অবস্থায় শুনতে পেলুম, কে যেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে; কত নূতন ভাব, নূতন কথা—সে-সব যেন ইহজন্মে শুনিনি, ভাবিওনি! ঘুম থেকে উঠে সেগুলি স্মরণ ক'রে রাখলুম, আর বক্তৃতায় তাই বললুম। এমন যে কতদিন ঘটেছে তার সংখ্যা নেই। শুয়ে শুয়ে এমন বক্তৃতা কতদিন শুনেছি! কখন বা এত জোরে জোরে

তা হ'ত যে, অন্য ঘরের লোক আওয়াজ পেত ও পরদিন আমায় ব'লত—'স্বামীজী, কাল অত রাত্রে আপনি কার সঙ্গে এত জোরে কথা কইছিলেন?' আমি তাদের সে-কথা কোনরূপে কাটিয়ে দিতুম। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড!

শিষ্য স্বামীজীর কথা শুনিয়া নির্বাক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'মহাশয়, তবে বোধ হয় আপনিই সূক্ষ্মদেহে ঐরূপে বক্তৃতা করিতেন এবং স্থূল-দেহে কখন কখন তার প্রতিধ্বনি বাহির হইত।'

শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'তা হবে।'

অনন্তর আমেরিকার কথা উঠিল। স্বামীজী বলিলেন, 'সে দেশের পুরুষের চেয়ে মেয়েরা অধিক শিক্ষিত। বিজ্ঞান-দর্শনে তারা সব মহা পণ্ডিত; তাই তারা আমায় অত খাতির ক'রত। পুরুষগুলো দিনরাত খাটছে, বিশ্রামের সময় নেই; মেয়েরা স্কুলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ক'রে মহা বিদুষী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকায় যে দিকে চাইবি, কেবলই মেয়েদের রাজত্ব।'

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, গোঁড়া ক্রিশ্চানেরা সেখানে আপনার বিপক্ষ হয় নাই?

স্বামীজী। হয়েছিল বইকি। লোকে যখন আমার খাতির করতে লাগলো, তখন পাদ্রীরা আমার পেছনে খুব লাগলো। আমার নামে কত কুৎসা কাগজে লিখে রটনা করেছিল! কত লোক আমায় তার প্রতিবাদ করতে ব'লত। আমি কিন্তু কিছু গ্রাহ্য করতুম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—চালাকি দ্বারা জগতে কোন মহৎ কার্য হয় না; তাই ঐ-সকল অশ্লীল কুৎসায় কর্ণপাত না ক'রে ধীরে ধীরে আপনার কাজ ক'রে যেতুম। দেখতেও পেতুম, অনেক সময়ে যারা আমায় অযথা গালমন্দ ক'রত, তারাও অনুতপ্ত হয়ে আমার শরণ নিত এবং নিজেরাই কাগজে contradict (প্রতিবাদ) ক'রে ক্ষমা চাইত। কখন কখন এমনও হয়েছে—আমায় কোন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেহ আমার নামে ঐ-সকল মিথ্যা কুৎসা বাড়িওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। তাই শুনে সে দোর বন্ধ ক'রে কোথায় চলে গেছে। আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি—সব ভোঁ ভাঁ, কেউ নেই। আবার কিছুদিন

পরে তারাই সত্য কথা জানতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আমার চেলা হ'তে এসেছে। কি জানিস বাবা, সংসার সবই দুনিয়া-দারি! ঠিক সৎসাহসী ও জ্ঞানী কি এ-সব দুনিয়াদারিতে ভোলে রে বাপ! জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্তব্য কার্য ক'রে চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ। নতুবা এ কি বলছে, ও কি লিখছে, ও-সব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে কোন মহৎ কাজ করা যায় না। এই শ্লোকটা জানিস না?—

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব মরণমস্তু শতাব্দান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥[১]

—লোকে তোর স্তুতিই করুক বা নিন্দাই করুক, তোর প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হোক বা না হোক, আজ বা শতবর্ষ পরে তোর দেহপাত হোক, ন্যায় পথ থেকে যেন ভ্রষ্ট হ'সনি। কত ঝড় তুফান এড়িয়ে গেলে তবে শান্তির রাজ্যে পৌঁছানো যায়। যে যত বড় হয়েছে, তার উপর তত কঠিন পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার কষ্টিপাথরে তার জীবন ঘষে মেজে দেখে তবে তাকে জগৎ বড় ব'লে স্বীকার করেছে। যারা ভীরু কাপুরুষ, তারাই সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে তীরে নৌকা ডোবায়। মহাবীর কি কিছুতে দৃক্‌পাত করে রে? যা হবার হোক গে, আমার ইষ্টলাভ আগে ক'রবই ক'রব—এই হচ্ছে পুরুষকার। এ পুরুষকার না থাকলে শত দৈবও তোর জড়ত্ব দূর করতে পারে না।

শিষ্য। তবে দৈবে নির্ভরতা কি দুর্বলতার চিহ্ন?

স্বামীজী। শাস্ত্র নির্ভরতাকে পঞ্চম পুরুষার্থ ব'লে নির্দেশ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে লোকে যেভাবে 'দৈব দৈব' করে, ওটা মৃত্যুর চিহ্ন, মহা-কাপুরুষতার পরিণাম, কিম্ভূতকিমাকার একটা ঈশ্বর কল্পনা ক'রে তার ঘাড়ে নিজের দোষ-চাপানোর চেষ্টামাত্র। ঠাকুরের সেই গোহত্যা-পাপের গল্প শুনেছিস তো? সেই গোহত্যা-পাপে শেষে বাগানের মালিককেই ভুগে মরতে হ'ল। আজকাল সকলেই 'যথা নিযুক্তোঽস্মি

[১] নীতিশতকম্—ভর্তৃহরি

তথা করোমি' বলে পাপ-পুণ্য দুই-ই ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। নিজে যেন পদ্মপত্রে জল! সর্বদা এ ভাবে থাকতে পারলে সে তো মুক্ত! কিন্তু ভালো-র বেলা 'আমি', আর মন্দের বেলা 'তুমি'—বলিহারি তাদের দৈবে নির্ভরতা! পূর্ণ প্রেম বা জ্ঞান না হ'লে নির্ভরের অবস্থা হতেই পারে না। যার ঠিক ঠিক নির্ভর হয়েছে, তার ভালমন্দ-ভেদবুদ্ধি থাকে না—ঐ অবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যদের) ভেতর ইদানীং নাগ-মহাশয়।

—বলিতে বলিতে নাগ-মহাশয়ের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন, 'অমন অনুরাগী ভক্ত কি আর দুটি দেখা যায়? আহা, তাঁর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে!'

শিষ্য। তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় আপনাকে দর্শন করিতে আসিবেন বলিয়া মা-ঠাকরুন (নাগ-মহাশয়ের পত্নী) আমায় চিঠি লিখিয়াছেন।

স্বামীজী। ঠাকুর জনক-রাজার সঙ্গে তাঁর তুলনা করতেন। অমন জিতেন্দ্রিয় পুরুষের দর্শন দূরে থাক, কথাও শোনা যায় না। তাঁর সঙ্গ খুব করবি। তিনি ঠাকুরের একজন অন্তরঙ্গ।

শিষ্য। মহাশয়, ওদেশে অনেকে তাঁহাকে পাগল বলে। আমি কিন্তু প্রথম দিন দেখা হইতেই তাঁহাকে মহাপুরুষ মনে করিয়াছিলাম। তিনি আমায় বড় ভালবাসেন ও কৃপা করেন।

স্বামীজী। অমন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করেছিস, তবে আর ভাবনা কিসের? বহু জন্মের তপস্যা থাকলে তবে ঐরকম মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয়। নাগ-মহাশয় বাড়িতে কিরূপ থাকেন?

শিষ্য। মহাশয়, কাজকর্ম তো কিছুই দেখি না। কেবল অতিথিসেবা লইয়াই আছেন; পালবাবুরা যে কয়েকটি টাকা দেন, তাহা ছাড়া গ্রাসাচ্ছাদনের অন্য সম্বল নাই; কিন্তু খরচপত্র একটা বড়লোকের বাড়িতে যেমন হয় তেমনি! নিজের ভোগের জন্য সিকি পয়সাও ব্যয় নাই—অতটা ব্যয় সবই কেবল পরসেবার্থ। সেবা, সেবা—ইহাই তাঁহার জীবনের মহাব্রত বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, যেন ভূতে ভূতে আত্মদর্শন করিয়া তিনি অভিন্ন-জ্ঞানে জগতের সেবা করিতে ব্যস্ত আছেন। সেবার জন্য নিজের শরীরটাকে শরীর বলিয়া জ্ঞান করেন না—যেন বেহুঁশ। বাস্তবিক

শরীর-জ্ঞান তাঁহার আছে কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। আপনি যে অবস্থাকে superconscious (অতিচেতন) বলেন, আমার বোধ হয় তিনি সর্বদা সেই অবস্থায় থাকেন।

স্বামীজী। তা না হবে কেন? ঠাকুর তাঁকে কত ভালবাসতেন! তোদের বাঙাল দেশে এবার ঠাকুরের ঐ একটি সঙ্গী এসেছেন। তাঁর আলোতে পূর্ববঙ্গ আলোকিত হয়ে আছে।

১৩

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী
কাল—ফেব্রুআরি, ১৮৯৮

বেলুড়ে গঙ্গাতীরে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটী ভাড়া করিয়া আলমবাজার হইতে ঐ স্থানে মঠ উঠাইয়া আনা হইয়াছে। সে-বার ঐ বাগানেই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিপূজা[1] হয়। স্বামীজী নীলাম্বরবাবুর বাগানেই অবস্থান করিতেছিলেন।

জন্মতিথিপূজায় সে-বার বিপুল আয়োজন! স্বামীজীর আদেশমত ঠাকুরঘর পরিপাটী দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। স্বামীজী সেদিন স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। পূজার তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'পৈতে এনেছিস্ তো?'

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। আপনার আদেশমত সব প্রস্তুত। কিন্তু এত পৈতার যোগাড় কেন, বুঝিতেছি না।

স্বামীজী। দ্বি-জাতিমাত্রেরই[2] উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণস্থল। আজ ঠাকুরের জন্মদিনে যারা আসবে, তাদের সকলকে পৈতে পরিয়ে দেবো। এরা সব ব্রাত্য (পতিত) হয়ে

১ ২২শে ফেব্রুআরি

২ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজাতি

গেছে। শাস্ত্র বলে, প্রায়শ্চিত্ত করলেই ব্রাত্য আবার উপনয়ন-সংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি, সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। তাই আজ সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে পৈতে পরাতে হবে। বুঝলি?

শিষ্য। আমি আপনার আদেশমত অনেকগুলি পৈতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। পূজান্তে আপনার অনুমতি অনুসারে সমাগত ভক্তগণকে ঐগুলি পরাইয়া দিব।

স্বামীজী। ব্রাহ্মণেতর ভক্তদিগকে এরূপ গায়ত্রী-মন্ত্র (এখানে শিষ্যকে ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজাতির গায়ত্রী-মন্ত্র বলিয়া দিলেন) দিবি। ক্রমে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের তো কথাই নেই। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। 'ছোঁব না, ছোঁব না' ব'লে এদের আমরাই হীন ক'রে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়েছে। এদের তুলতে হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে। বলতে হবে—'তোরাও আমাদের মতো মানুষ, তোদেরও আমাদের মতো সব অধিকার আছে।' বুঝলি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী। এখন যারা পৈতে নেবে, তাদের গঙ্গাস্নান ক'রে আসতে বল্। তারপর ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে সবাই পৈতে পরবে।

স্বামীজীর আদেশমত সমাগত প্রায় ৪০।৫০ জন ভক্ত ক্রমে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া, শিষ্যের নিকট গায়ত্রী-মন্ত্র লইয়া পৈতা পরিতে লাগিল। মঠে হুলস্থূল। পৈতা পরিয়া ভক্তগণ আবার ঠাকুরকে প্রণাম করিল, এবং স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া স্বামীজীর মুখারবিন্দ যেন শতগুণে প্রফুল্ল হইল। ইহার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় মঠে উপস্থিত হইলেন।

এইবার স্বামীজীর আদেশে সঙ্গীতের উদ্যোগ হইতে লাগিল, এবং মঠের সন্ন্যাসীরা আজ স্বামীজীকে মনের সাধে যোগী সাজাইলেন। তাঁহার কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল, সর্বাঙ্গে কর্পূরধবল পবিত্র বিভূতি, মস্তকে আপাদলম্বিত জটাভার, বাম হস্তে ত্রিশূল, উভয় বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয়, গলে আজানুলম্বিত ত্রিবলীকৃত বড় রুদ্রাক্ষমালা প্রভৃতি দেওয়া হইল।

এইবার স্বামীজী পশ্চিমাস্যে মুক্ত পদ্মাসনে বসিয়া 'কূজন্তং রামরামেতি' স্তবটি মধুর স্বরে উচ্চারণ করিতে এবং স্তবান্তে কেবল 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' এই কথা পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর অর্ধ-নিমীলিত নেত্র; হস্তে তানপুরায় সুর বাজিতেছে। 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' ধ্বনি ভিন্ন মঠে কিছুক্ষণ অন্য কিছুই শুনা গেল না! এইরূপে প্রায় অর্ধাধিক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তখনও কাহারও মুখে অন্য কোন কথা নাই। স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত রামনামসুধা পান করিয়া সকলেই আজ মাতোয়ারা!

রামনামকীর্তনান্তে স্বামীজী পূর্বের ন্যায় নেশার ঘোরেই গাহিতে লাগিলেন —'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাঈ।' স্বামী সারদানন্দ[১] 'একরূপ-অরূপ-নাম-বরণ' গানটি গাহিলেন। মৃদঙ্গের স্নিগ্ধ-গম্ভীর নির্ঘোষে গঙ্গা যেন উথলিয়া উঠিল, এবং স্বামী সারদানন্দের সুকণ্ঠ ও সঙ্গে সঙ্গে মধুর আলাপে গৃহ ছাইয়া ফেলিল। তৎপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে-সকল গান গাহিতেন, ক্রমে সেগুলি গীত হইতে লাগিল।

এইবার স্বামীজী সহসা নিজের বেশভূষা খুলিয়া গিরিশবাবুকে সাদরে ঐ সকল পরাইয়া সাজাইতে লাগিলেন। নিজহস্তে গিরিশবাবুর বিশাল দেহে ভস্ম মাখাইয়া কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ও বাহুতে রুদ্রাক্ষ-বলয় দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু সে সজ্জায় যেন আর এক মূর্তি হইয়া দাঁড়াইলেন; দেখিয়া ভক্তগণ অবাক হইয়া গেল! অনন্তর স্বামীজী বলিলেন:

পরমহংসদেব বলতেন, 'ইনি ভৈরবের অবতার।' আমাদের সঙ্গে এঁর কোনও প্রভেদ নেই।

গিরিশবাবু নির্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে আজ যেরূপ সাজে সাজাইতে চাহেন, তাহাতেই তিনি রাজী। অবশেষে স্বামীজীর আদেশে একখানি গেরুয়া কাপড় আনাইয়া গিরিশবাবুকে পরানো হইল। গিরিশবাবু কোন আপত্তি করিলেন না। গুরুভ্রাতাদের ইচ্ছায় তিনি আজ অবাধে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন। এইবার স্বামীজী বলিলেন, 'জি. সি., তুমি আজ আমাদের ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কথা শোনাবে; (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) তোরা সব স্থির হয়ে বস্।'

[১] অল্প কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত।

গিরিশবাবুর তখনও মুখে কোন কথা নাই। যাঁহার জন্মোৎসবে আজ সকলে মিলিত হইয়াছেন, তাঁহার লীলা ও তাঁহার সাক্ষাৎ পার্ষদগণের আনন্দ দর্শন করিয়া তিনি আনন্দে জড়বৎ হইয়াছেন। অবশেষে গিরিশবাবু বলিলেন, 'দয়াময় ঠাকুরের কথা আমি আর কি ব'লব? কামকাঞ্চন-ত্যাগী তোমাদের ন্যায় বালসন্ন্যাসীদের সঙ্গে যে তিনি এ অধমকে একাসনে বসিতে অধিকার দিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার অপার করুণা অনুভব করি!' কথাগুলি বলিতে বলিতে গিরিশবাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি অন্য কিছুই আর সেদিন বলিতে পারিলেন না।

অনন্তর স্বামীজী কয়েকটি হিন্দি গান গাহিলেন। এই সময়ে প্রথম পূজা শেষ হওয়ায় ভক্তগণকে জলযোগ করিবার জন্য ডাকা হইল। জলযোগ সাঙ্গ হইবার পর স্বামীজী নীচে বৈঠকখানা-ঘরে যাইয়া বসিলেন। সমাগত ভক্তেরাও তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। উপবীতধারী জনৈক গৃহস্থকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন:

তোরা হচ্ছিস দ্বিজাতি, বহুকাল থেকে ব্রাত্য হয়ে গেছলি। আজ থেকে আবার দ্বিজাতি হলি। প্রত্যহ গায়ত্রী-মন্ত্র অন্ততঃ এক শত বার জপবি বুঝলি?

গৃহস্থটি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিলেন। ইতোমধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাস্টার মহাশয়) উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী মাস্টার মহাশয়কে দেখিয়া সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রবাবু প্রণাম করিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়াছিলেন। স্বামীজী বারংবার বসিতে বলায় জড়সড়ভাবে এক কোণে উপবিষ্ট হইলেন।

স্বামীজী। মাস্টার মহাশয়, আজ ঠাকুরের জন্মদিন। ঠাকুরের কথা আজ আমাদের কিছু শোনাতে হবে।

মাস্টার মহাশয় মৃদুহাস্যে অবনতমস্তক হইয়া রহিলেন। ইতোমধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় দেড় মণ ওজনের দুইটি পান্তুয়া লইয়া মঠে উপস্থিত হইলেন। অদ্ভুত পান্তুয়া দুইটি দেখিতে সকলে ছুটিলেন। অনন্তর স্বামীজী প্রভৃতিকে উহা দেখানো হইলে স্বামীজী বলিলেন, 'ঠাকুরঘরে নিয়ে যা।'

স্বামী অখণ্ডানন্দকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন :

দেখছিস্ কেমন কর্মবীর! ভয় মৃত্যু—এ-সবের জ্ঞান নেই; এক রোখে কর্ম ক'রে যাচ্ছে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'।

শিষ্য। মহাশয়, কত তপস্যার বলে তাঁহাতে ঐ শক্তি আসিয়াছে।

স্বামীজী। তপস্যার ফলে শক্তি আসে। আবার পরার্থে কর্ম করলেই তপস্যা করা হয়। কর্মযোগীরা কর্মটাকেই তপস্যার অঙ্গ বলে। তপস্যা করতে করতে যেমন পরহিতেচ্ছা বলবতী হয়ে সাধককে কর্ম করায়, তেমনি আবার পরের জন্য কাজ করতে করতে পরা তপস্যার ফল—চিত্তশুদ্ধি ও পরমাত্মার দর্শনলাভ হয়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, প্রথম হইতে পরের জন্য প্রাণ দিয়া কাজ করিতে কয় জন পারে? মনে ঐরূপ উদারতা আসিবে কেন, যাহাতে জীব আত্মসুখেচ্ছা বলি দিয়া পরার্থে জীবন দিবে?

স্বামীজী। তপস্যাতেই বা কয় জনের মন যায়? কামকাঞ্চনের আকর্ষণে কয় জনই বা ভগবান লাভের আকাঙ্ক্ষা করে? তপস্যাও যেমন কঠিন, নিষ্কাম কর্মও সেরূপ। সুতরাং যারা পরহিতে কাজ ক'রে যায়, তাদের বিরুদ্ধে তোর কিছু বলবার অধিকার নেই। তোর তপস্যা ভাল লাগে, ক'রে যা; আর একজনের কর্ম ভাল লাগে—তাকে তোর নিষেধ করবার কি অধিকার আছে? তুই বুঝি বুঝে রেখেছিস—কর্মটা আর তপস্যা নয়?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, পূর্বে তপস্যা অর্থে আমি অন্যরূপ বুঝিতাম।

স্বামীজী। যেমন সাধন-ভজন অভ্যাস করতে করতে তাতে একটা রোক জন্মায়, তেমনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজ করতে করতে হৃদয় ক্রমে তাতে ডুবে যায়। ক্রমে পরার্থ কর্মে প্রবৃত্তি হয় বুঝলি? একবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের সেবা ক'রে দেখ না, তপস্যার ফল লাভ হয় কি না। পরার্থে কর্মের ফলে মনের আঁক-বাঁক ভেঙে যায় ও মানুষ ক্রমে অকপটে পরহিতে প্রাণ দিতে উন্মুখ হয়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, পরহিতের প্রয়োজন কি?

স্বামীজী। নিজহিতের জন্য। এই দেহটা—যাতে 'আমি' অভিমান ক'রে বসে আছিস, এই দেহটা পরের জন্য উৎসর্গ করেছি, এ কথা ভাবতে

গেলে এই আমিত্বটাকেও ভুলে যেতে হয়। অন্তিমে বিদেহ-বুদ্ধি আসে। তুই যত একাগ্রতার সহিত পরের ভাবনা ভাববি, ততটা আপনাকে ভুলে যাবি। এরূপে কর্মে যখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়ে আসবে, তখন তোরই আত্মা সর্বজীবে সর্বঘটে বিরাজমান,—এ তত্ত্ব দেখতে পাবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা পথ। এও জানবি এক প্রকারের ঈশ্বর-সাধনা। এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে—আত্মবিকাশ। জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সাধনা দ্বারা যেমন আত্ম-বিকাশ হয়, পরার্থে কর্ম দ্বারাও ঠিক তাই হয়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আমি যদি দিনরাত পরের ভাবনাই ভাবিব, তবে আত্মচিন্তা করিব কখন? একটা বিশেষ ভাব লইয়া পড়িয়া থাকিলে অভাবরূপী আত্মার কিরূপে সাক্ষাৎকার হইবে?

স্বামীজী। আত্মজ্ঞানলাভই সকল সাধনার—সকল পথের মুখ্য উদ্দেশ্য। তুই যদি সেবাপর হয়ে ঐ কর্মফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ ক'রে সর্বজীবকে আত্মবৎ দর্শন করতে পারিস তো আত্মদর্শনের বাকি কি রইল? আত্মদর্শন মানে কি জড়ের মতো—এই দেওয়ালটা বা কাঠখানার মতো হয়ে বসে থাকা?

শিষ্য। তাহা না হইলেও সর্ববৃত্তির ও কর্মের নিরোধকেই তো শাস্ত্র আত্মার স্ব-স্বরূপাবস্থান বলিয়াছেন?

স্বামীজী। শাস্ত্রে যাকে 'সমাধি' বলা হয়েছে, সে অবস্থা তো আর সহজে লাভ হয় না। কদাচিৎ কারও হলেও অধিক কাল স্থায়ী হয় না। তখন সে কি নিয়ে থাকবে বল্? সে-জন্য শাস্ত্রোক্ত অবস্থালাভের পর সাধক সর্বভূতে আত্মদর্শন ক'রে, অভিন্ন-জ্ঞানে সেবাপর হয়ে প্রারব্ধ ক্ষয় করে। এই অবস্থাটাকেই শাস্ত্রকারেরা জীবন্মুক্ত অবস্থা ব'লে গেছেন।

শিষ্য। তবেই তো এ কথা দাঁড়াইতেছে মহাশয় যে, জীবন্মুক্তির অবস্থা লাভ না করিলে ঠিক ঠিক পরার্থে কাজ করা যায় না।

স্বামীজী। শাস্ত্রে ঐ কথা বলেছে; আবার এও বলেছে যে, পরার্থে সেবাপর হ'তে হ'তে সাধকের জীবন্মুক্তি-অবস্থা ঘটে; নতুবা 'কর্মযোগ' ব'লে একটা আলাদা পথ উপদেশ করবার শাস্ত্রে কোনই প্রয়োজন ছিল না।

শিষ্য এতক্ষণে বুঝিয়া স্থির হইল; স্বামীজীও ঐ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কিন্নর-কণ্ঠে গান ধরিলেন :

দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো ক'রে।
কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর-ঘরে ॥
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়-সন্তাপহারী সাধ ধরি হৃদি 'পরে ॥
ভূতলে অতুল মণি, কে এলি রে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে।
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ কার তরে ॥[১]

গিরিশবাবু ও ভক্তেরা সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গান গাহিতে লাগিলেন। 'তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে'—পদটি বারবার গীত হইতে লাগিল। অতঃপর 'মজলো আমার মন-ভ্রমরা কালী-পদ-নীলকমলে' ইত্যাদি কয়েকটি গান হইবার পরে তিথিপূজার নিয়মানুযায়ী একটি জীবিত মৎস্য বাদ্যোদ্যমের সহিত গঙ্গায় ছাড়া হইল। তারপর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য ভক্তদিগের মধ্যে ধুম পড়িয়া গেল।

১৪

স্থান—কলিকাতা, ৺বলরামবাবুর বাটী
কাল—মার্চ (?) ১৮৯৮

স্বামীজী আজ দুই দিন যাবৎ বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্যের সুতরাং বিশেষ সুবিধা—প্রত্যহ তথায় যাতায়াত করে। অদ্য সন্ধ্যার কিছু পূর্বে স্বামীজী ঐ বাটীর ছাদে বেড়াইতেছেন। শিষ্য ও অন্য চার-পাঁচ জন লোক সঙ্গে আছে। বড় গরম পড়িয়াছে। স্বামীজীর খোলা গা। ধীরে ধীরে দক্ষিণে হাওয়া দিতেছে। বেড়াইতে

[১] শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক রচিত।

বেড়াইতে স্বামীজী গুরুগোবিন্দের কথা পাড়িয়া তাঁহার ত্যাগ তপস্যা তিতিক্ষা ও প্রাণপাতী পরিশ্রমের ফলে শিখজাতির কিরূপে পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল, কিরূপে তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে পর্যন্ত দীক্ষা দান করিয়া পুনরায় হিন্দু করিয়া শিখজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা তিনি নর্মদাতীরে মানবলীলা সংবরণ করেন, ওজস্বিনী ভাষায় সে-সকল বিষয়ের কিছু কিছু বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গুরুগোবিন্দের নিকট দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তখন যে কি মহাশক্তি সঞ্চারিত হইত, তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী শিখজাতির মধ্যে প্রচলিত একটি দোঁহা আবৃত্তি করিলেন :

সওয়া লাখ পর এক চড়াউঁ।
যব্ গুরু গোবিন্দ্ নাম শুনাউঁ॥

অর্থাৎ গুরুগোবিন্দের নিকট নাম (দীক্ষামন্ত্র) শুনিয়া এক এক ব্যক্তিতে সওয়া লক্ষ অপেক্ষাও অধিক লোকের শক্তি সঞ্চারিত হইত। গুরুগোবিন্দের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তাঁহার শক্তিতে জীবনে যথার্থ ধর্মপ্রাণতা উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যের অন্তর এমন অদ্ভুত বীরত্বে পূর্ণ হইত যে, সে তখন সওয়া লক্ষ বিধর্মীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত! ধর্মমহিমাসূচক ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজীর উৎসাহ-বিস্ফারিত নয়নে যেন তেজ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। শ্রোতৃবৃন্দ স্তব্ধ হইয়া স্বামীজীর মুখপানে চাহিয়া উহাই দেখিতে লাগিল। কি অদ্ভুত উৎসাহ ও শক্তিই স্বামীজীর ভিতরে ছিল! যখন যে বিষয়ে কথা পাড়িতেন, তখন তাহাতে তিনি এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, মনে হইত ঐ বিষয়কেই তিনি বুঝি জগতের অন্য সকল বিষয় অপেক্ষা বড় এবং উহা লাভই মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য বলিল, 'মহাশয়, ইহা কিন্তু বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার যে, গুরুগোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিয়া একই উদ্দেশ্যে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঐরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখা যায় না ?

স্বামীজী। Common interest (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টা) না হ'লে লোক কখনও একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় না। সভা সমিতি লেকচার দ্বারা

সর্বসাধারণকে কখনও unite (এক) করা যায় না—যদি তাদের interest (স্বার্থ) না এক হয়। গুরুগোবিন্দ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তদানীন্তন কালের কি হিন্দু কি মুসলমান—সকলেই ঘোর অত্যাচার-অবিচারের রাজ্যে বাস করছে। গুরুগোবিন্দ common interest create (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টায় সৃষ্টি) করেননি, কেবল সেটা ইতরসাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাই হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁকে follow (অনুসরণ) করেছিল। তিনি মহা শক্তিসাধক ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

রাত্রি হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী সকলকে সঙ্গে লইয়া দোতলার বৈঠকখানায় নামিয়া আসিলেন। তিনি এখানে উপবেশন করিলে সকলে তাঁহাকে আবার ঘিরিয়া বসিল। এই সময়ে miracle (সিদ্ধাই) সম্বন্ধে কথাবার্তা উঠিল।

স্বামীজী। সিদ্ধাই বা বিভূতি-শক্তি অতি সামান্য মনঃসংযমেই লাভ করা যায়। (শিষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া) তুই thought-reading (অপরের মনের কথা ঠিক ঠিক বলা) শিখবি? চার-পাঁচ দিনেই তোকে ঐ বিদ্যাটা শিখিয়ে দিতে পারি।

শিষ্য। তাতে কি উপকার হবে?

স্বামীজী। কেন? পরের মনের ভাব জানতে পারবি।

শিষ্য। তাতে ব্রহ্মবিদ্যালাভের কিছু সহায়তা হবে কি?

স্বামীজী। কিছুমাত্র নয়।

শিষ্য। তবে আমার ঐ বিদ্যা শিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মহাশয়, আপনি স্বয়ং সিদ্ধাই সম্বন্ধে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজী। আমি একবার হিমালয়ে ভ্রমণ করতে করতে কোন পাহাড়ী গ্রামে এক রাত্রের জন্য বাস করেছিলাম। সন্ধ্যার খানিক বাদে ঐ গাঁয়ে মাদলের খুব বাজনা শুনতে পেয়ে বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলুম—গ্রামের কোন্ লোকের উপর 'দেবতার ভর' হয়েছে। বাড়িওয়ালার আগ্রহাতিশয্যে এবং নিজের curiosity (কৌতূহল) চরিতার্থ করবার জন্য ব্যাপারখানা দেখতে যাওয়া গেল। গিয়ে দেখি,

বহুলোকের সমাবেশ। লম্বা ঝাঁকড়াচুলো একটা পাহাড়ীকে দেখিয়ে বললে, এরই উপর 'দেবতার ভর' হয়েছে। দেখলুম, তার কাছেই একখানি কুঠার আগুনে পোড়াতে দেওয়া হয়েছে। খানিক বাদে দেখি, অগ্নিবর্ণ কুঠারখানা ঐ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার দেহের স্থানে স্থানে লাগিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হচ্ছে, চুলেও লাগানো হচ্ছে! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঐ কুঠারস্পর্শে তার কোনও অঙ্গ বা চুল দগ্ধ হচ্ছে না বা তার মুখে কোনও কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে না! দেখে অবাক হয়ে গেলুম। ইতিমধ্যে গাঁয়ের মোড়ল করজোড়ে আমার কাছে এসে ব'লল, 'মহারাজ, আপনি দয়া ক'রে এর ভূতাবেশ ছাড়িয়ে দিন।' আমি তো ভেবে অস্থির! কি করি, সকলের অনুরোধে ঐ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার কাছে যেতে হ'ল। গিয়েই কিন্তু আগে কুঠারখানা পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হ'ল। যাই হাত দিয়ে ধরা, হাত পুড়ে গেল। তখন কুঠারটা তবু কালো হয়ে গেছে। হাতের জ্বালায় তো অস্থির। থিওরি-মিওর তখন সব লোপ পেয়ে গেল। কি করি, জ্বালায় অস্থির হয়েও ঐ লোকটার মাথায় হাত দিয়ে খানিকটা জপ করলুম। আশ্চর্যের বিষয়, ঐরূপ করার দশ-বার মিনিটের মধ্যেই লোকটা সুস্থ হয়ে গেল। তখন গাঁয়ের লোকের আমার উপর ভক্তি দেখে কে! আমায় একটা কেষ্ট-বিষ্টু ঠাওরালে। আমি কিন্তু ব্যাপারখানা কিছু বুঝতে পারলুম না। অগত্যা বিনা বাক্যব্যয়ে আশ্রয়দাতার সঙ্গে তার কুটীরে ফিরে এলুম। তখন রাত ১২টা হবে। এসে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু হাতের জ্বালায়, আর এই ব্যাপারের কিছুমাত্র রহস্যভেদ করতে পারলুম না ব'লে চিন্তায় ঘুম হ'ল না। জলন্ত কুঠারে মানুষের শরীর দগ্ধ হ'ল না দেখে কেবলই মনে হ'তে লাগল, 'There are more things in heaven and earth...than are dreamt of in your philosophy!'[১]

শিষ্য। পরে ঐ বিষয়ের কোন সুমীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন কি?

---

১ *Hamlet*—Shakespeare
স্বর্গে ও পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যাপার আছে, দর্শনশাস্ত্রে যা কল্পনা করা যায় না।

স্বামীজী। না। আজ কথায় কথায় ঘটনাটি মনে পড়ে গেল। তাই তোদের বললুম।

অনন্তর স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন :

ঠাকুর কিন্তু সিদ্ধাই-এর বড় নিন্দা করতেন; বলতেন, 'ঐ-সকল শক্তি-প্রকাশের দিকে মন দিলে পরমার্থ-তত্ত্বে পৌছানো যায় না।' কিন্তু মানুষের এমনি দুর্বল মন, গৃহস্থের তো কথাই নেই, সাধুদের মধ্যেও চৌদ্দ আনা লোক সিদ্ধাই-এর উপাসক হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশে ঐ প্রকার বুজরুকি দেখলে লোকে অবাক হয়ে যায়। সিদ্ধাই-লাভটা যে একটা খারাপ জিনিস, ধর্মপথের অন্তরায়, এ কথা ঠাকুর কৃপা ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, তাই বুঝতে পেরেছি। সে-জন্য দেখিসনি—ঠাকুরের সন্তানেরা কেউই ঐ দিকে খেয়াল রাখে না?

স্বামী যোগানন্দ এই সময়ে স্বামীজীকে বলিলেন, 'তোমার সঙ্গে মান্দ্রাজে যে একটা ভূতুড়ের দেখা হয়েছিল, সেই কথাটা বাঙাল-কে বলো না।'

শিষ্য ঐ বিষয় ইতঃপূর্বে শুনে নাই, শুনিবার জন্য জেদ করিয়া বসিলে অগত্যা স্বামীজী ঐ কথা এইরূপে বলিলেন :

মান্দ্রাজে যখন মন্মথবাবুর[১] বাড়ীতে ছিলুম, তখন একদিন স্বপ্ন দেখলুম, মা[২] মারা গেছেন! মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। তখন মঠেও বড় একটা চিঠিপত্র লিখতুম না—তা বাড়িতে লেখা তো দূরের কথা। মন্মথবাবুকে স্বপ্নের কথা বলায় তিনি তখনই ঐ বিষয়ের সংবাদের জন্য কলকাতায় 'তার' করলেন। কারণ স্বপ্নটা দেখে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আবার, এদিকে মান্দ্রাজের বন্ধুগণ তখন আমার আমেরিকায় যাবার যোগাড় ক'রে তাড়া লাগাচ্ছিল; কিন্তু মায়ের শারীরিক কুশল সংবাদটা না পেয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। আমার ভাব বুঝে মন্মথবাবু বললেন যে, শহরের কিছু দূরে একজন পিশাচসিদ্ধ লোক বাস করে, সে জীবের শুভাশুভ ভূত-ভবিষ্যৎ সব খবর ব'লে দিতে পারে। মন্মথবাবুর অনুরোধে ও নিজের মানসিক উদ্বেগ দূর করতে তার নিকট যেতে রাজী হলুম। মন্মথবাবু, আমি, আলাসিঙ্গা

১ ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্মথনাথ ভট্টাচার্য মান্দ্রাজে একাউন্টেন্ট জেনারেল ছিলেন।

২ স্বামীজীর গর্ভধারিণী

ও আর একজন খানিকটা রেলে ক'রে, পরে পায়ে হেঁটে সেখানে তো গেলুম। গিয়ে দেখি শ্মশানের পাশে বিকটাকার, শুঁটকো ভূষ-কালো একটা লোক বসে আছে। তার অনুচরগণ 'কিড়িং মিড়িং' ক'রে মাদ্রাজি ভাষায় বুঝিয়ে দিলে, উনিই পিশাচসিদ্ধ পুরুষ। প্রথমটা সে তো আমাদের আমলেই আনলে না। তারপর যখন আমরা ফেরবার উদ্যোগ করছি, তখন আমাদের দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করলে। সঙ্গী আলাসিঙ্গাই দোভাষীর কাজ করছিল; আমাদের দাঁড়াবার কথা বললে। তারপর একটা পেনসিল দিয়ে লোকটা খানিকক্ষণ ধরে কি আঁক পাড়তে লাগল। পরে দেখলুম, লোকটা concentration (মন একাগ্র) ক'রে যেন একেবারে স্থির হয়ে প'ড়ল। তারপর প্রথমে আমার নাম গোত্র চৌদ্দপুরুষের খবর বললে; আর বললে যে, ঠাকুর আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত ফিরছেন! মায়ের মঙ্গল সমাচারও বললে! ধর্মপ্রচার করতে আমাকে যে বহুদূরে অতি শীঘ্র যেতে হবে, তাও বলে দিলে! এইরূপে মায়ের মঙ্গলসংবাদ পেয়ে ভট্টাচার্যের সঙ্গে শহরে ফিরে এলুম। এসে কলকাতার তারেও মায়ের মঙ্গল সংবাদ পেলুম।

যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিলেন:

ব্যাটা কিন্তু যা যা বলেছিল, ঠিক তাই তাই হয়ে গেল; তা সেটা 'কাকতালীয়ের' ন্যায়ই হোক, বা যাই হোক।

যোগানন্দ। তুমি পূর্বে এ-সব কিছু বিশ্বাস করতে না, তাই তোমার ঐ সকল দেখবার প্রয়োজন হয়েছিল!

স্বামীজী। আমি কি না দেখে, না শুনে যা তা কতকগুলো বিশ্বাস করি? এমন ছেলেই নই। মহামায়ার রাজ্যে এসে জগৎ-ভেলকির সঙ্গে সঙ্গে কত কি ভেলকিই না দেখলুম। মায়া—মায়া!! রাম রাম! আজ কি ছাইভস্ম কথাই সব হ'ল। ভূত ভাবতে ভাবতে লোকে ভূত হয়ে যায়। আর যে দিনরাত জানতে-অজানতে বলে, 'আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা', সেই ব্রহ্মজ্ঞ হয়।

এই বলিয়া স্বামীজী স্নেহভরে শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন:

এইসব ছাইভস্ম কথাগুলোকে মনে কিছুমাত্র স্থান দিবিনি। কেবল সদসৎ বিচার করবি—আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে প্রাণপণ যত্ন করবি। আত্মজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। আর সবই মায়া—ভেলকিবাজি!

এক প্রত্যগাত্মাই অবিতথ সত্য। এ কথাটা বুঝেছি ; সে জন্যই তোদের বুঝাবার চেষ্টা করছি। 'একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'।

কথা বলিতে বলিতে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। অনন্তর স্বামীজী আহারান্তে বিশ্রাম করিতে গেলেন। শিষ্য স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। স্বামীজী বলিলেন, 'কাল আসবি তো?'

শিষ্য। আজ্ঞে আসিব বইকি? আপনাকে দিনান্তে না দেখিলে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া ছটফট করিতে থাকে।

স্বামীজী। তবে এখন আয়, রাত্রি হয়েছে।

১৫

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী

কাল—নভেম্বর, ১৮৯৮

আজ দুই-তিন দিন হইল স্বামীজী কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। শরীর তেমন ভাল নাই। শিষ্য মঠে আসিতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, 'কাশ্মীর থেকে ফিরে আসা অবধি স্বামীজী কারও সঙ্গে কোন কথাবার্তা কন না, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তুই স্বামীজীর কাছে গল্পসল্প ক'রে স্বামীজীর মনটা নীচে আনতে চেষ্টা করিস।'

শিষ্য উপরে স্বামীজীর ঘরে গিয়া দেখিল, স্বামীজী মুক্ত-পদ্মাসনে পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন, যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন, মুখে হাসি নাই, প্রদীপ্ত নয়নে বহির্মুখী দৃষ্টি নাই, যেন ভিতরে কিছু দেখিতেছেন। শিষ্যকে দেখিবামাত্র বলিলেন, 'এসেছিস বাবা, বোস'—এই পর্যন্ত। স্বামীজীর বামনেত্রের ভিতরটা রক্তবর্ণ দেখিয়া শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার চোখের ভিতরটা লাল হইয়াছে কেন?' 'ও কিছু না' বলিয়া স্বামীজী পুনরায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরেও যখন স্বামীজী কোন কথা কহিলেন না, তখন শিষ্য অধীর হইয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিল, '৺অমরনাথে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা আমাকে বলিবেন না?' পাদস্পর্শে

স্বামীজীর যেন একটু চমক ভাঙিল, যেন একটু বহির্দৃষ্টি আসিল; বলিলেন, 'অমরনাথ-দর্শনের পর থেকে আমার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা যেন শিব বসে আছেন, কিছুতেই নাবছেন না।' শিষ্য শুনিয়া অবাক হইয়া রহিল।

স্বামীজী। ৺অমরনাথ ও পরে ৺ক্ষীরভবানীর মন্দিরে খুব তপস্যা করেছিলাম। যা, তামাক সেজে নিয়ে আয়।

শিষ্য প্রফুল্লমনে স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তামাক সাজিয়া দিল। স্বামীজী আস্তে আস্তে ধূমপান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন:

অমরনাথ যাবার কালে পাহাড়ের একটা খাড়া চড়াই ভেঙে উঠেছিলুম। সে রাস্তায় যাত্রীরা কেউ যায় না, পাহাড়ী লোকেরাই যাওয়া-আসা করে। আমার কেমন রোক হ'ল, ঐ পথেই যাব। যাব তো যাবই। সেই পরিশ্রমে শরীর একটু দমে গেছে। ওখানে এমন কনকনে শীত যে, গায়ে যেন ছুঁচ ফোটে।

শিষ্য। শুনেছি, উলঙ্গ হয়ে ৺অমরনাথকে দর্শন করিতে হয়; কথাটা কি সত্য?

স্বামীজী। হাঁ, আমিও কৌপীনমাত্র পরে ভস্ম মেখে গুহায় প্রবেশ করেছিলাম; তখন শীত-গ্রীষ্ম কিছুই জানিতে পারিনি। কিন্তু মন্দির থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডায় যেন জড় হয়ে গিয়েছিলাম।

শিষ্য। পায়রা দেখিয়াছিলেন কি? শুনিয়াছি সেখানে ঠাণ্ডায় কোন জীবজন্তুকে বাস করিতে দেখা যায় না, কেবল কোথা হইতে এক ঝাঁক শ্বেত পারাবত মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে।

স্বামীজী। হাঁ, ৩।৪টা সাদা পায়রা দেখেছিলুম। তারা গুহায় থাকে কি নিকটবর্তী পাহাড়ে থাকে, তা বুঝতে পারলুম না।

শিষ্য। মহাশয়, লোকে বলে শুনিয়াছি—গুহা হইতে বাহিরে আসিয়া যদি কেহ সাদা পায়রা দেখে, তবে বুঝা যায় তাহার সত্যসত্য শিবদর্শন হইল।

স্বামীজী। শুনেছি পায়রা দেখলে যা কামনা করা যায়, তাই সিদ্ধ হয়।

অনন্তর স্বামীজী বলিলেন, আসিবার কালে তিনি সকল যাত্রী যে রাস্তায় ফেরে, সেই রাস্তা দিয়াই শ্রীনগরে আসিয়াছিলেন। শ্রীনগরে ফিরিবার অল্পদিন পরেই ৺ক্ষীরভবানী দেবীকে দর্শন করিতে যান এবং সাতদিন তথায় অবস্থান করিয়া ক্ষীর দিয়া দেবীর উদ্দেশে পূজা ও হোম করিয়াছিলেন।

প্রতিদিন এক মণ দুধের ক্ষীর ভোগ দিতেন ও হোম করিতেন। একদিন পূজা করিতে করিতে স্বামীজীর মনে উঠিয়াছিল :

মা ভবানী এখানে সত্যসত্যই কত কাল ধরিয়া প্রকাশিত রহিয়াছেন! পুরাকালে যবনেরা আসিয়া তাঁহার মন্দির ধ্বংস করিয়া যাইল, অথচ এখানকার লোকগুলো কিছুই করিল না। হায়, আমি যদি তখন থাকিতাম, তবে কখনও উহা চুপ করিয়া দেখিতে পারিতাম না—ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মন যখন দুঃখে ক্ষোভে নিতান্ত পীড়িত, তখন স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, মা বলিতেছেন, 'আমার ইচ্ছাতেই যবনেরা মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, আমার ইচ্ছা—আমি জীর্ণ মন্দিরে অবস্থান করিব। ইচ্ছা করিলে আমি কি এখনি এখানে সপ্ততল সোনার মন্দির তুলিতে পারি না? তুই কি করিতে পারিস? তোকে আমি রক্ষা করিব, না তুই আমাকে রক্ষা করিবি?'

স্বামীজী বলিলেন, 'ঐ দৈববাণী শোনা অবধি আমি আর কোন সঙ্কল্প রাখি না। মঠ-ফঠ করবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছি; মায়ের যা ইচ্ছা তাই হবে।' শিষ্য অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইনিই না একদিন বলিয়াছিলেন, 'যা কিছু দেখিস শুনিস তা তোর ভেতরে অবস্থিত আত্মার প্রতিধ্বনিমাত্র। বাইরে কিছুই নেই।' শিষ্য স্পষ্ট বলিয়াও ফেলিল, 'মহাশয়, আপনি তো বলিতেন—এই সকল দৈববাণী আমাদের ভিতরের ভাবের বাহ্য প্রতিধ্বনি মাত্র।' স্বামীজী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'তা ভেতরেরই হোক আর বাইরেরই হোক, তুই যদি নিজের কানে আমার মতো ঐরূপ অশরীরী কথা শুনিস, তা হ'লে কি মিথ্যা বলতে পারিস? দৈববাণী সত্যসত্যই শোনা যায়; ঠিক যেমন এই আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে—তেমনি।'

শিষ্য আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বামীজীর বাক্য শিরোধার্য করিয়া লইল; কারণ স্বামীজীর কথায় এমন এক অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, তাহা না মানিয়া থাকা যাইত না—যুক্তিতর্ক যেন কোথায় ভাসিয়া যাইত!

শিষ্য এইবার প্রেতাত্মাদের কথা পাড়িল। বলিল, 'মহাশয়, এই যে ভূতপ্রেতাদি যোনির কথা শোনা যায়, শাস্ত্রেও যাহার ভূয়োভূয়ঃ সমর্থন দৃষ্ট হয়, সে-সকল কি সত্যসত্য আছে?

স্বামীজী। সত্য বইকি। তুই যা না দেখিস, তা কি আর সত্য নয়? তোর দৃষ্টির বাইরে কত ব্রহ্মাণ্ড দূরদূরান্তরে ঘুরছে। তুই দেখতে পাস না

ব'লে তাদের কি আর অস্তিত্ব নেই? তবে ঐসব ভূতুড়ে কাণ্ডে মন দিসনে, ভাববি ভূতপ্রেত আছে তো আছে। তোর কাজ হচ্ছে—এই শরীর-মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁকে প্রত্যক্ষ করা। তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলে ভূতপ্রেত তোর দাসের দাস হয়ে যাবে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মনে হয়—উহাদের দেখিতে পাইলে পুনর্জন্মাদি-বিশ্বাস খুব দৃঢ় হয় এবং পরলোকে আর অবিশ্বাস থাকে না।

স্বামীজী। তোরা তো মহাবীর; তোরা আবার ভূতপ্রেত দেখে পরলোকে কি দৃঢ় বিশ্বাস করবি? এত শাস্ত্র, science (বিজ্ঞান) পড়লি—এই বিরাট বিশ্বের কত গূঢ়তত্ত্ব জানলি—এতেও কি ভূতপ্রেত দেখে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে? ছিঃ ছিঃ!

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, আপনি স্বয়ং ভূতপ্রেত কখন দেখিয়াছেন কি?

স্বামীজী বলিলেন, তাঁহার সংসার-সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি প্রেত হইয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত। কখন কখন দূর দূরের সংবাদসকলও আনিয়া দিত। কিন্তু তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন তাহার কথা সকল সময়ে সত্য হইত না। পরে কোন এক তীর্থে যাইয়া 'সে মুক্ত হয়ে যাক'—এইরূপ প্রার্থনা করা অবধি তিনি আর তাহার দেখা পান নাই।

শ্রাদ্ধাদি দ্বারা প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয় কি না, এই প্রশ্ন করিলে স্বামীজী কহিলেন, 'উহা কিছু অসম্ভব নয়।' শিষ্য ঐ বিষয়ের যুক্তিপ্রমাণ চাহিলে স্বামীজী কহিলেন, 'তোকে একদিন ঐ প্রসঙ্গ ভালরূপে বুঝিয়ে দেব। শ্রাদ্ধাদি দ্বারা যে প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয়, এ বিষয়ে অকাট্য যুক্তি আছে। আজ আমার শরীর ভাল নয়, অন্য একদিন বুঝিয়ে দেব।' শিষ্য কিন্তু এ জীবনে স্বামীজীর কাছে আর ঐ প্রশ্ন করিবার অবকাশ পায় নাই।

১৬

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী
কাল—নভেম্বর, ১৮৯৮

বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে এখনও মঠ রহিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগ। স্বামীজী এই সময় সংস্কৃত শাস্ত্রাদির বহুধা আলোচনায় তৎপর। 'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ঃ'[১] ইত্যাদি শ্লোক-দুইটি তিনি এই সময়েই রচনা করেন। আজ স্বামীজী 'ওঁ হ্রীং ঋতং' ইত্যাদি স্তবটি রচনা করিয়া শিষ্যের হাতে দিয়া বলিলেন, 'দেখিস, এতে কিছু ছন্দপতনাদি দোষ আছে কিনা।' শিষ্য স্বীকার করিয়া উহার একখানি নকল করিয়া লইল।

স্বামীজী যে দিন ঐ স্তবটি রচনা করেন, সে দিন স্বামীজীর জিহ্বায় যেন সরস্বতী আরূঢ়া হইয়াছিলেন। শিষ্যের সহিত অনর্গল সুললিত সংস্কৃত ভাষায় প্রায় দু-ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়াছিলেন। এমন সুললিত বাক্যবিন্যাস বড় বড় পণ্ডিতের মুখেও সে কখন শোনে নাই।

শিষ্য স্তবটি নকল করিয়া লইবার পর স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, 'দেখ, ভাবে তন্ময় হয়ে লিখতে লিখতে সময়ে সময়ে আমার ব্যাকরণগত স্খলন হয়; তাই তোদের বলি দেখে-শুনে দিতে।'

শিষ্য। মহাশয়, ও-সব স্খলন নয়—উহা আর্ষ প্রয়োগ।

। তুই তো বললি, কিন্তু লোকে তা বুঝবে কেন? এই সেদিন 'হিন্দুধর্ম কি?' ব'লে একটা বাঙলায় লিখলুম—তা তোদের ভেতরই কেউ কেউ বলছে, কটমট বাঙলা হয়েছে। আমার মনে হয় সকল জিনিসের মতো ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে। এই দেখ না—আগেকার কালের সন্ন্যাসীদের চালচলন ভেঙে গিয়ে এখন কেমন এক নূতন ছাঁচ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সমাজ এর বিরুদ্ধে বিস্তর প্রতিবাদও

১ এই গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে 'বীরবাণী' অংশে দ্রষ্টব্য।

করছে। কিন্তু তাতে কিছু হচ্ছে কি ?—না আমরাই তাতে ভয় পাচ্ছি ? এখন এ-সব সন্ন্যাসীদের দূরদূরান্তরে প্রচারকার্যে যেতে হবে—ছাইমাখা অর্ধ-উলঙ্গ প্রাচীন সন্ন্যাসীদের বেশভূষায় গেলে প্রথম তো জাহাজেই নেবে না ; ঐরূপ বেশে কোনরূপে ওদেশে পৌঁছলেও তাকে কারাগারে থাকতে হবে। দেশ, সভ্যতা ও সময়ের উপযোগী ক'রে সকল বিষয়ই কিছু কিছু change (পরিবর্তন) ক'রে নিতে হয়। এর পর বাঙলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করছি। সাহিত্যসেবিগণ হয়তো তা দেখে গালমন্দ করবে। করুক, তবু বাঙলা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা ক'রব। এখনকার বাঙলা-লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশী verbs (ক্রিয়াপদ) use (ব্যবহার) করে ; তাতে ভাষায় জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বেশী জোর হয়—এখন থেকে ঐরূপে লিখতে চেষ্টা কর্ দিকি। 'উদ্বোধনে' ঐরূপ ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করবি[১]। ভাষার ভেতর verb (ক্রিয়াপদ)-গুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস ?—ঐরূপে ভাবের pause (বিরাম) দেওয়া ; সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মতো দুর্বলতার চিহ্নমাত্র। ঐরূপ করলে মনে হয়, যেন ভাষার দম নেই। সেজন্যই বাঙলা ভাষায় ভাল lecture (বক্তৃতা) দেওয়া যায় না। ভাষার উপর যার control (দখল) আছে, সে অত শীগগীর শীগগীর ভাব থামিয়ে ফেলে না। তোদের ডালভাত খেয়ে শরীর যেমন ভেতো হয়ে গেছে, ভাষাও ঠিক সেইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে ; আহার চালচলন ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক survive করতে (বাঁচতে) পারবে। নতুবা অদূরে মৃত্যুর ছায়াতে অচিরে এ দেশ ও জাতিটা মিশে যাবে।

শিষ্য। মহাশয়, অনেক কাল হইতে এ দেশের লোকের ধাতু এক রকম হইয়া গিয়াছে ; উহার পরিবর্তন করা কি শীঘ্র সম্ভব ?

১ তখন 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশ করিবার আয়োজন চলিতেছিল।

স্বামীজী। তুই যদি পুরানো চালটা খারাপ বুঝে থাকিস তো যেমন বললুম নূতন ভাবে চলতে শেখ না। তোর দেখাদেখি আরো দশজনে তাই করবে; তাদের দেখে আরো ৫০ জনে শিখবে—এইরূপে কালে সমস্ত জাতটার ভেতর ঐ নূতন ভাব জেগে উঠবে। আর বুঝেও যদি তুই সেরূপ কাজ না করিস, তবে জানবি তোরা কেবল কথায় পণ্ডিত—practically (কাজের বেলায়) মূর্খ।

শিষ্য। আপনার কথা শুনিলে মহা সাহসের সঞ্চার হয়, উৎসাহ বল ও তেজে হৃদয় ভরিয়া যায়।

স্বামীজী। হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে বল আনতে হবে। একটা 'মানুষ' যদি তৈরী হয়, তো লাখ বক্তৃতার ফল হবে। মন মুখ এক ক'রে idea (ভাব)-গুলি জীবনে ফলাতে হবে। এর নামই ঠাকুর বলতেন 'ভাবের ঘরে চুরি না থাকা।' সব দিকে practical (কাজের লোক) হ'তে হবে। থিওরিতে থিওরিতে দেশটা উচ্ছন্ন হয়ে গেল। যে ঠিক ঠিক ঠাকুরের সন্তান হবে, সে ধর্মভাবসকলের practicality (কাজে পরিণত করবার উপায়) দেখাবে, লোকের বা সমাজের কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে আপন মনে কাজ ক'রে যাবে। তুলসীদাসের দোঁহায় আছে, শুনিসনি?—

হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভোঁকে হাজার।
সাধুন্‌কো দুর্ভাব নেহি যব্ নিন্দে সংসার॥

—এই ভাবে চলতে হবে। লোককে জানতে হবে পোক। তাদের ভালমন্দ কথায় কান দিলে জীবনে কোন মহৎ কাজ করতে পারা যায় না। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—শরীরে-মনে বল না থাকলে আত্মাকে লাভ করা যায় না। পুষ্টিকর উত্তম আহারে আগে শরীর গড়তে হবে, তবে তো মনে বল হবে। মনটা শরীরেরই সূক্ষ্মাংশ। মনে-মুখে খুব জোর করবি। 'আমি হীন, আমি হীন' বলতে বলতে মানুষ হীন হয়ে যায়। শাস্ত্রকার তাই বলেছেন—

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিম্বদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥

—যার 'মুক্ত'-অভিমান সর্বদা জাগরূক, সেই মুক্ত হয়ে যায়; যে ভাবে 'আমি বদ্ধ', জানবি জন্মে জন্মে তার বন্ধনদশা। ঐহিক পারমার্থিক

উভয় পক্ষেই ঐ কথা সত্য জানবি। ইহ জীবনে যারা সর্বদা হতাশচিত্ত, তাদের দ্বারা কোন কাজ হ'তে পারে না; তারা জন্ম জন্ম হা হুতাশ করতে করতে আসে ও যায়। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—বীরই বসুন্ধরা ভোগ করে, এ-কথা ধ্রুব সত্য। বীর হ—সর্বদা বল্ 'অভীঃ, অভীঃ'। সকলকে শোনা 'মাভৈঃ মাভৈঃ'—ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক, ভয়ই অধর্ম, ভয়ই ব্যভিচার। জগতে যত কিছু negative thoughts (নেতিবাচক ভাব) আছে, সে-সকলই এই ভয়রূপ শয়তান থেকে বেরিয়েছে। এই ভয়ই সূর্যের সূর্যত্ব, ভয়ই বায়ুর বায়ুত্ব, ভয়ই যমের যমত্ব যথাস্থানে রেখেছে—নিজের নিজের গণ্ডির বাইরে কাউকে যেতে দিচ্ছে না। তাই শ্রুতি বলছেন,

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥[১]

যেদিন ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ভয়শূন্য হবেন, সব ব্রহ্মে মিশে যাবেন; সৃষ্টিরূপ অধ্যাসের লয় সাধিত হবে। তাই বলি—'অভীঃ, অভীঃ'।

—বলিতে বলিতে স্বামীজীর সেই নীলোৎপল-নয়নপ্রান্ত যেন অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। যেন 'অভীঃ' মূর্তিমান্ হইয়া গুরুরূপে শিষ্যের সম্মুখে সশরীরে অবস্থান করিতেছেন।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন: এই দেহধারণ ক'রে কত সুখে-দুঃখে—কত সম্পদ-বিপদের তরঙ্গে আলোড়িত হবি। কিন্তু জানবি, ও-সব মুহূর্তকাল-স্থায়ী। ঐ-সকলকে গ্রাহ্যের ভেতর আনবিনি, 'আমি অজর অমর চিন্ময় আত্মা'—এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ ক'রে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। 'আমার জন্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই, আমি নির্লেপ আত্মা'—এই ধারণায় একেবারে তন্ময় হয়ে যা। একবার তন্ময় হয়ে যেতে পারলে দুঃখ-কষ্টের সময় আপনা-আপনি ঐ ভাব মনে উঠে পড়বে, চেষ্টা ক'রে আর আনতে হবে না। এই যে সেদিন বৈদ্যনাথ দেওঘরে প্রিয় মুখুয্যের বাড়ি গিয়েছিলুম, সেখানে এমন হাঁপ ধ'রল যে প্রাণ যায়। ভেতর থেকে কিন্তু শ্বাসে শ্বাসে গভীর ধ্বনি উঠতে লাগলো—'সোঽহং সোঽহং'; বালিশে ভর

১ কঠ উপ, ২।৩।৩

ক'রে প্রাণবায়ু বেরোবার অপেক্ষা করছিলুম[1] আর দেখছিলুম—ভেতর থেকে কেবল শব্দ হচ্ছে 'সোঽহং সোঽহং'—কেবল শুনতে লাগলুম 'একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন!'

শিষ্য। (স্তম্ভিত হইয়া) মহাশয়, আপনার সঙ্গে কথা কহিলে, আপনার অনুভূতিসকল শুনিলে শাস্ত্রপাঠের আর প্রয়োজন হয় না।

স্বামীজী। না রে! শাস্ত্রও পড়তে হয়। জ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্রপাঠ একান্ত প্রয়োজন। আমি মঠে শীঘ্রই class (ক্লাস) খুলছি। বেদ, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত পড়া হবে, অষ্টাধ্যায়ী পড়াব।

শিষ্য। আপনি কি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি পড়িয়াছেন?

স্বামীজী। যখন জয়পুরে ছিলুম, তখন এক মহাবৈয়াকরণের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর কাছে ব্যাকরণ পড়তে ইচ্ছা হ'ল। ব্যাকরণে মহাপণ্ডিত হলেও তাঁর অধ্যাপনার তত ক্ষমতা ছিল না। আমাকে প্রথম সূত্রের ভাষ্য তিন দিন ধরে বোঝালেন, তবুও আমি তার কিছুমাত্র ধারণা করতে পারলুম না। চার দিনের দিন অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'স্বামীজী! তিন দিনেও আপনাকে প্রথম সূত্রের মর্ম বোঝাতে পারলুম না! আমাদ্বারা আপনার অধ্যাপনায় কোন ফল হবে না বোধ হয়।' ঐ কথা শুনে মনে তীব্র ভর্ৎসনা এল। খুব দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে প্রথম সূত্রের ভাষ্য নিজে নিজে পড়তে লাগলুম। তিন ঘণ্টার মধ্যে ঐ সূত্রভাষ্যের অর্থ যেন 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ হয়ে গেল, তারপর অধ্যাপকের কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য কথায় কথায় বুঝিয়ে বললুম। অধ্যাপক শুনে বললেন, 'আমি তিন দিন বুঝিয়ে যা করতে পারলুম না, আপনি তিন ঘণ্টায় তার এমন চমৎকার ব্যাখ্যা কেমন ক'রে উদ্ধার করলেন?' তারপর প্রতিদিন জোয়ারের জলের মতো অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়ে যেতে লাগলুম। মনের একাগ্রতা থাকলে সব সিদ্ধ হয়—সুমেরুও চূর্ণ করতে পারা যায়।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার সবই অদ্ভুত।

স্বামীজী। অদ্ভুত ব'লে বিশেষ একটা কিছুই নেই। অজ্ঞানতাই অন্ধকার। তাতেই সব ঢেকে রেখে অদ্ভুত দেখায়। জ্ঞানালোকে সব উদ্ভিন্ন হ'লে

---

১ ডিসেম্বরের শেষ দিকে বায়ুপরিবর্তনের জন্য বৈদ্যনাথে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়া স্বামীজী বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন।

কিছুরই আর অদ্ভুতত্ব থাকে না। এমন যে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া, তা-ও লুকিয়ে যায়! যাঁকে জানলে সব জানা যায়, তাঁকে জান্—তাঁর কথা ভাব্—সেই আত্মা প্রত্যক্ষ হ'লে শাস্ত্রার্থ 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ হবে। পুরাতন ঋষিগণের হয়েছিল, আর আমাদের হবে না? আমরাও মানুষ। একবার একজনের জীবনে যা হয়েছে, চেষ্টা করলে তা অবশ্যই আবার অন্যের জীবনেও সিদ্ধ হবে। History repeats itself—যা একবার ঘটেছে, তাই বার বার ঘটে। এই আত্মা সর্বভূতে সমান। কেবল প্রতি ভূতে তাঁর বিকাশের তারতম্য আছে মাত্র। এই আত্মা বিকাশ করবার চেষ্টা কর্। দেখবি বুদ্ধি সব বিষয়ে প্রবেশ করবে। অনাত্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি একদেশদর্শিনী। আত্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি সর্বগ্রাসিনী। আত্মার প্রকাশ হ'লে দেখবি দর্শন বিজ্ঞান সব আয়ত্ত হয়ে যাবে। সিংহগর্জনে আত্মার মহিমা ঘোষণা কর্, জীবকে অভয় দিয়ে বল্—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—Arise! awake! and stop not till the goal is reached. (ওঠ, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থামিও না।)

১৭

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী

কাল—১৮৯৮

আজ দু-দিন হইল শিষ্য বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাটীতে স্বামীজীর কাছে রহিয়াছে। কলিকাতা হইতে অনেক যুবক এ সময় স্বামীজীর কাছে যাতায়াত করায় মঠে যেন আজকাল নিত্য-উৎসব। কত ধর্মচর্চা, কত সাধন-ভজনের উদ্যম, কত দীনদুঃখমোচনের উপায় আলোচিত হইতেছে!

আজ স্বামীজী শিষ্যকে তাঁহার কক্ষে রাত্রে থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই সেবাধিকার পাইয়া শিষ্যের হৃদয়ে আজ আনন্দ ধরে না। প্রসাদ-গ্রহণান্তে সে স্বামীজীর পদসেবা করিতেছে, এমন সময় স্বামীজী বলিলেন:

এমন জায়গা ছেড়ে তুই কি না কলকাতায় যেতে চাস্—এখানে কেমন পবিত্র ভাব, কেমন গঙ্গার হাওয়া, কেমন সব সাধুর সমাগম! এমন স্থান কি আর কোথাও খুঁজে পাবি?

শিষ্য। মহাশয়, বহু জন্মান্তরের তপস্যায় আপনার সঙ্গলাভ হইয়াছে। এখন যাহাতে আর না মায়ামোহের মধ্যে পড়ি, কৃপা করিয়া তাহা করিয়া দিন। এখন প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য মন মাঝে মাঝে বড় ব্যাকুল হয়।

স্বামীজী। আমারও অমন কত হয়েছে। কাশীপুরের বাগানে একদিন ঠাকুরের কাছে খুব ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলুম। তারপর সন্ধ্যার সময় ধ্যান করতে করতে নিজের দেহ খুঁজে পেলুম না। দেহটা একেবারে নেই মনে হয়েছিল। চন্দ্র সূর্য, দেশ কাল আকাশ—সব যেন একাকার হয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল, দেহাদি-বুদ্ধির প্রায় অভাব হয়েছিল, প্রায় লীন হয়ে গিছলুম আর কি! একটু 'অহং' ছিল, তাই সে সমাধি থেকে ফিরেছিলুম। ঐরূপ সমাধিকালেই 'আমি' আর 'ব্রহ্মের' ভেদ চলে যায়, সব এক হয়ে যায়, যেন মহাসমুদ্র—জল জল, আর কিছুই নেই, ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়। 'অবাঙ্মনসো-গোচরম্' কথাটা ঐ সময়েই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়। নতুবা 'আমি ব্রহ্ম' এ-কথা সাধক যখন ভাবছে বা বলছে তখনও 'আমি' ও 'ব্রহ্ম' এই দুই পদার্থ পৃথক্ থাকে—দ্বৈতভান থাকে। তারপর ঐরূপ অবস্থালাভের জন্য বারংবার চেষ্টা করেও আনতে পারলুম না। ঠাকুরকে জানাতে বললেন, 'দিবারাত্র ঐ অবস্থাতে থাকলে মা-র কাজ হবে না; সেজন্য এখন আর ঐ অবস্থা আনতে পারবি না, কাজ করা শেষ হ'লে পর আবার ঐ অবস্থা আসবে।'

শিষ্য। নিঃশেষ সমাধি বা ঠিক ঠিক নির্বিকল্প সমাধি হইলে তবে কি কেহই আর পুনরায় অহংজ্ঞান আশ্রয় করিয়া দ্বৈতভাবের রাজত্বে,—সংসারে ফিরিতে পারে না?

স্বামীজী। ঠাকুর বলতেন, 'একমাত্র অবতারেরাই জীবহিতে ঐ সমাধি থেকে নেবে আসতে পারেন। সাধারণ জীবের আর ব্যুত্থান হয় না; একুশ দিন-মাত্র জীবিত থেকে তাদের দেহটা শুষ্ক পত্রের মতো সংসাররূপ বৃক্ষ হ'তে খসে পড়ে যায়।'

শিষ্য। মন বিলুপ্ত হইয়া যখন সমাধি হয়, মনের কোন তরঙ্গই যখন আর থাকে না, তখন আবার বিক্ষেপের—আবার অহংজ্ঞান লইয়া সংসারে ফিরিবার সম্ভাবনা কোথায়? মনই যখন নাই, তখন কে কি নিমিত্তই বা সমাধি-অবস্থা ছাড়িয়া দ্বৈতরাজ্যে নামিয়া আসিবে?

স্বামীজী। বেদান্তশাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, নিঃশেষ নিরোধ-সমাধি থেকে পুনরাবৃত্তি হয় না; যথা—'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'। কিন্তু অবতারেরা এক-আধটা সামান্ত বাসনা জীবহিতকল্পে রেখে দেন। তাই ধরে আবার superconscious state (জ্ঞানাতীত ভূমি) থেকে conscious state-এ—'আমি তুমি'-জ্ঞানমূলক দ্বৈতভূমিতে আসেন।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, যদি এক-আধটা বাসনাও থাকে, তবে তাহাকে নিঃশেষ নিরোধ-সমাধি বলি কিরূপে? কারণ শাস্ত্রে আছে, নিঃশেষ নির্বিকল্প সমাধিতে মনের সর্ব বৃত্তির, সকল বাসনার নিরোধ বা ধ্বংস হইয়া যায়।

স্বামীজী। মহাপ্রলয়ের পরে তবে সৃষ্টিই বা আবার কেমন ক'রে হবে? মহাপ্রলয়েও তো সব ব্রহ্মে মিশে যায়? তারপরেও কিন্তু আবার শাস্ত্রমুখে সৃষ্টিপ্রসঙ্গ শোনা যায়—সৃষ্টি ও লয় প্রবাহাকারে আবার চলতে থাকে। মহাপ্রলয়ের পরে সৃষ্টি ও লয়ের পুনরাবর্তনের মতো অবতার-পুরুষদিগের নিরোধ এবং ব্যুত্থানও তেমনি অপ্রাসঙ্গিক কেন হবে?

শিষ্য। আমি যদি বলি, লয়কালে পুনঃসৃষ্টির বীজ ব্রহ্মে লীনপ্রায় থাকে এবং উহা মহাপ্রলয় বা নিরোধ-সমাধি নহে, কিন্তু সৃষ্টির বীজ ও শক্তির—আপনি যেমন বলেন potential (অব্যক্ত) আকারধারণ মাত্র?

স্বামীজী। তা হ'লে আমি ব'লব, যে ব্রহ্মে কোন বিশেষণের আভাস নেই—যা নির্লেপ ও নির্গুণ—তাঁর দ্বারা এই সৃষ্টিই বা কিরূপে projected (বহির্গত) হওয়া সম্ভব হয়, তার জবাব দে।

শিষ্য। ইহা তো seeming projection (আপাতপ্রতীয়মান বহিঃপ্রকাশ)। সে কথার উত্তরে তো শাস্ত্র বলিয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির বিকাশটা মরুমরীচিকার মতো দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ সৃষ্টি প্রভৃতি কিছুই হয় নাই। ভাব-বস্তু ব্রহ্মের অভাব বা মিথ্যা মায়াশক্তিবশতঃ এইরূপ ভ্রম দেখাইতেছে।

স্বামীজী। সৃষ্টিটাই যদি মিথ্যা হয়—তবে জীবের নির্বিকল্প-সমাধি ও সমাধি থেকে ব্যুত্থানটাকেও তুই seeming (মিথ্যা) ধরে নিতে পারিস তো? জীব স্বতই·ব্রহ্মস্বরূপ ; তার আবার বন্ধের অনুভূতি কি? তুই যে 'আমি আত্মা' এই অনুভব করতে চাস, সেটাও তা হ'লে ভ্রম, কারণ শাস্ত্র বলছে, You are already that (তুমি সর্বদা ব্রহ্মই হয়ে রয়েছ)। অতএব 'অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি'—তুই যে সমাধিলাভ করতে চাচ্ছিস, এটাই তোর বন্ধন।

শিষ্য। এ তো বড় মুশকিলের কথা ; আমি যদি ব্রহ্মই, তবে ঐ বিষয়ের সর্বদা অনুভূতি হয় না কেন?

স্বামীজী। Conscious plane-এ ('তুমি-আমি'র দ্বৈতভূমিতে) ঐ কথা অনুভূতি করতে হ'লে একটা করণ বা যা দ্বারা অনুভব করবি, তা একটা চাই। মনই হচ্ছে আমাদের সেই করণ। কিন্তু মন পদার্থটা তো জড়। পেছনে আত্মার প্রভায় মনটা চেতনের মতো প্রতিভাত হচ্ছে মাত্র। পঞ্চদশীকার তাই বলেছেন, 'চিচ্ছায়াবশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা'—চিৎস্বরূপ আত্মার ছায়া বা প্রতিবিম্বের আবেশেই শক্তিকে চৈতন্যময়ী ব'লে মনে হয় এবং ঐ জন্যই মনকেও চেতনপদার্থ ব'লে বোধ হয়। অতএব 'মন' দিয়ে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে যে জানতে পারবি না, এ-কথা নিশ্চয়। মনের পারে যেতে হবে। মনের পারে তো আর কোন করণ নেই—এক আত্মাই আছেন ; সুতরাং যাকে জানবি, সেটাই আবার করণস্থানীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কর্তা কর্ম করণ—এক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এজন্য শ্রুতি বলছেন, 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।' ফল-কথা conscious plane-এর (দ্বৈতভূমির) উপরে একটা অবস্থা আছে, সেখানে কর্তা-কর্ম-করণাদির দ্বৈতভান নেই। মন নিরুদ্ধ হ'লে তা প্রত্যক্ষ হয়। অন্য ভাষা নেই ব'লে ঐ অবস্থাটিকে 'প্রত্যক্ষ' করা বলছি ; নতুবা সে অনুভব-প্রকাশের ভাষা নেই! শঙ্করাচার্য তাকে 'অপরোক্ষানুভূতি' ব'লে গেছেন। ঐ প্রত্যক্ষানুভূতি বা অপরোক্ষানুভূতি হলেও অবতারেরা নীচে নেবে এসে দ্বৈতভূমিতে তার আভাস দেন। সে জন্যই বলে, (আপ্তপুরুষের) অনুভব থেকেই বেদাদি শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণ জীবের অবস্থা কিন্তু

'নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে যাওয়ার' মতো ; বুঝলি ? মোট কথা হচ্ছে যে, 'তুই যে নিত্যকাল ব্রহ্ম' এই কথাটা জানতে হবে মাত্র ; তুই সর্বদা তাই হয়ে রয়েছিস, তবে মাঝখান থেকে একটা জড় মন (যাকে শাস্ত্রে মায়া বলে) এসে সেটা বুঝতে দিচ্ছে না ; সেই সূক্ষ্ম, জড়রূপ উপাদানে নির্মিত মনরূপ পদার্থটা প্রশমিত হ'লে—আত্মার প্রভায় আত্মা আপনিই উদ্ভাসিত হন। এই মায়া বা মন যে মিথ্যা, তার একটা প্রমাণ এই যে, মন নিজে জড় ও অন্ধকার-স্বরূপ। পেছনে আত্মার প্রভায় চেতনবৎ প্রতীত হয়। এটা যখন বুঝতে পারবি, তখন এক অখণ্ড চেতনে মনের লয় হয়ে যাবে ; তখনই অনুভূতি হবে—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'।

অতঃপর স্বামীজী বলিলেন, 'তোর ঘুম পাচ্ছে বুঝি ?—তবে শো।' শিষ্য স্বামীজীর পাশের বিছানায় শুইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। শেষ রাত্রে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গে আনন্দে শয্যা ত্যাগ করিল। প্রাতে গঙ্গা-স্নানান্তে শিষ্য আসিয়া দেখিল স্বামীজী মঠের নীচের তলায় বড় বেঞ্চখানির উপর পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। গত রাত্রের স্বপ্ন-কথা স্মরণ করিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম অর্চনা করিবার জন্য স্বামীজীর অনুমতি প্রার্থনা করিল। তাহার একান্ত আগ্রহে স্বামীজী সম্মত হইলে সে কতকগুলি ধুতুরা পুষ্প সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্বামি-শরীরে মহাশিবের অধিষ্ঠান চিন্তা করিয়া বিধিমত তাঁহার পূজা করিল।

পূজান্তে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'তোর পূজো তো হ'ল, কিন্তু বাবুরাম (প্রেমানন্দ) এসে তোকে এখনি খেয়ে ফেলবে ! তুই কেনা ঠাকুরের পূজোর বাসনে (পুষ্পপাত্রে) আমার পা রেখে পূজো করলি ?' কথাগুলি বলা শেষ হইতে না হইতে স্বামী প্রেমানন্দ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, 'ওরে, দেখ্, আজ কি কাণ্ড করেছে ! ! ঠাকুরের পূজোর থালা বাসন চন্দন এনে ও আজ আমায় পূজো করেছে।' স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তা বেশ করেছে ; তুমি আর ঠাকুর কি ভিন্ন ?' কথা শুনিয়া শিষ্য নির্ভয় হইল।

শিষ্য গোঁড়া হিন্দু ; অখাদ্য দূরে থাকুক কাহারও স্পৃষ্ট দ্রব্য পর্যন্ত খায় না। এজন্য স্বামীজী শিষ্যকে কখন কখন 'ভট্চায' বলিয়া ডাকিতেন।

প্রাতে জলযোগসময়ে বিলাতি বিস্কুটাদি খাইতে খাইতে স্বামীজী সদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, 'ভট্‌চাযকে ধরে নিয়ে আয় তো।' আদেশ শুনিয়া শিষ্য নিকটে উপস্থিত হইলে স্বামীজী ঐ-সকল দ্রব্যের কিঞ্চিৎ তাহাকে প্রসাদস্বরূপে খাইতে দিলেন। শিষ্য দ্বিধা না করিয়া তাহা গ্রহণ করিল দেখিয়া স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, 'আজ কি খেলি তা জানিস্? এগুলি ডিমের তৈরী!' উত্তরে সে বলিল, 'যাহাই থাকুক আমার জানিবার প্রয়োজন নাই। আপনার প্রসাদরূপ অমৃত খাইয়া অমর হইলাম।' শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'আজ থেকে তোর জাত, বর্ণ, আভিজাত্য, পাপপুণ্যাদি অভিমান জন্মের মতো দূর হোক—আশীর্বাদ করছি।'

অপরাহ্নে স্বামীজীর কাছে মাদ্রাজের একাউন্টেণ্ট জেনারেল বাবু মন্মথনাথ ভট্টাচার্য উপস্থিত হইলেন। আমেরিকা যাইবার পূর্বে মাদ্রাজে স্বামীজী কয়েক দিন ইঁহার বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন এবং তদবধি ইনি স্বামীজীকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। ভট্টাচার্য মহাশয় স্বামীজীকে পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে ঐ-সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া এবং অন্য নানারূপে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, 'একদিন এখানে থেকেই যান না।' মন্মথবাবু তাহাতে রাজী হইয়া 'আর একদিন এসে থাকা যাবে' বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

১৮

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী
কাল—১৮৯৮

শিষ্য আজ প্রাতে মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া দাঁড়াইবামাত্র স্বামীজী বলিলেন, 'কি হবে আর চাকরি ক'রে? না হয় একটা ব্যবসা কর্।' শিষ্য তখন এক স্থানে একটি প্রাইভেট মাস্টারি করে মাত্র। সংসারের ভার তখনও তাহার ঘাড়ে পড়ে নাই। আনন্দে দিন কাটায়। শিক্ষকতা-কার্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন:

অনেক দিন মাস্টারি করলে বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায়; জ্ঞানের বিকাশ হয় না। দিনরাত ছেলের দলে থেকে থেকে ক্রমে জড়বৎ হয়ে যায়। আর মাস্টারি করিস না।

শিষ্য। তবে কি করিব?

স্বামীজী। কেন? যদি তোর সংসারই করতে হয়, যদি অর্থ-উপায়ের স্পৃহাই থাকে, তবে যা—আমেরিকায় চলে যা। আমি ব্যবসায়ের বুদ্ধি দেব। দেখবি পাঁচ বছরে কত টাকা এনে ফেলতে পারবি।

শিষ্য। কি ব্যবসা করিব? টাকাই বা কোথা হইতে পাইব?

স্বামীজী। পাগলের মতো কি বকছিস? ভেতরে অদম্য শক্তি রয়েছে। শুধু 'আমি কিছু নই' ভেবে ভেবে বীর্যহীন হয়ে পড়েছিস। তুই কেন?—সব জাতটা তাই হয়ে পড়েছে! একবার বেড়িয়ে আয়—দেখবি ভারতেতর দেশে লোকের জীবন-প্রবাহ কেমন তরতর ক'রে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। আর তোরা কি করছিস্? এত বিদ্যা শিখে পরের দোরে ভিখারীর মতো 'চাকরি দাও, চাকরি দাও' ব'লে চেঁচাচ্ছিস। জুতো খেয়ে খেয়ে—দাসত্ব ক'রে ক'রে তোরা কি আর মানুষ আছিস! তোদের মূল্য এক কানাকড়িও নয়। এমন সজলা সফলা দেশ, যেখানে প্রকৃতি অন্য সকল দেশের চেয়ে কোটিগুণে ধন-ধান্য প্রসব করছেন, সেখানে দেহধারণ ক'রে তোদের পেটে অন্ন নেই, পিঠে কাপড় নেই! যে দেশের ধন-ধান্য পৃথিবীর অন্য সব দেশে civilisation (সভ্যতা) বিস্তার করেছে, সেই অন্নপূর্ণার দেশে তোদের

এমন দুর্দশা? ঘৃণিত কুকুর অপেক্ষাও যে তোদের দুর্দশা হয়েছে! তোরা আবার তোদের বেদবেদান্তের বড়াই করিস! যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না, পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবনধারণ করে, সে জাতের আবার বড়াই! ধর্মকর্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হ। ভারতে কত জিনিস জন্মায়। বিদেশী লোক সেই raw material (কাঁচা মাল) দিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দভের মতো তাদের মাল টেনে মরছিস। ভারতে যে-সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের লোক তাই নিয়ে তার ওপর বুদ্ধি খরচ ক'রে, নানা জিনিস তৈয়ের ক'রে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে 'হা অন্ন, হা অন্ন' ক'রে বেড়াচ্ছিস!

শিষ্য। কি উপায়ে অন্ন-সংস্থান হইতে পারে, মহাশয়?

স্বামীজী। উপায় তোদেরই হাতে রয়েছে। চোখে কাপড় বেঁধে বলছিস, 'আমি অন্ধ, কিছুই দেখতে পাই না!' চোখের বাঁধন ছিঁড়ে ফেল্, দেখবি মধ্যাহ্নসূর্যের কিরণে জগৎ আলো হয়ে রয়েছে। টাকা না জোটে তো জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে চলে যা। দিশী কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাঁটা মাথায় ক'রে আমেরিকা-ইওরোপে পথে পথে ফেরি করগে। দেখবি—ভারত-জাত জিনিসের এখনও কত কদর! আমেরিকায় দেখলুম, হুগলী জেলার কতকগুলি মুসলমান ঐরূপে ফেরি ক'রে ক'রে ধনবান্ হয়ে পড়েছে। তাদের চেয়েও কি তোদের বিদ্যাবুদ্ধি কম? এই দেখ না—এদেশে যে বেনারসী শাড়ী হয়, এমন উৎকৃষ্ট কাপড় পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না। এই কাপড় নিয়ে আমেরিকায় চলে যা। সে দেশে ঐ কাপড়ে গাউন তৈরী ক'রে বিক্রী করতে লেগে যা, দেখবি কত টাকা আসে।

শিষ্য। মহাশয়, তারা বেনারসী শাড়ীর গাউন পরিবে কেন? শুনেছি, চিত্রবিচিত্র কাপড় ওদেশের মেয়েরা পছন্দ করে না।

স্বামীজী। নেবে কি না, তা আমি বুঝব এখন। তুই উদ্যম ক'রে চ'লে যা দেখি! আমার বহু বন্ধুবান্ধব সে দেশে আছে। আমি তোকে তাদের কাছে introduce (পরিচিত) ক'রে দিচ্ছি। তাদের ভেতর ঐগুলি

অনুরোধ ক'রে প্রথমটা চালিয়ে দেবো। তারপর দেখবি—কত লোক তাদের follow (অনুসরণ) করবে। তুই তখন মাল দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবিনি।

শিষ্য। ব্যবসা করিবার মূলধন কোথায় পাইব?

স্বামীজী। আমি যে ক'রে হোক তোকে start (আরম্ভ) করিয়ে দেবো। তারপর কিন্তু তোর নিজের উদ্যমের উপর সব নির্ভর করবে। 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্'—এই চেষ্টায় যদি মরে যাস তা-ও ভাল, তোকে দেখে আরও দশ জন অগ্রসর হবে। আর যদি success (সফলতা) হয়, তো মহাভোগে জীবন কাটবে।

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু সাহসে কুলায় না।

স্বামীজী। তাইতো বলছি বাবা, তোদের শ্রদ্ধা নেই—আত্মপ্রত্যয়ও নেই। কি হবে তোদের? না হবে সংসার, না হবে ধর্ম। হয় ঐপ্রকার উদ্যোগ উদ্যম ক'রে সংসারে successful (গণ্য মান্য সফল) হ—নয় তো সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আমাদের পথে আয়। দেশ-বিদেশের লোককে ধর্ম উপদেশ দিয়ে তাঁদের উপকার কর্। তবে তো আমাদের মতো ভিক্ষা মিলবে। আদান-প্রদান না থাকলে কেউ কারুর দিকে চায় না। দেখছিস তো আমরা দুটো ধর্মকথা শোনাই, তাই গেরস্তেরা আমাদের দুমুঠো অন্ন দিচ্ছে। তোরা কিছুই করবিনি, তোদের লোকে অন্ন দেবে কেন? চাকরিতে গোলামিতে এত দুঃখ দেখেও তোদের চেতনা হচ্ছে না, কাজেই দুঃখও দূর হচ্ছে না! এ নিশ্চয়ই দৈবী মায়ার খেলা! ওদেশে দেখলুম, যারা চাকরি করে, parliament-এ (জাতীয় সমিতিতে) তাদের স্থান পেছনে নির্দিষ্ট। যারা নিজের উদ্যমে বিদ্যায় বুদ্ধিতে স্বনামধন্য হয়েছে, তাদের বসবার জন্যই front seat (সামনের আসনগুলি)। ও-সব দেশে জাত-ফাতের উৎপাত নেই। উদ্যম ও পরিশ্রমে ভাগ্যলক্ষ্মী যাঁদের প্রতি প্রসন্না, তাঁরাই দেশের নেতা ও নিয়ন্তা বলে গণ্য হন। আর তোদের দেশে জাতের বড়াই ক'রে ক'রে তোদের অন্ন পর্যন্ত জুটছে না। একটা ছুঁচ গড়বার ক্ষমতা নেই, তোরা আবার ইংরেজদের criticise (দোষগুণ-বিচার) করতে যাস—আহম্মক! ওদের পায়ে ধরে জীবন-

সংগ্রামোপযোগী বিদ্যা, শিল্পবিজ্ঞান, কর্মতৎপরতা শিখগে। যখন উপযুক্ত হবি, তখন তোদের আবার আদর হবে। ওরাও তখন তোদের কথা রাখবে। কোথাও কিছুই নেই, কেবল Congress (কংগ্রেস—জাতীয় মহাসমিতি) ক'রে চেঁচামিচি করলে কি হবে?

শিষ্য। মহাশয়, দেশের সমস্ত শিক্ষিত লোকই কিন্তু উহাতে যোগদান করিতেছে।

স্বামীজী। কয়েকটা পাস দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই তোদের কাছে শিক্ষিত হ'ল! যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা। আজকালকার এই সব স্কুল-কলেজে পড়ে তোরা কেমন এক প্রকারের একটা dyspeptic (অজীর্ণরোগাক্রান্ত) জাত তৈরী হচ্ছিস। কেবল machine (কল) এর মত খাটছিস, আর 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' এই বাক্যের সাক্ষিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিস। এই যে চাষাভুষো, মুচি-মুদ্দাফরাশ—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ ক'রে যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে! Capital (মূলধন) তাদের হাতে গিয়ে পড়ছে—তোদের মতো তাদের অভাবের জন্য তাড়না নেই। বর্তমান শিক্ষায় তোদের বাহ্যিক হাল-চাল বদলে দিচ্ছে, অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে তোদের অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না। তোরা এই সব সহিষ্ণু নীচ জাতদের ওপর এতদিন অত্যাচার করেছিস, এখন এরা তার প্রতিশোধ নেবে। আর তোরা 'হা চাকরি, জো চাকরি' ক'রে ক'রে লোপ পেয়ে যাবি।

শিষ্য। মহাশয়, অপর দেশের তুলনায় আমাদিগের উদ্ভাবনী শক্তি অল্প হইলেও ভারতের ইতর জাতিসকল তো আমাদের বুদ্ধিতেই চালিত হইতেছে। অতএব ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি ভদ্র জাতিদিগকে জীবনসংগ্রামে পরাজিত করিবার শক্তি ও শিক্ষা ইতর জাতিরা কোথায় পাইবে?

স্বামীজী। তোদের মতো তারা কতকগুলো বই-ই না-হয় না পড়েছে। তোদের মতো শার্ট কোট পরে সভ্য না-হয় নাই হ'তে শিখেছে। তাতে আর কি এল গেল! কিন্তু এরাই হচ্ছে জাতের মেরুদণ্ড—সব দেশে। এই ইতর শ্রেণীর লোক কাজ বন্ধ করলে তোরা অন্নবস্ত্র কোথায় পাবি? একদিন মেথররা কলকাতায় কাজ বন্ধ করলে হা-হুতাশ লেগে যায়, তিন দিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে শহর উজাড় হয়ে যায়! শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করলে তোদের অন্নবস্ত্র জোটে না। এদের তোরা ছোট লোক ভাবছিস, আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই করছিস?

জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। এরা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মতো একই ভাবে এতদিন কাজ ক'রে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐ-রকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে ঐ-কথা বুঝতে পাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইওরোপ-আমেরিকায় ইতরজাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে ছোটলোকদের ভেতর আজকাল এত যে ধর্মঘট হচ্ছে, ওতেই ঐ-কথা বোঝা যাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্র জাতেরা ছোট জাতের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতর-জাতের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্র জাতদের কল্যাণ।

তাই তো বলি, তোরা এই mass (জনসাধারণ) এর ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বলগে, 'তোমরা আমাদের ভাই, শরীরের একাঙ্গ; আমরা তোমাদের ভালবাসি, ঘৃণা করি না।' তোদের এই sympathy (সহানুভূতি) পেলে এরা শত-গুণ উৎসাহে কার্যতৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞানসহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। আদানপ্রদানে উভয়েই উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ইহাদের ভিতর শিক্ষার বিস্তার হইলে ইহারাও তো আবার কালে আমাদের মতো উর্বরমস্তিষ্ক অথচ উদ্যমহীন ও অলস হইয়া উহাদিগের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের পরিশ্রমের সারাংশ গ্রহণ করিতে থাকিবে ?

স্বামীজী। তা কেন হবে ? জ্ঞানোন্মেষ হলেও কুমোর কুমোরই থাকবে, জেলে জেলেই থাকবে, চাষা চাষই করবে। জাত-ব্যবসা ছাড়বে কেন ? 'সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ'—এই ভাবে শিক্ষা পেলে এরা নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়বে কেন ? জ্ঞানবলে নিজের সহজাত কর্ম যাতে আরও ভাল ক'রে করতে পারে, সেই চেষ্টা করবে। দু-দশ জন প্রতিভাশালী লোক কালে তাদের ভেতর থেকে উঠবেই উঠবে। তাদের তোরা (ভদ্র জাতিরা) তোদের শ্রেণীর ভেতর ক'রে নিবি। তেজস্বী বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণেরা যে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল, তাতে ক্ষত্রিয় জাতটা ব্রাহ্মণদের কাছে তখন কতদূর কৃতজ্ঞ হয়েছিল—বল্ দেখি ? ঐরূপ sympathy (সহানুভূতি) ও সাহায্য পেলে মানুষ তো দূরের কথা পশুপক্ষীও আপনার হয়ে যায়।

শিষ্য। মহাশয়, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইলেও ভদ্রেতর শ্রেণীর ভিতর এখনও যেন বহু ব্যবধান রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের ইতর জাতিদিগের প্রতি ভদ্রলোকদিগের সহানুভূতি আনয়ন করা বড় কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী। তা না হ'লে কিন্তু তোদের (ভদ্র জাতিদের) কল্যাণ নেই। তোরা চিরকাল যা ক'রে আসছিস—ঘরাঘরি লাঠালাঠি ক'রে সব ধ্বংস হয়ে যাবি! এই mass (জনসাধারণ) যখন জেগে উঠবে, আর তাদের ওপর তোদের (ভদ্রলোকদের) অত্যাচার বুঝতে পারবে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তোদের ভেতর civilisation (সভ্যতা) এনে দিয়েছে ; তারাই আবার তখন সব ভেঙে দেবে। ভেবে দেখ্—গল-জাতের হাতে অমন যে প্রাচীন রোমক সভ্যতা কোথায় ধ্বংস হয়ে গেল! এই জন্য বলি, এইসব নীচ জাতদের ভেতর বিদ্যাদান জ্ঞানদান ক'রে এদের ঘুম ভাঙাতে যত্নশীল হ। এরা যখন জাগবে—আর একদিন জাগবে নিশ্চয়ই—তখন তারাও

তোদের কৃত উপকার বিস্মৃত হবে না, তোদের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

এইরূপ কথোপকথনের পর স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন : ও-সব কথা এখন থাক; তুই এখন কি স্থির করলি, তা বল্। যা হয় একটা কর্। হয়, কোন ব্যবসায়ের চেষ্টা দেখ্, নয় তো আমাদের মতো 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' যথার্থ সন্ন্যাসের পথে চলে আয়। এই শেষ পন্থাই অবশ্য শ্রেষ্ঠ পন্থা, কি হবে ছাই সংসারী হয়ে? বুঝে তো দেখছিস সবই ক্ষণিক—'নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্'।[1] অতএব যদি এই আত্মপ্রত্যয় লাভ করতে উৎসাহ হয়ে থাকে তো আর কালবিলম্ব করিস্ নে। এখুনি অগ্রসর হ। 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'।[2] পরার্থে নিজ জীবন বলি দিয়ে লোকের দোরে দোরে গিয়ে অভয়বাণী শোনা—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।

১৯

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী ও নূতন মঠভূমি

কাল—৯ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮

আজ নূতন মঠের জমিতে স্বামীজী যজ্ঞ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করিবেন। শিষ্য পূর্বরাত্র হইতেই মঠে আছে; ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা দর্শন করিবে—এই বাসনা।

প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া স্বামীজী ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পূজকের আসনে বসিয়া পুষ্পপাত্রে যতগুলি ফুল-বিল্বপত্র ছিল, সব দুই হাতে এককালে তুলিয়া লইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদুকায় অঞ্জলি দিয়া ধ্যানস্থ হইলেন—অপূর্ব দর্শন। তাঁহার ধর্মপ্রভা-বিভাসিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল কান্তিতে

১ মোহমুদ্গর, শঙ্করাচার্য

২ বৃঃ উপনিষদ

ঠাকুরঘর যেন কি এক অদ্ভুত আলোকে পূর্ণ হইল! প্রেমানন্দ ও অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ ঠাকুরঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ধ্যানপূজাবসানে এইবার মঠভূমিতে যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। তাম্রনির্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাস্থি স্বামীজী স্বয়ং দক্ষিণ স্কন্ধে লইয়া অগ্রগামী হইলেন। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণসহ শিষ্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শঙ্খ-ঘণ্টারোলে তটভূমি মুখরিত হওয়ায় ভাগীরথী যেন ঢল ঢল ভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন:

ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে ক'রে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছতলাই কি, আর কুটীরই কি।' সেজন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে ক'রে নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহু কাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।

শিষ্য। ঠাকুর আপনাকে কখন এই কথা বলিয়াছেন?

স্বামীজী। (মঠের সাধুগণকে দেখাইয়া) ওদের মুখে শুনিসনি?—কাশীপুরের বাগানে।

শিষ্য। ওঃ! সেই সময়েই বুঝি ঠাকুরের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী ভক্তদের ভিতর সেবাধিকার লইয়া দলাদলি হইয়াছিল?

স্বামীজী। 'দলাদলি' ঠিক নয়, একটু মন-কষাকষি হয়েছিল। জানবি, যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, যাঁরা ঠিক ঠিক তাঁর কৃপা লাভ করেছেন—তা গৃহস্থই হোন আর সন্ন্যাসীই হোন—তাঁদের ভেতর দল-ফল নেই, থাকতেই পারে না। তবে ওরূপ একটু-আধটু মন-কষাকষির কারণ কি তা জানিস? প্রত্যেক ভক্ত ঠাকুরকে আপন আপন বুদ্ধির রঙে রঙিয়ে এক এক জনে এক এক রকম দেখে ও বোঝে। তিনি যেন মহাসূর্য, আর আমরা যেন প্রত্যেকে এক এক রকম রঙিন কাচ চোখে দিয়ে সেই এক সূর্যকে নানা রঙ-বিশিষ্ট ব'লে দেখছি। অবশ্য এই কথাও ঠিক যে, কালে এই থেকেই দলের সৃষ্টি হয়। তবে যারা সৌভাগ্যক্রমে অবতারপুরুষের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসে, তাদের জীবৎ-কালে ঐরূপ 'দল-ফল' সচরাচর হয় না। সেই আত্মারাম পুরুষের আলোতে তাদের চোখ ঝলসে যায়; অহংকার, অভিমান, হীনবুদ্ধি

সব ভেসে যায়। কাজেই 'দল-কল' করবার তাদের অবসর হয় না; কেবল যে যার নিজের ভাবে হৃদয়ের পূজা দেয়।

শিষ্য। মহাশয়, তবে কি ঠাকুরের ভক্তেরা সকলেই তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জানিলেও সেই এক ভগবানের স্বরূপ তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখেন এবং সেজন্যই তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা কালে এক একটি ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে পড়িয়া ছোট ছোট দল বা সম্প্রদায়সকল গঠন করিয়া বসে?

স্বামীজী। হাঁ, এজন্য কালে সম্প্রদায় হবেই। এই দেখ্ না, চৈতন্যদেবের এখন দু-তিন শ সম্প্রদায় হয়েছে; যীশুর হাজার হাজার মত বেরিয়েছে; কিন্তু ঐ-সকল সম্প্রদায় চৈতন্যদেব ও যীশুকেই মানছে।

শিষ্য। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগের মধ্যেও কালে বোধ হয় বহু সম্প্রদায় হইবে?

স্বামীজী। হবে বইকি। তবে আমাদের এই যে মঠ হচ্ছে, তাতে সকল মতের, সকল ভাবের সামঞ্জস্য থাকবে। ঠাকুরের যেমন উদার মত ছিল, এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্রস্থান হবে; এখান থেকে যে মহাসমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছটা বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে।

এইরূপ কথাবার্তা চলিতে চলিতে সকলে মঠভূমিতে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী স্কন্ধস্থিত কৌটাটি জমিতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি নামাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অপর সকলেও প্রণাম করিলেন।

অনন্তর স্বামীজী পুনরায় পূজায় বসিলেন। পূজান্তে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া হোম করিলেন এবং সন্ন্যাসী ভ্রাতৃগণের সহায়ে স্বহস্তে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। বোধ হয়, ঐ দিন ঐ স্থানে তিনি কয়েকটি গৃহস্থকে দীক্ষাও দিয়াছিলেন। পূজা সমাপন করিয়া স্বামীজী সাদরে সমাগত সকলকে আহ্বান ও সম্বোধন করিয়া বলিলেন:

আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান ক'রে একে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়-কেন্দ্র ক'রে রাখেন।

সকলেই করজোড়ে ঐরূপে প্রার্থনা করিলেন। পূজান্তে স্বামীজী শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ঠাকুরের এই কৌটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আমাদের (সন্ন্যাসী-দের) কারও আর অধিকার নেই; কারণ আজ আমরা ঠাকুরকে এখানে

বসিয়েছি। অতএব তুই-ই মাথায় ক'রে ঠাকুরের এই কৌটা তুলে মঠে নিয়ে চল্।' শিষ্য কৌটা স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'ভয় নেই, মাথায় কর্, আমার আজ্ঞা।'

শিষ্য তখন আনন্দিত চিত্তে স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া কৌটা মাথায় তুলিয়া লইল এবং শ্রীগুরুর আজ্ঞায় ঐ কৌটার স্পর্শাধিকার লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে করিতে চলিল। অগ্রে কৌটা-মস্তকে শিষ্য, পশ্চাতে স্বামীজী, তারপর অন্যান্য সকলে আসিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, 'ঠাকুর আজ তোর মস্তকে উঠে তোকে আশীর্বাদ করছেন। সাবধান, আজ থেকে আর কোন অনিত্য বিষয়ে মন দিসনে।' একটি ছোট সাঁকো পার হইবার পূর্বে স্বামীজী শিষ্যকে পুনরায় বলিলেন, 'দেখিস, এবার খুব সাবধান, খুব সতর্কে যাবি।'

এইরূপে নির্বিঘ্নে মঠে (নীলাম্বর বাবুর বাগানে) উপস্থিত হইয়া সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী শিষ্যকে এখন কথাপ্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন:

ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নামলো। আমার মনে এখন কি হচ্ছে, জানিস? এই মঠ হবে, বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান। তোদের মতো ধার্মিক গৃহস্থেরা এর চারদিককার জমিতে ঘরবাড়ি ক'রে থাকবে, আর মাঝখানে ত্যাগী সন্ন্যাসীরা থাকবে। আর মঠের ঐ দক্ষিণের জমিটায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভক্তদের থাকবার ঘর-দোর হবে। এরূপ হ'লে কেমন হয় বল্ দেখি?

শিষ্য। মহাশয়, আপনার এ অদ্ভুত কল্পনা!

স্বামীজী। কল্পনা কি রে? সময়ে সব হবে। আমি তো পত্তন-মাত্র ক'রে দিচ্ছি—এর পর আরও কত কি হবে! আমি কতক ক'রে যাব; আর তোদের ভেতর নানা idea (ভাব) দিয়ে যাব। তোরা পরে সে-সব work out (কাজে পরিণত) করবি। বড় বড় principle (নীতি) কেবল শুনলে কি হবে? সেগুলিকে practical field-এ (কর্মক্ষেত্রে) দাঁড় করাতে, প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে হবে। শাস্ত্রের লম্বা লম্বা কথাগুলি কেবল পড়লে কি হবে? শাস্ত্রের কথাগুলি আগে বুঝতে হবে। তারপর জীবনে সেগুলিকে ফলাতে হবে। বুঝলি? একেই বলে practical religion (কর্মজীবনে পরিণত ধর্ম)।

এইরূপে নানা প্রসঙ্গ চলিতে চলিতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের কথা উঠিল। শিষ্য শ্রীশঙ্করের বড়ই পক্ষপাতী ছিল; এমন কি, ঐ বিষয়ে তাহাকে গোঁড়া বলিলেও বলা যাইত। স্বামীজী উহা জানিতেন এবং কেহ কোন মতের গোঁড়া হয়, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কোন বিষয়ের গোঁড়ামি দেখিলেই তিনি উহার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিতেন এবং অজস্র অমোঘ যুক্তির আঘাতে ঐ গোঁড়ামির সঙ্কীর্ণ বাঁধ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেন।

স্বামীজী। শঙ্করের ক্ষুরধার বুদ্ধি—তিনি বিচারক বটে, পণ্ডিত বটে, কিন্তু তাঁর উদারতাটা বড় গভীর ছিল না; হৃদয়টাও ঐরূপ ছিল ব'লে বোধ হয়। আবার ব্রাহ্মণ-অভিমানটুকু খুব ছিল। একটি দক্ষিণী ভট্টাচার্য গোছের ছিলেন আর কি! ব্রাহ্মণেতর জাতের ব্রহ্মজ্ঞান হবে না, এ কথা বেদান্তভাষ্যে কেমন সমর্থন ক'রে গেছেন! বলিহারি বিচার! বিদুরের[১] কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন—তার পূর্বজন্মের ব্রাহ্মণ-শরীরের ফলে সে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিল। বলি, আজকাল যদি ঐরূপ কোন শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তবে কি তোর শঙ্করের মতে মত দিয়ে বলতে হবে যে, সে পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিল, তাই তার হয়েছে? ব্রাহ্মণত্বের এত টানাটানিতে কাজ কি রে বাবা? বেদ তো ত্রৈবর্ণিক-মাত্রকেই বেদপাঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করেছে। অতএব শঙ্করের ঐ বিষয় নিয়ে বেদের উপর এই অদ্ভুত বিদ্যাপ্রকাশের কোন প্রয়োজন ছিল না। আবার এমনি হৃদয় যে কত বৌদ্ধ শ্রমণকে আগুনে পুড়িয়ে মারলেন—তাদের তর্কে হারিয়ে! আহাম্মক বৌদ্ধগুলোও কি না তর্কে হার মেনে আগুনে পুড়ে মরতে গেল! শঙ্করের ঐরূপ কাজকে fanaticism (সঙ্কীর্ণ ধর্মোন্মাদ) ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? কিন্তু দেখ্ বুদ্ধদেবের হৃদয়! 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' কা কথা, সামান্য একটা ছাগশিশুর জীবনরক্ষার জন্য নিজ-জীবন দান করতে সর্বদা প্রস্তুত! দেখ্ দেখি কি উদারতা—কি দয়া!

শিষ্য। বুদ্ধের ঐ ভাবটাকেও কি মহাশয়, অন্য এক প্রকারের পাগলামি বলা যাইতে পারে না? একটা পশুর জন্য কি না নিজের গলা দিতে গেলেন!

১ পাণ্ডবদের পরমধার্মিক ঋষিতুল্য পিতৃব্য।

স্বামীজী। কিন্তু তাঁর ঐ fanaticism (ধর্মোন্মাদ)-এ জগতের জীবের কত কল্যাণ হ'ল—তা দেখ্! কত আশ্রম—স্কুল-কলেজ, কত public hospital (সাধারণের জন্য হাসপাতাল), কত পশুশালার স্থাপন, কত স্থাপত্যবিদ্যার বিকাশ হ'ল, তা ভেবে দেখ্! বুদ্ধদেব জন্মাবার আগে এ দেশে এ-সব ছিল কি?—তালপাতার পুঁথিতে বাঁধা কতকগুলো ধর্মতত্ত্ব—তা-ও অল্প কয়েকজনের জানা ছিল মাত্র। ভগবান বুদ্ধদেব সেগুলি practical field-এ (কার্যক্ষেত্রে) আনলেন, লোকের দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো কেমন ক'রে কাজে লাগাতে হবে, তা দেখিয়ে দিলেন। ধরতে গেলে তিনিই যথার্থ বেদান্তের স্ফুরন্‌মূর্তি।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, বর্ণাশ্রমধর্ম ভাঙিয়া দিয়া ভারতে হিন্দুধর্মের বিপ্লব তিনিই ঘটাইয়া গিয়াছেন এবং সেই জন্যই তৎ-প্রচারিত ধর্ম ভারত হইতে কালে নির্বাসিত হইয়াছে, এ কথা সত্য বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী। বৌদ্ধধর্মের ঐরূপ দুর্দশা তাঁর teaching-এর (শিক্ষার) দোষে হয় নাই, তাঁর follower (চেলা)-দের দোষেই হয়েছিল; বেশী philosophic হয়ে (দর্শনচর্চা ক'রে) তাদের heart (হৃদয়)-এর উদারতা কমে গেল। তারপর ক্রমে বামাচারের ব্যভিচার ঢুকে বৌদ্ধধর্ম মরে গেল। অমন বীভৎস বামাচার এখনকার কোন তন্ত্রে নেই। বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল 'জগন্নাথক্ষেত্র'—সেখানে মন্দিরের গায়ে খোদা বীভৎস মূর্তিগুলি একবার গিয়ে দেখে এলেই ঐ কথা জানতে পারবি। রামানুজ ও চৈতন্য-মহাপ্রভুর সময় থেকে পুরুষোত্তমক্ষেত্রটা বৈষ্ণবদের দখলে এসেছে। এখন উহা ঐ-সকল মহাপুরুষের শক্তিসহায়ে অন্য এক মূর্তি ধারণ করেছে।

শিষ্য। মহাশয়, শাস্ত্রমুখে তীর্থাদি-স্থানের বিশেষ মহিমা অবগত হওয়া যায়, উহার কতটা সত্য?

স্বামীজী। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন নিত্য আত্মা ঈশ্বরের বিরাট শরীর, তখন স্থান-মাহাত্ম্য থাকাটার বিচিত্রতা কি আছে? স্থানবিশেষে তাঁর বিশেষ প্রকাশ কোথাও স্বতঃ এবং কোথাও শুদ্ধসত্ত্ব মানবমনের ব্যাকুল আগ্রহে হয়ে থাকে। সাধারণ মানব ঐ-সকল স্থানে জিজ্ঞাসু হয়ে গেলে সহজে ফল পায়। এই জন্য তীর্থাদি আশ্রয় ক'রে কালে আত্মার বিকাশ হ'তে পারে।

তবে স্থির জানবি, এই মানবদেহের চেয়ে আর কোনও বড় তীর্থ নেই। এখানে আত্মার যেমন বিকাশ, এমন আর কোথাও নয়। ঐ যে জগন্নাথের রথ, তাও এই দেহরথের concrete form (স্থূল রূপ) মাত্র। এই দেহরথে আত্মাকে দর্শন করতে হবে। পড়েছিস না—'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি'[১] ইত্যাদি, 'মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে'—এই বামন-রূপী আত্মদর্শনই ঠিক ঠিক জগন্নাথদর্শন। ঐ যে বলে 'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'—এর মানে হচ্ছে, তোর ভেতরে যে আত্মা আছেন, যাঁকে উপেক্ষা ক'রে তুই কিম্ভূতকিমাকার এই দেহরূপ জড়পিণ্ডটাকে সর্বদা 'আমি' ব'লে ধরে নিচ্ছিস, তাঁকে দর্শন করতে পারলে আর পুনর্জন্ম হয় না। যদি কাঠের দোলায় ঠাকুর দেখে জীবের মুক্তি হ'ত, তা হ'লে বছরে বছরে কোটি জীবের মুক্তি হয়ে যেত—আজকাল আবার রেলে যাওয়ার যে স্থযোগ! তবে ৺জগন্নাথের সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তদিগের বিশ্বাসকেও আমি 'কিছু নয় বা মিথ্যা' বলছি না। এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা ঐ মূর্তি-অবলম্বনে উচ্চ থেকে ক্রমে উচ্চতর তত্ত্বে উঠে যায়, অতএব ঐ মূর্তিকে আশ্রয় ক'রে শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি যে প্রকাশিত রয়েছে, এতে সন্দেহ নেই।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, মূর্খ ও বুদ্ধিমানের ধর্ম আলাদা?

স্বামীজী। তাই তো, নইলে তোর শাস্ত্রেই বা এত অধিকারি-নির্দেশের হাঙ্গামা কেন? সবই truth (সত্য), তবে relative truth different in degrees (আপেক্ষিক সত্যে তারতম্য আছে)। মানুষ যা কিছু সত্য ব'লে জানে, সে সকলই ঐরূপ; কোনটি অল্প সত্য, কোনটি তার চেয়ে অধিক সত্য; নিত্য সত্য কেবল একমাত্র ভগবান্। এই আত্মা জড়ের ভেতর একেবারে ঘুমুচ্ছেন, 'জীব'নামধারী মানুষের ভেতর তিনিই আবার কিঞ্চিৎ conscious (জাগরিত) হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণে, বুদ্ধ-শঙ্করাদিতে আবার ঐ আত্মাই superconscious stage-এ—অর্থাৎ পূর্ণভাবে জাগরিত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এর উপরেও অবস্থা আছে, যা ভাবে বা ভাষায় বলা যায় না—'অবাঙ্মনসোগোচরম্'।

১ কঠ উপ,—১।৩।৩

শিষ্য। মহাশয়, কোন কোন ভক্তসম্প্রদায় বলে, ভগবানের সহিত একটা ভাব বা সম্বন্ধ পাতাইয়া সাধনা করিতে হইবে। আত্মার মহিমাদির কথা তাহারা কিছুই বোঝে না, শুনিলেও বলে—'ঐ-সকল কথা ছাড়িয়া সর্বদা ভাবে থাকো।'

স্বামীজী। তারা যা বলে, তা তাদের পক্ষে সত্য। ঐরূপ করতে করতে তাদের ভেতরও একদিন ব্রহ্ম জেগে উঠবেন। আমরা (সন্ন্যাসীরা) যা করছি, তাও আর এক রকম ভাব। আমরা সংসারত্যাগ করেছি, অতএব সাংসারিক সম্বন্ধে মা-বাপ স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদির মতো কোন একটা ভাব ভগবানে আরোপ ক'রে সাধনা করা—আমাদের ভাব কেমন ক'রে হবে? ও-সব আমাদের কাছে সঙ্কীর্ণ ব'লে মনে হয়। অবশ্য, সর্বভাবাতীত শ্রীভগবানের উপাসনা বড় কঠিন। কিন্তু অমৃত পাই না ব'লে কি বিষ খেতে যাব? এই আত্মার কথা সর্বদা বলবি, শুনবি, বিচার করবি। ঐরূপ করতে করতে কালে দেখবি—তোর ভেতরেও সিঙ্গি (সিংহ, ব্রহ্ম) জেগে উঠবেন। ঐ সব ভাব-খেয়ালের পারে চলে যা। এই শোন্, কঠোপনিষদে যম কি বলেছেন: উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

এইরূপে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল। মঠে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিল। স্বামীজীর সঙ্গে শিষ্যও প্রসাদ গ্রহণ করিতে চলিল।

২০

স্থান—কলিকাতা

কাল—১৮৯৮

আজ তিন দিন হইল স্বামীজী বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যহ অসংখ্য লোকের ভিড়। স্বামী যোগানন্দও স্বামীজীর সঙ্গে একত্র অবস্থান করিতেছেন। আজ সিষ্টার নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী আলিপুরের পশুশালা দেখিতে যাইবেন। শিষ্য উপস্থিত হইলে তাহাকে ও স্বামী যোগানন্দকে বলিলেন, 'তোরা আগে চলে যা—আমি নিবেদিতাকে নিয়ে গাড়ি ক'রে একটু পরেই যাচ্ছি।'......

প্রায় সাড়ে চারিটার সময় স্বামীজী নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া পশুশালায় উপস্থিত হইলেন। বাগানের তদানীন্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর রামব্রহ্ম সান্যাল পরম সাদরে স্বামীজী ও নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন এবং প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল তাঁহাদের অনুগমন করিয়া বাগানের নানা স্থান দেখাইতে লাগিলেন। স্বামী যোগানন্দও শিষ্যের সঙ্গে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রামব্রহ্মবাবু উদ্যানস্থ নানা বৃক্ষ দেখাইতে দেখাইতে বৃক্ষাদির কালে কিরূপ ক্রমপরিণতি হইয়াছে তদ্বিষয় আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নানা জীবজন্তু দেখিতে দেখিতে স্বামীজীর মধ্যে মধ্যে জীবের উত্তরোত্তর পরিণতি-সম্বন্ধে ডারুইনের (Darwin) মতের আলোচনা করিতে লাগিলেন। শিষ্যের মনে আছে, সর্প-গৃহে যাইয়া তিনি চক্রাঙ্কিতগাত্র একটা প্রকাণ্ড সাপ দেখাইয়া বলিলেন, 'ইহা হইতেই কালে tortoise (কচ্ছপ) উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সাপই বহুকাল ধরিয়া একস্থানে বসিয়া থাকিয়া ক্রমে কঠোরপৃষ্ঠ হইয়া গিয়াছে।' কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী শিষ্যকে তামাসা করিয়া বলিলেন, 'তোরা না কচ্ছপ খাস্? ডারুইনের মতে এই সাপই কাল-পরিণামে কচ্ছপ হয়েছে; তা হ'লে তোরা সাপও খাস্!' ইহা শুনিয়া শিষ্য ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া বলিল, 'মহাশয়, একটা পদার্থ ক্রমপরিণতির দ্বারা পদার্থান্তর হইয়া গেলে যখন তাহার পূর্বের আকৃতি ও স্বভাব থাকে না, তখন কচ্ছপ খাইলেই যে সাপ খাওয়া হইল, এ কথা কেমন করিয়া বলিতেছেন?'

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজী ও রামব্রহ্মবাবু হাসিয়া উঠিলেন এবং সিষ্টার নিবেদিতাকে ঐ কথা বুঝাইয়া দেওয়াতে তিনিও হাসিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলেই যেখানে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি ছিল, সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রামব্রহ্মবাবুর আদেশে রক্ষকেরা সিংহব্যাঘ্রের জন্য প্রচুর মাংস আনিয়া আমাদের সম্মুখেই উহাদিগকে আহার করাইতে লাগিল। উহাদের সাহ্লাদ গর্জন শুনিবার এবং সাগ্রহ ভোজন দেখিবার অল্পক্ষণ পরেই উদ্যানমধ্যস্থ রামব্রহ্মবাবুর বাসাবাড়িতে আমরা সকলে উপস্থিত হইলাম। তথায় চা ও জলপানের উদ্যোগ হইয়াছিল। স্বামীজী অল্পমাত্র চা পান করিলেন। নিবেদিতাও চা পান করিলেন। এক টেবিলে বসিয়া সিষ্টার নিবেদিতা-স্পৃষ্ট মিষ্টান্ন ও চা খাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী শিষ্যকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া উহা খাওয়াইলেন এবং নিজে জলপান করিয়া তাহার অবশিষ্টাংশ শিষ্যকে পান করিতে দিলেন। অতঃপর ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ লইয়া কিছুক্ষণ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

রামব্রহ্মবাবু। ডারুইন ক্রমবিকাশবাদ ও তাহার কারণ যেভাবে বুঝাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ?

স্বামীজী। ডারুইনের কথা সঙ্গত হলেও evolution (ক্রমবিকাশবাদ)-এর কারণ সম্বন্ধে উহা যে চূড়ান্ত মীমাংসা, এ কথা আমি স্বীকার করতে পারি না।

রামব্রহ্মবাবু। এ বিষয়ে আমাদের দেশে প্রাচীন পণ্ডিতগণ কোনরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন কি ?

স্বামীজী। সাংখ্যদর্শনে ঐ বিষয় সুন্দর আলোচিত হয়েছে। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্তই ক্রমবিকাশের কারণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা ব'লে আমার ধারণা।

রামব্রহ্মবাবু। সংক্ষেপে ঐ সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া বলা চলিলে শুনিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজী। নিম্ন জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত করতে পাশ্চাত্য মতে struggle for existence (জীবন-সংগ্রাম), survival of the fittest (যোগ্যতমের উদ্বর্তন), natural selection (প্রাকৃতিক

নির্বাচন) প্রভৃতি যে-সকল নিয়ম কারণ ব'লে নির্দিষ্ট হয়েছে, সে-সকল আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। পাতঞ্জল-দর্শনে কিন্তু এ-সকলের একটিও তার কারণ ব'লে সমর্থিত হয়নি। পতঞ্জলির মত হচ্ছে, এক species (জাতি) থেকে আর এক species-এ (জাতিতে) পরিণতি 'প্রকৃতির আপূরণের' দ্বারা (প্রকৃত্যাপূরাৎ) সংসাধিত হয়। আবরণ বা obstacles-এর (প্রতিবন্ধক বা বাধার) সঙ্গে দিনরাত struggle (লড়াই) ক'রে যে ওটা সাধিত হয়, তা নয়। আমার বিবেচনায় struggle (লড়াই) এবং competition (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) জীবের পূর্ণতালাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। হাজার জীবনকে ধ্বংস ক'রে যদি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয়—যা পাশ্চাত্য দর্শন সমর্থন করে, তা হ'লে বলতে হয়, এই evolution (ক্রমবিকাশ) দ্বারা সংসারের বিশেষ কোন উন্নতিই হচ্ছে না। সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার ক'রে নিলেও আধ্যাত্মিক বিকাশকল্পে ওটা যে বিষম প্রতিবন্ধক, এ কথা স্বীকার করতেই হয়। আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণের অভিপ্রায়—জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের তারতম্যেই বিচিত্রভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও বিকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির ও বিকাশের প্রতিবন্ধকগুলি সর্বতোভাবে সরে দাঁড়ালে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিম্নস্তরে যাই হোক, উচ্চস্তরে কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করেই যে ওদের অতিক্রম করা যায়, তা নয়; দেখা যায় সেখানে শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা ও প্রধানতঃ ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি সরে যায় বা অধিকতর আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। সুতরাং obstacle (প্রতিবন্ধক)-গুলিকে আত্মপ্রকাশের কার্য না ব'লে কারণরূপে নির্দেশ করা এবং প্রকৃতির এই বিচিত্র অভিব্যক্তির সহায়ক বলা যুক্তিযুক্ত নয়। হাজার পাপীর প্রাণসংহার ক'রে জগৎ থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা দ্বারা জগতে পাপের বৃদ্ধিই হয়। কিন্তু উপদেশ দিয়ে জীবকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলে জগতে আর পাপ থাকে না। এখন দেখুন, পাশ্চাত্য Struggle Theory (প্রাণীদের পরস্পর সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা উন্নতিলাভরূপ মত)টা কতদূর horrible (ভীষণ) হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রামব্রহ্মবাবু স্বামীজীর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; অবশেষে বলিলেন, 'ভারতবর্ষে এখন আপনার স্থায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞ লোকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ঐরূপ লোকেই একদেশদর্শী শিক্ষিত জনগণের ভ্রমপ্রমাদ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে সমর্থ। আপনার Evolution Theory-র (ক্রমবিকাশবাদের) নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম।'

শিষ্য স্বামী যোগানন্দের সহিত ট্রামে করিয়া রাত্রি প্রায় ৮টার সময় বাগবাজারে ফিরিয়া আসিল। স্বামীজী ঐ সময়ের প্রায় পনর মিনিট পূর্বে ফিরিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রায় অর্ধঘণ্টা বিশ্রামান্তে তিনি বৈঠকখানায় আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী অদ্য পশুশালা দেখিতে গিয়া রামব্রহ্মবাবুর নিকট ক্রমবিকাশবাদের অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন শুনিয়া উপস্থিত সকলে ঐ প্রসঙ্গ বিশেষরূপে শুনিবার জন্য ইতঃপূর্বেই সমুৎসুক ছিলেন। অতএব স্বামীজী আসিবামাত্র সকলের অভিপ্রায় বুঝিয়া শিষ্য ঐ কথাই পাড়িল।

শিষ্য। মহাশয়, পশুশালায় ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। অনুগ্রহ করিয়া সহজ কথায় তাহা পুনরায় বলিবেন কি?

স্বামীজী। কেন, কি বুঝিসনি?

শিষ্য। এই আপনি অন্য অনেক সময় আমাদের বলিয়াছেন যে, বাহিরের শক্তিসমূহের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতাই জীবনের চিহ্ন এবং উহাই উন্নতির সোপান। আজ আবার যেন উলটা কথা বলিলেন।

স্বামীজী। উলটো ব'লব কেন? তুই-ই বুঝতে পারিসনি। Animal kingdom-এ (নিম্ন প্রাণিজগতে) আমরা সত্য-সত্যই struggle for existence, survival of the fittest (জীবনসংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন) প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই ডারুইনের theory (তত্ত্ব) কতকটা সত্য ব'লে প্রতিভাত হয়। কিন্তু human kingdom (মনুষ্য-জগৎ)-এ, যেখানে rationality (জ্ঞান-বুদ্ধি)-র বিকাশ, সেখানে এ নিয়মের উলটোই দেখা যায়। মনে কর্, যাঁদের আমরা really great men (বাস্তবিক মহাপুরুষ) বা ideal (আদর্শ) ব'লে

জানি, তাঁদের বাহ্য struggle (সংগ্রাম) একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। Animal kingdom (মনুষ্যেতর প্রাণিজগৎ)-এ instinct (স্বাভাবিক জ্ঞান)-এর প্রাবল্য। মানুষ কিন্তু যত উন্নত হয়, ততই তাতে rationality (বিচার-বুদ্ধি)-র বিকাশ। এজন্য animal kingdom (প্রাণিজগৎ)-এর মতো rational human kingdom (বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্যজগৎ)-এ পরের ধ্বংস সাধন ক'রে progress (উন্নতি) হ'তে পারে না। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ evolution (পূর্ণবিকাশ) একমাত্র sacrifice (ত্যাগ) দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত sacrifice (ত্যাগ) করতে পারে, মানুষের মধ্যে সে তত বড়। আর নিম্নস্তরের প্রাণিজগতে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত বলবান্ জানোয়ার হয়। সুতরাং Struggle Theory (জীবনসংগ্রাম-তত্ত্ব) এ উভয় রাজ্যে equally applicable (সমানভাবে উপযোগী) হ'তে পারে না। মানুষের struggle (সংগ্রাম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control (আয়ত্ত) করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal kingdom (মানবেতর প্রাণিজগৎ)-এ স্থূল দেহের সংরক্ষণে যে struggle (সংগ্রাম) পরিলক্ষিত হয়, human plane of existence (মানব-জীবন)-এ মনের ওপর আধিপত্যলাভের জন্য বা সত্ত্ব(গুণ)বৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্য সেই struggle (সংগ্রাম) চলেছে। জীবন্ত বৃক্ষ ও পুকুরের জলে পতিত বৃক্ষচ্ছায়ার মতো মনুষ্যেতর প্রাণীতে ও মনুষ্যজগতে struggle (সংগ্রাম) বিপরীত দেখা যায়।

শিষ্য। তাহা হইলে আপনি আমাদের শারীরিক উন্নতিসাধনের জন্য এত করিয়া বলেন কেন?

স্বামীজী। তোরা কি আবার মানুষ? তবে একটু rationality (বিচার-বুদ্ধি) আছে, এই মাত্র। Physique (দেহটা) ভাল না হ'লে মনের সহিত struggle (সংগ্রাম) করবি কি ক'রে? তোরা কি আর জগতের highest evolution (পূর্ণবিকাশস্থল) 'মানুষ'পদবাচ্য আছিস? আহার নিদ্রা মৈথুন ভিন্ন তোদের আর আছে কি? এখনও যে চতুষ্পদ হয়ে যাসনি, এই ঢের। ঠাকুর বলতেন, 'মান হুঁশ আছে

যায়, সেই মানুষ'। তোরা তো 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব'-বাক্যের সাক্ষী হয়ে স্বদেশবাসীর হিংসার স্থল ও বিদেশিগণের ঘৃণার আস্পদ হয়ে রয়েছিস। তোরা animal (প্রাণী), তাই struggle (সংগ্রাম) করতে বলি। থিওরি-ফিওরি রেখে দে। নিজেদের দৈনন্দিন কার্য ও ব্যবহার স্থিরভাবে আলোচনা ক'রে দেখ্ দেখি, তোরা animal and human planes-এর (মানব এবং মানবেতর স্তরের) মধ্যবর্তী জীববিশেষ কি না! Physique (দেহ)-টাকে আগে গড়ে তোল্। তবে তো মনের ওপর ক্রমে আধিপত্য লাভ হবে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' বুঝলি ?

শিষ্য। মহাশয়, 'বলহীনেন' অর্থে ভাষ্যকার কিন্তু 'ব্রহ্মচর্যহীনেন' বলেছেন।

স্বামীজী। তা বলুনগে। আমি বলছি, the physically weak are unfit for the realisation of the self (দুর্বল শরীরে আত্ম-সাক্ষাৎকার হয় না)।

শিষ্য। কিন্তু সবল শরীরে অনেক জড়বুদ্ধিও তো দেখা যায়।

স্বামীজী। তাদের যদি তুই যত্ন ক'রে ভাল idea (ভাব) একবার দিতে পারিস, তা হ'লে তারা যত শীগগীর তা work out (কার্যে পরিণত) করতে পারবে, হীনবীর্য লোক তত শীগগীর পারবে না। দেখছিস না, ক্ষীণ শরীরে কাম-ক্রোধের বেগধারণ হয় না। শুঁটকো লোকগুলো শীগগীর রেগে যায়—শীগগীর কামমোহিত হয়।

শিষ্য। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বামীজী। তা নেই কে বলছে ? মনের ওপর একবার control (সংযম) হয়ে গেলে, দেহ সবল থাক বা শুকিয়েই যাক, তাতে আর কিছু এসে যায় না। মোট কথা হচ্ছে physique (শরীর) ভাল না হ'লে যে আত্মজ্ঞানের অধিকারীই হ'তে পারে না; ঠাকুর বলতেন, 'শরীরে এতটুকু খুঁত থাকলে জীব সিদ্ধ হ'তে পারে না।'

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী রহস্য করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিতে লাগিলেন, 'আর এক কথা শুনেছেন, আজ এই ভটচায বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টান্ন না হয় খেলি, তাতে তত আসে যায় না, কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি ক'রে খেলি ?'

শিষ্য। তা আপনিই তো আদেশ করিয়াছিলেন। গুরুর আদেশে আমি সব করিতে পারি। জলটা খাইতে কিন্তু আমি নারাজ ছিলাম; আপনি পান করিয়া দিলেন, কাজেই প্রসাদ বলিয়া খাইতে হইল।

স্বামীজী। তোর জাতের দফা রফা হয়ে গেছে—এখন আর তোকে কেউ ভটচায বামুন বলে মানবে না!

শিষ্য। না মানে নাই মানুক। আমি আপনার আদেশে চণ্ডালের ভাতও খাইতে পারি।

কথা শুনিয়া স্বামীজী ও উপস্থিত সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

২১

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী

কাল—১৮৯৮

আজ বেলা প্রায় দুইটার সময় শিষ্য পদব্রজে মঠে আসিয়াছে। নীলাম্বর-বাবুর বাগানবাটীতে এখন মঠ উঠাইয়া আনা হইয়াছে এবং বর্তমান মঠের জমিও অল্পদিন হইল খরিদ করা হইয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া বেলা চারিটা আন্দাজ মঠের নূতন জমিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। মঠের জমি তখনও জঙ্গলপূর্ণ। জমিটির উত্তরাংশে তখন একখানি একতলা কোঠাবাড়ি ছিল; উহারই সংস্কার করিয়া বর্তমান মঠ-বাড়ি নির্মিত হইয়াছে। মঠের জমিটি যিনি খরিদ করাইয়া দেন, তিনিও স্বামীজীর সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত আসিয়া বিদায় লইলেন। স্বামীজী শিষ্যসঙ্গে মঠের জমিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে ভাবী মঠের কার্যকারিতা ও বিধিবিধান পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে একতলা ঘরের পূর্বদিকের বারান্দায় পৌঁছিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজী বলিলেন:

এইখানে সাধুদের থাকবার স্থান হবে। সাধন-ভজন ও জ্ঞানচর্চায় এই মঠ প্রধান কেন্দ্রস্থান হবে, এই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির

অভ্যুদয় হবে, তা জগৎ ছেয়ে ফেলবে; মানুষের জীবনগতি ফিরিয়ে দেবে; জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্মের একত্র সমন্বয়ে এখান থেকে ideals (উচ্চাদর্শ-সকল) বেরোবে; এই মঠভুক্ত সাধুদের ইঙ্গিতে কালে দিগ্‌দিগন্তরে প্রাণের সঞ্চার হবে; যথার্থ ধর্মানুরাগিগণ সব এখানে কালে এসে জুটবে—মনে এরূপ কত কল্পনার উদয় হচ্ছে।

মঠের দক্ষিণ ভাগে ঐ যে জমি দেখছিস, ওখানে বিদ্যার কেন্দ্রস্থল হবে। ব্যাকরণ দর্শন বিজ্ঞান কাব্য অলঙ্কার স্মৃতি ভক্তিশাস্ত্র আর রাজকীয় ভাষা ঐ স্থানে শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাচীন টোলের ধরনে ঐ 'বিদ্যামন্দির' স্থাপিত হবে। বালব্রহ্মচারীরা ঐখানে বাস ক'রে শাস্ত্রপাঠ করবে। তাদের অশন-বসন সব মঠ থেকে দেওয়া হবে। এ-সব ব্রহ্মচারীরা পাঁচ বৎসর training (শিক্ষালাভ)-এর পর ইচ্ছে হ'লে গৃহে ফিরে গিয়ে সংসারী হ'তে পারবে। মঠে মহাপুরুষগণের অভিমতে সন্ন্যাসও ইচ্ছে হ'লে নিতে পারবে। এই ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে যাদের উচ্ছৃঙ্খল বা অসচ্চরিত্র দেখা যাবে, মঠস্বামিগণ তাদের তখনি বহিষ্কৃত ক'রে দিতে পারবেন। এখানে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে অধ্যয়ন করানো হবে। এতে যাদের objection (আপত্তি) থাকবে, তাদের নেওয়া হবে না। তবে নিজের জাতিবর্ণাশ্রমাচার মেনে যারা চলতে চাইবে, তাদের আহারাদির বন্দোবস্ত নিজেদের ক'রে নিতে হবে। তারা অধ্যয়ন-মাত্র সকলের সঙ্গে একত্র করবে। তাদেরও চরিত্র-বিষয়ে মঠস্বামিগণ সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। এখানে trained (শিক্ষিত) না হ'লে কেউ সন্ন্যাসের অধিকারী হ'তে পারবে না। ক্রমে এরূপে যখন এই মঠের কাজ আরম্ভ হবে, তখন কেমন হবে বল্ দেখি?

শিষ্য। আপনি তবে প্রাচীনকালের মতো গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অনুষ্ঠান পুনরায় দেশে চালাইতে চান?

স্বামীজী। নয় তো কি? Modern system of education-এ (বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে) ব্রহ্মবিদ্যা-বিকাশের সুযোগ কিছুমাত্র নেই। পূর্বের মতো ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবে এখন broad basis (উদারভাব)-এর ওপর তার foundation (ভিত্তিস্থাপন) করতে হবে, অর্থাৎ কালোপযোগী অনেক পরিবর্তন তাতে ঢোকাতে হবে। সে সব পরে ব'লব।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন :

মঠের দক্ষিণে ঐ যে জমিটা আছে, ঐটেও কালে কিনে নিতে হবে। ঐখানে মঠের 'অন্নসত্র' হবে। ঐখানে যথার্থ দীনদুঃখিগণকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করবার বন্দোবস্ত থাকবে। ঐ অন্নসত্র ঠাকুরের নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। যেমন fund (টাকা) জুটবে, সেই অনুসারে অন্নসত্র প্রথম খুলতে হবে। চাই কি প্রথমে দু-তিনটি লোক নিয়ে start (আরম্ভ) করতে হবে। উৎসাহী ব্রহ্মচারীদের এই অন্নসত্র চালাতে train করতে (শেখাতে) হবে। তাদের যোগাড়-সোগাড় ক'রে, চাই কি ভিক্ষা ক'রে এই অন্নসত্র চালাতে হবে। মঠ এ-বিষয়ে কোনরকম অর্থসাহায্য করতে পারবে না। ব্রহ্মচারীদের ওর জন্য অর্থসংগ্রহ ক'রে আনতে হবে। সেবাসত্রে ঐভাবে পাঁচ বৎসর training (শিক্ষালাভ) সম্পূর্ণ হ'লে তবে তারা 'বিদ্যামন্দির'-শাখায় প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারবে। অন্নসত্রে পাঁচ বৎসর আর বিদ্যাশ্রমে পাঁচ বৎসর—একুনে দশ বৎসর training-এর (শিক্ষার) পর মঠের স্বামিগণের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতে পারবে—অবশ্য যদি তাদের সন্ন্যাসী হ'তে ইচ্ছে হয় এবং উপযুক্ত অধিকারী বুঝে মঠাধ্যক্ষগণ তাদের সন্ন্যাসী করা অভিমত করেন। তবে কোন কোন বিশেষ সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রে মঠাধ্যক্ষ তাকে যখন ইচ্ছে সন্ন্যাসদীক্ষা দিতেও পারবেন। সাধারণ ব্রহ্মচারিগণকে কিন্তু পূর্বে যেমন বললুম, সেইভাবে ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতে হবে। আমার মাথায় এই-সব idea (ভাব) রয়েছে।

শিষ্য। মহাশয়, মঠে এরূপ তিনটি শাখাস্থাপনের উদ্দেশ্য কি হবে ?

স্বামীজী। বুঝলিনি ? প্রথমে অন্নদান, তারপর বিদ্যাদান, সর্বোপরি জ্ঞানদান। এই তিন ভাবের সমন্বয় এই মঠ থেকে করতে হবে। অন্নদান করবার চেষ্টা করতে করতে ব্রহ্মচারীদের মনে পরার্থকর্মতৎপরতা ও শিবজ্ঞানে জীবসেবার ভাব দৃঢ় হবে। ও থেকে তাদের চিত্ত ক্রমে নির্মল হয়ে তাতে সত্ত্বভাবের স্ফুরণ হবে। তা হলেই ব্রহ্মচারিগণ কালে ব্রহ্মবিদ্যালাভের যোগ্যতা ও সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করবে।

শিষ্য। মহাশয়, জ্ঞানদানই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আর অন্নদান ও বিদ্যাদানের শাখা স্থাপনের প্রয়োজন কি ?

স্বামীজী। তুই এতক্ষণেও কথাটা বুঝতে পারলিনি! শোন্—এই অন্ন-হাহাকারের দিনে তুই যদি পরার্থে সেবাকল্পে ভিক্ষা-শিক্ষা ক'রে যেরূপে হোক দুমুঠো অন্ন দীনদুঃখীকে দিতে পারিস, তা হ'লে জীব-জগতের ও তোর মঙ্গল তো হবেই—সঙ্গে সঙ্গে তুই এই সৎকাজের জন্য সকলের sympathy (সহানুভূতি) পাবি। ঐ সৎকাজের জন্য তোকে বিশ্বাস ক'রে কামকাঞ্চনবদ্ধ সংসারীরা তোর সাহায্য করতে অগ্রসর হবে। তুই বিদ্যাদানে বা জ্ঞানদানে যত লোক আকর্ষণ করতে পারবি, তার সহস্রগুণ লোক তোর এই অযাচিত অন্নদানে আকৃষ্ট হবে। এই কাজে তুই public sympathy (সাধারণের সহানুভূতি) যত পাবি, তত আর কোন কাজে পাবিনি। যথার্থ সৎকাজে মানুষ কেন, ভগবানও সহায় হন। এরূপে লোক আকৃষ্ট হ'লে তখন তাদের মধ্য দিয়ে বিদ্যা ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা উদ্দীপিত করতে পারবি। তাই আগে অন্নদান।

শিষ্য। মহাশয়, অন্নসত্র করিতে প্রথম—স্থান চাই, তারপর ঐজন্য ঘর-দ্বার নির্মাণ করা চাই, তারপর কাজ চালাইবার টাকা চাই। এত টাকা কোথা হইতে আসিবে?

স্বামীজী। মঠের দক্ষিণ দিকটা আমি এখনি ছেড়ে দিচ্ছি এবং ঐ বেলতলায় একখানা চালা তুলে দিচ্ছি। তুই একটি কি দুটি অন্ধ আতুর সন্ধান ক'রে নিয়ে এসে কাল থেকেই তাদের সেবায় লেগে যা দেখি। নিজে ভিক্ষা ক'রে তাদের জন্য নিয়ে আয়। নিজে রেঁধে তাদের খাওয়া। এইরূপে কিছু দিন করলেই দেখবি—তোর এই কাজে কত লোক সাহায্য করতে অগ্রসর হবে, কত টাকা-কড়ি দেবে! 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।'[১]

শিষ্য। হাঁ, তাহা বটে। কিন্তু ঐরূপে নিরন্তর কর্ম করিতে করিতে কালে কর্মবন্ধন তো ঘটিতে পারে?

স্বামীজী। কর্মের ফলে যদি তোর দৃষ্টি না থাকে এবং সকল প্রকার কামনা-বাসনার পারে যাবার যদি তোর একান্ত অনুরাগ থাকে, তা হ'লে ঐ সব সৎকাজ তোর কর্মবন্ধন-মোচনেই সহায়তা করবে। ঐরূপ কর্মে

---

১ গীতা, ৬-৪০

বন্ধন আসবে!—ও-কথা তুই কি বলছিস? এরূপ পরার্থ কর্মই কর্ম-বন্ধনের মূলোৎপাটনের একমাত্র উপায়। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

শিষ্য। আপনার কথায় অন্নসত্র ও সেবাশ্রম সম্বন্ধে আপনার মনোভাব বিশেষ করিয়া শুনিতে প্রাণে উৎসাহ হইতেছে।

স্বামীজী। গরীব-দুঃখীদের জন্য well-ventilated (বায়ু-চলাচলের পথযুক্ত) ছোট ছোট ঘর তৈরি করতে হবে। এক এক ঘরে তাদের দু-জন কি তিন জন মাত্র থাকবে। তাদের ভালো বিছানা, পরিষ্কার কাপড়-চোপড় সব দিতে হবে। তাদের জন্য একজন ডাক্তার থাকবেন। হপ্তায় একবার কি দুবার সুবিধামত তিনি তাদের দেখে যাবেন। সেবাশ্রমটি অন্নসত্রের ভেতর একটা ward (বিভাগ)-এর মতো থাকবে, তাতে রোগীদের শুশ্রূষা করা হবে। ক্রমে যখন fund (টাকা) এসে পড়বে, তখন একটা মস্ত kitchen (রন্ধনশালা) করতে হবে। অন্নসত্রে কেবল 'দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতাম্' এই রব উঠবে। ভাতের ফেন গঙ্গায় গড়িয়ে পড়ে গঙ্গার জল সাদা হয়ে যাবে। এই রকম অন্নসত্র হয়েছে দেখলে তবে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

শিষ্য। আপনার যখন ঐরূপ ইচ্ছা হইতেছে, তখন বোধ হয় কালে ঐ বিষয়টি বাস্তবিকই হইবে।

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজী গঙ্গার দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। পরে প্রসন্নমুখে সস্নেহে শিষ্যকে বলিলেন:

তোদের ভেতর কার কবে সিংহ জেগে উঠবে, তা কে জানে? তোদের একটার মধ্যে মা যদি শক্তি জাগিয়ে দেন তো দুনিয়াময় অমন কত অন্নসত্র হবে। কি জানিস, জ্ঞান শক্তি ভক্তি—সকলই সর্বজীবে পূর্ণভাবে আছে। এদের বিকাশের তারতম্যটাই কেবল আমরা দেখি এবং একে বড়, ওকে ছোট ব'লে মনে করি। জীবের মনের ভেতর একটা পর্দা যেন মাঝখানে পড়ে পূর্ণ বিকাশটাকে আড়াল ক'রে রয়েছে। সেটা সরে গেলেই বস্, সব হয়ে গেল! তখন যা চাইবি, যা ইচ্ছে করবি, তাই হবে।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন:

ঈশ্বর করেন তো এ মঠকে মহাসমন্বয়ক্ষেত্র ক'রে তুলতে হবে। ঠাকুর আমাদের সর্বভাবের সাক্ষাৎ সমন্বয়মূর্তি। ঐ সমন্বয়ের ভাবটি এখানে জাগিয়ে

রাখলে ঠাকুর জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। সর্বমতের সর্বপথের আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ—সকলে যাতে এখানে এসে আপন আপন ideal (আদর্শ) দেখতে পায়, তা করতে হবে। সেদিন যখন মঠের জমিতে ঠাকুরকে স্থাপন করলুম, তখন মনে হ'ল, যেন এখান হ'তে তাঁর ভাবের বিকাশ হয়ে চরাচর বিশ্ব ছেয়ে ফেলছে! আমি তো যথাসাধ্য করছি ও ক'রব—তোরাও ঠাকুরের উদার ভাব লোকদের বুঝিয়ে দে। বেদান্ত কেবল প'ড়ে কি হবে? Practical life (কর্মজীবন)-এ শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সত্যতা প্রমাণিত করতে হবে। শঙ্কর এ অদ্বৈতবাদকে জঙ্গলে পাহাড়ে রেখে গেছেন; আমি এবার সেটাকে সেখান থেকে সংসারে ও সমাজের সর্বত্র রেখে যাব ব'লে এসেছি। ঘরে ঘরে, মাঠে ঘাটে, পর্বতে প্রান্তরে এই অদ্বৈতবাদের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে। তোরা আমার সহায় হয়ে লেগে যা।

শিষ্য। মহাশয়, ধ্যানসহায়ে ঐ ভাব অনুভূতি করিতেই যেন আমার ভাল লাগে। লাফাতে ঝাঁপাতে ইচ্ছা হয় না।

স্বামীজী। সেটা তো নেশা ক'রে অচেতন হয়ে থাকার মতো; শুধু ঐরূপ থেকে কি হবে? অদ্বৈতবাদের প্রেরণায় কখন বা তাণ্ডব নৃত্য করবি, কখন বা বুঁদ হয়ে থাকবি। ভাল জিনিস পেলে কি একা খেয়ে সুখ হয়? দশ জনকে দিতে হয় ও খেতে হয়। আত্মানুভূতি লাভ ক'রে না-হয় তুই মুক্ত হয়ে গেলি—তাতে জগতের এল গেল কি? ত্রিজগৎ মুক্ত ক'রে নিয়ে যেতে হবে। মহামায়ার রাজ্যে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে! তখনই নিত্য-সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবি। সে আনন্দের কি তুলনা আছে রে! 'নিরবধি গগনাভম্'—আকাশকল্প ভূমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হবি। জীবজগতের সর্বত্র তোর নিজ সত্তা দেখে অবাক হয়ে পড়বি! স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত তোর আপনার সত্তা ব'লে বোধ হবে। তখন সকলকে আপনার মতো যত্ন না ক'রে থাকতে পারবিনি। এরূপ অবস্থাই হচ্ছে Practical Vedanta (কর্মে পরিণত বেদান্তের অনুভূতি)—বুঝলি। তিনি (ব্রহ্ম) এক হয়েও ব্যাবহারিকভাবে বহুরূপে সামনে রয়েছেন। নাম ও রূপ এই ব্যবহারের মূলে রয়েছে। যেমন ঘটের নাম-রূপটা বাদ দিয়ে কি দেখতে পাস—একমাত্র মাটি, যা এর প্রকৃত সত্তা। সেরূপ ভ্রমে ঘট পট মঠ—সব ভাবছিস ও দেখছিস। জ্ঞান-প্রতিবন্ধক এই যে অজ্ঞান, যার বাস্তব

কোন সত্তা নেই, তাই নিয়ে ব্যবহার চলছে। মাগ-ছেলে, দেহ-মন—যা কিছু সবই নামরূপসহায়ে অজ্ঞানের সৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায়। অজ্ঞানটা যেই সরে দাঁড়াল, তখনি ব্রহ্ম-সত্তার অনুভূতি হয়ে গেল।

শিষ্য। এই অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজী। কোত্থেকে এল তা পরে ব'লব। তুই যখন দড়াকে সাপ ভেবে ভয়ে দৌড়ুতে লাগলি, তখন কি দড়াটা সাপ হয়ে গিয়েছিল?—না, তোর অজ্ঞতাই তোকে অমন ক'রে ছুটিয়েছিল?

শিষ্য। অজ্ঞতা হইতেই ঐরূপ করিয়াছিলাম।

স্বামীজী। তা হ'লে ভেবে দেখ্—তুই যখন আবার দড়াকে দড়া ব'লে জানতে পারবি, তখন নিজের পূর্বকার অজ্ঞতা ভেবে হাসি পাবে কি না? তখন নামরূপ মিথ্যা ব'লে বোধ হবে কি না?

শিষ্য। তা হবে।

স্বামীজী। তা যদি হয়, তবে নামরূপ মিথ্যা হয়ে দাঁড়াল। এরূপে ব্রহ্মসত্তাই একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়াল। এই অনন্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্যেও তাঁর স্বরূপের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। কেবল তুই এই অজ্ঞানের মন্দান্ধকারে এটা মাগ, এটা ছেলে, এটা আপন, এটা পর ভেবে সেই সর্ব-বিভাসক আত্মার সত্তা বুঝতে পারিসনে। যখন গুরুর উপদেশ ও নিজের বিশ্বাস দ্বারা এই নামরূপাত্মক জগৎটা না দেখে এর মূল সত্তাটাকে কেবল অনুভব করবি, তখনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকল পদার্থে তোর আত্মানুভূতি হবে—তখনি 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ'[১] হবে।

শিষ্য। মহাশয়, এই অজ্ঞানের আদি-অন্তের কথা জানিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজী। যে জিনিসটা পরে থাকে না—সে জিনিসটা যে মিথ্যা, তা তো বুঝতে পেরেছিস? যে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছে সে বলবে, অজ্ঞান আবার কোথায়? সে দড়াকে দড়াই দেখে—সাপ ব'লে দেখতে পায় না। যারা দড়াকে সাপ ব'লে দেখে, তাদের ভয়-ভীতি দেখে তার হাসি পায়! সেজন্য অজ্ঞানের বাস্তব স্বরূপ নেই। অজ্ঞানকে সৎও বলা যায় না—অসৎও বলা যায় না। 'সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো'। যে জিনিসটা

---

১ মুণ্ডক উপনিষদ, ২।২।৮

এরূপে মিথ্যা ব'লে প্রতিপন্ন হচ্ছে, তার বিষয়ে প্রশ্নই বা কি, আর উত্তরই বা কি? ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করাটা যুক্তিযুক্তও হ'তে পারে না। কেন, তা শোন্।—এই প্রশ্নোত্তরটাও তো সেই নামরূপ বা দেশকাল ধরে করা হচ্ছে? যে ব্রহ্মবস্তু নাম-রূপ-দেশ-কালের অতীত, তাকে প্রশ্নোত্তর দিয়ে কি বোঝানো যায়? এইজন্য শাস্ত্র মন্ত্র প্রভৃতি ব্যাবহারিকভাবে সত্য—পারমার্থিকরূপে সত্য নয়। স্বরূপতঃ অজ্ঞানের অস্তিত্বই নেই, তা আবার বুঝবি কি? যখন ব্রহ্মের প্রকাশ হবে, তখন আর ঐরূপ প্রশ্ন করবার অবসরই থাকবে না। ঠাকুরের সেই 'মুচি-মুটের গল্প' শুনেছিস না?—ঠিক তাই।—অজ্ঞানকে যেই চেনা যায়, অমনি সে পালিয়ে যায়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, অজ্ঞানটা আসিল কোথা হইতে?

স্বামীজী। যে জিনিসটাই নেই, তা আবার আসবে কি ক'রে?—থাকলে তো আসবে?

শিষ্য। তবে এই জীব-জগতের কি করিয়া উৎপত্তি হইল?

স্বামীজী। এক ব্রহ্মসত্তাই তো রয়েছেন! তুই মিথ্যা নামরূপ দিয়ে তাকে রূপান্তরে নামান্তরে দেখছিস।

শিষ্য। এই মিথ্যা নামরূপই বা কেন? কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজী। শাস্ত্রে এই নামরূপাত্মক সংস্কার বা অজ্ঞতাকে প্রবাহরূপে নিত্য-প্রায় বলেছে। কিন্তু ওটা সান্ত। ব্রহ্মসত্তা কিন্তু সর্বদা দড়ার মতো স্ব-স্বরূপেই রয়েছেন। এইজন্য বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে অধ্যস্ত ইন্দ্রজালবৎ ভাসমান। তাতে ব্রহ্মের কিছুমাত্র স্বরূপ-বৈলক্ষণ্য ঘটেনি। বুঝলি?

শিষ্য। একটা কথা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামীজী। কি বল্ না?

শিষ্য। এই যে আপনি বলিলেন, এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি ব্রহ্মে অধ্যস্ত, তাদের কোন স্বরূপ-সত্তা নাই—তা কি করিয়া হইতে পারে? যে যাহা পূর্বে দেখে নাই, সে জিনিসের ভ্রম তাহার হইতেই পারে না। যে কখনও সাপ দেখে নাই, তাহার দড়াতে যেমন সর্পভ্রম হয় না; সেইরূপ যে এই সৃষ্টি দেখে নাই, তার ব্রহ্মে সৃষ্টিভ্রম হইবে

কেন? সুতরাং সৃষ্টি ছিল বা আছে, তাই সৃষ্টিভ্রম হইয়াছে! ইহাতেই দ্বৈতাপত্তি উঠিতেছে।

স্বামীজী। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তোর প্রশ্ন এইরূপে প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করবেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে সৃষ্টি প্রভৃতি একেবারেই প্রতিভাত হচ্ছে না। তিনি একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই দেখছেন। রজ্জুই দেখছেন, সাপ দেখছেন না। তুই যদি বলিস্, 'আমি তো এই সৃষ্টি বা সাপ দেখছি', তবে তোর দৃষ্টিদোষ দূর করতে তিনি তোকে রজ্জুর স্বরূপ বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন। যখন তাঁর উপদেশে ও বিচার-বলে তুই রজ্জুসত্তা বা ব্রহ্মসত্তা বুঝতে পারবি, তখন এই ভ্রমাত্মক সর্পজ্ঞান বা সৃষ্টিজ্ঞান নাশ হয়ে যাবে। তখন এই সৃষ্টিস্থিতিলয়রূপ ভ্রমজ্ঞান ব্রহ্মে আরোপিত ভিন্ন আর কি বলতে পারিস? অনাদি প্রবাহরূপে এই সৃষ্টিভানাদি চলে এসে থাকে তো থাকুক, তার নির্ণয়ে লাভালাভ কিছুই নেই। ব্রহ্মতত্ত্ব 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ না হ'লে এ প্রশ্নের পর্যাপ্ত মীমাংসা হ'তে পারে না এবং হ'লে আর প্রশ্নও উঠে না, উত্তরেরও প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মতত্ত্বাস্বাদ তখন 'মূকাস্বাদনবৎ' হয়।

শিষ্য। তবে আর এত বিচার করিয়া কি হইবে?

স্বামীজী। ঐ বিষয়টি বোঝবার জন্য বিচার। সত্য বস্তু কিন্তু বিচারের পারে —'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'।[১]

এইরূপ কথা চলিতে চলিতে শিষ্য স্বামীজীর সঙ্গে মঠে[২] আসিয়া উপস্থিত হইল। মঠে আসিয়া স্বামীজী মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে অদ্যকার ব্রহ্মবিচারের সংক্ষিপ্ত মর্ম বুঝাইয়া দিলেন। উপরে উঠিতে উঠিতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।

১. কঠোপনিষদ

২ নীলাম্বরবাবুর বাগানে অবস্থিত

২২

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য। স্বামীজী, আপনি এদেশে বক্তৃতা দেন না কেন? বক্তৃতাপ্রভাবে ইওরোপ-আমেরিকা মাতাইয়া আসিলেন, কিন্তু ভারতে ফিরিয়া আপনার ঐ বিষয়ে উদ্যম ও অনুরাগ যে কেন কমিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্যদেশগুলি অপেক্ষা—আমাদের বিবেচনায় এখানেই ঐরূপ উদ্যমের অধিক প্রয়োজন।

স্বামীজী। এদেশে আগে ground (জমি) তৈরি করতে হবে, তবে বীজ ফেললে গাছ হবে। পাশ্চাত্যের মাটিই এখন বীজ ফেলবার উপযুক্ত, খুব উর্বর। ওদেশের লোকেরা এখন ভোগের শেষ সীমায় উঠেছে। ভোগে তৃপ্ত হয়ে এখন তাদের মন তাতে আর শান্তি পাচ্ছে না। একটা দারুণ অভাব বোধ করছে। তোদের দেশে না আছে ভোগ, না আছে যোগ। ভোগের ইচ্ছা কতকটা তৃপ্ত হ'লে তবে লোকে যোগের কথা শোনে ও বোঝে। অন্নাভাবে ক্ষীণদেহ ক্ষীণমন, রোগ-শোক-পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেকচার-ফেকচার দিয়ে কি হবে?

শিষ্য। কেন, আপনিই তো কখন কখন বলিয়াছেন এদেশ ধর্মভূমি। এদেশে লোকে যেমন ধর্মকথা বুঝে ও কার্যতঃ ধর্মানুষ্ঠান করে, অন্যদেশে তেমন নহে। তবে আপনার জলন্ত বাগ্মিতায় দেশ কেন না মাতিয়া উঠিবে—কেন না ফল হইবে?

স্বামীজী। ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই—পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না করলে, তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না, পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির! বিদেশীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাণিজ্যে অবাধ রপ্তানি, সবচেয়ে তোদের পরস্পরের ভেতর ঘৃণিত দাসসুলভ ঈর্ষাই তোদের দেশের অস্থিমজ্জা খেয়ে ফেলেছে। ধর্মকথা শোনাতে হ'লে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা শুধু লেকচার-ফেকচারে বিশেষ কোন ফল হবে না।

শিষ্য। তবে আমাদের এখন কি করা প্রয়োজন ?

স্বামীজী। প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্ম না ভেবে পরের জন্ম জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন ক'রে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে তাই ঐরূপে তৈরি করছি। শিক্ষা শেষ হ'লে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিভাবে হ'তে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান্ সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মতো পরিষ্কার ক'রে তাদের বুঝিয়ে দেবে। তোদের দেশের mass of people (জনসাধারণ) যেন একটা sleeping Leviathan (ঘুমন্ত বিরাট জলজন্তু)! এদেশের এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এতে শতকরা বড়জোর একজন কি দুজন দেশের লোক শিক্ষা পাচ্ছে। যারা পাচ্ছে—তারাও দেশের হিতের জন্ম কিছু ক'রে উঠতে পারছে না। কি করেই বা বেচারি করবে বল্? কলেজ থেকে বেরিয়েই দেখে সে সাত ছেলের বাপ! তখন যা তা ক'রে একটা কেরানিগিরি, বড়জোর একটা ডেপুটিগিরি জুটিয়ে নেয়। এই হ'ল শিক্ষার পরিণাম! তারপর সংসারের ভারে উচ্চকর্ম উচ্চচিন্তা করবার তাদের আর সময় কোথায়? তার নিজের স্বার্থই সিদ্ধ হয় না; পরার্থে সে আবার কি করবে?

শিষ্য। তবে কি আমাদের উপায় নাই ?

স্বামীজী। অবশ্য আছে। এ সনাতন ধর্মের দেশ। এদেশ পড়ে গেছে বটে, কিন্তু নিশ্চয় আবার উঠবে। এমন উঠবে যে জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে। দেখিসনি নদী বা সমুদ্রে তরঙ্গ যত নামে, তারপর সেটা তত জোরে ওঠে? এখানেও সেইরূপ হবে। দেখছিসনি—পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য ওঠার আর বিলম্ব নেই? তোরা এই সময়ে কোমর বেঁধে লেগে যা—সংসার-ফংসার ক'রে কি হবে? তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশে-দেশে গাঁয়ে-গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলিস্যি ক'রে বসে থাকলে চলছে না। শিক্ষাহীন ধর্মহীন বর্তমান অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে, 'ভাই সব, ওঠ, জাগো। কতদিন আর ঘুমুবে?' আর শাস্ত্রের মহান্

সত্যগুলি সরল ক'রে তাদের বুঝিয়ে দিগে। এতদিন এদেশের ব্রাহ্মণেরা ধর্মটা একচেটে ক'রে বসে ছিল। কালের স্রোতে তা যখন আর টিকলো না, তখন সেই ধর্মটা দেশের সকল লোকে যাতে পায়, তার ব্যবস্থা করগে। সকলকে বোঝাগে ব্রাহ্মণদের মতো তোমাদেরও ধর্মে সমান অধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর্। আর সোজা কথায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থজীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি উপদেশ দিগে। নতুবা তোদের লেখাপড়াকেও ধিক, আর তোদের বেদবেদান্ত পড়াকেও ধিক।

শিষ্য। মহাশয়, আমাদের সে শক্তি কোথায়? আপনার শতাংশের একাংশ শক্তি থাকিলে নিজেও ধন্য হইতাম, অপরকেও ধন্য করিতে পারিতাম।

স্বামীজী। দূর মূর্খ! শক্তি-ফক্তি কেউ কি দেয়? ও তোর ভেতরেই রয়েছে, সময় হলেই আপনা-আপনি বেরিয়ে পড়বে। তুই কাজে লেগে যা না; দেখবি এত শক্তি আসবে যে সামলাতে পারবিনি। পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভেতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালবাসি, কিন্তু ইচ্ছা হয়, তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা—আমি দেখে খুশী হই।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, যাহারা আমার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের কি হইবে?

স্বামীজী। তুই যদি পরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হ'স্ তো ভগবান তাদের একটা উপায় করবেনই করবেন। 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'—গীতায় পড়েছিস তো?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী। ত্যাগই হচ্ছে আসল কথা—ত্যাগী না হ'লে কেউ পরের জন্য ষোল আনা প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ত্যাগী সকলকে সমভাবে দেখে, সকলের সেবায় নিযুক্ত হয়। বেদান্তেও পড়েছিস, সকলকে সমানভাবে দেখতে হবে। তবে একটি স্ত্রী ও কয়েকটি ছেলেকে বেশী আপনার ব'লে ভাববি কেন? তোর দোরে স্বয়ং নারায়ণ কাঙালবেশে এসে অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছেন, তাঁকে কিছু না দিয়ে

খালি নিজের ও নিজের স্ত্রী-পুত্রদেরই উদর নানাপ্রকার চর্ব্য-চূষ্য দিয়ে পূর্তি করা—সে তো পশুর কাজ।

শিষ্য। মহাশয়, পরার্থে কার্য করিতে সময়ে সময়ে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়; তাহা কোথায় পাইব?

স্বামীজী। বলি, যতটুকু ক্ষমতা আছে ততটুকুই আগে কর্ না। পয়সার অভাবে যদি কিছু নাই দিতে পারিস—একটা মিষ্টি কথা বা দুটো সৎ উপদেশও তো তাদের শোনাতে পারিস। না—তাতেও তোর টাকার দরকার?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, তা পারি।

স্বামীজী। 'হাঁ পারি' কেবল মুখে বললে হচ্ছে না। কি পারিস—তা কাজে আমায় দেখা, তবে তো জানবো আমার কাছে আসা সার্থক। লেগে যা। কদিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস, তখন একটা দাগ রেখে যা। নতুবা গাছ-পাথরও তো হচ্ছে মরছে—ঐরূপ জন্মাতে মরতে মানুষের কখন ইচ্ছা হয় কি? আমায় কাজে দেখা যে, তোর বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। সকলকে এই কথা শোনাগে—'তোমাদের ভেতরে অনন্ত শক্তি রয়েছে, সে শক্তিকে জাগিয়ে তোল।' নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? মুক্তিকামনাও তো মহা স্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান, ফেলে দে মুক্তি-ফুক্তি। আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা।

শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন:

তোরা ঐরূপে আগে জমি তৈরি করগে। আমার মতো হাজার হাজার বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা করতে নরলোকে শরীর ধারণ করবে; তার জন্য ভাবনা নেই। এই দেখ্ না, আমাদের (শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যদের) ভেতর যারা আগে ভাবত তাদের কোন শক্তি নেই, তারাই এখন অনাথ-আশ্রম, দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড কত কি খুলছে! দেখছিস না—নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হয়েও তোদের সেবা করতে শিখেছে। আর তোরা তোদের নিজের দেশের লোকের জন্য তা করতে পারবিনি? যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সেদিকে। নয়—মরেই যাবি। তোর আমার মতো কত কীট হচ্ছে মরছে। তাতে জগতের

কি আসছে যাচ্ছে? একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই; তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই মরা ভাল। এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর্, নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাই দেশের আশা-ভরসা। তোদের কর্মহীন দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে যা—লেগে যা। দেরি করিসনি —মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আসছে। পরে করবি ব'লে আর বসে থাকিসনি—তা হ'লে কিছুই হবে না।

২৩

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য। স্বামীজী, ব্রহ্ম যদি একমাত্র সত্য বস্তু হন, তবে জগতে এত বিচিত্রতা দেখা যায় কেন?

স্বামীজী। সত্যই হ'ন বা আর যাই হ'ন, ব্রহ্মবস্তুকে কে জানে বল্? জগৎটাকেই আমরা দেখি ও সত্য ব'লে দৃঢ় বিশ্বাস ক'রে থাকি। তবে সৃষ্টিগত বৈচিত্র্যটাকে সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে বিচারপথে অগ্রসর হ'লে কালে একত্বমূলে পৌছানো যায়। যদি সেই একত্বে অবস্থিত হ'তে পারতিস, তা হ'লে এই বিচিত্রতাটা দেখতে পেতিস না।

শিষ্য। মহাশয়, যদি একত্বেই অবস্থিত হইতে পারিব, তবে এই প্রশ্নই বা কেন করিব? আমি বিচিত্রতা দেখিয়াই যখন প্রশ্ন করিতেছি, তখন উহাকে সত্য বলিয়া অবশ্য মানিয়া লইতেছি।

স্বামীজী। বেশ কথা। সৃষ্টির বিচিত্রতা দেখে তাকে সত্য ব'লে মেনে নিয়ে একত্বের মূলানুসন্ধান করাকে শাস্ত্রে 'ব্যতিরেকী বিচার' বলে। অর্থাৎ অভাব বা অসত্য বস্তুকে ভাব বা সত্য বস্তু ব'লে ধরে নিয়ে বিচার ক'রে দেখানো যে, সেটা ভাব নয়—অভাব বস্তু। তুই ঐরূপে মিথ্যাকে সত্য ব'লে ধরে সত্যে পৌছানোর কথা বলছিস। কেমন?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, তবে আমি ভাবকেই সত্য বলি এবং ভাবরাহিত্যটাকেই মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করি।

স্বামীজী। আচ্ছা। এখন দেখ্, বেদ বলছে, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'; যদি বস্তুতঃ এক ব্রহ্মই থাকেন, তবে তোর নানাত্ব তো মিথ্যা হচ্ছে। বেদ মানিস তো?

শিষ্য। বেদের কথা আমি মানি বটে। কিন্তু যদি কেহ না মানে, তাহাকেও তো নিরস্ত করিতে হইবে?

স্বামীজী। তা ঠিক। জড়-বিজ্ঞান সহায়ে তাকে প্রথম বেশ ক'রে বুঝিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষকেও আমরা বিশ্বাস করতে পারি না; ইন্দ্রিয়গুলিও ভুল সাক্ষ্য দেয় এবং যথার্থ সত্য বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির বাইরে রয়েছে। তারপর তাকে বলতে হয় মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের পারে যাবার উপায় আছে। তাকেই ঋষিরা যোগ বলেছেন। যোগ অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ, হাতে-নাতে করতে হয়। বিশ্বাস কর্ আর নাই কর্, করলেই ফল পাওয়া যায়। ক'রে দেখ্—হয়, কি না হয়। আমি বাস্তবিকই দেখেছি—ঋষিরা যা বলেছেন, সব সত্য। এই দেখ্—তুই যাকে বিচিত্রতা বলছিস, তা এক সময় লুপ্ত হয়ে যায়—অনুভব হয় না। তা আমি নিজের জীবনে ঠাকুরের কৃপায় প্রত্যক্ষ করেছি।

শিষ্য। কখন ঐরূপ করিয়াছেন?

স্বামীজী। একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আমায় ছুঁয়ে দিয়েছিলেন; দেবামাত্র দেখলুম ঘরবাড়ি, দোর-দালান, গাছপালা, চন্দ্র-সূর্য—সব যেন আকাশে লয় পেয়ে যাচ্ছে। ক্রমে আকাশও যেন কোথায় লয় পেয়ে গেল। তারপর কি যে প্রত্যক্ষ হয়েছিল, কিছুই স্মরণ নেই; তবে মনে আছে, ঐরূপ দেখে বড় ভয় হয়েছিল—চীৎকার ক'রে ঠাকুরকে বলেছিলুম, 'ওগো, তুমি আমার কি ক'রছ গো, আমার যে বাপ-মা আছে!' ঠাকুর তাতে হাসতে হাসতে 'তবে এখন থাক্' ব'লে ফের ছুঁয়ে দিলেন। তখন ক্রমে আবার দেখলুম—ঘরবাড়ি দোর-দালান যা যেমন সব ছিল; ঠিক সেই রকম রয়েছে! আর একদিন আমেরিকার একটি lake-এর (হ্রদের) ধারে ঠিক ঐরূপ হয়েছিল।

শিষ্য। (অবাক হইয়া) আচ্ছা মহাশয়, ঐরূপ অবস্থা মস্তিষ্কের বিকারেও তো হইতে পারে? আর এক কথা, ঐ অবস্থাতে আপনার বিশেষ আনন্দ উপলব্ধি হইয়াছিল কি?

স্বামীজী। যখন রোগের খেয়ালে নয়, নেশা ক'রে নয়, রকম-বেরকমের দম টেনেও নয়, সহজ মানুষের সুস্থাবস্থায় এ অবস্থা হয়ে থাকে, তখন তাকে মস্তিষ্কের বিকার কি ক'রে বলবি, বিশেষতঃ যখন আবার ঐরূপ অবস্থা-লাভের কথা বেদের সঙ্গে মিলছে, পূর্বপূর্ব আচার্য ও ঋষিগণের আপ্ত-বাক্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে? আমায় কি শেষে তুই বিকৃতমস্তিষ্ক ঠাওরালি?

শিষ্য। না মহাশয়, আমি তাহা বলিতেছি না। শাস্ত্রে যখন শত শত এরূপ একত্বানুভূতির দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, আপনি যখন বলিতেছেন যে ইহা করামলকবৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, আর আপনার অপরোক্ষানুভূতি যখন বেদাদি শাস্ত্রোক্ত বাক্যের অবিসংবাদী, তখন ইহাকে মিথ্যা বলিতে সাহস হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন—'ক গতং কেন বা নীতং' ইত্যাদি।

স্বামীজী। জানবি, এই একত্বজ্ঞান—যাকে তোদের শাস্ত্রে ব্রহ্মানুভূতি বলে—তা হ'লে জীবের আর ভয় থাকে না, জন্মমৃত্যুর পাশ ছিন্ন হয়ে যায়। এই হেয় কামকাঞ্চনে বদ্ধ হয়ে জীব সে ব্রহ্মানন্দ লাভ করতে পারে না। সেই পরমানন্দ পেলে জগতের সুখদুঃখে জীব আর অভিভূত হয় না।

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, যদি তাহাই হয় এবং আমরা যদি যথার্থ পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপই হই, তাহা হইলে ঐরূপে সমাধিতে সুখলাভে আমাদের যত্ন হয় না কেন? আমরা তুচ্ছ কামকাঞ্চনের প্রলোভনে পড়িয়া বারবার মৃত্যুমুখে ধাবমান হইতেছি কেন?

স্বামীজী। তুই মনে করছিস, জীবের সে শান্তিলাভে আগ্রহ নেই বুঝি? একটু ভেবে দেখ্—বুঝতে পারবি, যে যা করছে, সে তা ভূমা সুখের আশাতেই করছে। তবে সকলে ঐ কথা বুঝে উঠতে পারছে না। সে পরমানন্দলাভের ইচ্ছা আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলের ভেতর পূর্ণভাবে রয়েছে। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মও সকলের অন্তরের অন্তরে রয়েছেন। তুইও সেই পূর্ণব্রহ্ম। এই মুহূর্তে—ঠিক ঠিক ভাবলেই ঐ কথার অনুভূতি হয়। কেবল অনুভূতির অভাব মাত্র। তুই যে চাকরি ক'রে স্ত্রী-পুত্রের জন্য

এত খাটছিস, তার উদ্দেশ্যও সেই সচ্চিদানন্দলাভ। সেই মোহের মারপেঁচে পড়ে ঘা খেয়ে খেয়ে ক্রমশঃ স্ব-স্বরূপে নজর আসবে। বাসনা আছে বলেই ধাক্কা খাচ্ছিস ও খাবি। ঐরূপে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে নিজের দিকে দৃষ্টি পড়বে—সকলেরই এক সময় পড়বেই পড়বে। তবে কারও এ জন্মে, কারও বা লক্ষ জন্ম পরে।

শিষ্য। সে চৈতন্য হওয়া—মহাশয়, আপনার আশীর্বাদ ও ঠাকুরের কৃপা না হইলে কখনও হইবে না।

স্বামীজী। ঠাকুরের কৃপা-বাতাস তো বইছেই। তুই পাল তুলে দে না। যখন যা করবি, খুব একান্তমনে করবি। দিনরাত ভাববি, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—আমার আবার ভয়-ভাবনা কি? এই দেহ মন বুদ্ধি—সবই ক্ষণিক; এর পারে যা তাই আমি।

শিষ্য। ঐ ভাব ক্ষণিক আসিলেও আবার তখনি উড়িয়া যায় এবং ছাইভস্ম সংসার ভাবি।

স্বামীজী। ও রকম প্রথম প্রথম হয়ে থাকে; ক্রমে শুধরে যাবে। তবে মনের খুব তীব্রতা, ঐকান্তিক ইচ্ছা চাই। ভাববি যে আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, আমি কি কখন অন্যায় কাজ করতে পারি? আমি কি সামান্য কামকাঞ্চনলোভে পড়ে সাধারণ জীবের মতো মুগ্ধ হ'তে পারি? মনে এমনি ক'রে জোর করবি; তবে তো ঠিক কল্যাণ হবে।

শিষ্য। মহাশয়, এক একবার মনের বেশ জোর হয়। আবার ভাবি, ডেপুটিগিরির জন্য পরীক্ষা দিব—ধন মান হবে, বেশ মজায় থাকব।

স্বামীজী। মনে যখন ও-সব আসবে, তখনি বিচার করবি। তুই তো বেদান্ত পড়েছিস? ঘুমুবার সময়ও বিচারের তরোয়ালখানা শিয়রে রেখে ঘুমুবি, যেন স্বপ্নেও লোভ সামনে না এগোতে পারে। এইরূপে জোর ক'রে বাসনা ত্যাগ করতে করতে ক্রমে যথার্থ বৈরাগ্য আসবে, তখন দেখবি স্বর্গের দ্বার খুলে গেছে।

শিষ্য। আচ্ছা স্বামীজী, ভক্তিশাস্ত্রে যে বলে বেশী বৈরাগ্য হ'লে ভাব থাকে না।

স্বামীজী। আরে ফেলে দে তোর সে ভক্তিশাস্ত্র, যাতে ও-রকম কথা আছে। বৈরাগ্য—বিষয়বিতৃষ্ণা না হ'লে, কাকবিষ্ঠার ন্যায় কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ

না করলে 'ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি'—ব্রহ্মার কোটিকল্পেও জীবের মুক্তি নেই। জপ, ধ্যান, পূজা, হোম, তপস্যা কেবল তীব্র বৈরাগ্য আনবার জন্য। তা যার হয়নি, তার জানবি—নোঙর ফেলে নৌকোর দাঁড়টানার মতো হচ্ছে! 'ন ধনেন ন চেজ্যয়া, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।'

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, কামকাঞ্চনত্যাগ হইলেই কি সব হইল?

স্বামীজী। ও দুটো ত্যাগের পরও অনেক লেঠা আছেন! এই যেমন, তারপর আসেন লোকখ্যাতি! সেটা যে-সে লোক সামলাতে পারে না। লোকে মান দিতে থাকে, নানা ভোগ এসে জোটে। এতেই ত্যাগীদের মধ্যে বার আনা লোক বাঁধা পড়ে। এই যে মঠ-ফঠ করছি, নানা রকমের পরার্থে কাজ ক'রে সুখ্যাতি হচ্ছে—কে জানে, আমাকেই বা আবার ফিরে আসতে হয়।

শিষ্য। মহাশয়, আপনিই ঐ কথা বলিতেছেন, তবে আমরা আর যাই কোথায়?

স্বামীজী। সংসারে রয়েছিস, তাতে ভয় কি? 'অভীরভীরভীঃ'—ভয় ত্যাগ কর্। নাগ-মহাশয়কে দেখেছিস তো?—সংসারে থেকেও সন্ন্যাসীর বাড়া! এমনটি বড় একটা দেখা যায় না। গেরস্ত যদি কেউ হয় তো যেন নাগ-মহাশয়ের মতো হয়। নাগ-মহাশয় পূর্ববঙ্গ আলো ক'রে বসে আছেন। ওদেশের লোকদের বলবি—যেন তাঁর কাছে যায়, তা হ'লে তাদের কল্যাণ হবে।

শিষ্য। মহাশয়, যথার্থ কথাই বলিয়াছেন; নাগ-মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচর, তাঁকে জীবন্ত দীনতা বলিয়া বোধ হয়!

স্বামীজী। তা একবার বলতে? আমি তাঁকে একবার দর্শন করতে যাব। তুইও যাবি? জলে ভেসে গেছে, এমন মাঠ দেখতে আমার এক এক সময়ে বড় ইচ্ছা হয়। আমি যাব, দেখব। তুই তাঁকে লিখিস।

শিষ্য। আমি লিখিয়া দিব। আপনার দেওভোগ যাইবার কথা শুনিলে তিনি আনন্দে উন্মাদপ্রায় হইবেন। বহুপূর্বে আপনার একবার যাইবার কথা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'পূর্ববঙ্গ আপনার চরণধূলিতে তীর্থ হইয়া যাইবে।'

স্বামীজী। জানিস তো, নাগ-মহাশয়কে ঠাকুর বলতেন, 'জলন্ত আগুন'।

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, তা শুনিয়াছি।

স্বামীজী। অনেক রাত হয়েছে, তবে এখন আয়—কিছু খেয়ে যা।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

অনন্তর কিছু প্রসাদ পাইয়া শিষ্য কলিকাতা যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল: স্বামীজী কি অদ্ভুত পুরুষ—যেন সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্তি আচার্য শঙ্কর!

২৪

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য। স্বামীজী, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে? দেখিতে পাই, ভক্তিপথাবলম্বিগণ আচার্য শঙ্করের নাম শুনিলে কানে হাত দেন, আবার জ্ঞানমার্গীরা ভক্তদের আকুল ক্রন্দন, উল্লাস ও নৃত্যগীতাদি দেখিয়া বলেন, ওরা পাগলবিশেষ।

স্বামীজী। কি জানিস, গৌণ জ্ঞান ও গৌণ ভক্তি নিয়েই কেবল বিবাদ উপস্থিত হয়। ঠাকুরের সেই ভূত-বানরের গল্প শুনেছিস তো?[১]

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ।

স্বামীজী। কিন্তু মুখ্যা ভক্তি ও মুখ্য জ্ঞানে কোন প্রভেদ নেই। মুখ্যা ভক্তি মানে হচ্ছে—ভগবানকে প্রেমস্বরূপে উপলব্ধি করা। তুই যদি সর্বত্র সকলের ভেতরে ভগবানের প্রেমমূর্তি দেখতে পাস্ তো কার ওপর আর হিংসাদ্বেষ করবি? সেই প্রেমানুভূতি এতটুকু বাসনা—ঠাকুর যাকে বলতেন 'কামকাঞ্চনাসক্তি'—থাকতে হবার জো নেই। সম্পূর্ণ প্রেমানুভূতিতে দেহবুদ্ধি পর্যন্ত থাকে না। আর মুখ্য জ্ঞানের মানে

১ শিব-রামের যুদ্ধ হইয়াছিল। এখন রামের গুরু শিব ও শিবের গুরু রাম, সুতরাং যুদ্ধের পরে দুজনের ভাবও হইল। কিন্তু শিবের চেলা ভূতপ্রেতগুলির আর রামের সঙ্গী বানরগুলির মধ্যে ঝগড়া কিচিমিচি সেই দিন হইতে আরম্ভ হইয়া আজ পর্যন্ত মিটিল না।

হচ্ছে সর্বত্র একত্বানুভূতি, আত্মস্বরূপের সর্বত্র দর্শন। তাও এতটুকু অহংবুদ্ধি থাকতে হবার জো নেই।

শিষ্য। তবে আপনি যাহাকে প্রেম বলেন, তাহাই কি পরমজ্ঞান?

স্বামীজী। তা বই কি! পূর্ণপ্রজ্ঞ না হ'লে কারও প্রেমানুভূতি হয় না। দেখছিস তো বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মকে 'সচ্চিদানন্দ' বলে। ঐ সচ্চিদানন্দ-শব্দের মানে হচ্ছে—'সৎ' অর্থাৎ অস্তিত্ব, 'চিৎ' অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান, আর 'আনন্দ'ই প্রেম। ভগবানের সৎ-ভাবটি নিয়ে ভক্ত ও জ্ঞানীর মধ্যে কোন বিবাদ-বিসংবাদ নেই। কিন্তু জ্ঞানমার্গী ব্রহ্মের চিৎ বা চৈতন্য-সত্তাটির ওপরেই সর্বদা বেশী ঝোঁক দেয়, আর ভক্তগণ আনন্দ-সত্তাটিই সর্বক্ষণ নজরে রাখে। কিন্তু চিৎস্বরূপ অনুভূতি হবা-মাত্র আনন্দস্বরূপের উপলব্ধি হয়। কারণ যা চিৎ, তা-ই যে আনন্দ।

শিষ্য। তবে ভারতবর্ষে এত সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল কেন এবং ভক্তি ও জ্ঞান-শাস্ত্রেই বা এত বিরোধ কেন?

স্বামীজী। কি জানিস, গৌণভাব নিয়েই অর্থাৎ যে ভাবগুলো ধরে মানুষ ঠিক জ্ঞান বা ঠিক ভক্তি লাভ করতে অগ্রসর হয়, সেইগুলো নিয়েই যত লাঠালাঠি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তোর কি বোধ হয়? End (উদ্দেশ্য) বড়, কি means (উপায়গুলো) বড়? নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য থেকে উপায় কখন বড় হ'তে পারে না। কেন না, অধিকারি-ভেদে একই উদ্দেশ্যলাভ নানাবিধ উপায়ে হয়। এই যে দেখছিস—জপ ধ্যান পূজা হোম ইত্যাদি ধর্মের অঙ্গ, এগুলি সবই হচ্ছে উপায়। আর পরাভক্তি বা পরব্রহ্মস্বরূপকে দর্শনই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবি—বিবাদ হচ্ছে কি নিয়ে। একজন বলছেন—পূবমুখো হয়ে ব'সে ভগবানকে ডাকলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়; আর একজন বলছেন—না, পশ্চিমমুখো হয়ে বসতে হবে, তবেই তাঁকে পাওয়া যাবে। হয়তো একজন বহুকাল পূর্বে পূবমুখো হয়ে ব'সে ধ্যানভজন ক'রে ঈশ্বরলাভ করেছিলেন; তাঁর চেলারা তাই দেখে অমনি ঐ মত চালিয়ে দিয়ে বলতে লাগলো, পূবমুখো হয়ে না বসলে ঈশ্বরলাভ কখনই হবে না। আর একদল বললে—সে কি কথা? পশ্চিমমুখো ব'সে অমুক ভগবান লাভ করেছে, আমরা শুনেছি যে!

আমরা তোদের ঐ মত মানি না। এইরূপে সব দল বেঁধেছে। একজন হয়তো হরিনাম জপ ক'রে পরাভক্তি লাভ করেছিলেন ; অমনি শাস্ত্র তৈরী হল—'নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'। কেউ আবার 'আল্লা' ব'লে সিদ্ধ হলেন, তখনি তাঁর আর এক মত চলতে লাগলো। আমাদের এখন দেখতে হবে—এই সকল জপ-পূজাদির খেই (আরম্ভ) কোথায়। সে খেই হচ্ছে শ্রদ্ধা ; সংস্কৃতভাষায় 'শ্রদ্ধা' কথাটি বোঝাবার মতো শব্দ আমাদের ভাষায় নেই। উপনিষদে আছে, ঐ শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। 'একাগ্রতা' কথাটির দ্বারাও শ্রদ্ধা-কথার সমুদয় ভাবটুকু প্রকাশ করা যায় না। বোধ হয় 'একাগ্রনিষ্ঠা' বললে সংস্কৃত শ্রদ্ধা-কথাটার অনেকটা কাছাকাছি মানে হয়। নিষ্ঠার সহিত একাগ্র-মনে যে-কোন তত্ত্ব হোক না, ভাবতে থাকলেই দেখতে পাবি, মনের গতি ক্রমেই একত্বের দিকে চলেছে বা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের অনুভূতির দিকে যাচ্ছে। ভক্তি এবং জ্ঞান-শাস্ত্র উভয়েই ঐরূপ এক একটি নিষ্ঠা জীবনে আনবার জন্য মানুষকে বিশেষভাবে উপদেশ করছে। যুগপরম্পরায় বিকৃত ভাব ধারণ ক'রে সেইসব মহান্ সত্য ক্রমে দেশাচারে পরিণত হয়েছে। শুধু যে তোদের ভারতবর্ষে ঐরূপ হয়েছে তা নয়—পৃথিবীর সকল জাতিতে ও সকল সমাজেই ঐরূপ হয়েছে। আর বিচারবিহীন সাধারণ জীব ঐগুলো নিয়ে সেই অবধি বিবাদ ক'রে মরছে, খেই হারিয়ে ফেলেছে ; তাই এত লাঠালাঠি চলেছে।

শিষ্য। মহাশয়, তবে এখন উপায় কি ?

স্বামীজী। পূর্বের মতো ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা আনতে হবে। আগাছাগুলো উপড়ে ফেলতে হবে। সকল মতে সকল পথেই দেশকালাতীত সত্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলোর উপর অনেক আবর্জনা পড়ে গেছে। সেগুলো সাফ ক'রে ঠিক ঠিক তত্ত্বগুলি লোকের সামনে ধরতে হবে ; তবেই তোদের ধর্মের ও দেশের মঙ্গল হবে।

শিষ্য। কেমন করিয়া উহা করিতে হইবে ?

স্বামীজী। কেন ? প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে। যাঁরা সেইসব সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ ক'রে গেছেন, তাঁদের—লোকের কাছে ideal (আদর্শ বা ইষ্ট)-রূপে খাড়া করতে হবে। যেমন ভারতবর্ষে

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ। দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি। বৃন্দাবনলীলা-ফীলা এখন রেখে দে। গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা, শক্তিপূজা চালা।

শিষ্য। কেন, বৃন্দাবনলীলা মন্দ কি?

স্বামীজী। এখন শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ পূজায় তোদের দেশে ফল হবে না। বাঁশী বাজিয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুদ্ধবুদ্ধি-সহায়ে মহা উত্তম প্রকাশ ক'রে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানবার জন্ম উঠে পড়ে লাগা।

শিষ্য। মহাশয়, তবে আপনার মতে বৃন্দাবন-লীলা কি সত্য নহে?

স্বামীজী। তা কে বলছে? ঐ লীলার ঠিক ঠিক ধারণা ও উপলব্ধি করতে বড় উচ্চ সাধনার প্রয়োজন। এই ঘোর কাম-কাঞ্চনাসক্তির সময় ঐ লীলার উচ্চ ভাব কেউ ধারণা করতে পারবে না।

শিষ্য। মহাশয়, তবে কি আপনি বলিতে চাহেন, যাহারা মধুর-সখ্যাদি ভাব-অবলম্বনে এখন সাধনা করিতেছে, তাহারা কেহই ঠিক পথে যাইতেছে না?

স্বামীজী। আমার তো বোধ হয়, তাই—বিশেষতঃ আবার যারা মধুরভাবের সাধক ব'লে পরিচয় দেয়, তারা; তবে দু-একটি ঠিক ঠিক লোক থাকলেও থাকতে পারে। বাকি সব জানবি ঘোর তমোভাবাপন্ন—full of morbidity (মানসিকদুর্বলতা-সমাচ্ছন্ন)! তাই বলছি, দেশটাকে এখন তুলতে হ'লে মহাবীরের পূজা চালাতে হবে, শক্তিপূজা চালাতে হবে, শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ঘরে ঘরে করতে হবে। তবে তোদের এবং দেশের কল্যাণ। নতুবা উপায় নেই।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, শুনিয়াছি ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) তো সকলকে লইয়া সংকীর্তনে বিশেষ আনন্দ করিতেন।

স্বামীজী। তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তাঁর সঙ্গে জীবের তুলনা হয়? তিনি সব মতে সাধন ক'রে দেখিয়েছেন—সকলগুলিই এক তত্ত্বে পৌঁছে দেয়। তিনি যা করেছেন, তা কি তুই আমি করতে পারব? তিনি যে কে ও কত বড়, তা আমরা কেউই এখনও বুঝতে পারিনি! এজন্তই আমি তাঁর কথা যেখানে সেখানে বলি না। তিনি যে কি ছিলেন, তা

তিনিই জানতেন; তাঁর দেহটাই কেবল মানুষের মতো ছিল, কিন্তু চালচলন সব স্বতন্ত্র অমানুষিক ছিল।

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, আপনি তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানেন কি?

স্বামীজী। তোর অবতার কথার মানেটা কি, তা আগে বল্?

শিষ্য। কেন? যেমন শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, ঈশা ইত্যাদি পুরুষের মতো পুরুষ।

স্বামীজী। তুই যাঁদের নাম করলি, আমি ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ)-কে তাঁদের সকলের চেয়ে বড় ব'লে জানি—মানা তো ছোট কথা। থাক্ এখন সে কথা, এইটুকুই এখন শুনে রাখ্—সময়- ও সমাজ-উপযোগী এক এক মহাপুরুষ আসেন ধর্ম উদ্ধার করতে। তাঁদের মহাপুরুষ বল্ বা অবতার বল্, তাতে কিছু আসে যায় না। তাঁরা সংসারে এসে জীবকে নিজ জীবন গঠন করবার ideal (আদর্শ) দেখিয়ে যান। যিনি যখন আসেন, তখন তাঁর ছাঁচে গড়ন চলতে থাকে, মানুষ তৈরী হয় এবং সম্প্রদায় চলতে থাকে। কালে ঐ-সকল সম্প্রদায় বিকৃত হ'লে আবার ঐরূপ অন্য সংস্কারক আসেন। এই প্রথা প্রবাহরূপে চলে আসছে।

শিষ্য। মহাশয়, তবে আপনি ঠাকুরকে অবতার ব'লে ঘোষণা করেন না কেন? আপনার তো শক্তি—বাগ্মিতা যথেষ্ট আছে।

স্বামীজী। তার কারণ, আমি তাঁকে অল্পই বুঝেছি। তাঁকে এত বড় মনে হয় যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমার ভয় হয়—পাছে সত্যের অপলাপ হয়, পাছে আমার এই অল্পশক্তিতে না কুলোয়, বড় করতে গিয়ে তাঁর ছবি আমার ঢঙে এঁকে তাঁকে পাছে ছোট ক'রে ফেলি!

শিষ্য। আজকাল অনেকে তো তাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছে!

স্বামীজী। তা করুক। যে যেমন বুঝেছে, সে তেমন করছে। তোর ঐরূপ বিশ্বাস হয় তো তুইও কর্।

শিষ্য। আমি আপনাকেই সম্যক্ বুঝিতে পারি না, তা আবার ঠাকুরকে! মনে হয়, আপনার কৃপাকণা পাইলেই আমি এ জন্মে ধন্য হইব।

অদ্য এইখানেই কথার পরিসমাপ্তি হইল এবং শিষ্য স্বামীজীর পদধূলি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

২৫

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য। স্বামীজী! ঠাকুর বলিতেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তবে যাহারা গৃহস্থ, তাহাদের উপায় কি? তাহাদের তো দিনরাত ঐ উভয় লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়।

স্বামীজী। কাম-কাঞ্চনের আসক্তি না গেলে ঈশ্বরে মন যায় না, তা গেরস্তই হোক আর সন্ন্যাসীই হোক। ঐ দুই বস্তুতে যতক্ষণ মন আছে, জানবি ততক্ষণ ঠিক ঠিক অনুরাগ, নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা কখনই আসবে না।

শিষ্য। তবে গৃহস্থদিগের উপায়?

স্বামীজী। উপায় হচ্ছে ছোটখাট বাসনাগুলিকে পূর্ণ ক'রে নেওয়া, আর বড় বড় গুলিকে বিচার ক'রে ত্যাগ করা। ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হবে না, 'যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ'—বেদকর্তা ব্রহ্মা স্বয়ং তা বললেও হবে না।

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়; সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি বিষয়-ত্যাগ হয়?

স্বামীজী। তা কি কখন হয়? তবে সন্ন্যাসীরা কাম-কাঞ্চন সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হচ্ছে, চেষ্টা করছে; আর গেরস্তরা নোঙর ফেলে নৌকায় দাঁড় টানছে—এই প্রভেদ। ভোগের সাধ কখন মেটে কি রে? 'ভূয় এবাভিবর্ধতে'—দিন দিন বাড়তেই থাকে।

শিষ্য। কেন? ভোগ করিয়া করিয়া বিরক্ত হইলে শেষে তো বিতৃষ্ণা আসিতে পারে?

স্বামীজী। দূর ছোঁড়া, তা ক-জনের আসতে দেখেছিস? ক্রমাগত বিষয়ভোগ করতে থাকলে, মনে সেই-সব বিষয়ের ছাপ পড়ে যায়, দাগ পড়ে যায়, মন বিষয়ের রঙে র'ঙে যায়। ত্যাগ, ত্যাগ—এই হচ্ছে মূলমন্ত্র।

শিষ্য। কেন মহাশয়, ঋষিবাক্য তো আছে—'গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয়-নিগ্রহস্তপঃ, নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্'—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয় অর্থাৎ রূপরসাদি-ভোগ হইতে বিরত রাখাকেই তপস্যা বলে; বিষয়ের প্রতি অনুরাগ দূর হইলে গৃহই তপোবনে পরিণত হয়।

স্বামীজী। গৃহে থেকে যারা কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করতে পারে, তারা ধন্য; কিন্তু তা ক-জনের হয়?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আপনি তো ইতঃপূর্বেই বলিলেন যে, সন্ন্যাসীদের মধ্যেও অধিকাংশের সম্পূর্ণরূপে কামকাঞ্চন-ত্যাগ হয় নাই।

স্বামীজী। তা বলেছি; কিন্তু এ-কথাও বলেছি যে, তারা ত্যাগের পথে চলেছে; তারা কামকাঞ্চনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। গেরস্তদের কামকাঞ্চনাসক্তিটাকে এখনও বিপদ বলেই ধারণা হয়নি, আত্মোন্নতির চেষ্টাই হচ্ছে না। ওটার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করতে হবে, এ ভাবনাই এখনও আসেনি।

শিষ্য। কেন মহাশয়, তাহাদিগের মধ্যেও তো অনেকেই ঐ আসক্তি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছে?

স্বামীজী। যারা করছে, তারা অবশ্য ক্রমে ত্যাগী হবে; তাদেরও কাম-কাঞ্চনাসক্তি ক্রমে কমে যাবে। কিন্তু কি জানিস—'যাচ্ছি যাব, হচ্ছে হবে' যারা এইরূপে চলেছে, তাদের আত্মদর্শন এখনও অনেক দূরে। 'এখনই ভগবান লাভ ক'রব, এই জন্মেই ক'রব'—এই হচ্ছে বীরের কথা। ঐরূপ লোকে এখনই সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়; শাস্ত্র তাদের সম্বন্ধেই বলেছেন, 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—যখনই বৈরাগ্য আসবে, তখনই সংসার ত্যাগ করবে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ঠাকুর তো বলিতেন—ঈশ্বরের কৃপা হইলে, তাঁহাকে ডাকিলে তিনি এইসকল আসক্তি এক দণ্ডে কাটাইয়া দেন।

স্বামীজী। হাঁ, তাঁর কৃপা হ'লে হয় বটে, কিন্তু তাঁর কৃপা পেতে হ'লে আগে শুদ্ধ পবিত্র হওয়া চাই; কায়মনোবাক্যে পবিত্র হওয়া চাই, তবেই তাঁর কৃপা হয়।

শিষ্য। কিন্তু কায়মনোবাক্যে সংযম করিতে পারিলে কৃপার আর দরকার কি? তাহা হইলে তো আমি নিজেই নিজের চেষ্টায় আত্মোন্নতি করিলাম।

স্বামীজী। তুই প্রাণপণে চেষ্টা করছিস দেখে তবে তাঁর কৃপা হয়। Struggle (উদ্যম বা পুরুষকার) না ক'রে বসে থাক্, দেখবি কখনও কৃপা হবে না।

শিষ্য। ভাল হইব, ইহা বোধ হয় সকলেরই ইচ্ছা; কিন্তু কি দুর্লক্ষ্য সূত্রে যে মন নীচগামী হয়, তাহা বলিতে পারি না; সকলেরই কি মনে ইচ্ছা হয় না যে, আমি সৎ হইব, ভাল হইব, ঈশ্বর লাভ করিব?

স্বামীজী। যাদের ভেতর ওরূপ ইচ্ছা হয়েছে, তাদের ভেতর জানবি Struggle (উদ্যম বা চেষ্টা) এসেছে এবং ঐ চেষ্টা করতে করতেই ঈশ্বরের দয়া হয়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, অনেক অবতার-জীবনে তো ইহাও দেখা যায়—যাহাদের আমরা ভয়ানক পাপী ব্যভিচারী ইত্যাদি মনে করি, তাহারাও সাধনভজন না করিয়া তাঁহাদের কৃপায় অনায়াসে ঈশ্বরলাভে সক্ষম হইয়াছিল—ইহার অর্থ কি?

স্বামীজী। জানবি—তাদের ভেতর ভয়ানক অশান্তি এসেছিল, ভোগ করতে করতে বিতৃষ্ণা এসেছিল, অশান্তিতে তাদের হৃদয় জ্বলে যাচ্ছিল; হৃদয়ে এত অভাব বোধ হচ্ছিল যে, একটা শান্তি না পেলে তাদের দেহ ছুটে যেত। তাই ভগবানের দয়া হয়েছিল। তমোগুণের ভেতর দিয়ে ঐ-সকল লোক ধর্মপথে উঠেছিল।

শিষ্য। তমোগুণ বা যাহাই হউক, কিন্তু ঐ ভাবেও তো তাহাদের ঈশ্বরলাভ হইয়াছিল?

স্বামীজী। হাঁ, তা হবে না কেন? কিন্তু পায়খানার দোর দিয়ে না ঢুকে সদর দোর দিয়ে বাড়িতে ঢোকা ভাল নয় কি? এবং ঐ পথেও তো 'কি ক'রে মনের এ অশান্তি দূর করি'—এইরূপ একটা বিষম হাঁক-পাকানি ও চেষ্টা আছে।

শিষ্য। তাহা ঠিক, তবে আমার মনে হয়, যাহারা ইন্দ্রিয়াদি দমন ও কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে উদ্যত, তাহারা পুরুষকারবাদী ও স্বাবলম্বী; এবং যাহারা কেবলমাত্র তাঁহার নামে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের কামকাঞ্চনাসক্তি তিনিই কালে দূর করিয়া অন্তে পরম পদ দেন।

স্বামীজী। হাঁ, তবে ঐরূপ লোক বিরল; সিদ্ধ হবার পর লোকে এদেরই 'কৃপাসিদ্ধ' বলে। জ্ঞানী ও ভক্ত—এ উভয়েরই মতে কিন্তু ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র।

শিষ্য। তাহাতে আর সন্দেহ কি! শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একদিন আমায় বলিয়াছিলেন, 'কৃপাপক্ষে কোন নিয়ম নেই; যদি থাকে, তবে তাকে কৃপা বলা যায় না। সেখানে সবই বে-আইনী কারখানা।'

স্বামীজী। তা নয় রে, তা নয়; ঘোষজ যেখানকার কথা বলেছে, সেখানেও আমাদের অজ্ঞাত একটা আইন বা নিয়ম আছেই আছে। বে-আইনী কারখানাটা হচ্ছে শেষ কথা, দেশকালনিমিত্তের অতীত স্থানের কথা; সেখানে Law of Causation (কার্য-কারণ-সম্বন্ধ) নেই, কাজেই সেখানে কে কারে কৃপা করবে? সেখানে সেব্য-সেবক ধ্যাতা-ধ্যেয়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয় এক হয়ে যায়—সব সমরস।

শিষ্য। আজ তবে আসি। আপনার কথা শুনিয়া আজ বেদ-বেদান্তের সার বুঝা হইল; এতদিন কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র করা হইতেছিল।

স্বামীজীর পদধূলি লইয়া শিষ্য কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইল।

২৬

স্থান—বেলুড়মঠ

কাল—(ঐ নির্মাণকাল) ১৮৯৮

শিষ্য। স্বামীজী, খাদ্যাখাদ্যের সহিত ধর্মাচরণের কিছু সম্বন্ধ আছে কি?

স্বামীজী। অল্পবিস্তর আছে বইকি।

শিষ্য। মাছ-মাংস খাওয়া উচিত এবং আবশ্যক কি?

স্বামীজী। খুব খাবি বাবা! তাতে যা পাপ হবে তা আমার।[১] তোদের দেশের লোকগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখ্ দেখি—মুখে মলিনতার ছায়া, বুকে সাহস- ও উদ্যমশূন্যতা, পেটটি বড়, হাতে পায়ে বল নেই, ভীরু ও কাপুরুষ!

শিষ্য। মাছ-মাংস খাইলে যদি উপকারই হইবে, তবে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্মে অহিংসাকে 'পরমো ধর্মঃ' বলিয়াছে কেন?

১ আমিষ-নিরামিষ আহার-বিষয়ে স্বামীজী অধিকারী-বিচার করিতেন।

স্বামীজী। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম আলাদা নয়। বৌদ্ধধর্ম মরে যাবার সময় হিন্দুধর্ম তার কতকগুলি নিয়ম নিজেদের ভেতর ঢুকিয়ে আপনার ক'রে নিয়েছিল। ঐ ধর্মই এখন ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম বলে বিখ্যাত। 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'—বৌদ্ধধর্মের এই মত খুব ভাল, তবে অধিকারী বিচার না ক'রে বলপূর্বক রাজ-শাসনের দ্বারা ঐ মত জনসাধারণ সকলের উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম দেশের মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে। ফলে হয়েছে এই যে, লোকে পিঁপড়েকে চিনি দিচ্ছে, আর টাকার জন্য ভাইয়ের সর্বনাশ করছে! অমন 'বক-ধার্মিক' এ জীবনে অনেক দেখেছি! অন্যপক্ষে দেখ্—বৈদিক ও মনূক্ত ধর্মে মৎস্য-মাংস খাবার বিধান রয়েছে, আবার অহিংসার কথাও আছে। অধিকারি-বিশেষে হিংসা ও অধিকারি-বিশেষে অহিংসা-ধর্মপালনের ব্যবস্থা আছে। শ্রুতি বলছেন —'মা হিংস্যাৎ সর্বভূতানি'; মনুও বলেছেন—'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'।

শিষ্য। কিন্তু এমন দেখিয়াছি মহাশয়, ধর্মের দিকে একটু ঝোঁক হইলেই লোক আগে মাছ-মাংস ছাড়িয়া দেয়। অনেকের চক্ষে ব্যভিচারাদি গুরুতর পাপ অপেক্ষাও যেন মাছ-মাংস খাওয়াটা বেশী পাপ!—এ ভাবটা কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজী। কোত্থেকে এলো, তা জেনে তোর দরকার কি? তবে ঐ মত ঢুকে যে তোদের সমাজের ও দেশের সর্বনাশ সাধন করেছে, তা তো দেখতে পাচ্ছিস? দেখ্ না—তোদের পূর্ববঙ্গের লোক খুব মাছ-মাংস খায়, কচ্ছপ খায়, তাই তারা পশ্চিমবাঙলার লোকের চেয়ে সুস্থশরীর। তোদের পূর্ববাঙলার বড় মানুষেরাও এখনো রাত্রে লুচি বা রুটি খেতে শেখেনি। তাই আমাদের দেশের লোকগুলোর মতো অম্বলের ব্যারামে ভোগে না। শুনেছি, পূর্ববাঙলার পাড়াগাঁয়ে লোকে অম্বলের ব্যারাম কাকে বলে, তা বুঝতেই পারে না।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ। আমাদের দেশে অম্বলের ব্যারাম বলিয়া কোন ব্যারাম নাই। এদেশে আসিয়া ঐ ব্যারামের নাম শুনিয়াছি। দেশে আমরা দুবেলাই মাছ-ভাত খাইয়া থাকি।

স্বামীজী। তা খুব খাবি। ঘাসপাতা খেয়ে যত পেটরোগা বাবাজীর দলে দেশ ছেয়ে ফেলেছে। ও-সব সত্ত্বগুণের চিহ্ন নয়, মহা তমোগুণের ছায়া—

মৃত্যুর ছায়া। সত্ত্বগুণের চিহ্ন হচ্ছে—মুখে উজ্জ্বলতা, হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ, tremendous activity (প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা); আর তমোগুণের লক্ষণ হচ্ছে আলস্য, জড়তা, মোহ, নিদ্রা—এই সব।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মাছ-মাংসে তো রজোগুণ বাড়ায়।

স্বামীজী। আমি তো তাই চাই। এখন রজোগুণেরই দরকার। দেশের যে-সব লোককে এখন সত্ত্বগুণী ব'লে মনে করছিস, তাদের ভেতর পনের আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক সত্ত্বগুণী মেলে তো ঢের! এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা। দেশ যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, দেখতে পাচ্ছিস না? এখন দেশের লোককে মাছ-মাংস খাইয়ে উদ্যমী ক'রে তুলতে হবে, জাগাতে হবে, কার্যতৎপর করতে হবে। নতুবা ক্রমে দেশসুদ্ধ লোক জড় হয়ে যাবে, গাছ-পাথরের মতো জড় হয়ে যাবে। তাই বলছিলুম, মাছ-মাংস খুব খাবি।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মনে যখন সত্ত্বগুণের অত্যন্ত স্ফূর্তি হয়, তখন মাছ-মাংসে স্পৃহা থাকে কি?

স্বামীজী। না, তা থাকে না। সত্ত্বগুণের যখন খুব বিকাশ হয়, তখন মাছ-মাংসে রুচি থাকে না। কিন্তু সত্ত্বগুণ-প্রকাশের এইসব লক্ষণ জানবি—পরের জন্য সর্বস্ব-পণ, কামিনী-কাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্তি, নিরভিমানতা, অহংবুদ্ধিশূন্যতা। এইসব লক্ষণ যার হয়, তার আর animal-food (আমিষাহার)-এর ইচ্ছা হয় না। আর যেখানে দেখবি, মনে ঐসব গুণের স্ফূর্তি নেই, অথচ অহিংসার দলে নাম লিখিয়েছে—সেখানে জানবি হয় ভণ্ডামি, না হয় লোকদেখানো ধর্ম। তোর যখন ঠিক ঠিক সত্ত্বগুণের অবস্থা হবে তখন আমিষাহার ছেড়ে দিস।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ছান্দোগ্য শ্রুতিতে তো আছে 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ'—শুদ্ধ বস্তু আহার করিলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, ইত্যাদি। অতএব সত্ত্বগুণী হইবার জন্য রজঃ ও তমোগুণোদ্দীপক পদার্থসকলের ভোজন পূর্বেই ত্যাগ করা কি এখানে শ্রুতির অভিপ্রায় নহে?

স্বামীজী। ঐ শ্রুতির অর্থ করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলেছেন—'আহার'-অর্থে 'ইন্দ্রিয়-বিষয়', আর শ্রীরামানুজস্বামী 'আহার'-অর্থে খাদ্য ধরেছেন। আমার মত হচ্ছে তাঁহাদের ঐ উভয় মতের সামঞ্জস্য ক'রে নিতে হবে।

কেবল দিনরাত খাদ্যাখাদ্যের বাদবিচার ক'রে জীবনটা কাটাতে হবে, না ইন্দ্রিয়সংযম করতে হবে? ইন্দ্রিয়সংযমটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে ধরতে হবে; আর ঐ ইন্দ্রিয়সংযমের জন্যই ভাল-মন্দ খাদ্যাখাদ্যের অল্প-বিস্তর বিচার করতে হবে। শাস্ত্র বলেন, খাদ্য ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট ও পরিত্যাজ্য হয়: (১) জাতিদুষ্ট—যেমন পেঁয়াজ, রশুন ইত্যাদি। (২) নিমিত্তদুষ্ট—যেমন ময়রার দোকানের খাবার, দশগণ্ডা মাছি মরে প'ড়ে রয়েছে, রাস্তার ধুলোই কত উড়ে পড়ছে। (৩) আশ্রয়দুষ্ট—যেমন অসৎ লোকের দ্বারা স্পৃষ্ট অন্নাদি। খাদ্য জাতিদুষ্ট ও নিমিত্তদুষ্ট হয়েছে কি না, তা সকল সময়েই খুব নজর রাখতে হয়। কিন্তু এদেশে ঐদিকে নজর একেবারেই উঠে গেছে। কেবল শেষোক্ত দোষটি—যা যোগী ভিন্ন অন্য কেউ প্রায় বুঝতেই পারে না, তা নিয়েই যত লাঠালাঠি চলছে, 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা' ক'রে ছুঁৎমার্গীর দল দেশটাকে ঝালাপালা করেছে। তাও ভালমন্দ লোকের বিচার নেই; গলায় একগাছা সুতো থাকলেই হ'ল, তার হাতে অন্ন খেতে ছুঁৎমার্গী-দের আর আপত্তি নেই। খাদ্যের আশ্রয়দোষ ধরতে পারা একমাত্র ঠাকুরকেই দেখেছি। এমন অনেক ঘটনা হয়েছে, যেখানে তিনি কোন কোন লোকের ছোঁয়া খেতে পারেননি। বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানতে পেরেছি—বাস্তবিকই সে-সকল লোকের ভিতর কোন-না-কোন বিশেষ দোষ ছিল। তোদের যত কিছু ধর্ম এখন দাঁড়িয়েছে গিয়ে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে! অপর জাতির ছোঁয়া ভাতটা না খেলেই যেন ভগবান-লাভ হয়ে গেল! শাস্ত্রের মহান্ সত্যসকল ছেড়ে কেবল খোসা নিয়েই মারামারি চলছে।

শিষ্য। মহাশয়, তবে কি আপনি বলিতে চান, সকলের স্পৃষ্ট অন্ন খাওয়াই আমাদের কর্তব্য?

স্বামীজী। তা কেন ব'লব? আমার কথা হচ্ছে তুই বামুন, অপর জাতের অন্ন নাই খেলি; কিন্তু তুই সব বামুনের অন্ন কেন খাবিনি? তোরা রাঢ়ীশ্রেণী বলে বারেন্দ্র বামুনের অন্ন খেতে আপত্তি হবে কেন? আর বারেন্দ্র বামুনই বা তোদের অন্ন না খাবে কেন? মারাঠী, তেলেঙ্গী ও কনোজী বামুনই বা তোদের অন্ন না খাবে কেন?

কলকাতায় জাতবিচারটা আরও কিছু মজার। দেখা যায়, অনেক বামুন-কায়েতই হোটেলে ভাত মারছেন; তাঁরাই আবার মুখ পুঁছে এসে সমাজের নেতা হচ্ছেন; তাঁরাই অন্যের জন্য জাতবিচার ও অন্নবিচারের আইন করছেন! বলি ঐসব কপটাদের আইনমত কি সমাজকে চলতে হবে? ওদের কথা ফেলে দিয়ে সনাতন ঋষিদের শাসন চালাতে হবে, তবেই দেশের কল্যাণ।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, কলিকাতার অধুনাতন সমাজে ঋষিশাসন চলিতেছে না?

স্বামীজী। শুধু কলকাতায় কেন? আমি ভারতবর্ষ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছি, কোথাও ঋষিশাসনের ঠিক ঠিক প্রচলন নেই। কেবল লোকাচার, দেশাচার আর স্ত্রী-আচার—এতেই সকল জায়গায় সমাজ শাসিত হচ্ছে। শাস্ত্রফাস্ত্র কি কেউ পড়ে—না, প'ড়ে সেইমত সমাজকে চালাতে চায়?

শিষ্য। তবে মহাশয়, এখন আমাদের কি করিতে হইবে?

স্বামীজী। ঋষিগণের মত চালাতে হবে; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিদের মন্ত্রে দেশটাকে দীক্ষিত করতে হবে। তবে সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন ক'রে দিতে হবে। এই দেখ্ না ভারতের কোথাও আর চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগ দেখা যায় না। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার জাতে দেশের লোকগুলোকে ভাগ করতে হবে। সব বামুন এক ক'রে একটি ব্রাহ্মণজাত গড়তে হবে। এইরূপ সব ক্ষত্রিয়, সব বৈশ্য, সব শূদ্রদের নিয়ে অন্য তিনটি জাত ক'রে সকল জাতিকে বৈদিক প্রণালীতে আনতে হবে। নতুবা শুধু 'তোমায় ছোঁব না' বললেই কি দেশের কল্যাণ হবে রে? কখনই নয়।

২৭

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(ঐ নির্ম্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য। স্বামীজী, বর্ত্তমান কালে আমাদের সমাজ ও দেশের এত দুর্দশা হইয়াছে কেন?

স্বামীজী। তোরাই সে জন্য দায়ী।

শিষ্য। বলেন কি? কেমন করিয়া?

স্বামীজী। বহুকাল থেকে দেশের নীচ জাতদের ঘেন্না ক'রে ক'রে তোরা এখন জগতে ঘৃণাভাজন হয়ে পড়েছিস!

শিষ্য। কবে আবার আমরা উহাদের ঘৃণা করিলাম?

স্বামীজী। কেন? ভটচাযের দল তোরাই তো বেদবেদান্তাদি যত সারবান্ শাস্ত্রগুলি ব্রাহ্মণেতর জাতদের কখনও পড়তে দিসনি, তাদের ছুঁসনি, তাদের কেবল নীচে দাবিয়ে রেখেছিস, স্বার্থপরতা থেকে তোরাই তো চিরকাল ঐরূপ ক'রে আসছিস। ব্রাহ্মণেরাই তো ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিকে একচেটে ক'রে বিধি-নিষেধ তাদেরই হাতে রেখেছিল; আর ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতগুলিকে নীচ ব'লে ব'লে তাদের মনে ধারণা করিয়ে দিয়েছিল যে, তারা সত্যসত্যই হীন। তুই যদি একটা লোককে খেতে শুতে বসতে সর্বক্ষণ বলিস, 'তুই নীচ, তুই নীচ'—তবে সময়ে তার ধারণা হবেই হবে, 'আমি সত্যসত্যই নীচ।' ইংরেজীতে একে বলে hypnotise (হিপ্‌নোটাইজ) বা মন্ত্রমুগ্ধ করা। ব্রাহ্মণেতর জাতগুলির একটু একটু ক'রে চমক ভাঙছে। ব্রাহ্মণদের তন্ত্রেমন্ত্রে তাদের আস্থা কমে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে ব্রাহ্মণদের সব তুকতাক এখন ভেঙে পড়ছে, পদ্মার পাড় ধসে যাবার মতো, দেখতে পাচ্ছিস তো?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আচার-বিচারটা আজকাল ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

স্বামীজী। পড়বে না? ব্রাহ্মণেরা যে ক্রমে ঘোর অনাচার-অত্যাচার আরম্ভ করেছিল! স্বার্থপর হয়ে কেবল নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্য কত কি অদ্ভুত অবৈদিক, অনৈতিক, অযৌক্তিক মত চালিয়েছিল! তার ফলও হাতে হাতেই পাচ্ছে।

শিষ্য। কি ফল পাইতেছে, মহাশয়?

স্বামীজী। ফলটা কি দেখতে পাচ্ছিস না? তোরা যে ভারতের অপর সাধারণ জাতগুলিকে ঘেন্না করেছিলি, তার জন্যই এখন তোদের হাজার বছরের দাসত্ব করতে হচ্ছে, তাই তোরা এখন বিদেশীর ঘৃণাস্থল ও স্বদেশবাসিগণের উপেক্ষাস্থল হয়ে রয়েছিস।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, এখনও তো ব্যবস্থাদি ব্রাহ্মণদের মতেই চলিতেছে; গর্ভাধান হইতে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপেই লোকে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বলিতেছেন, সেইরূপই করিতেছে। তবে আপনি ঐরূপ বলিতেছেন কেন?

স্বামীজী। কোথায় চলছে? শাস্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার কোথায় চলছে? আমি তো ভারতবর্ষটা সব ঘুরে দেখেছি, সর্বত্রই শ্রুতি-স্মৃতি-বিগর্হিত দেশাচারে সমাজ শাসিত হচ্ছে! লোকাচার, দেশাচার ও স্ত্রী-আচার—এই এখন সর্বত্র স্মৃতিশাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে! কে কার কথা শুনছে? টাকা দিতে পারলেই ভটচাযের দল যা-তা বিধি-নিষেধ লিখে দিতে রাজী আছেন! কয়জন ভটচায বৈদিক কল্প-গৃহ্য-ও শ্রৌত-সূত্র পড়েছেন? তারপর দেখ্—বাঙলায় রঘুনন্দনের শাসন, আর একটু এগিয়ে দেখবি মিতাক্ষরার শাসন, আর একদিকে গিয়ে দেখ মনুস্মৃতির শাসন চলেছে! তোরা ভাবিস—সর্বত্র বুঝি একমত চলেছে! সেজন্যই আমি চাই—বেদের প্রতি লোকের সম্মান বাড়িয়ে বেদের চর্চা করাতে এবং সর্বত্র বেদের শাসন চালাতে।

শিষ্য। মহাশয়, তাহা কি এখন আর চলা সম্ভবপর?

স্বামীজী। বেদের সকল প্রাচীন নিয়মই চলবে না বটে, কিন্তু সময়োপযোগী বাদ-সাদ দিয়ে নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ ক'রে নূতন ছাঁচে গড়ে সমাজকে দিলে চলবে না কেন?

শিষ্য। মহাশয়, আমার ধারণা ছিল অন্ততঃ মনুর শাসনটা ভারতে সকলেই এখনও মানে।

স্বামীজী। কোথায় মানছে? তোদের নিজেদের দেশেই দেখ্ না—তন্ত্রের বামাচার তোদের হাড়ে হাড়ে ঢুকেছে। এমন কি, আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম—যা মৃত বৌদ্ধধর্মের কঙ্কালাবশিষ্ট—তাতেও ঘোর বামাচার ঢুকেছে। ঐ অবৈদিক বামাচারের প্রভাবটা খর্ব করতে হবে।

শিষ্য। মহাশয়, এ পক্ষোদ্ধার এখন সম্ভব কি?

স্বামীজী। তুই কি বলছিস, ভীরু কাপুরুষ? অসম্ভব ব'লে ব'লে তোরা দেশটা মজালি। মানুষের চেষ্টায় কি না হয়?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ দেশে পুনরায় না জন্মালে উহা সম্ভবপর মনে হয় না।

স্বামীজী। আরে, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থ চেষ্টার জন্যই তো তাঁরা মনু-যাজ্ঞবল্ক্য হয়েছিলেন, না আর কিছু! চেষ্টা করলে আমরাই যে মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের চেয়ে ঢের বড় হ'তে পারি! আমাদের মতই বা তখন চলবে না কেন?

শিষ্য। মহাশয়, ইতঃপূর্বে আপনিই তো বলিলেন, প্রাচীন আচারাদি দেশে চালাইতে হইবে। তবে মন্বাদিকে আমাদেরই মতো একজন বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন?

স্বামীজী। কি কথায় কি কথা নিয়ে এলি! তুই আমার কথাই বুঝতে পারছিস না। আমি কেবল বলেছি যে প্রাচীন বৈদিক আচারগুলি সমাজ- ও সময়োপযোগী ক'রে নূতন ছাঁচে গড়ে নূতনভাবে দেশে চালাতে হবে। নয় কি?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ।

স্বামীজী। তবে ও কি বলছিলি? তোরা শাস্ত্র পড়েছিস, আমার আশা-ভরসা তোরাই। আমার কথাগুলি ঠিক ঠিক বুঝে সেইভাবে কাজে লেগে যা।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আমাদের কথা শুনিবে কে? দেশের লোক উহা লইবে কেন?

স্বামীজী। তুই যদি ঠিক ঠিক বোঝাতে পারিস এবং যা বলবি তা হাতে-নাতে ক'রে দেখাতে পারিস তো অবশ্য নেবে। আর তোতাপাখীর মতো যদি কেবল শ্লোকই আওড়াস, বাক্যবাগীশ হয়ে কাপুরুষের মতো কেবল অপরের দোহাই দিস ও কাজে কিছুই না দেখাস, তা হ'লে তোর কথা কে শুনবে বল্?

শিষ্য। মহাশয়, সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে দুই-একটি উপদেশ দিন।

স্বামীজী। উপদেশ তো তোকে ঢের দিলুম; একটি উপদেশও অন্ততঃ কাজে পরিণত কর্। জগৎ দেখুক যে, তোর শাস্ত্র পড়া ও আমার কথা শোনা সার্থক হয়েছে। এই যে মন্বাদি শাস্ত্র পড়লি, আরও কত কি পড়লি, বেশ ক'রে ভেবে দেখ্—এর মূল ভিত্তি বা উদ্দেশ্য কি। সেই ভিত্তিটা বজায় রেখে সার সার তত্ত্বগুলি ও প্রাচীন ঋষিদের মত সংগ্রহ কর্ এবং সময়োপযোগী মতসকল তাতে নিবদ্ধ কর্; কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিস, যেন সমগ্র ভারতবর্ষের সকল জাতের, সকল সম্প্রদায়েরই ঐসকল নিয়মপালনে যথার্থ কল্যাণ হয়। লে ৺ দেখি ঐরূপ একখানা স্মৃতি; আমি দেখে সংশোধন ক'রে দেবো'খন।

শিষ্য। মহাশয়, ব্যাপারটি সহজসাধ্য নহে; কিন্তু ঐরূপে স্মৃতি লিখিলেও উহা চলিবে কি?

স্বামীজী। কেন চলবে না? তুই লেখ্ না। 'কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী'—যদি ঠিক ঠিক লিখিস তো একদিন না একদিন চলবেই। আপনাতে বিশ্বাস রাখ্। তোরাই তো পূর্বে বৈদিক ঋষি ছিলি। শুধু শরীর বদলিয়ে এসেছিস বইতো নয়? আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, তোদের ভেতর অনন্ত শক্তি রয়েছে! সেই শক্তি জাগা; ওঠ্, ওঠ্, লেগে পড়্, কোমর বাঁধ্। কি হবে দু-দিনের ধন-মান নিয়ে? আমার ভাব কি জানিস? আমি মুক্তি-ফুক্তি চাই না। আমার কাজ হচ্ছে—তোদের ভেতর এই ভাবগুলি জাগিয়ে দেওয়া; একটা মানুষ তৈরি করতে লক্ষ জন্ম যদি নিতে হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ঐরূপ কার্যে লাগিয়াই বা কি হইবে? মৃত্যু তো পশ্চাতে।

স্বামীজী। দূর ছোঁড়া, মরতে হয় একবারই মরবি। কাপুরুষের মতো অহরহঃ মৃত্যু-চিন্তা ক'রে বারে বারে মরবি কেন?

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, মৃত্যু-চিন্তা না হয় নাই করিলাম, কিন্তু এই অনিত্য সংসারে কর্ম করিয়াই বা ফল কি?

স্বামীজী। ওরে, মৃত্যু যখন অনিবার্য, তখন ইট-পাটকেলের মতো মরার চেয়ে বীরের মতো মরা ভাল। এ অনিত্য সংসারে দু-দিন বেশী বেঁচেই বা লাভ কি? It is better to wear out than rust out—জরাজীর্ণ

হয়ে একটু একটু ক'রে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে বীরের মতো অপরের এতটুকু কল্যাণের জন্যও লড়াই ক'রে মরাটা ভাল নয় কি?

শিষ্য। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে আজ অনেক বিরক্ত করিলাম।

স্বামীজী। ঠিক ঠিক জিজ্ঞাসুর কাছে দু-রাত্রি বকলেও আমার শ্রান্তি বোধ হয় না, আমি আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রে অনবরত বকতে পারি। ইচ্ছা করলে তো আমি হিমালয়ের গুহায় সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতে পারি। আর আজকাল দেখছিস তো মায়ের ইচ্ছায় কোথাও আমার খাবার ভাবনা নেই, কোন-না-কোন রকম জোটেই জোটে। তবে কেন ঐরূপ করি না? কেনই বা এদেশে রয়েছি? কেবল দেশের দশা দেখে ও পরিণাম ভেবে আর স্থির থাকতে পারিনে। সমাধি-ফমাধি তুচ্ছ বোধ হয়, 'তুচ্ছং ব্রহ্মপদং' হয়ে যায়। তোদের মঙ্গল-কামনা হচ্ছে আমার জীবনব্রত। যে দিন ঐ ব্রত শেষ হবে, সে দিন দেহ ফেলে চোঁচা দৌড় মারব!

শিষ্য মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্বামীজীর ঐ-সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিল। পরে বিদায়গ্রহণের আশায় তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল, 'মহাশয়, আজ তবে আসি।'

স্বামীজী। আসবি কেন রে? মঠে থেকেই যা না। সংসারীদের ভেতর গেলে মন আবার মলিন হয়ে যাবে। এখানে দেখ—কেমন হাওয়া, গঙ্গার তীর, সাধুরা সাধনভজন করছে, কত ভাল কথা হচ্ছে। আর কলকাতায় গিয়েই ছাইভস্ম ভাববি।

শিষ্য সহর্ষে বলিল, 'আচ্ছা মহাশয়, তবে আজ এখানেই থাকিব।'

স্বামীজী। 'আজ' কেন রে? একেবারে থেকে যেতে পারিস না? কি হবে ফের সংসারে গিয়ে?

শিষ্য স্বামীজীর ঐ কথা শুনিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিল; মনে যুগপৎ নানা চিন্তার উদয় হওয়ায় কোনই উত্তর দিতে পারিল না।

২৮

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

স্বামীজীর শরীর সম্প্রতি অনেকটা সুস্থ; মঠের নূতন জমিতে যে প্রাচীন বাড়িটি ছিল, তাহার ঘরগুলি মেরামত করিয়া বাসোপযোগী করা হইতেছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সমগ্র জমিটি মাটি ফেলিয়া ইতঃপূর্বেই সমতল করা হইয়া গিয়াছে। স্বামীজী আজ অপরাহ্ণে শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া মঠের জমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। স্বামীজীর হস্তে একটি দীর্ঘ যষ্টি, গায়ে গেরুয়া রঙের ফ্লানেলের আলখাল্লা, মস্তক অনাবৃত। শিষ্যের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে দক্ষিণমুখে ফটক পর্যন্ত গিয়া পুনরায় উত্তরাস্যে ফিরিতেছেন—এইরূপে বাড়ি হইতে ফটক ও ফটক হইতে বাড়ি পর্যন্ত বারংবার পদচারণা করিতেছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে বিল্বতরুমূল বাঁধানো হইতেছে; ঐ বেলগাছের অদূরে দাঁড়াইয়া স্বামীজী এইবার ধীরে ধীরে গান ধরিলেন:

গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনবো চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী যোগী জটাধারী!

—গান গাহিতে গাহিতে শিষ্যকে বলিলেন: হেথা 'আসবে কত দণ্ডী যোগী জটাধারী'! বুঝলি? কালে এখানে কত সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হবে! —বলিতে বলিতে বিল্বতরুমূলে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন, 'বিল্বতরুমূল বড়ই পবিত্র স্থান। এখানে ব'সে ধ্যানধারণা করলে শীঘ্র উদ্দীপনা হয়। ঠাকুর এ-কথা বলতেন।'

শিষ্য। মহাশয়, যাহারা আত্মানাত্মবিচারে রত, তাহাদের স্থানাস্থান, কালাকাল, শুদ্ধি-অশুদ্ধি-বিচারের আবশ্যকতা আছে কি?

স্বামীজী। যাঁদের আত্মজ্ঞানে 'নিষ্ঠা' হয়েছে, তাঁদের ঐসব বিচার করবার প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু ঐ নিষ্ঠা কি অমনি হলেই হ'ল? কত সাধ্যসাধনা করতে হয়, তবে হয়। তাই প্রথম প্রথম এক-আধটা

বাহ্য অবলম্বন নিয়ে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হয়। পরে যখন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয়, তখন কোন অবলম্বনের আর দরকার থাকে না।

শাস্ত্রে যে নানা প্রকার সাধনমার্গ নির্দিষ্ট হয়েছে, সে-সব কেবল ঐ আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য। তবে অধিকারিভেদে সাধনা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ঐ-সব সাধনাদিও এক প্রকার কর্ম; এবং যতক্ষণ কর্ম, ততক্ষণ আত্মার দেখা নেই। আত্ম-প্রকাশের অন্তরায়গুলি শাস্ত্রোক্ত সাধনরূপ কর্ম দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, কর্মের নিজের সাক্ষাৎ আত্ম-প্রকাশের শক্তি নেই; কতকগুলি আবরণকে দূর ক'রে দেয় মাত্র। তারপর আত্মা আপন প্রভায় আপনি উদ্‌ভাসিত হয়। বুঝলি? এইজন্য তোর ভাষ্যকার বলছেন, 'ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের লেশমাত্র সম্বন্ধ নেই।'

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, কোন না কোনরূপ কর্ম না করিলে যখন আত্ম-প্রকাশের অন্তরায়গুলির নিরাস হয় না, তখন পরোক্ষভাবে কর্মই তো জ্ঞানের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

স্বামীজী। কার্যকারণ-পরম্পরা-দৃষ্টিতে আপাততঃ ঐরূপ প্রতীয়মান হয় বটে। মীমাংসা-শাস্ত্রে ঐরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করেই 'কাম্য কর্ম নিশ্চিত ফল প্রসব করে'—এ-কথা বলা হয়েছে। নির্বিশেষ আত্মার দর্শন কিন্তু কর্মের দ্বারা হবার নয়। কারণ আত্মজ্ঞানপিপাসুর পক্ষে বিধান এই যে, সাধনাদি কর্ম করবে, অথচ তার ফলাফলে উদাসীন থাকবে। তবেই হ'ল—ঐ-সব সাধনাদি কর্ম সাধকের চিত্তশুদ্ধির কারণ ভিন্ন আর কিছুই নয়; কারণ ঐ সাধনাদির ফলেই যদি আত্মাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা যেত, তবে আর শাস্ত্রে সাধককে ঐ-সব কর্মের ফল ত্যাগ করতে ব'লত না। অতএব মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত ফলপ্রসূ কর্মবাদের নিরাকরণকল্পেই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের অবতারণা করা হয়েছে। বুঝলি?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, কর্মের ফলাফলেরই যদি প্রত্যাশা না রাখিলাম, তবে কষ্টকর কর্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন?

স্বামীজী। শরীরধারণ ক'রে সর্বক্ষণ একটা কিছু না ক'রে থাকতে পারা যায় না। জীবকে যখন কর্ম করতেই হচ্ছে, তখন যেভাবে কর্ম করলে

আত্মার দর্শন পেয়ে মুক্তিলাভ হয়, সেভাবে কর্ম করতেই নিষ্কাম কর্ম-যোগে বলা হয়েছে। আর তুই যে বললি 'প্রবৃত্তি হবে কেন?', তার উত্তর হচ্ছে এই যে, যত কিছু কর্ম করা যায় তা সবই প্রবৃত্তিমূলক; কিন্তু কর্ম ক'রে ক'রে যখন কর্ম থেকে কর্মান্তরে, জন্ম থেকে জন্মান্তরেই কেবল গতি হ'তে থাকে, তখন লোকের বিচারপ্রবৃত্তি কালে আপনা-আপনি জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করে—এই কর্মের অন্ত কোথায়? তখনি সে গীতামুখে ভগবান যা বলেছেন, 'গহনা কর্মণো গতিঃ'—তার মর্ম বুঝতে পারে। অতএব যখন কর্ম ক'রে ক'রে আর শান্তিলাভ হয় না, তখনই সাধক কর্মত্যাগী হয়। কিন্তু দেহধারণ ক'রে কিছু একটা নিয়ে তো থাকতে হবে—কি নিয়ে থাকবে বল্? তাই দু-চারটে সৎকর্ম ক'রে যায়, কিন্তু ঐ কর্মের ফলাফলের প্রত্যাশা রাখে না। কারণ, তখন তারা জেনেছে যে, ঐ কর্মফলেই জন্মমৃত্যুর বহুধা অঙ্কুর নিহিত আছে। সেই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞেরা সর্বকর্মত্যাগী—লোক-দেখানো দু-চারটে কর্ম করলেও তাতে তাঁদের কিছুমাত্র আঁট নেই। এঁরাই শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্মযোগী ব'লে কথিত হয়েছেন।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞের উদ্দেশ্যহীন কর্ম উন্মত্তের চেষ্টাদির ন্যায়?

স্বামীজী। তা কেন? নিজের জন্য, আপন শরীর-মনের সুখের জন্য কর্ম না করাই হচ্ছে কর্মফল ত্যাগ করা। ব্রহ্মজ্ঞ নিজ সুখান্বেষণই করেন না, কিন্তু অপরের কল্যাণ বা যথার্থ সুখলাভের জন্য কেন কর্ম করবেন না? তাঁরা ফলাসঙ্গরহিত হয়ে যা-কিছু কর্ম ক'রে যান, তাতে জগতের হিত হয়—সে-সব কর্ম 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' হয়। ঠাকুর বলতেন, 'তাদের পা কখনও বেচালে পড়ে না।' তাঁরা যা যা করেন, তাই অর্থবন্ত হয়ে দাঁড়ায়। উত্তরচরিতে পড়িসনি—'ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থো-ঽনুধাবতি।'—ঋষিদের বাক্যের অর্থ আছেই আছে, কখনও নিরর্থক বা মিথ্যা হয় না। মন যখন আত্মায় লীন হয়ে বৃত্তিহীন-প্রায় হয়, তখনই [ঠিক ঠিক] 'ইহামুত্রফলভোগবিরাগ' জন্মায় অর্থাৎ সংসারে বা মৃত্যুর পর স্বর্গাদিতে কোন প্রকার সুখভোগ করবার বাসনা থাকে না—মনে আর সংকল্প-বিকল্পের তরঙ্গ থাকে না। কিন্তু ব্যুত্থানকালে অর্থাৎ সমাধি

বা ঐ বৃত্তিহীন অবস্থা থেকে নেমে মন যখন আবার 'আমি-আমার' রাজ্যে আসে, তখন পূর্বকৃত কর্ম বা অভ্যাস বা প্রারব্ধজনিত সংস্কারবশে দেহাদির কর্ম চলতে থাকে। মন তখন প্রায়ই superconscious (অতিচেতন) অবস্থায় থাকে; না খেলে নয়, তাই খাওয়া-দাওয়া থাকে—দেহাদি-বুদ্ধি এত অল্প বা ক্ষীণ হয়ে যায়। এই অতিচেতন ভূমিতে পৌঁছে যা যা করা যায়, তাই ঠিক ঠিক করতে পারা যায়; সে-সব কাজে জীবের ও জগতের যথার্থ হিত হয়, কারণ তখন কর্তার মন আর স্বার্থপরতায় বা নিজের লাভ-লোকসান খতিয়ে দূষিত হয় না। ঈশ্বর superconscious state-এ (জ্ঞানাতীত ভূমিতে) সর্বদা অবস্থান করেই এই জগদ্রূপ বিচিত্র সৃষ্টি করেছেন; এ সৃষ্টিতে সেইজন্য কোন কিছু imperfect (অসম্পূর্ণ) দেখা যায় না। এইজন্যই বলছিলুম, আত্মজ্ঞের ফলাসক্তিরহিত কর্মাদি অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ হয় না—তাতে জীবের ও জগতের ঠিক ঠিক কল্যাণ হয়।

শিষ্য। আপনি ইতঃপূর্বে বলিলেন, জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরবিরোধী। ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের তিলমাত্র স্থান নাই, অথবা কর্মের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মদর্শন হয় না, তবে আপনি মহা রজোগুণের উদ্দীপক উপদেশ—মধ্যে মধ্যে দেন কেন? এই সেদিন আমাকেই বলিতেছিলেন, 'কর্ম কর্ম কর্ম—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

স্বামীজী। আমি দুনিয়া ঘুরে দেখলুম, এদেশের মতো এত অধিক তামস-প্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাইরে সাত্ত্বিকতার ভান, ভেতরে একেবারে ইট-পাটকেলের মতো জড়ত্ব—এদের দ্বারা জগতের কি কাজ হবে? এমন অকর্মা, অলস, শিশ্নোদরপরায়ণ জাত দুনিয়ায় কতদিন আর বেঁচে থাকতে পারবে? ওদেশ (পাশ্চাত্য) বেড়িয়ে আগে দেখে আয়, পরে আমার ঐ কথার প্রতিবাদ করিস। তাদের জীবনে কত উদ্যম, কত কর্মতৎপরতা, কত উৎসাহ, কত রজোগুণের বিকাশ! তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে, ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুটতে পারছে না, সর্বাঙ্গে paralysis (পক্ষাঘাত) হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছে! আমি তাই এদের ভেতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে

সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই! কি হবে রে, জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা? আমি নেড়ে চেড়ে এদের ভেতর সাড় আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম। তোরা ঐ কাজে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে-গাঁয়ে দেশে-দেশে এই অভয়বাণী আচণ্ডালব্রাহ্মণকে শোনাগে। সকলকে ধ'রে ধ'রে বল্‌গে যা—তোমরা অমিতবীর্য, অমৃতের অধিকারী। এইভাবে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর্‌—জীবনসংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর্‌, তারপর মুক্তিলাভের কথা তাদের বল্‌। আগে ভেতরের শক্তি জাগ্রত ক'রে দেশের লোককে নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করা, উত্তম অশন-বসন, উত্তম ভোগ আগে করতে শিখুক, তার পর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি ক'রে মুক্ত হ'তে পারবে, তা বলে দে। আলস্য, হীনবুদ্ধিতা, কপটতায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে! বুদ্ধিমান লোক এ দেখে কি স্থির হয়ে থাকতে পারে? কান্না পায় না? মান্দ্রাজ, বম্বে, পাঞ্জাব, বাঙলা—যেদিকে চাই, কোথাও যে জীবনীশক্তির চিহ্ন দেখি না। তোরা ভাবছিস—আমরা শিক্ষিত। কি ছাই মাথামুণ্ড শিখেছিস? কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ ক'রে মাথার ভেতরে পুরে পাস ক'রে ভাবছিস, আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা!! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানিগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকিল হওয়া, না হয় বড়জোর কেরানিগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরি—এই তো! এতে তোদেরই বা কি হ'ল, আর দেশেরই বা কি হ'ল? একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি?—কখনও নয়। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানসহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর্‌—চাকরি গুখুরি ক'রে নয়; নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞানসহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার ক'রে। ঐ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ-তৎপর হ'তে উপদেশ দিই। অন্নবস্ত্রাভাবে

চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কি করছিস? ফেলে দে তোর শাস্ত্রফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস। কর্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হ'লে ধর্ম-কথায় কেউ কান দেবে না। তাই বলি আগে আপনার ভেতর অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর্, তারপর দেশের ইতরসাধারণ সকলের ভেতর যতটা পারিস ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত ক'রে প্রথম অন্ন-সংস্থান, পরে ধর্মলাভ করতে তাদের শেখা। আর বসে থাকবার সময় নেই। কখন কার মৃত্যু হবে, তা কে বলতে পারে?

কথাগুলি বলিতে বলিতে ক্ষোভ দুঃখ ও করুণার সহিত অপূর্ব এক তেজের মিলনে স্বামীজীর বদন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চক্ষে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার তখনকার সেই দিব্যমূর্তি অবলোকন করিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে শিষ্যের আর কথা সরিল না! কতক্ষণ পরে স্বামীজী পুনরায় বলিলেন:

ঐরূপ কর্মতৎপরতা ও আত্মনির্ভরতা কালে দেশে আসবেই আসবে—বেশ দেখতে পাচ্ছি; There is no escape (গত্যন্তর নেই);…ঠাকুরের জন্মাবার সময় হতেই পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে; কালে তার উজ্জ্বল ছটায় দেশ মধ্যাহ্ন-সূর্যকরে আলোকিত হবে।

২৯

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

মঠ-বাটী নির্মাণ হইয়াছে, সামান্য একটু-আধটু যাহা বাকি আছে, স্বামীজীর অভিমতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাহা শেষ করিতেছেন। স্বামীজীর শরীর তত ভাল নয়, তাই ডাক্তারগণ তাঁহাকে নৌকায় করিয়া গঙ্গাবক্ষে সকাল-সন্ধ্যা বেড়াইতে বলিয়াছেন। নড়ালের রায়বাবুদের বজরাখানি কিছুদিনের জন্য মঠের সামনে বাঁধা রহিয়াছে। স্বামীজী ইচ্ছামত কখন কখন ঐ বজরায় করিয়া গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

আজ রবিবার। শিষ্য মঠে আসিয়াছে এবং আহারান্তে স্বামীজীর ঘরে বসিয়া স্বামীজীর সহিত কথোপকথন করিতেছে। মঠে এই সময় স্বামীজী সন্ন্যাসী ও বালব্রহ্মচারিগণের জন্য কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, গৃহস্থদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকাই ঐগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; যথা—পৃথক আহারের স্থান, পৃথক বিশ্রামের স্থান ইত্যাদি। ঐ বিষয় লইয়াই এখন কথাবার্তা হইতে লাগিল।

স্বামীজী। গেরস্তদের গায়ে-কাপড়ে আজকাল কেমন একটা সংযমহীনতার গন্ধ পাই; তাই মঠে নিয়ম করেছি, গেরস্তরা সাধুদের বিছানায় না বসে, না শোয়। আগে শাস্ত্রে পড়তুম যে, ঐরূপ পাওয়া যায় এবং সেজন্য সন্ন্যাসীরা গৃহস্থদের গন্ধ সইতে পারে না। এখন দেখছি—ঠিক কথা। নিয়মগুলি প্রতিপালন ক'রে চললে বালব্রহ্মচারীদের কালে ঠিক ঠিক সন্ন্যাস হবে। সন্ন্যাস-নিষ্ঠা দৃঢ় হ'লে পর গৃহস্থদের সহিত সমভাবে মিলে-মিশে থাকলেও আর ক্ষতি হবে না। কিন্তু এখন নিয়মের গণ্ডির ভেতর না রাখলে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা সব বিগড়ে যাবে। যথার্থ ব্রহ্মচারী হ'তে হ'লে প্রথম প্রথম সংযম সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন ক'রে চলতে হয়, স্ত্রীলোকের নাম-গন্ধ থেকে তো দূরে থাকতেই হয়, তা ছাড়া স্ত্রীসঙ্গীদের সঙ্গও ত্যাগ করতেই হয়।

গৃহস্থাশ্রমী শিষ্য স্বামীজীর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল এবং মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদিগের সহিত পূর্বের মতো সমভাবে মিশিতে পারিবে না

ভাবিয়া বিমর্ষ হইয়া কহিল, 'কিন্তু মহাশয়, এই মঠ ও মঠস্থ যাবতীয় লোককে আমার বাড়ি-ঘর স্ত্রী-পুত্রের অপেক্ষা অধিক আপনার বলিয়া মনে হয়। ইহারা সকলে যেন কতকালের চেনা! মঠে আমি যেমন সর্বতোমুখী স্বাধীনতা উপভোগ করি, জগতের কোথাও আর তেমন করি না!'

স্বামীজী। যত শুদ্ধসত্ত্ব লোক আছে, সবারই এখানে ঐরূপ অনুভূতি হবে। যার হয় না, সে জানবি এখানকার লোক নয়। কত লোক হুজুগে মেতে এসে আবার যে পালিয়ে যায়, উহাই তার কারণ। ব্রহ্মচর্যবিহীন, দিনরাত অর্থ অর্থ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সব লোকে এখানকার ভাব কখনও বুঝতে পারবে না, কখনও মঠের লোককে আপনার ব'লে মনে করবে না। এখানকার সন্ন্যাসীরা সেকেলে ছাই-মাখা, মাথায়-জটা, চিম্‌টে-হাতে, ঔষধ-দেওয়া সন্ন্যাসীদের মতো নয়; তাই লোকে দেখে শুনে কিছুই বুঝতে পারে না। আমাদের ঠাকুরের চালচলন ভাব— সকলই নূতন ধরনের ছিল, তাই আমরাও সব নূতন রকমের; কখন সেজে-গুজে বক্তৃতা দিই, আবার কখন 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' ব'লে ছাই মেখে পাহাড়-জঙ্গলে ঘোর তপস্যায় মন দিই!

শুধু সেকেলে পাঁজি-পুঁথির দোহাই দিলে এখন আর কি চলে রে? এই পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্বেল প্রবাহ তর্‌তর্ ক'রে এখন দেশ জুড়ে বয়ে যাচ্ছে। তার উপযোগিতা একটুও প্রত্যক্ষ না ক'রে কেবল পাহাড়ে বসে ধ্যানস্থ থাকলে এখন আর কি চলে? এখন চাই গীতায় ভগবান যা বলেছেন—প্রবল কর্মযোগ, হৃদয়ে অসীম সাহস, অমিত বল পোষণ করা। তবে তো দেশের লোকগুলো সব জেগে উঠবে, নতুবা তুমি যে তিমিরে, তারাও সেই তিমিরে।

বেলা প্রায় অবসান। স্বামীজী গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণোপযোগী সাজ করিয়া নীচে নামিলেন এবং মঠের জমিতে যাইয়া পূর্বদিকে এখন যেখানে পোস্তা গাঁথা হইয়াছে, সেখানে পদচারণা করিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইতে লাগিলেন। পরে বজরাখানি ঘাটে আনা হইলে স্বামী নির্ভয়ানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ ও শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় উঠিলেন।

নৌকায় উঠিয়া স্বামীজী ছাতে বসিলে শিষ্য তাঁহার পাদমূলে উপবেশন করিল। গঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি নৌকার তলদেশে প্রতিহত হইয়া

কলকল শব্দ করিতেছে, মৃদুল মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে, আকাশের পশ্চিমদিক এখনও সন্ধ্যার রক্তিম রাগে রঞ্জিত হয় নাই, ভগবান মরীচিমালী অস্ত যাইতে এখনও অর্ধঘণ্টা বাকি। নৌকা উত্তর দিকে চলিয়াছে। স্বামীজীর মুখে প্রফুল্লতা, নয়নে কোমলতা, কথায় উদাসীনতা! সে এক ভাবপূর্ণ রূপ—বুঝানো অসম্ভব!

এইবার দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়া নৌকা অনুকূল বায়ুবশে আরও উত্তরে অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি দেখিয়া শিষ্য ও অপর সন্ন্যাসিদ্বয় প্রণাম করিল। স্বামীজী কিন্তু কি এক গভীর ভাবে আত্মহারা হইয়া এলো-থেলো ভাবে বসিয়া রহিলেন! শিষ্য ও সন্ন্যাসীরা পরস্পরে দক্ষিণেশ্বরের কত কথা বলিতে লাগিল, সে-সকল কথা যেন তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্টই হইল না। দেখিতে দেখিতে নৌকা পেনেটির দিকে অগ্রসর হইল। পেনেটিতে ৺গোবিন্দকুমার চৌধুরীর বাগানবাটীর ঘাটে নৌকা কিছুক্ষণের জন্য বাঁধা হইল। এই বাগানখানিই ইতঃপূর্বে একবার মঠের জন্য ভাড়া করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। স্বামীজী অবতরণ করিয়া বাগান ও বাটী বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'বাগানটি বেশ, কিন্তু কলকাতা থেকে অনেক দূর; ঠাকুরের শিষ্য (ভক্ত)দের যেতে আসতে কষ্ট হ'ত; এখানে মঠ যে হয়নি, তা ভালই হয়েছে।'

এইবার নৌকা আবার মঠের দিকে চলিল এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে চলিতে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল।

৩০

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৮৯৯ খৃঃ প্রারম্ভ

শিষ্য অদ্য নাগ-মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মঠে আসিয়াছে।

স্বামীজী। (নাগ-মহাশয়কে প্রণাম করিয়া) ভাল আছেন তো?

নাগ-মহাশয়। আপনাকে দর্শন করতে এলাম। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিব-দর্শন হ'ল।

কথাগুলি বলিয়া নাগ-মহাশয় করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

স্বামীজী। শরীর কেমন আছে?

নাগ-মহাশয়। ছাই হাড়মাসের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার দর্শনে আজ ধন্য হলাম, ধন্য হলাম।

ঐরূপ বলিয়া নাগ-মহাশয় স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

স্বামীজী। (নাগ-মহাশয়কে তুলিয়া) ও কি করছেন?

নাগ-মঃ। আমি দিব্য চক্ষে দেখছি, আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম। জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ!

স্বামীজী। (শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া) দেখছিস, ঠিক ভক্তিতে মানুষ কেমন হয়! নাগ-মহাশয় তন্ময় হয়ে গেছেন, দেহবুদ্ধি একেবারে গেছে! এমনটি আর দেখা যায় না। (প্রেমানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া) নাগ-মহাশয়ের জন্য প্রসাদ নিয়ে আয়।

নাগ-মঃ। প্রসাদ! প্রসাদ! (স্বামীজীর প্রতি করজোড়ে) আপনার দর্শনে আজ আমার ভবক্ষুধা দূর হয়ে গেছে।

মঠে ব্রহ্মচারী- ও সন্ন্যাসিগণ উপনিষদ পাঠ করিতেছিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আজ ঠাকুরের একজন মহাভক্ত এসেছেন। নাগ মহাশয়ের শুভাগমনে আজ তোদের পাঠ বন্ধ থাকলো।' সকলেই বই বন্ধ করিয়া নাগ-মহাশয়ের চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। স্বামীজীও নাগ-মহাশয়ের সম্মুখে বসিলেন।

স্বামীজী। (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) দেখছিস! নাগ-মহাশয়কে দেখ; ইনি গেরস্ত, কিন্তু জগৎ আছে কি নেই, এঁর সে জ্ঞান নেই; সর্বদা তন্ময়

হয়ে আছেন! (নাগ-মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) এই সব ব্রহ্মচারীদের ও আমাদের ঠাকুরের কিছু কথা শোনান।

নাগ-মঃ। ও কি বলেন! ও কি বলেন! আমি কি ব'লব? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি; ঠাকুরের লীলার সহায় মহাবীরকে দর্শন করতে এসেছি; ঠাকুরের কথা এখন লোকে বুঝবে। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামীজী। আপনিই যথার্থ রামকৃষ্ণদেবকে চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরেই মরলুম।

নাগ-মঃ। ছি! ও-কথা কি বলছেন! আপনি ঠাকুরের ছায়া—এপিঠ আর ওপিঠ; যার চোখ আছে, সে দেখুক।

স্বামীজী। এ-সব যে মঠ-ফঠ হচ্ছে, এ কি ঠিক হচ্ছে?

নাগ-মঃ। আমি ক্ষুদ্র, আমি কি বুঝি? আপনি যা করেন, নিশ্চয় জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে—মঙ্গল হবে।

অনেকে নাগ-মহাশয়ের পদধূলি লইতে ব্যস্ত হওয়ায় নাগ-মহাশয় উন্মাদের মতো হইলেন। স্বামীজী সকলকে বলিলেন, 'যাতে এঁর কষ্ট হয়, তা ক'রো না।' শুনিয়া সকলে নিরস্ত হইলেন।

স্বামীজী। আপনি এসে মঠে থাকুন না কেন? আপনাকে দেখে মঠের ছেলেরা সব শিখবে।

নাগ-মঃ। ঠাকুরকে ঐ কথা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, 'গৃহেই থেকো।' তাই গৃহেই আছি; মধ্যে মধ্যে আপনাদের দেখে ধন্য হয়ে যাই।

স্বামীজী। আমি একবার আপনার দেশে যাব।

নাগ-মঃ। (আনন্দে উন্মত্ত হইয়া) এমন দিন কি হবে? দেশ কাশী হয়ে যাবে, কাশী হয়ে যাবে। সে অদৃষ্ট আমার হবে কি?

স্বামীজী। আমার তো ইচ্ছা আছে। এখন মা নিয়ে গেলে হয়।

নাগ-মঃ। আপনাকে কে বুঝবে—কে বুঝবে? দিব্য দৃষ্টি না খুললে চিনবার জো নেই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন; আর সকলে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র, কেউ বুঝতে পারেনি।

স্বামীজী। আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি—মহাবীর যেন নিজের শক্তিমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে—সাড়া নেই, শব্দ নেই।

সনাতন ধর্মভাবে একে কোনরূপে জাগাতে পারলে বুঝব, ঠাকুরের ও আমাদের আসা সার্থক হ'ল। কেবল ঐ ইচ্ছাটা আছে—মুক্তি-মুক্তি তুচ্ছ বোধ হয়েছে। আপনি আশীর্বাদ করুন যেন কৃতকার্য হওয়া যায়।

নাগ-মঃ। ঠাকুরের আশীর্বাদ। আপনার ইচ্ছার গতি ফেরায় এমন কাকেও দেখি না; যা ইচ্ছা করবেন, তাই হবে।

স্বামীজী। কই কিছুই হয় না—তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না।

নাগ-মঃ। তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হয়ে গেছে; আপনার যা ইচ্ছা, তা ঠাকুরেরই ইচ্ছা। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামীজী। কাজ করতে মজবুত শরীর চাই; এই দেখুন, এদেশে এসে অবধি শরীর ভাল নেই; ওদেশে বেশ ছিলুম।

নাগ-মঃ। শরীর ধারণ করলেই—ঠাকুর বলতেন—'ঘরের টেক্স দিতে হয়।' রোগশোক সেই টেক্স। আপনি যে মোহরের বাক্স; ঐ বাক্সের খুব যত্ন চাই। কে করবে? কে বুঝবে? ঠাকুরই একমাত্র বুঝেছিলেন। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামীজী। মঠের এরা আমায় যত্নে রাখে।

নাগ-মঃ। যাঁরা করছেন তাঁদেরই কল্যাণ, বুঝুক আর নাই বুঝুক। সেবার কমতি হ'লে দেহ রাখা ভার হবে।

স্বামীজী। নাগ-মহাশয়! কি যে করছি, কি না করছি—কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, সেই মতো কাজ ক'রে যাচ্ছি, এতে ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছি না।

নাগ-মঃ। ঠাকুর যে বলেছিলেন—'চাবি দেওয়া রইল।' তাই এখন বুঝতে দিচ্ছেন না। বুঝামাত্রই লীলা ফুরিয়ে যাবে।

স্বামীজী একদৃষ্টে কি ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া আসিলেন এবং নাগ-মহাশয় ও অন্যান্য সকলকে দিলেন। নাগ-মহাশয় দুই হাতে করিয়া প্রসাদ মাথায় তুলিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক। প্রসাদ পাইয়া সকলে বাগানে পায়চারি করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে স্বামীজী একখানি কোদাল লইয়া আস্তে আস্তে মঠের পুকুরের পূর্বপারে মাটি কাটিতেছিলেন—নাগ-মহাশয়

দর্শনমাত্র তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, 'আমরা থাকতে আপনি ও কি করেন ?' স্বামীজী কোদাল ছাড়িয়া মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প বলিতে লাগিলেন :

ঠাকুরের দেহ যাবার পর একদিন শুনলুম, নাগ-মহাশয় চার-পাঁচ দিন উপোস ক'রে তাঁর কলকাতায় খোলার ঘরে পড়ে আছেন ; আমি, হরি ভাই ও আর একজন মিলে তো নাগ-মহাশয়ের কুটীরে গিয়ে হাজির ; দেখেই লেপমুড়ি ছেড়ে উঠলেন। আমি বললুম—আপনার এখানে আজ ভিক্ষা পেতে হবে। অমনি নাগ-মহাশয় বাজার থেকে চাল, হাঁড়ি, কাঠ প্রভৃতি এনে রাঁধতে শুরু করলেন। আমরা মনে করেছিলুম—আমরাও খাব, নাগ-মহাশয়কেও খাওয়াব। রান্নাবান্না ক'রে তো আমাদের দেওয়া হ'ল ; আমরা নাগ-মহাশয়ের জন্য সব রেখে দিয়ে আহারে বসলুম। আহারের পর, ওঁকে খেতে যাই অনুরোধ করা আর তখনি ভাতের হাঁড়ি ভেঙে ফেলে কপালে আঘাত ক'রে বলতে লাগলেন—'যে দেহে ভগবান-লাভ হ'ল না, সে দেহকে আবার আহার দিব ?' আমরা তো দেখেই অবাক ! অনেক ক'রে পরে কিছু খাইয়ে তবে আমরা ফিরে এলুম।

স্বামীজী। নাগ-মহাশয় আজ মঠে থাকবেন কি ?

শিষ্য। না। ওঁর কি কাজ আছে, আজই যেতে হবে।

স্বামীজী। তবে নৌকা দেখ। সন্ধ্যা হয়ে এল।

নৌকা আসিলে শিষ্য ও নাগ-মহাশয় স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন।

৩১

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী
কাল—(৩য় সপ্তাহ) জানুআরি, ১৮৯৯

আলমবাজার হইতে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে যখন মঠ উঠিয়া আসে, তাহার অল্পদিন পরে স্বামীজী তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের নিকট প্রস্তাব করেন যে, ঠাকুরের ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকল্পে বাঙলা ভাষায় একখানি সংবাদ-পত্র বাহির করিতে হইবে। স্বামীজী প্রথমতঃ একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রস্তাব করেন। কিন্তু উহা বিস্তর ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় পাক্ষিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাবই সকলের অভিমত হইল এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের উপর উহার পরিচালনের ভার অর্পিত হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীত এইরূপে কার্যভার গ্রহণ করিয়া ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ ঐ পত্র প্রথম প্রকাশ করিলেন। স্বামীজী ঐ পত্রের 'উদ্বোধন' নাম মনোনীত করেন।

পত্রের প্রস্তাবনা স্বামীজী নিজে লিখিয়া দেন এবং কথা হয় যে, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিবেন। সঙ্ঘরূপে পরিণত 'রামকৃষ্ণ মিশনের' সভ্যগণকে স্বামীজী এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং ঠাকুরের ধর্মসম্বন্ধীয় মত পত্রসহায়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইলে শিষ্য একদিন মঠে উপস্থিত হইল। শিষ্য প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী তাহার সহিত 'উদ্বোধন' পত্র সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন :

স্বামীজী। (পত্রের নামটি বিকৃত করিয়া পরিহাসচ্ছলে) 'উদ্বন্ধন' দেখেছিস ?

শিষ্য। আজ্ঞে হ্যাঁ ; সুন্দর হয়েছে।

স্বামীজী। এই পত্রের ভাব ভাষা—সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।

শিষ্য। কিরূপ ?

স্বামীজী। ঠাকুরের ভাব তো সব্বাইকে দিতে হবেই ; অধিকন্তু বাঙলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদের ব্যবহার) করলে, ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে। তুই ঐরূপ প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ কর্। আমায় আগে দেখিয়ে তবে উদ্বোধনে ছাপতে দিবি।

শিষ্য। মহাশয়, স্বামী ত্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

স্বামীজী। তুই বুঝি মনে করছিস, ঠাকুরের এইসব সন্ন্যাসী সন্তানেরা কেবল গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে জন্মেছে? এদের যে যখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক হবে। এদের কাছে কাজ কি ক'রে করতে হয়, তা শেখ্। এই দেখ্, আমার আদেশ পালন করতে ত্রিগুণাতীত সাধনভজন ধ্যানধারণা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কাজে নেবেছে। এ কি কম sacrifice (স্বার্থত্যাগ)-এর কথা! আমার প্রতি কতটা ভালবাসা থেকে এ কর্মপ্রবৃত্তি এসেছে বল্ দেখি! Success (কাজ হাসিল) ক'রে তবে ছাড়বে!! তোদের কি এমন রোক্ আছে?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীর গৃহীদের দ্বারে দ্বারে ঐরূপে ঘোরা আমাদের চক্ষে কেমন কেমন ঠেকে!

স্বামীজী। কেন? পত্রের প্রচার তো গৃহীদেরই কল্যাণের জন্য। দেশে নবভাব-প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম বুঝি তুই সাধন-ভজনের চেয়ে কম মনে করছিস? আমাদের উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রের আয় দ্বারা টাকা জমাবার মতলব আমাদের নেই। আমরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, মাগছেলে নেই যে, তাদের জন্য কিছু রেখে যেতে হবে। Success (কাজ হাসিল) হয় তো এর income (আয়টা) সমস্তই জীবসেবাকল্পে ব্যয়িত হবে। স্থানে স্থানে সঙ্ঘ-গঠন, সেবাশ্রম-স্থাপন, আরও কত কি হিতকর কাজে এর উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্ব্যয় হ'তে পারবে। আমরা তো গৃহীদের মতো নিজেদের রোজগারের মতলব এঁটে এ কাজ করছি না। শুধু পরহিতেই আমাদের সকল movement (কাজকর্ম)—এটা জেনে রাখবি।

শিষ্য। তাহা হইলেও—সকলে এভাব লইতে পারিবে না।

স্বামীজী। নাই বা পারলে। তাতে আমাদের এল গেল কি? আমরা criticism (সমালোচনা) গণ্য ক'রে কাজে অগ্রসর হইনি।

শিষ্য। মহাশয়, এই পত্র ১৫ দিন অন্তর বাহির হইবে; আমাদের ইচ্ছা সাপ্তাহিক হয়।

স্বামীজী। তা তো বটে, কিন্তু funds (টাকা) কোথায় ? ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকার যোগাড় হ'লে এটাকে পরে দৈনিকও করা যেতে পারে। রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার গলিতে গলিতে free distribution (বিনামূল্যে বিতরণ) করা যেতে পারে।

শিষ্য। আপনার এ সঙ্কল্প বড়ই উত্তম।

স্বামীজী। আমার ইচ্ছে হয়, কাগজটাকে পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তোকে editor (সম্পাদক) ক'রে দেবো। কোন বিষয়কে প্রথমটা পায়ে দাঁড় করাবার শক্তি তোদের এখনও হয়নি। সেটা করতে এইসব সর্বত্যাগী সাধুরাই সক্ষম। এরা কাজ ক'রে ক'রে মরে যাবে, তবু হটবার ছেলে নয়। তোরা একটু বাধা পেলে, একটু criticism (সমালোচনা) শুনলেই দুনিয়া আঁধার দেখিস!

শিষ্য। সেদিন দেখিলাম, স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রেসে ঠাকুরের ছবি পূজা করিয়া তবে কাজ আরম্ভ করিলেন এবং কার্যের সফলতার জন্য আপনার কৃপা প্রার্থনা করিলেন।

স্বামীজী। আমাদের centre (কেন্দ্র) তো ঠাকুরই। আমরা এক একজন সেই জ্যোতিঃকেন্দ্রের এক একটি ray (কিরণ)। ঠাকুরের পূজা ক'রে কাজটা আরম্ভ করেছে—বেশ করেছে। কই আমায় তো পূজোর কথা কিছু বললে না।

শিষ্য। মহাশয়, তিনি আপনাকে ভয় করেন। ত্রিগুণাতীত স্বামী আমায় কল্য বলিলেন, 'তুই আগে স্বামীজীর কাছে গিয়ে জেনে আয়, পত্রের ১ম সংখ্যা বিষয়ে তিনি কি অভিমত প্রকাশ করেছেন, তারপর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রব।'

স্বামীজী। তুই গিয়ে বলিস, আমি তার কাজে খুব খুশী হয়েছি। তাকে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি, তাকে সাহায্য করিস। ওতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে 'উদ্বোধনে'র জন্য ত্রিগুণাতীত স্বামীকে আরও টাকা দিতে আদেশ করিলেন। ঐ দিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজী পুনরায় শিষ্যের সহিত 'উদ্বোধন' পত্র সম্বন্ধে এরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন :

স্বামীজী। 'উদ্বোধনে' সাধারণকে কেবল positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। Negative thought (নেতি-বাচক ভাব) মানুষকে weak (দুর্বল) ক'রে দেয়। দেখছিস না, যে-সকল মা বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়, বলে 'এটার কিছু হবে না, বোকা, গাধা'—তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, children in the region of higher thoughts (ভাবরাজ্যের উচ্চস্তরে যারা শিশু, তাদের) সম্বন্ধেও তাই। Positive ideas (গঠনমূলক ভাবগুলি) দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হয়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐ-সব বিষয় কেমন ক'রে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই ব'লে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের feeling wounded (মনে আঘাত দেওয়া) হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি-গতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমটা অদ্ভুত!

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী একটু স্থির হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিলেন:

ধর্মপ্রচারটা কেবল যাতে তাতে এবং যার তার উপর নাকসিঁটকানো ব্যাপার ব'লে যেন বুঝিসনি। Physical, mental, spiritual (শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক) সকল ব্যাপারেই মানুষকে positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। কিন্তু ঘেন্না ক'রে নয়। পরস্পরকে ঘেন্না ক'রে ক'রেই তোদের অধঃপতন হয়েছে। এখন কেবল positive thought (গঠনমূলক ভাব) ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে। প্রথমে ঐরূপে সমস্ত হিঁদুজাতটাকে তুলতে হবে, তারপর জগৎটাকে তুলতে হবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়ার কারণই এই। তিনি জগতে কারও ভাব নষ্ট করেননি। মহা-অধঃপতিত মানুষকেও তিনি অভয় দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তাঁর পদানুসরণ ক'রে সকলকে তুলতে হবে, জাগাতে হবে। বুঝলি?

তোদের history, literature, mythology (ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাণ) প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ মানুষকে কেবল ভয়ই দেখাচ্ছে! মানুষকে কেবল বলছে—'তুই নরকে যাবি, তোর আর উপায় নেই!' তাই এত অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। সেই জন্য বেদ-বেদান্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে। 'উদ্বোধন' কাগজে এই-সব লিখে আবালবৃদ্ধবনিতাকে তোল্ দেখি। তবে জানব—তোর বেদ-বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। কি বলিস—পারবি?

শিষ্য। আপনার আশীর্বাদ ও আদেশ হইলে সকল বিষয়েই সিদ্ধকাম হইব বলিয়া মনে হয়!

স্বামীজী। আর একটা কথা—শরীরটাকে খুব মজবুত করতে তোকে শিখতে হবে ও সকলকে শেখাতে হবে। দেখছিসনে এখনও রোজ আমি ডামবেল কষি। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বেড়াবি; শারীরিক পরিশ্রম করবি। Body and mind must run parallel (দেহ ও মন সমানভাবে চলবে)। সব বিষয়ে পরের ওপর নির্ভর করলে চলবে কেন? শরীরটা সবল করবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলে নিজেরাই তখন ঐ বিষয়ে যত্ন করবে। সেই প্রয়োজনীয়তা-বোধের জন্যই এখন education-এর (শিক্ষার) দরকার।

৩২

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০০

এখন স্বামীজী বেশ সুস্থ আছেন। শিষ্য রবিবার প্রাতে মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর পাদপদ্ম-দর্শনান্তে নীচে আসিয়া স্বামী নির্মলানন্দের সহিত বেদান্ত-শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে। এমন সময়ে স্বামীজী নীচে নামিয়া আসিলেন এবং শিষ্যকে দেখিয়া বলিলেন, 'কিরে, তুলসীর সঙ্গে তোর কি বিচার হচ্ছিল?'

শিষ্য। মহাশয়, তুলসী মহারাজ বলিতেছিলেন, 'বেদান্তের ব্রহ্মবাদ কেবল তোর স্বামীজী আর তুই বুঝিস। আমরা কিন্তু জানি—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'

স্বামীজী। তুই কি বললি?

শিষ্য। আমি বলিলাম, এক আত্মাই সত্য। কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ছিলেন মাত্র। তুলসী মহারাজ ভিতরে বেদান্তবাদী, বাহিরে কিন্তু দ্বৈতবাদীর পক্ষ লইয়া তর্ক করেন। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া কথা অবতারণা করিয়া ক্রমে বেদান্তবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় প্রমাণিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উনি আমায় 'বৈষ্ণব' বলিলেই আমি ঐ কথা ভুলিয়া যাই এবং তাঁহার সহিত তর্কে লাগিয়া যাই।

স্বামীজী। তুলসী তোকে ভালবাসে কিনা, তাই ঐরূপ ব'লে তোকে খ্যাপায়। তুই চটবি কেন? তুইও বলবি, 'আপনি শূন্যবাদী নাস্তিক।'

শিষ্য। মহাশয়, উপনিষদে ঈশ্বর যে শক্তিমান্ ব্যক্তি-বিশেষ, এ কথা আছে কি? লোকে কিন্তু ঐরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্।

স্বামীজী। সর্বেশ্বর কখনও ব্যক্তিবিশেষ হ'তে পারেন না। জীব হচ্ছে ব্যষ্টি, আর সকল জীবের সমষ্টি হচ্ছেন ঈশ্বর। জীবের অবিদ্যা প্রবল; ঈশ্বর বিদ্যা ও অবিদ্যার সমষ্টি মায়াকে বশীভূত ক'রে রয়েছেন এবং স্বাধীনভাবে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎটা নিজের ভেতর থেকে project (বাহির) করেছেন। ব্রহ্ম কিন্তু ঐ ব্যষ্টি-সমষ্টির অথবা জীব ও ঈশ্বরের পারে বর্তমান। ব্রহ্মের অংশাংশভাগ হয় না। বোঝাবার জন্য তাঁর ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ ইত্যাদি কল্পনা করা হয়েছে মাত্র। যে পাদে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়

অধ্যাস হচ্ছে, সেই ভাগকেই শাস্ত্র 'ঈশ্বর' ব'লে নির্দেশ করেছে। অপর ত্রিপাদ কূটস্থ, যাতে কোনরূপ দ্বৈত-কল্পনার ভান নেই, তাই ব্রহ্ম। তা ব'লে এরূপ যেন মনে করিসনি যে, ব্রহ্ম—জীবজগৎ থেকে একটা স্বতন্ত্র বস্তু। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্মই জীবজগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, তা নয়, ব্রহ্মে এই জীবজগৎ অধ্যস্ত হয়েছে মাত্র; কিন্তু বস্তুতঃ ওতে ব্রহ্মের কোনরূপ পরিণাম হয়নি। অদ্বৈতবাদী বলেন, নামরূপ নিয়েই জগৎ। যতক্ষণ নামরূপ আছে, ততক্ষণই জগৎ আছে। ধ্যান-ধারণা-বলে যখন নামরূপের বিলয় হয়ে যায়, তখন এক ব্রহ্মই থাকেন। তখন তোর, আমার বা জীব-জগতের স্বতন্ত্র সত্তার আর অনুভব হয় না। তখন বোধ হয়, আমিই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ প্রত্যক্-চৈতন্য বা ব্রহ্ম। জীবের স্বরূপই হচ্ছেন ব্রহ্ম; ধ্যান-ধারণায় নামরূপের আবরণটা দূর হয়ে ঐ ভাবটা প্রত্যক্ষ হয় মাত্র। এই হচ্ছে শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সারমর্ম। বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র-ফাস্ত্র এই কথাই নানা রকমে বারংবার বুঝিয়ে দিচ্ছে।

শিষ্য। তাহা হইলে ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান্ ব্যক্তিবিশেষ—একথা আর সত্য হয় কিরূপে?

স্বামীজী। মনরূপ উপাধি নিয়েই মানুষ। মন দিয়েই মানুষকে সকল বিষয় ধরতে বুঝতে হচ্ছে। কিন্তু মন যা ভাবে, তা limited (সীমাবদ্ধ) হবেই। এ-জন্য নিজের personality (ব্যক্তিত্ব) থেকে ঈশ্বরের personality (ব্যক্তিত্ব) কল্পনা করা জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। মানুষ তার ideal (আদর্শ)-কে মানুষরূপেই ভাবতে সক্ষম। এই জরামরণসঙ্কুল জগতে এসে মানুষ দুঃখের ঠেলায় 'হা হতোঽস্মি' করে এবং এমন এক ব্যক্তির আশ্রয় চায়, যাঁর উপর নির্ভর ক'রে সে চিন্তাশূন্য হ'তে পারে। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? নিরাধার সর্বজ্ঞ আত্মাই একমাত্র আশ্রয়স্থল। প্রথমে মানুষ তা টের পায় না। বিবেক-বৈরাগ্য এলে ধ্যান-ধারণা করতে করতে সেটা ক্রমে টের পায়। কিন্তু যে যে-ভাবেই সাধন করুক না কেন, সকলেই অজ্ঞাতসারে নিজের ভেতরে অবস্থিত ব্রহ্মভাবকে জাগিয়ে তুলছে। তবে আলম্বন ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে। যার personal God (ব্যক্তিবিশেষ

ঈশ্বর)-এ বিশ্বাস আছে, তাকে ঐ ভাব ধরেই সাধনভজন করতে হয়। ঐকান্তিকতা এলে ঐ থেকেই কালে ব্রহ্ম-সিংহ তার ভেতরে জেগে ওঠেন। ব্রহ্মজ্ঞানই হচ্ছে জীবের goal (লক্ষ্য)। তবে নানা পথ—নানা মত। জীবের পারমার্থিক স্বরূপ ব্রহ্ম হলেও মনরূপ উপাধিতে অভিমান থাকায় সে হরেক রকম সন্দেহ-সংশয় সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু নিজের স্বরূপলাভে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলেই গতিশীল। যতক্ষণ না 'অহং ব্রহ্ম' এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হবে, ততক্ষণ এই জন্মমৃত্যু-গতির হাত থেকে কারুরই নিস্তার নেই। মানুষজন্ম লাভ ক'রে মুক্তির ইচ্ছা প্রবল হ'লে ও মহাপুরুষের কৃপালাভ হ'লে—তবে মানুষের আত্মজ্ঞানস্পৃহা বলবতী হয়। নতুবা কাম-কাঞ্চন-জড়িত লোকের ওদিকে মনের গতিই হয় না। মাগ-ছেলে ধন-মান লাভ করবে ব'লে মনে যার সঙ্কল্প রয়েছে, তার কি ক'রে ব্রহ্ম-বিবিদিষা হবে? যে সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, যে সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের চঞ্চল প্রবাহে ধীর স্থির শান্ত সমনস্ক, সেই আত্মজ্ঞানলাভে যত্নপর হয়। সেই 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী'—মহাবলে জগজ্জাল ছিন্ন ক'রে মায়ার গণ্ডি ভেঙে সিংহের মতো বেরিয়ে পড়ে।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, সন্ন্যাস ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পারে না?

স্বামীজী। তা একবার বলতে? অন্তর্বহিঃ উভয় প্রকারেই সন্ন্যাস অবলম্বন করা চাই। আচার্য শঙ্করও উপনিষদের 'তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ'[১]—এই অংশের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলছেন, লিঙ্গহীন অর্থাৎ সন্ন্যাসের বাহ্য চিহ্নস্বরূপ গৈরিকবসন দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ না ক'রে তপস্যা করলে দুরধিগম্য ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় না। বৈরাগ্য না এলে, ত্যাগ না এলে, ভোগস্পৃহা-ত্যাগ না হ'লে কি কিছু হবার জো আছে? 'সে যে ছেলের হাতে মোয়া নয় যে, ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে।'

শিষ্য। কিন্তু সাধন করিতে করিতে ক্রমে তো ত্যাগ আসিতে পারে?

স্বামীজী। যার ক্রমে আসে তার আসুক। তুই তা ব'লে বসে থাকবি কেন? এখনি খাল কেটে জল আনতে লেগে যা। ঠাকুর বলতেন, 'হচ্ছে-হবে

১ মুণ্ডক উপ.—৩।২।৪ মন্ত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য

—ও-সব মেদাটে ভাব।' পিপাসা পেলে কি কেউ বসে থাকতে পারে, না, জলের জন্ম ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়? পিপাসা পায়নি, তাই বসে আছিস। বিবিদিষা প্রবল হয়নি, তাই মাগ-ছেলে নিয়ে সংসার করছিস।

শিষ্য। বাস্তবিক কেন যে এখনও ঐরূপ সর্বস্ব-ত্যাগের বুদ্ধি হয় না, তাহা বুঝিতে পারি না। আপনি ইহার একটা উপায় করিয়া দিন।

স্বামীজী। উদ্দেশ্য ও উপায়—সবই তোর হাতে। আমি কেবল stimulate (উদ্বুদ্ধ) ক'রে দিতে পারি। এইসব সৎশাস্ত্র পড়ছিস, এমন ব্রহ্মজ্ঞ সাধুদের সেবা ও সঙ্গ করছিস—এতেও যদি না ত্যাগের ভাব আসে, তবে জীবনই বৃথা। তবে একেবারে বৃথা হবে না, কালে এর ফল তেড়েফুঁড়ে বেরুবেই বেরুবে।

শিষ্য। (অধোমুখে বিষণ্ণভাবে) মহাশয়, আমি আপনার শরণাগত, আমার মুক্তিলাভের পন্থা খুলিয়া দিন, আমি যেন এই শরীরেই তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারি।

স্বামীজী। (শিষ্যের অবসন্নতা দর্শন করিয়া) ভয় কি? সর্বদা বিচার করবি—এই দেহগেহ, জীবজগৎ সকলই নিঃশেষ মিথ্যা, স্বপ্নের মতো; সর্বদা ভাববি—এই দেহটা একটা জড় যন্ত্রমাত্র। এতে যে আত্মারাম পুরুষ রয়েছেন, তিনিই তোর যথার্থ স্বরূপ। মনরূপ উপাধিটাই তাঁর প্রথম ও সূক্ষ্ম আবরণ, তারপর দেহটা তাঁর স্থূল আবরণ হয়ে রয়েছে। নিষ্কল নির্বিকার স্বয়ংজ্যোতিঃ সেই পুরুষ এইসব মায়িক আবরণে আচ্ছাদিত থাকায় তুই তোর স্ব-স্বরূপকে জানতে পারছিস না। এই রূপ-রসে ধাবিত মনের গতি অন্তর্দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মনটাকে মারতে হবে। দেহটা তো স্থূল—এটা ম'রে পঞ্চভূতে মিশে যায়। কিন্তু সংস্কারের পুঁটলি—মনটা শীগগীর মরে না। বীজাকারে কিছুকাল থেকে আবার বৃক্ষে পরিণত হয়; আবার স্থূল শরীর ধারণ ক'রে জন্মমৃত্যুপথে গমনাগমন করে, এইরূপ যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান হয়। সেজন্ম বলি, ধ্যান-ধারণা ও বিচারবলে মনকে সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবিয়ে দে। মনটা ম'রে গেলেই সব গেল—ব্রহ্মসংস্থ হলি।

শিষ্য। মহাশয়, এই উদ্দাম উন্মত্ত মনকে ব্রহ্মাবগাহী করা মহা কঠিন।

স্বামীজী। বীরের কাছে আবার কঠিন ব'লে কোন জিনিস আছে? কাপুরুষেরাই ও-কথা বলে।—বীরাণামেব করতলগতা মুক্তিঃ, ন পুনঃ কাপুরুষাণাম্।[১] অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে মনকে সংযত কর্। গীতা বলছেন, 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।'[২] চিত্ত হচ্ছে যেন স্বচ্ছ হ্রদ। রূপরসাদির আঘাতে তাতে যে তরঙ্গ উঠছে, তার নামই মন। এজন্যই মনের স্বরূপ সংকল্পবিকল্পাত্মক। ঐ সঙ্কল্প-বিকল্প থেকেই বাসনা ওঠে। তারপর ঐ মনই ক্রিয়াশক্তিরূপে পরিণত হয়ে স্থূলদেহরূপ যন্ত্র দিয়ে কাজ করে। আবার কর্মও যেমন অনন্ত, কর্মের ফলও তেমনি অনন্ত। সুতরাং অনন্ত অযুত কর্মফলরূপ তরঙ্গে মন সর্বদা দুলছে। সেই মনকে বৃত্তিশূন্য ক'রে দিতে হবে—পুনরায় স্বচ্ছ হ্রদে পরিণত করতে হবে, যাতে বৃত্তিরূপ তরঙ্গ আর একটিও না থাকে; তবেই ব্রহ্ম প্রকাশ হবেন। শাস্ত্রকার ঐ অবস্থারই আভাস এই ভাবে দিচ্ছেন—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ' ইত্যাদি।[৩] বুঝলি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু ধ্যান তো বিষয়াবলম্বী হওয়া চাই?

স্বামীজী। তুই নিজেই নিজের বিষয় হবি। তুই সর্বগ আত্মা—এটিই মনন ও ধ্যান করবি। আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, স্থূল নই, সূক্ষ্ম নই—এইরূপে 'নেতি নেতি' ক'রে প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপ স্ব-স্বরূপে মনকে ডুবিয়ে দিবি। এরূপে মন-শালাকে বারংবার ডুবিয়ে ডুবিয়ে মেরে ফেলবি। তবেই বোধস্বরূপের বোধ বা স্ব-স্বরূপে স্থিতি হবে। ধ্যাতা-ধ্যেয়-ধ্যান তখন এক হয়ে যাবে; জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এক হয়ে যাবে। নিখিল অধ্যাসের নিবৃত্তি হবে। একেই শাস্ত্রে বলে—'ত্রিপুটিভেদ'। ঐরূপ অবস্থায় জানাজানি থাকে না। আত্মাই যখন একমাত্র বিজ্ঞাতা, তখন তাঁকে আবার জানবি কি ক'রে? আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই চৈতন্য, আত্মাই সচ্চিদানন্দ। যাকে সৎ বা অসৎ কিছুই ব'লে নির্দেশ করা যায় না, সেই অনির্বচনীয়-মায়াশক্তি-প্রভাবেই জীবরূপী ব্রহ্মের ভেতরে জ্ঞাতা-

১ মুক্তি বীরগণেরই করতলগত, কাপুরুষের নয়।

২ গীতা, ৬।৩৫

৩ মুণ্ডক উপ. ২।২।৮

জ্ঞেয়-জ্ঞানের ভাবটা এসেছে। এটাকেই সাধারণ মানুষ conscious state (চেতন বা জ্ঞানের অবস্থা) বলে। আর যেখানে এই দ্বৈত-সংঘাত নিরাবিল ব্রহ্মতত্ত্বে এক হয়ে যায়, তাকে শাস্ত্র superconscious state (সমাধি, সাধারণ জ্ঞানভূমি অপেক্ষা উচ্চাবস্থা) ব'লে এইরূপে বর্ণনা করেছেন—'স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্।'

(গভীর ভাবে মগ্ন হইয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন)

এই জ্ঞাতা-জ্ঞেয় বা জানাজানি-ভাব থেকেই দর্শন-শাস্ত্র বিজ্ঞান সব বেরিয়েছে। কিন্তু মানব-মনের কোন ভাব বা ভাষা জানাজানির পারের বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারছে না। দর্শন-বিজ্ঞানাদি partial truth (আংশিক সত্য)। ওরা সেজন্য পরমার্থতত্ত্বের সম্পূর্ণ expression (প্রকাশ) কখনই হ'তে পারে না। এই জন্য পরমার্থের দিক দিয়ে দেখলে সবই মিথ্যা ব'লে বোধ হয়—ধর্ম মিথ্যা, কর্ম মিথ্যা, আমি মিথ্যা, তুই মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। তখনই বোধ হয় যে আমিই সব, আমিই সর্বগত আত্মা, আমার প্রমাণ আমিই। আমার অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য আবার প্রমাণান্তরের অপেক্ষা কোথায়? শাস্ত্রে যেমন বলে, 'নিত্যমস্মৎ-প্রসিদ্ধম্'—নিত্যবস্তুরূপে ইহা স্বতঃসিদ্ধ—এইভাবেই আমি সর্বদা ইহা অনুভব করি। আমি ঐ অবস্থা সত্যসত্যই দেখেছি, অনুভূতি করেছি। তোরাও দেখ্, অনুভূতি কর্ আর জীবকে এই ব্রহ্মতত্ত্ব শোনাগে। তবে তো শান্তি পাবি।

ঐ কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল এবং তাঁহার মন যেন কোন্ এক অজ্ঞাতরাজ্যে যাইয়া কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া গেল! কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন:

এই সর্বমতগ্রাসিনী সর্বমতসমঞ্জসা ব্রহ্মবিদ্যা নিজে অনুভব কর্, আর জগতে প্রচার কর্। এতে নিজের মঙ্গল হবে, জীবেরও কল্যাণ হবে। তোকে আজ সারকথা বললাম; এর চাইতে বড় কথা আর কিছুই নেই।

শিষ্য। মহাশয়, আপনি এখন জ্ঞানের কথা বলিতেছেন; আবার কখন বা ভক্তির, কখন কর্মের এবং কখন যোগের প্রাধান্য কীর্তন করেন। উহাতে আমাদের বুদ্ধি গুলাইয়া যায়।

স্বামীজী। কি জানিস্—এই ব্রহ্মজ্ঞ হওয়াই চরম লক্ষ্য, পরম পুরুষার্থ। তবে মানুষ তো আর সর্বদা ব্রহ্মসংস্থ হয়ে থাকতে পারে না! ব্যুত্থান-কালে কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে। তখন এমন কর্ম করা উচিত, যাতে লোকের শ্রেয়োলাভ হয়। এইজন্য তোদের বলি, অভেদ-বুদ্ধিতে জীবসেবারূপ কর্ম কর্। কিন্তু বাবা, কর্মের এমন মারপ্যাঁচ যে বড় বড় সাধুরাও এতে বদ্ধ হয়ে পড়েন। সেইজন্য ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কর্ম করতে হয়। গীতায় ঐ কথাই বলেছে। কিন্তু জানবি, ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশও নেই; সৎকর্ম দ্বারা বড়জোর চিত্তশুদ্ধি হয়। এ-জন্যই ভাষ্যকার[১] জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়ের প্রতি এত তীব্র কটাক্ষ—এত দোষারোপ করেছেন। নিষ্কাম কর্ম থেকে কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞান হ'তে পারে। এও একটা উপায় বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ। এ কথাটা বেশ ক'রে জেনে রাখ্—বিচারমার্গ ও অন্য সকল প্রকার সাধনার ফল হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞতা লাভ করা।

শিষ্য। মহাশয়, একবার ভক্তি ও রাজযোগের উপযোগিত্ব বলিয়া আমার জানিবার আকাঙ্ক্ষা দূর করুন।

স্বামীজী। ঐ সব পথে সাধন করতে করতেও কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়ে যায়। ভক্তিমার্গ—slow process (মন্থর গতি), দেরীতে ফল হয়, কিন্তু সহজসাধ্য। যোগে নানা বিঘ্ন; হয়তো বিভূতিপথে মন চলে গেল, আর স্বরূপে পৌঁছুতে পারলে না। একমাত্র জ্ঞানপথই আশুফলপ্রদ এবং সর্বমত-সংস্থাপক ব'লে সর্বকালে সর্বদেশে সমান আদৃত। তবে বিচারপথে চলতে চলতেও মন দুস্তর তর্কজালে বদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করা চাই। বিচার ও ধ্যানবলে উদ্দেশ্যে বা ব্রহ্মতত্ত্বে পৌঁছুতে হবে। এইভাবে সাধন করলে goal-এ (লক্ষ্যে) ঠিক পৌঁছানো যায়। আমার মতে, এই পন্থা সহজ ও আশুফলপ্রদ।

শিষ্য। এইবার আমায় অবতারবাদ-বিষয়ে কিছু বলুন।

স্বামীজী। তুই যে একদিনেই সব মেরে নিতে চাস্!

---

১ শঙ্করাচার্য

শিষ্য। মহাশয়, মনের ধাঁধা একদিনে মিটিয়া যায় তো বারবার আর আপনাকে বিরক্ত করিতে হইবে না।

স্বামীজী। যে-আত্মার এত মহিমা শাস্ত্রমুখে অবগত হওয়া যায়, সেই আত্মজ্ঞান যাঁদের কৃপায় এক মুহূর্তে লাভ হয়, তাঁরাই সচল তীর্থ—অবতারপুরুষ। তাঁরা আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞ, এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞে কিছুমাত্র তফাত নেই—'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।' আত্মাকে তো আর জানা যায় না, কারণ এই আত্মাই বিজ্ঞাতা ও মন্তা হয়ে রয়েছেন—এ কথা পূর্বেই বলেছি। অতএব মানুষের জানাজানি ঐ অবতার পর্যন্ত—যাঁরা আত্মসংস্থ। মানব-বুদ্ধি ঈশ্বর সম্বন্ধে highest ideal (সর্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শ) যা গ্রহণ করতে পারে, তা ঐ পর্যন্ত। তারপর আর জানাজানি থাকে না। ঐরূপ ব্রহ্মজ্ঞ কদাচিৎ জগতে জন্মায়। অল্প লোকেই তাঁদের বুঝতে পারে। তাঁরাই শাস্ত্রোক্তির প্রমাণস্থল—ভবসমুদ্রে আলোক-স্তম্ভস্বরূপ। এই অবতারগণের সঙ্গ ও কৃপাদৃষ্টিতে মুহূর্তমধ্যে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়ে যায়—সহসা ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণ হয়। কেন বা কি process-এ (উপায়ে) হয়, তার নির্ণয় করা যায় না। তবে হয়—হ'তে দেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ আত্মসংস্থ হয়ে গীতা বলেছিলেন। গীতার যে যে স্থলে 'অহং' শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তা 'আত্মপর' ব'লে জানবি। 'মামেকং শরণং ব্রজ' কিনা 'আত্মসংস্থ হও'। এই আত্মজ্ঞানই গীতার চরম লক্ষ্য। যোগাদির উল্লেখ ঐ আত্মতত্ত্বলাভের আনুষঙ্গিক অবতারণা। এই আত্মজ্ঞান যাদের হয় না, তারাই আত্মঘাতী। 'বিনিহন্ত্যসদ্গ্রহাৎ'—রূপরসাদির উদ্বন্ধনে তাদের প্রাণ যায়। তোরাও তো মানুষ—দুদিনের ছাই-ভস্ম ভোগকে উপেক্ষা করতে পারবিনি? 'জায়স্ব ম্রিয়স্বে'র দলে যাবি? 'শ্রেয়ঃ'কে গ্রহণ কর, 'প্রেয়ঃ'কে পরিত্যাগ কর্। এই আত্মতত্ত্ব আচণ্ডাল সবাইকে বলবি। বলতে বলতে নিজের বুদ্ধিও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর 'তত্ত্বমসি', 'সোঽহমস্মি', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' প্রভৃতি মহামন্ত্র সর্বদা উচ্চারণ করবি এবং হৃদয়ে সিংহের মতো বল রাখবি। ভয় কি? ভয়ই মৃত্যু—ভয়ই মহাপাতক। নররূপী অর্জুনের ভয় হয়েছিল—তাই আত্মসংস্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গীতা উপদেশ দিলেন; তবু কি তাঁর ভয় যায়? পরে

অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন ক'রে আত্মসংস্থ হলেন, তখন জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মা হয়ে যুদ্ধ করলেন।

শিষ্য। মহাশয়, আত্মজ্ঞান লাভ হইলেও কি কর্ম থাকে?

স্বামীজী। জ্ঞানলাভের পর সাধারণে যাকে কর্ম বলে, সেরূপ কর্ম থাকে না। তখন কর্ম 'জগদ্ধিতায়' হয়ে দাঁড়ায়। আত্মজ্ঞানীর চলন-বলন সবই জীবের কল্যাণসাধন করে। ঠাকুরকে দেখেছি 'দেহস্থোঽপি ন দেহস্থঃ'[১]—এই ভাব! ঐরূপ পুরুষদের কর্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেবল এই কথামাত্র বলা যায়—'লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্।'[২]

৩৩

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০১

কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা বাবু রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া শিষ্য আজ বেলুড় মঠে আসিয়াছে। রণদাবাবু শিল্পকলানিপুণ সুপণ্ডিত ও স্বামীজীর গুণগ্রাহী। আলাপ-পরিচয়ের পর স্বামীজী রণদাবাবুর সঙ্গে শিল্প-বিদ্যা সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন; রণদাবাবুকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁর একাডেমিতে একদিন যাইতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নানা অসুবিধায় স্বামীজীর তথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

স্বামীজী রণদাবাবুকে বলিতে লাগিলেন:

পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের শিল্প-সৌন্দর্য দেখে এলুম, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যায়, তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদশাদের সময়েও ঐ বিদ্যার

১ দেহেতে থাকিয়াও দেহবুদ্ধিশূন্য।

২ বেদান্তসূত্র, ২অ, ১ পা, ৩৩ সূ.

বিশেষ বিকাশ হয়েছিল; সেই বিদ্যার কীর্তিস্তম্ভরূপে আজও তাজমহল, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মানুষ যে জিনিসটি তৈরি করে, তাতে কোন একটা idea express (মনোভাব প্রকাশ) করার নামই art (শিল্প)। যাতে idea-র expression (ভাবের প্রকাশ) নেই, রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত art (শিল্প) বলা যায় না। ঘটি, বাটি, পেয়ালা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলিও ঐরূপে বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ ক'রে তৈরি করা উচিত। প্যারিস প্রদর্শনীতে পাথরের খোদাই এক অদ্ভুত মূর্তি দেখেছিলাম। মূর্তিটির পরিচায়ক এই কয়টি কথা নীচে লেখা, 'Art unveiling nature' অর্থাৎ শিল্প কেমন ক'রে প্রকৃতির নিবিড় অবগুণ্ঠন স্বহস্তে মোচন ক'রে ভেতরের রূপসৌন্দর্য দেখে। মূর্তিটি এমনভাবে তৈরি করেছে যেন প্রকৃতিদেবীর রূপচ্ছবি এখনও স্পষ্ট বেরোয়নি; যতটুকু বেরিয়েছে, ততটুকু সৌন্দর্য দেখেই শিল্পী যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। যে ভাস্কর এই ভাবটি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁর প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। ঐ রকমের original (মৌলিক) কিছু করতে চেষ্টা করবেন।

রণদাবাবু। আমারও ইচ্ছা আছে সময়মত original modelling (নূতন ভাবের মূর্তি) সব গড়তে; কিন্তু এদেশে উৎসাহ পাই না। অর্থাভাব, তার উপর আমাদের দেশে গুণগ্রাহী লোকের অভাব।

স্বামীজী। আপনি যদি প্রাণ দিয়ে যথার্থ একটি খাঁটি জিনিস করতে পারেন, যদি art-এ (শিল্পে) একটি ভাবও যথাযথ express (প্রকাশ) করতে পারেন, কালে নিশ্চয় তার appreciation (সমাদর) হবে। খাঁটি জিনিসের কখনও জগতে অনাদর হয়নি। এরূপও শোনা যায়, এক-এক জন artist (শিল্পী) মরবার হাজার বছর পর হয়তো তার appreciation (সমাদর) হ'ল!

রণদাবাবু। তা ঠিক। কিন্তু আমরা যেরূপ অপদার্থ হয়ে পড়েছি, তাতে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে' সাহসে কুলোয় না। এই পাঁচ বৎসরের চেষ্টায় আমি যা হ'ক কিছু কৃতকার্য হয়েছি। আশীর্বাদ করুন যেন উদ্যম বিফল না হয়।

স্বামীজী। যদি ঠিক ঠিক কাজে লেগে যান, তবে নিশ্চয় successful (সফল) হবেন। যে যে-বিষয়ে মনপ্রাণ ঢেলে খাটে, তাতে তার success (সফলতা) তো হয়ই, তারপর চাই কি ঐ কাজের তন্ময়তা থেকে ব্রহ্মবিদ্যা পর্যন্ত লাভ হয়। যে কোন বিষয়ে প্রাণ দিয়ে খাটলে ভগবান তার সহায় হন।

রণদাবাবু। ওদেশ এবং এদেশের শিল্পের ভেতর তফাত কি দেখলেন?

স্বামীজী। প্রায় সবই সমান, originality (মৌলিকত্ব) প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না। ঐসব দেশে ফটোযন্ত্রের সাহায্যে এখন নানা চিত্র তুলে ছবি আঁকছে। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে নিলেই originality (মৌলিকত্ব) লোপ পেয়ে যায়; নিজের idea-র expression দিতে (মনোগত ভাব প্রকাশ করতে) পারা যায় না। আগেকার ভাস্করগণ নিজেদের মাথা থেকে নূতন নূতন ভাব বের করতে বা সেইগুলি ছবিতে বিকাশ করতে চেষ্টা করতেন; এখন ফটোর অনুরূপ ছবি হওয়ায় মাথা খেলাবার শক্তি ও চেষ্টার লোপ হয়ে যাচ্ছে। তবে এক-একটা জাতের এক-একটা characteristic (বিশেষত্ব) আছে। আচারে-ব্যবহারে, আহারে-বিহারে, চিত্রে-ভাস্কর্যে সেই বিশেষ ভাবের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরুন—ওদেশের গান-বাজনা-নাচের expression (বাহ্য বিকাশ)-গুলি সবই pointed (তীব্র, তীক্ষ্ণ); নাচছে যেন হাত পা ছুঁড়ছে! বাজনাগুলির আওয়াজে কানে যেন সঙীনের খোঁচা দিচ্ছে! গানেরও ঐরূপ। এদেশের নাচ আবার যেন হেলেদুলে তরঙ্গের মতো গড়িয়ে পড়ছে, গানের গমক মূর্ছনাতেও ঐরূপ rounded movement (মোলায়েম গতি) দেখা যায়। বাজনাতেও তাই। অতএব art (শিল্প) সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্নরূপ বিকাশ হয়। যে জাতটা বড় materialistic (জড়বাদী), তারা nature (প্রকৃতি) টাকেই ideal (আদর্শ) ব'লে ধরে এবং তদনুরূপ ভাবের expression (বিকাশ) শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাবপ্রাপ্তিতেই ideal (আদর্শ) ব'লে ধরে, সেটা ঐ ভাবই nature-এর (প্রকৃতিগত) শক্তিসহায়ে শিল্পে express (প্রকাশ) করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতের Nature (প্রকৃতি)-ই হচ্ছে

primary basis of art (শিল্পের মূল ভিত্তি) ; আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর Ideality (প্রকৃতির অতীত একটা ভাব) হচ্ছে শিল্প-বিকাশের মূল কারণ। ঐরূপে দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য ধ'রে শিল্পচর্চায় অগ্রসর হলেও ফল উভয় শ্রেণীর প্রায় একই দাঁড়িয়েছে, উভয়েই নিজ নিজ ভাবে শিল্পোন্নতি করছে। ও-সব দেশের এক একটা ছবি দেখে আপনার সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ব'লে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি—পুরাকালে স্থাপত্য-বিদ্যার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকার এক-একটি মূর্তি দেখলে আপনাকে এই জড় প্রাকৃতিক রাজ্য ভুলিয়ে একটা নূতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেলবে। ওদেশে এখন যেমন আগেকার মতো ছবি হয় না, এদেশেও তেমনি নূতন নূতন ভাববিকাশকল্পে ভাস্করগণের আর চেষ্টা দেখা যায় না। এই দেখুন না, আপনাদের আর্ট স্কুলের ছবিগুলোতে যেন কোন expression (ভাবের বিকাশ) নেই। আপনারা হিন্দুদের নিত্য-ধ্যেয় মূর্তিগুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক expression (বহিঃপ্রকাশ) দিয়ে আঁকবার চেষ্টা করলে ভাল হয়।

রণদাবাবু। আপনার কথায় হৃদয়ে মহা উৎসাহ হয়। চেষ্টা ক'রে দেখব, আপনার কথামত কাজ করতে চেষ্টা ক'রব।

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন :

এই মনে করুন, মা কালীর ছবি। এতে যুগপৎ ক্ষেমঙ্করী ও ভয়ঙ্করী মূর্তির সমাবেশ। ঐ ছবিগুলির কোনখানিতে কিন্তু ঐ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক expression (প্রকাশ) দেখা যায় না। তা দূরে যাক, একটাও চিত্রে ঐ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক বিকাশ করবার চেষ্টা কারুর নেই! আমি মা কালীর ভীমা মূর্তির কিছু idea (ভাব) 'Kali the Mother' (কালী দি মাদার) নামক ইংরেজী কবিতাটায় লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। আপনি ঐ ভাবটা একখানা ছবিতে express (প্রকাশ) করতে পারেন কি ?

রণদাবাবু। কি ভাব ?

স্বামীজী শিষ্যের পানে তাকাইয়া তাঁহার ঐ কবিতাটি উপর হইতে আনিতে বলিলেন। শিষ্য লইয়া আসিলে স্বামীজী রণদাবাবুকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন : 'The stars are blotted out' &c[১].

---

১ দ্রষ্টব্য : বীরবাণী কবিতা পুস্তক বা Complete Works

স্বামীজীর ঐ কবিতাটি পাঠের সময়ে শিষ্যের মনে হইতে লাগিল, যেন মহাপ্রলয়ের সংহারমূর্তি তাহার কল্পনাসমক্ষে নৃত্য করিতেছে। রণদাবাবুও কবিতাটি শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ বাদে রণদাবাবু যেন কল্পনানয়নে ঐ চিত্রটি দেখিতে পাইয়া 'বাপ' বলিয়া ভীত-চকিতনয়নে স্বামীজীর মুখপানে তাকাইলেন।

স্বামীজী। কেমন, এই idea (ভাবটা) চিত্রে বিকাশ করতে পারবেন তো?

রণদাবাবু। আজ্ঞে, চেষ্টা ক'রব।[১] কিন্তু ঐ ভাবের কল্পনা করতেই যেন মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

স্বামীজী। ছবিখানি এঁকে আমাকে দেখাবেন। তারপর আমি উহা সর্বাঙ্গসম্পন্ন করতে যা যা দরকার, তা আপনাকে ব'লে দেবো।

অতঃপর স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের সীলমোহরের জন্য বিকশিত-কমলদলযুক্ত হ্রদমধ্যে হংসবিরাজিত সর্পবেষ্টিত যে ক্ষুদ্র ছবিটি করিয়াছিলেন, তাহা আনাইয়া রণদাবাবুকে দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিতে বলিলেন। রণদাবাবু প্রথমে উহার মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া স্বামীজীকেই উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেন:

চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি—জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়—চিত্রের ইহাই অর্থ।

রণদাবাবু চিত্রটির ঐরূপ অর্থ শুনিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, 'আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হ'তে পারত।'

অতঃপর ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির যেভাবে নির্মাণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা, স্বামীজী তাহারই একখানি চিত্র (Drawing) আনাইলেন। চিত্রখানি

---

১ শিষ্য তখন রণদাবাবুর সঙ্গে একত্র থাকিত। তিনি দেখিয়াছিলেন, রণদাবাবু বাড়ি ফিরিয়া পরদিন হইতেই ঐ প্রলয়তাণ্ডবোন্মত্ত চণ্ডীমূর্তি আঁকিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু চিত্রখানি সম্পূর্ণ হয় নাই, এবং স্বামীজীকে দেখানোও হয় নাই।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর পরামর্শমত আঁকিয়াছিলেন। চিত্রখানি রণদাবাবুকে দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিলেন :

এই ভাবী মঠমন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আছে আমার। পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্পসম্বন্ধে যত সব idea (ভাব) নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দিরনির্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা ক'রব। বহুসংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে। তার দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে। হাজার লোক যাতে একত্র ব'সে ধ্যানজপ করতে পারে, নাটমন্দিরটি এমন বড় ক'রে নির্মাণ করতে হবে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও নাটমন্দিরটি এমন ভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে দূর থেকে দেখলে ঠিক 'ওঁকার' বলে ধারণা হবে। মন্দিরমধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মূর্তি থাকবে। দোরে দুদিকে দুটি ছবি এইভাবে থাকবে—একটি সিংহ ও একটি মেষ বন্ধুভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাটছে—অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানম্রতা যেন প্রেমে একত্র সম্মিলিত হয়েছে। মনে এই সব idea (ভাব) রয়েছে; এখন জীবনে কুলোয় তো কাজে পরিণত ক'রে যাব। নতুবা ভাবী generation (বংশীয়েরা) ঐগুলি ক্রমে কাজে পরিণত করতে পারে তো করবে। আমার মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে। সেজন্য ধর্ম কর্ম বিদ্যা জ্ঞান ভক্তি—সমস্তই যাতে এই মঠকেন্দ্র থেকে জগতে ছড়িয়ে পড়ে, এমনভাবে ঠাকুরের এই মঠটি গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে আপনারা আমার সহায় হউন।

রণদাবাবু এবং উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ স্বামীজীর কথাগুলি শুনিয়া অবাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। যাঁহার মহৎ উদার মন সকল বিষয়ের সকল প্রকার মহান্ ভাবরাশির অদৃষ্টপূর্ব ক্রীড়াভূমি ছিল, সেই স্বামীজীর মহত্ত্বের কথা ভাবিয়া সকলে একটা অব্যক্তভাবে পূর্ণ হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরে স্বামীজী আবার বলিলেন :

আপনি শিল্পবিদ্যার যথার্থ আলোচনা করেন বলেই আজ ঐ সম্বন্ধে এত চর্চা হচ্ছে। শিল্পসম্বন্ধে এতকাল আলোচনা ক'রে আপনি ঐ বিষয়ের যা কিছু সার ও সর্বোচ্চ ভাব পেয়েছেন, তাই এখন আমাকে বলুন।

রণদাবাবু। মহাশয়, আমি আপনাকে নূতন কথা কি শোনাব, আপনিই ঐ বিষয়ে আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন। শিল্পসম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ জীবনে আর কখনও শুনিনি। আশীর্বাদ করুন, আপনার নিকট যে-সকল ভাব পেলাম, তা যেন কাজে পরিণত করতে পারি।

অতঃপর স্বামীজী আসন হইতে উঠিয়া ময়দানে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্যকে বলিলেন, 'ছেলেটি খুব তেজস্বী'।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে।

স্বামীজী শিষ্যের ঐ কথার কোন উত্তর না দিয়া আপন মনে গুনগুন করিয়া ঠাকুরের একটি গান গাহিতে লাগিলেন—'পরম ধন সে পরশমণি' ইত্যাদি।

এইরূপে কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর স্বামীজী মুখ ধুইয়া শিষ্যসঙ্গে উপরে নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং 'Encyclopædia Britannica' পুস্তকের শিল্প-সম্বন্ধীয় অধ্যায়টি কিছুক্ষণ পাঠ করিলেন। পাঠ সাঙ্গ হইলে পূর্ববঙ্গের কথা এবং উচ্চারণের ঢং অনুকরণ করিয়া শিষ্যের সঙ্গে সাধারণভাবে ঠাট্টা-তামাসা করিতে লাগিলেন।

৩৪

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—মে (শেষ ভাগ), ১৯০১

স্বামীজী কয়েকদিন হইল পূর্ববঙ্গ ও আসাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শরীর অসুস্থ, পা ফুলিয়াছে। শিষ্য আসিয়া মঠের উপর তলায় স্বামীজীর কাছে গিয়া প্রণাম করিল। শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও স্বামীজীর সহাস্য বদন ও স্নেহমাখা দৃষ্টি সকল দুঃখ ভুলাইয়া সকলকে আত্মহারা করিয়া দিত।

শিষ্য। স্বামীজী, কেমন আছেন?

স্বামীজী। আর বাবা, থাকাথাকি কি? দেহ তো দিন দিন অচল হচ্ছে। বাঙলাদেশে এসে শরীর ধারণ করতে হয়েছে, শরীরে রোগ লেগেই

আছে। এদেশের physique (শারীরিক গঠন) একেবারে ভাল নয়। বেশী কাজ করতে গেলেই শরীর বয় না। তবে যে-কটা দিন দেহ আছে, তোদের জন্য খাটব। খাটতে খাটতে ম'রব।

শিষ্য। আপনি এখন কিছুদিন কাজকর্ম ছাড়িয়া স্থির হইয়া থাকুন, তাহা হইলেই শরীর সারিবে। এ দেহের রক্ষায় জগতের মঙ্গল।

স্বামীজী। বসে থাকবার জো আছে কি বাবা! ঐ যে ঠাকুর যাকে 'কালী, কালী' ব'লে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখবার দু-তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে; সেইটেই আমাকে এদিক ওদিক কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়, স্থির হয়ে থাকতে দেয় না, নিজের সুখের দিক দেখতে দেয় না!

শিষ্য। শক্তি-প্রবেশের কথাটা কি রূপকচ্ছলে বলিতেছেন?

স্বামীজী। না রে। ঠাকুরের দেহ যাবার তিন-চার দিন আগে তিনি আমাকে একাকী একদিন কাছে ডাকলেন। আর সামনে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তখন ঠিক অনুভব করতে লাগলুম, তাঁর শরীর থেকে একটা সূক্ষ্ম তেজ electric shock (তড়িৎ-কম্পন)-এর মতো এসে আমার শরীরে ঢুকছে! ক্রমে আমিও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। কতক্ষণ এরূপভাবে ছিলুম, আমার কিছু মনে পড়ে না; যখন বাহ্য চেতনা হ'ল, দেখি ঠাকুর কাঁদছেন। জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর সস্নেহে বললেন, 'আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ ক'রে তবে ফিরে যাবি।' আমার বোধ হয়, ঐ শক্তিই আমাকে এ-কাজে সে-কাজে কেবল ঘুরোয়। বসে থাকবার জন্য আমার এ দেহ হয়নি।

শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিল, এ-সকল কথা সাধারণ লোকে কিভাবে বুঝিবে, কে জানে! অনন্তর ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিল, 'মহাশয়, আমাদের বাঙাল দেশ (পূর্ববঙ্গ) আপনার কেমন লাগিল?'

স্বামীজী। দেশ কিছু মন্দ নয়, মাঠে দেখলুম খুব শস্য ফলেছে। আবহাওয়াও মন্দ নয়; পাহাড়ের দিকের দৃশ্য অতি মনোহর। ব্রহ্মপুত্র valley-র (উপত্যকার) শোভা অতুলনীয়। আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো

কিছু মজবুত ও কর্মঠ। তার কারণ বোধ হয়, মাছ-মাংসটা খুব খায়; যা করে, খুব গোঁয়ে করে। খাওয়া-দাওয়াতে খুব তেল-চর্বি দেয়; ওটা ভাল নয়। তেল-চর্বি বেশী খেলে শরীরে মেদ জন্মে।

শিষ্য। ধর্মভাব কেমন দেখিলেন?

স্বামীজী। ধর্মভাব সম্বন্ধে দেখলুম—দেশের লোকগুলো বড় conservative (রক্ষণশীল); উদারভাবে ধর্ম করতে গিয়ে আবার অনেকে fanatic (ধর্মোন্মাদ) হয়ে পড়েছে। ঢাকার মোহিনীবাবুর বাড়িতে একদিন একটি ছেলে একখানা কার photo (প্রতিকৃতি) এনে আমায় দেখালে এবং বললে, 'মহাশয়, বলুন ইনি কে, অবতার কি না?' আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, 'তা বাবা, আমি কি জানি?' তিন-চার বার বললেও সে ছেলেটি দেখলুম কিছুতেই তার জেদ ছাড়ে না। অবশেষে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হ'ল, 'বাবা, এখন থেকে ভাল ক'রে খেয়ো-দেয়ো, তা হ'লে মস্তিষ্কের বিকাশ হবে। পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে তোমার মাথা যে শুকিয়ে গেছে।' এ-কথা শুনে বোধ হয় ছেলেটির অসন্তোষ হয়ে থাকবে। তা কি ক'রব বাবা, ছেলেদের এরূপ না বললে তারা যে ক্রমে পাগল হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য। আমাদের পূর্ববাঙলায় আজকাল অনেক অবতারের অভ্যুদয় হইতেছে!

স্বামীজী। গুরুকে লোকে অবতার বলতে পারে, যা ইচ্ছা তাই ব'লে ধারণা করবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ভগবানের অবতার যখন তখন যেখানে সেখানে হয় না। এক ঢাকাতেই শুনলুম, তিন-চারটি অবতার দাঁড়িয়েছে!

শিষ্য। ওদেশের মেয়েদের কেমন দেখিলেন?

স্বামীজী। মেয়েরা সর্বত্রই প্রায় একরূপ। বৈষ্ণব-ভাবটা ঢাকায় বেশী দেখলুম। 'হ—'র স্ত্রীকে খুব intelligent (বুদ্ধিমতী) ব'লে বোধ হ'ল। সে খুব যত্ন ক'রে আমায় রেঁধে খাবার পাঠিয়ে দিত।

শিষ্য। শুনিলাম, নাগ-মহাশয়ের বাড়ি নাকি গিয়াছিলেন?

স্বামীজী। হাঁ, অমন মহাপুরুষ! এতদূর গিয়ে তাঁর জন্মস্থান দেখব না? নাগ-মহাশয়ের স্ত্রী আমায় কত রেঁধে খাওয়ালেন! বাড়িখানি কি মনোরম—যেন শান্তি-আশ্রম! ওখানে গিয়ে এক পুকুরে সাঁতার

কেটে নিয়েছিলুম। তারপর, এসে এমন নিদ্রা দিলুম যে বেলা ২॥টা। আমার জীবনে যে-কয় দিন সুনিদ্রা হয়েছে, নাগ-মহাশয়ের বাড়ির নিদ্রা তার মধ্যে এক দিন। তারপর উঠে প্রচুর আহার। নাগ-মহাশয়ের স্ত্রী একখানা কাপড় দিয়েছিলেন। সেইখানি মাথায় বেঁধে ঢাকায় রওনা হলুম। নাগ-মহাশয়ের ফটো পূজা হয়.দেখলুম। তাঁর সমাধিস্থানটি বেশ ভাল ক'রে রাখা উচিত। এখনও—যেমন হওয়া উচিত, তেমন হয়নি।

শিষ্য। মহাশয়, নাগ-মহাশয়কে ও-দেশের লোকে তেমন চিনিতে পারে নাই।

স্বামীজী। ও-সব মহাপুরুষকে সাধারণে কি বুঝবে? যারা তাঁর সঙ্গ পেয়েছে, তারাই ধন্য।

শিষ্য। কামাখ্যা (আসাম) গিয়া কি দেখিলেন?

স্বামীজী। শিলং পাহাড়টি অতি সুন্দর। সেখানে চীফ কমিশনার কটন (Chief Commissioner Mr. Cotton) সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'স্বামীজী! ইওরোপ ও আমেরিকা বেড়িয়ে এই দূর পর্বতপ্রান্তে আপনি কি দেখতে এসেছেন?' কটন সাহেবের মতো অমন সদাশয় লোক প্রায় দেখা যায় না। আমার অসুখ শুনে সরকারী ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুবেলা আমার খবর নিতেন। সেখানে বেশী লেকচার-ফেকচার করতে পারিনি; শরীর বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। রাস্তায় নিতাই খুব সেবা করেছিল।

শিষ্য। সেখানকার ধর্মভাব কেমন দেখলেন?

স্বামীজী। তন্ত্রপ্রধান দেশ। এক 'হঙ্কর'দেবের নাম শুনলুম, যিনি ও-অঞ্চলে অবতার ব'লে পূজিত হন। শুনলুম, তাঁর সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত। ঐ 'হঙ্কর'দেব শঙ্করাচার্যেরই নামান্তর কি না বুঝতে পারলাম না। ওরা ত্যাগী—বোধ হয়, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কিংবা শঙ্করাচার্যেরই সম্প্রদায়-বিশেষ।

অতঃপর শিষ্য বলিল, 'মহাশয়, ও-দেশের লোকেরা বোধ হয় নাগ-মহাশয়ের মতো আপনাকেও ঠিক বুঝিতে পারে নাই।'

স্বামীজী। আমায় বুঝুক আর নাই বুঝুক—এ অঞ্চলের লোকের চেয়ে কিন্তু তাদের রজোগুণ প্রবল; কালে সেটা আরও বিকাশ হবে। যেরূপ চাল-চলনকে ইদানীং সভ্যতা বা শিষ্টাচার বলা হয়, সেটা এখনও ও-অঞ্চলে ভালরূপে প্রবেশ করেনি। সেটা ক্রমে হবে। সকল সময়ে capital (রাজধানী) থেকেই ক্রমে প্রদেশসকলে চাল-চলন আদব-কায়দার বিস্তার হয়। ও-দেশেও তাই হচ্ছে। যে দেশে নাগ-মহাশয়ের মতো মহাপুরুষ জন্মায়, সে দেশের আবার ভাবনা? তাঁর আলোতেই পূর্ববঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, সাধারণ লোক তাঁহাকে তত জানিত না; তিনি বড় গুপ্তভাবে ছিলেন।

স্বামীজী। ও-দেশে আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বড় গোল ক'রত। ব'লত—ওটা কেন খাবেন, ওর হাতে কেন খাবেন, ইত্যাদি। তাই বলতে হ'ত—আমি তো সন্ন্যাসী-ফকির লোক, আমার আবার আচার কি? তোদের শাস্ত্রেই না বলছে, 'চরেন্মাধুকরীং বৃত্তিমপি ম্লেচ্ছকুলাদপি।'[1] তবে অবশ্য বাইরের আচার ভেতরে ধর্মের অনুভূতির জন্য প্রথম প্রথম চাই; শাস্ত্রজ্ঞানটা নিজের জীবনে practical (কার্যকর) ক'রে নেবার জন্য চাই। ঠাকুরের সেই পাঁজি নেঙড়ানো জলের কথা[2] শুনেছিস তো? আচার-বিচার কেবল মানুষের ভেতরের মহা-শক্তিস্ফুরণের উপায় মাত্র। যাতে ভেতরের সেই শক্তি জাগে, যাতে মানুষ তার স্বরূপ ঠিক ঠিক বুঝতে পারে, তাই হচ্ছে সর্বশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। উপায়গুলি বিধিনিষেধাত্মক। উদ্দেশ্য হারিয়ে খালি উপায় নিয়ে ঝগড়া করলে কি হবে? যে দেশেই যাই, দেখি উপায় নিয়েই লাঠালাঠি চলেছে। উদ্দেশ্যের দিকে লোকের নজর নেই, ঠাকুর ঐটি দেখাতেই এসেছিলেন। 'অনুভূতি'ই হচ্ছে সার কথা। হাজার বৎসর গঙ্গাস্নান কর্, আর হাজার বৎসর নিরামিষ খা—ওতে যদি আত্মবিকাশের

১ মাধুকরী ভিক্ষা ম্লেচ্ছজাতি হইতেও গ্রহণ করিবে।

২ পাঁজিতে লেখা থাকে—'এ বৎসর বিশ আড়া জল হবে', কিন্তু পাঁজিখানা নেঙড়ালে এক ফোঁটা জলও পড়ে না। সেইরূপ, শাস্ত্রে লেখা আছে, 'এইরূপ এইরূপ করলে ঈশ্বরদর্শন হয়'; তা না ক'রে কেবল শাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করলে কিছুই ফল পাওয়া যায় না।

সহায়তা না হয়, তবে জানবি সর্বৈব বৃথা হ'ল। আর আচার-বর্জিত হয়ে যদি কেউ আত্মদর্শন করতে পারে, তবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার। তবে আত্মদর্শন হলেও লোকসংস্থিতির জন্য আচার কিছু কিছু মানা ভাল। মোট কথা মনকে একনিষ্ঠ করা চাই। এক বিষয়ে নিষ্ঠা হ'লে মনের একাগ্রতা হয় অর্থাৎ মনের অন্য বৃত্তিগুলি নিবে গিয়ে এক বিষয়ে একতানতা হয়। অনেকের—বাহ্য আচার বা বিধিনিষেধের জালেই সব সময়টা কেটে যায়, আত্মচিন্তা আর করা হয় না। দিনরাত বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে থাকলে আত্মার প্রসার হবে কি ক'রে? যে যতটা আত্মানুভূতি করতে পেরেছে, তার বিধিনিষেধ ততই কমে যায়। আচার্য শঙ্করও বলেছেন, 'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ?'[১] অতএব মূলকথা হচ্ছে—অনুভূতি। তাই জানবি goal (উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য) ; মত—পথ, রাস্তা মাত্র। কার কতটা ত্যাগ হয়েছে, এইটি জানবি উন্নতির test (পরীক্ষা), কষ্টিপাথর। কাম-কাঞ্চনের আসক্তি যার মধ্যে দেখবি কমতি—সে যে-মতের যে-পথের লোক হোক না কেন, জানবি তার শক্তি জাগ্রত হচ্ছে, জানবি তার আত্মানুভূতির দোর খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল্, হাজার শ্লোক আওড়া, তবু যদি ত্যাগের ভাব না এসে থাকে তো জানবি—জীবন বৃথা। এই অনুভূতিলাভে তৎপর হ, লেগে যা। শাস্ত্র-টাস্ত্র তো ঢের পড়লি। বল্ দিকি, তাতে হ'ল কি? কেউ টাকার চিন্তা ক'রে ধনকুবের হয়েছে, তুই না হয় শাস্ত্রচিন্তা ক'রে পণ্ডিত হয়েছিস। উভয়ই বন্ধন। পরাবিদ্যালাভে বিদ্যা-অবিদ্যার পারে চলে যা।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার কৃপায় সব বুঝি, কিন্তু কর্মের ফেরে ধারণা করিতে পারি না।

স্বামীজী। কর্ম-ফর্ম ফেলে দে। তুই-ই পূর্বজন্মে কর্ম ক'রে এই দেহ পেয়েছিস—এ-কথা যদি সত্য হয়, তবে কর্মদ্বারা কর্ম কেটে তুই আবার কেন না এ দেহেই জীবন্মুক্ত হবি? জানবি, মুক্তি বা আত্মজ্ঞান তোর নিজের হাতে রয়েছে। জ্ঞানে কর্মের লেশমাত্র নেই। তবে যারা

---

১ গুণাতীত অবস্থায় যাঁহারা বিচরণ করেন, তাঁহাদের কোন বিধিনিষেধ নাই।

জীবন্মুক্ত হয়েও কাজ করে, তারা জানবি 'পরহিতায়' কর্ম করে। তারা ভাল-মন্দ ফলের দিকে চায় না, কোন বাসনা-বীজ তাদের মনে স্থান পায় না। সংসারাশ্রমে থেকে ঐরূপ যথার্থ 'পরহিতায়' কর্ম করা একপ্রকার অসম্ভব—জানবি। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে ঐ-বিষয়ে এক জনক রাজার নামই আছে। তোরা কিন্তু এখন বছর বছর ছেলে জন্ম দিয়ে ঘরে ঘরে 'জনক' হ'তে চাস্।

শিষ্য। আপনি কৃপা করুন, যাহাতে আত্মানুভূতিলাভ এ শরীরেই হয়।

স্বামীজী। ভয় কি? মনের ঐকান্তিকতা থাকলে, আমি নিশ্চয় বলছি, এ জন্মেই হবে; তবে পুরুষকার চাই। পুরুষকার কি জানিস? আত্মজ্ঞান লাভ করবই ক'রব, এতে যে বাধাবিপদ সামনে পড়ে, তা কাটাবই কাটাব—এইরূপ দৃঢ় সংকল্প। মা-বাপ, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র মরে মরুক, এ দেহ থাকে থাক, যায় যাক, আমি কিছুতেই ফিরে চাইব না, যতক্ষণ না আমার আত্মদর্শন ঘটে—এইরূপে সকল বিষয় উপেক্ষা ক'রে একমনে নিজের goal (লক্ষ্য)-এর দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টার নামই পুরুষকার। নতুবা অন্য পুরুষকার তো পশু-পক্ষীরাও করছে। মানুষ এ দেহ পেয়েছে কেবলমাত্র সেই আত্মজ্ঞানলাভের জন্য। সংসারে সকলে যে-পথে যাচ্ছে, তুইও কি সেই স্রোতে গা ঢেলে চলে যাবি? তবে আর তোর পুরুষকার কি? সকলে তো মরতে বসেছে! তুই যে মৃত্যু জয় করতে এসেছিস। মহাবীরের মতো অগ্রসর হ। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করবিনি। ক-দিনের জন্যই বা শরীর? ক-দিনের জন্যই বা সুখ-দুঃখ? যদি মানবদেহই পেয়েছিস, তবে ভেতরের আত্মাকে জাগা আর বল্—আমি অভয়-পদ পেয়েছি। বল্—আমি সেই আত্মা, যাতে আমার কাঁচা আমিত্ব ডুবে গেছে। এই ভাবে সিদ্ধ হয়ে যা; তারপর যতদিন দেহ থাকে, ততদিন অপরকে এই মহাবীর্য-প্রদ নির্ভয় বাণী শোনা—'তত্ত্বমসি', 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' এটি হ'লে তবে জানব যে তুই যথার্থই একগুঁয়ে বাঙাল।

৩৫

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(জুন), ১৯০১

শনিবার বৈকালে শিষ্য মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর শরীর তত সুস্থ নহে, শিলং পাহাড় হইতে অসুস্থ হইয়া অল্প দিন হইল প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার পা ফুলিয়াছে, সমস্ত শরীরেই যেন জলসঞ্চার হইয়াছে; গুরুভ্রাতাগণ সেই জন্য বড়ই চিন্তিত। স্বামীজী কবিরাজী ঔষধ খাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আগামী মঙ্গলবার হইতে নুন ও জল বন্ধ করিয়া 'বাঁধা' ঔষধ খাইতে হইবে। আজ রবিবার।

শিষ্য। মহাশয়, এই দারুণ গ্রীষ্মকাল! তাহাতে আবার আপনি ঘণ্টায় ৪।৫ বার করিয়া জল পান করেন, এ সময়ে জল বন্ধ করিয়া ঔষধ খাওয়া আপনার অসহ্য হইবে।

স্বামীজী। তুই কি বলছিস? ঔষধ খাওয়ার দিন প্রাতে 'আর জলপান ক'রব না' ব'লে দৃঢ় সংকল্প ক'রব, তারপর সাধ্যি কি জল আর কণ্ঠের নীচে নাবেন! তখন একুশ দিন জল আর নীচে নাবতে পারছেন না। শরীরটা তো মনেরই খোলস। মন যা বলবে, সেইমত তো ওকে চলতে হবে, তবে আর কি? নিরঞ্জনের অনুরোধে আমাকে এটা করতে হ'ল, ওদের (গুরুভ্রাতাদের) অনুরোধ তো আর উপেক্ষা করতে পারিনে।

বেলা প্রায় ১০টা। স্বামীজী উপরেই বসিয়া আছেন। শিষ্যের সঙ্গে প্রসন্নবদনে মেয়েদের জন্য যে ভাবী মঠ করিবেন, সে বিষয়ে বলিতেছেন:

মাকে কেন্দ্র ক'রে গঙ্গার পূর্বতটে মেয়েদের জন্য একটি মঠ স্থাপন করতে হবে। এ মঠে যেমন ব্রহ্মচারী সাধু—সব তৈরী হবে, ওপারে মেয়েদের মঠেও তেমনি ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী—সব তৈরী হবে।

শিষ্য। মহাশয়, ভারতবর্ষে বহু পূর্বকালে মেয়েদের জন্য তো কোন মঠের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধযুগেই স্ত্রী-মঠের কথা শুনা যায়। কিন্তু উহা হইতে কালে নানা ব্যভিচার আসিয়া পড়িয়াছিল, ঘোর বামাচারে দেশ পর্যুদস্ত হইয়া গিয়াছিল।

স্বামীজী। এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাত কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস বল্ দেখি? স্মৃতি-ফৃতি লিখে, নিয়ম-নীতিতে বদ্ধ ক'রে এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে manufacturing machine (উৎপাদনের যন্ত্র) ক'রে তুলেছে! মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এইসব মেয়েদের এখন না তুললে বুঝি তোদের আর উপায়ান্তর আছে?

শিষ্য। মহাশয়, স্ত্রীজাতি সাক্ষাৎ মায়ার মূর্তি। মানুষের অধঃপতনের জন্য যেন উহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। স্ত্রীজাতিই মায়া দ্বারা মানবের জ্ঞান-বৈরাগ্য আবরিত করিয়া দেয়। সেইজন্যই বোধ হয় শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, উহাদের জ্ঞানভক্তি কখনও হইবে না।

স্বামীজী। কোন্ শাস্ত্রে এমন কথা আছে যে মেয়েরা জ্ঞান-ভক্তির অধিকারিণী হবে না? ভারতের অধঃপতন হ'ল ভটচায-বামুনরা ব্রাহ্মণেতর জাতকে যখন বেদপাঠের অনধিকারী ব'লে নির্দেশ করলে, সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকার কেড়ে নিলে। নতুবা বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে দেখতে পাবি—মৈত্রেয়ী গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃ-স্মরণীয়া মেয়েরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করেছিলেন। এ-সব আদর্শস্থানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল, তখন মেয়েদের সে অধিকার এখনই বা থাকবে না কেন? একবার যা ঘটেছে, তা আবার অবশ্য ঘটতে পারে। History repeats itself (ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়)। মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ—সে-জাত কখনও বড় হ'তে পারেনি, কস্মিন্ কালে পারবেও না। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এইসব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা। মনু বলেছেন, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥'[১]

---

[১] যেখানে নারীগণ পূজিতা হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন। যেখানে নারীগণ সম্মানিতা হন না, সেখানে সকল কাজই নিষ্ফল।—মনুসংহিতা, ৩।৫৬

যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের—সে দেশের কখন উন্নতির আশা নেই। এ-জন্য এদের আগে তুলতে হবে—এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে।

শিষ্য। মহাশয়, প্রথমবার বিলাত হইতে আসিয়া আপনি স্টার থিয়েটারে বক্তৃতা দিবার কালে তন্ত্রকে কত গালমন্দ করিয়াছিলেন। এখন আবার তন্ত্র-সমর্থিত স্ত্রী-পূজার সমর্থন করিয়া নিজের কথা নিজেই যে বদলাইতেছেন।

স্বামীজী। তন্ত্রের বামাচার-মতটা পরিবর্তিত হয়ে এখন যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি তারই নিন্দা করেছিলুম। তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবের অথবা ঠিক ঠিক বামাচারেরও নিন্দা করিনি। ভগবতীজ্ঞানে মেয়েদের পূজা করাই তন্ত্রের অভিপ্রায়। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের সময় বামাচারটা ঘোর দূষিত হয়ে উঠেছিল, সেই দূষিত ভাবটা এখনকার বামাচারে এখনও রয়েছে; এখনও ভারতের তন্ত্রশাস্ত্র ঐ ভাবের দ্বারা influenced (প্রভাবিত) হয়ে রয়েছে। ঐ সকল বীভৎস প্রথারই আমি নিন্দা করেছিলুম—এখনও তো তা করি। যে মহামায়ার রূপরসাত্মক বাহ্যবিকাশ মানুষকে উন্মাদ ক'রে রেখেছে, তাঁরই জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্যাদি আন্তরবিকাশে আবার মানুষকে সর্বজ্ঞ সিদ্ধসংকল্প ব্রহ্মজ্ঞ ক'রে দিচ্ছে—সেই মাতৃরূপিণীর স্ফুরদ্বিগ্রহস্বরূপিণী মেয়েদের পূজা করতে আমি কখনই নিষেধ করিনি। 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'[১] —এই মহামায়াকে পূজা প্রণতি দ্বারা প্রসন্না না করতে পারলে সাধ্য কি ব্রহ্মা বিষ্ণু পর্যন্ত তাঁর হাত ছাড়িয়ে মুক্ত হন? গৃহলক্ষ্মীগণের পূজাকল্পে—তাদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যাবিকাশকল্পে মেয়েদের মঠ ক'রে যাব।

শিষ্য। আপনার উহা উত্তম সংকল্প হইতে পারে, কিন্তু মেয়ে কোথায় পাইবেন? সমাজের কঠিন বন্ধনে কে কুলবধূদের স্ত্রী-মঠে যাইতে অনুমতি দিবে?

স্বামীজী। কেন রে? এখনও ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে স্ত্রী-মঠ start (আরম্ভ) ক'রে দিয়ে যাব।

---

১ চণ্ডী, ১।৫৬

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী তাঁদের central figure (কেন্দ্রস্বরূপা) হয়ে বসবেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদের স্ত্রী-কন্যারা ওখানে প্রথমে বাস করবে। কারণ, তারা ঐরূপ স্ত্রী-মঠের উপকারিতা সহজেই বুঝতে পারবে। তারপর তাদের দেখাদেখি কত গেরস্ত এই মহাকার্যে সহায় হবে।

শিষ্য। ঠাকুরের ভক্তেরা এ কার্যে অবশ্যই যোগ দিবেন। কিন্তু সাধারণ লোকে এ কার্যে সহায় হইবে বলিয়া মনে হয় না।

স্বামীজী। জগতের কোন মহৎ কাজই sacrifice (ত্যাগ) ভিন্ন হয়নি। বটগাছের অঙ্কুর দেখে কে মনে করতে পারে—কালে উহা প্রকাণ্ড বটগাছ হবে? এখন তো এইভাবে মঠস্থাপন ক'রব। পরে দেখবি, এক-আধ generation (পুরুষ) বাদে ঐ মঠের কদর দেশের লোক বুঝতে পারবে। এই যে বিদেশী মেয়েরা আমার চেলী হয়েছে, এরাই এ-কাজে জীবনপাত ক'রে যাবে। তোরা ভয় কাপুরুষতা ছেড়ে এই মহৎ কাজে সহায় হ। আর এই উচ্চ ideal (আদর্শ) সকল লোকের সামনে ধর্। দেখবি, কালে এর প্রভায় দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

শিষ্য। মহাশয়, মেয়েদের জন্য কিরূপ মঠ করিতে চাহেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ আমাকে বলুন। শুনিবার বড়ই উৎসাহ হইতেছে।

স্বামীজী। গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হবে। তাতে অবিবাহিতা কুমারীরা থাকবে, আর বিধবা ব্রহ্মচারিণীরা থাকবে। আর ভক্তিমতী গেরস্তর মেয়েরা মধ্যে মধ্যে এসে অবস্থান করতে পাবে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংস্রব থাকবে না। পুরুষ-মঠের বয়োবৃদ্ধ সাধুরা দূর থেকে স্ত্রী-মঠের কার্যভার চালাবে। স্ত্রী-মঠে মেয়েদের একটি স্কুল থাকবে; তাতে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, চাই কি—অল্প-বিস্তর ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হবে। সেলাইয়ের কাজ, রান্না, গৃহকর্মের যাবতীয় বিধান এবং শিশুপালনের স্থূল বিষয়গুলিও শেখানো হবে। আর জপ, ধ্যান, পূজা এ-সব তো শিক্ষার অঙ্গ থাকবেই। যারা বাড়ি ছেড়ে একেবারে এখানে থাকতে পারবে, তাদের অন্নবস্ত্র এই মঠ থেকে দেওয়া হবে। যারা তা পারবে না, তারা এই মঠে দৈনিক ছাত্রী-রূপে এসে পড়াশুনা করতে পারবে। চাই কি, মঠাধ্যক্ষের অভিমতে মধ্যে

মধ্যে এখানে থাকতে এবং যতদিন থাকবে খেতেও পাবে। মেয়েদের ব্রহ্মচর্যকল্পে এই মঠে বয়োবৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নেবে। এই মঠে ৫।৭ বৎসর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাদের বিয়ে দিতে পারবে। যোগ্যাধিকারিণী ব'লে বিবেচিত হ'লে অভিভাবকদের মত নিয়ে ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারী-ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করতে পারবে। যারা চিরকুমারীব্রত অবলম্বন করবে, তারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে centres (শিক্ষাকেন্দ্র) খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ন করবে। চরিত্রবতী, ধর্মভাবাপন্না ঐরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হবে। ধর্মপরায়ণতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলঙ্কার হবে; আর সেবাধর্ম তাদের জীবনব্রত হবে। এইরূপ আদর্শ জীবন দেখলে কে তাদের না সম্মান করবে—কেই বা তাদের অবিশ্বাস করবে? দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইভাবে গঠিত হ'লে তবে তো তোদের দেশে সীতা সাবিত্রী গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হবে। দেশাচারের ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন স্পন্দনহীন হয়ে তোদের মেয়েরা এখন কি যে হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা একবার পাশ্চাত্য দেশ দেখে এলে বুঝতে পারতিস্। মেয়েদের ঐ দুর্দশার জন্য তোরাই দায়ী। আবার দেশের মেয়েদের পুনরায় জাগিয়ে তোলাও তোদের হাতে রয়েছে। তাই বলছি, কাজে লেগে যা। কি হবে ছাই শুধু কতকগুলো বেদবেদান্ত মুখস্থ ক'রে?

শিষ্য। মহাশয়, এখানে শিক্ষালাভ করিয়াও যদি মেয়েরা বিবাহ করে, তবে আর তাহাদের ভিতর আদর্শ জীবন কেমন করিয়া লোকে দেখিতে পাইবে? এমন নিয়ম হইলে ভাল হয় না কি যে, যাহারা এই মঠে শিক্ষালাভ করিবে, তাহারা আর বিবাহ করিতে পারিবে না?

স্বামীজী। তা কি একেবারেই হয় রে? শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তারপর নিজেরাই ভেবে চিন্তে যা হয় করবে। বে ক'রে সংসারী হলেও ঐরূপে শিক্ষিতা মেয়েরা নিজ নিজ পতিকে উচ্চ ভাবের প্রেরণা দেবে এবং বীর পুত্রের জননী হবে। কিন্তু স্ত্রী-মঠের ছাত্রীদের অভিভাবকেরা ১৫ বৎসরের পূর্বে তাদের বে দেবার নামগন্ধ করতে পারবে না—এ নিয়ম রাখতে হবে।

শিষ্য। মহাশয়, তাহা হইলে সমাজে ঐ-সকল মেয়েদের কলঙ্ক রটিবে। কেহই তাহাদের আর বিবাহ করিতে চাহিবে না।

স্বামীজী। কেন চাইবে না? তুই সমাজের গতি এখনও বুঝতে পারিসনি। এই সব বিদুষী ও কর্মতৎপরা মেয়েদের বরের অভাব হবে না। 'দশমে কন্যকাপ্রাপ্তিঃ'—সে-সব বচনে এখন সমাজ চলছে না, চলবেও না। এখনি দেখতে পাচ্ছিসনে?

শিষ্য। যাহাই বলুন, কিন্তু প্রথম প্রথম ইহার বিরুদ্ধে একটা ঘোরতর আন্দোলন হইবে।

স্বামীজী। তা হোক না; তাতে ভয় কি? সৎসাহসে অনুষ্ঠিত সৎকাজে বাধা পেলে অনুষ্ঠাতাদের শক্তি আরও জেগে উঠবে। যাতে বাধা নেই, প্রতিকূলতা নেই, তা মানুষকে মৃত্যুপথে নিয়ে যায়। Struggle (বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করবার চেষ্টাই) জীবনের চিহ্ন। বুঝেছিস?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী। পরমব্রহ্মতত্ত্বে লিঙ্গভেদ নেই। আমরা 'আমি-তুমি'র plane-এ (ভূমিতে) লিঙ্গভেদটা দেখতে পাই; আবার মন যত অন্তর্মুখ হ'তে থাকে, ততই ঐ ভেদজ্ঞানটা চলে যায়। শেষে মন যখন সমরস ব্রহ্মতত্ত্বে ডুবে যায়, তখন আর 'এ স্ত্রী, ও পুরুষ'—এই জ্ঞান একেবারেই থাকে না। আমরা ঠাকুরে ঐরূপ প্রত্যক্ষ দেখেছি। তাই বলি, মেয়ে-পুরুষে বাহ্য ভেদ থাকলেও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নেই। অতএব পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হ'তে পারে তো মেয়েরা তা হ'তে পারবে না কেন? তাই বলছিলুম—মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞ হন, তবে তাঁর প্রতিভায় হাজারো মেয়ে জেগে উঠবে এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণ হবে। বুঝলি?

শিষ্য। মহাশয়, আপনার উপদেশে আজ আমার চক্ষু খুলিয়া গেল।

স্বামীজী। এখনি কি খুলেছে? যখন সর্বাবভাসক আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবি, তখন দেখবি—এই স্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হবে; তখনই মেয়েদের ব্রহ্মরূপিণী ব'লে বোধ হবে। ঠাকুরকে দেখেছি, স্ত্রীমাত্রেই মাতৃভাব—তা যে-জাতির যেরূপ স্ত্রীলোকই হোক না কেন। দেখেছি কি না!—তাই এত ক'রে তোদের ঐরূপ করতে বলি এবং

মেয়েদের জন্ত গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে তাদের মানুষ করতে বলি। মেয়েরা মানুষ হ'লে তবে তো কালে তাদের সন্তান-সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জল হবে—বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে।

শিষ্য। আধুনিক শিক্ষায় কিন্তু মহাশয়, বিপরীত ফল ফলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। মেয়েরা একটু-আধটু পড়িতে ও সেমিজ-গাউন পরিতেই শিখিতেছে, কিন্তু ত্যাগ-সংযম-তপস্যা-ব্রহ্মচর্যাদি ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপযোগী বিষয়ে কতটা উন্নত যে হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

স্বামীজী। প্রথম প্রথম অমনটা হয়ে থাকে। দেশে নূতন idea-র (ভাবের) প্রথম প্রচারকালে কতকগুলি লোক ঐ ভাব ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে না পেরে অমন খারাপ হয়ে যায়। তাতে বিরাট সমাজের কি আসে যায়? কিন্তু যারা অধুনা প্রচলিত যৎসামান্য স্ত্রীশিক্ষার জন্তও প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের মহাপ্রাণতায় কি সন্দেহ আছে? তবে কি জানিস, শিক্ষাই বলিস আর দীক্ষাই বলিস, ধর্মহীন হ'লে তাতে গলদ থাকবেই থাকবে। এখন ধর্মকে centre (কেন্দ্র) ক'রে রেখে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা secondary (গৌণ) হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্যব্রত-উদ্‌যাপন—এ জন্ত শিক্ষার দরকার। বর্তমানকালে এ পর্যন্ত ভারতে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েছে, তাতে ধর্মটাকেই secondary (গৌণ) ক'রে রাখা হয়েছে, তাইতেই তুই যে-সব দোষের কথা বললি, সেগুলি হয়েছে। কিন্তু তাতে স্ত্রীলোকদের কি দোষ বল্? সংস্কারকেরা নিজে ব্রহ্মজ্ঞ না হয়ে স্ত্রীশিক্ষা দিতে অগ্রসর হওয়াতেই তাদের অমন বে-চালে পা পড়েছে। সকল সৎকার্যের প্রবর্তকেরই অভীপ্সিত কার্যানুষ্ঠানের পূর্বে কঠোর তপস্যাসহায়ে আত্মজ্ঞ হওয়া চাই। নতুবা তার কাজে গলদ বেরোবেই। বুঝলি।

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক শিক্ষিতা মেয়েরা কেবল নভেল-নাটক পড়িয়াই সময় কাটায়; পূর্ববঙ্গে কিন্তু মেয়েরা শিক্ষিতা হইয়াও নানা ব্রতের অনুষ্ঠান করে। এদেশে ঐরূপ করে কি?

স্বামীজী। ভাল-মন্দ সব দেশে সব জাতের ভেতর রয়েছে। আমাদের কাজ হচ্ছে—নিজের জীবনে ভাল কাজ ক'রে লোকের সামনে

example (দৃষ্টান্ত) ধরা। Condemn (নিন্দাবাদ) ক'রে কোন কাজ সফল হয় না। কেবল লোক হটে যায়। যে যা বলে বলুক, কাকেও contradict (অস্বীকার) করবিনি। এই মায়ার জগতে যা করতে যাবি, তাইতেই দোষ থাকবে। 'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ'[১]—আগুন থাকলেই ধূম উঠবে। কিন্তু তাই ব'লে কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হবে? যতটা পারিস, ভাল কাজ ক'রে যেতে হবে।

শিষ্য। ভাল কাজটা কি?

স্বামীজী। যাতে ব্রহ্মবিকাশের সাহায্য করে, তাই ভাল কাজ। সব কাজই প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষভাবে আত্মতত্ত্ব-বিকাশের সহায়কারী ভাবে করা যায়। তবে ঋষিপ্রচলিত পথে চললে ঐ আত্মজ্ঞান শীগগীর ফুটে বেরোয়। আর যাকে শাস্ত্রকারগণ অন্যায় ব'লে নির্দেশ করেছেন, সেগুলি করলে আত্মার বন্ধন ঘটে, কখন কখন জন্মজন্মান্তরেও সেই মোহবন্ধন ঘোচে না। কিন্তু সর্বদেশে সর্বকালেই জীবের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। কারণ আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। নিজের স্বরূপ নিজে কি ছাড়তে পারে? তোর ছায়ার সঙ্গে তুই হাজার বৎসর লড়াই করেও ছায়াকে কি তাড়াতে পারিস? সে তোর সঙ্গে থাকবেই।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আচার্য শঙ্করের মতে কর্ম জ্ঞানের পরিপন্থী—জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়কে তিনি বহুধা খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব কর্ম কেমন করিয়া জ্ঞানের প্রকাশক হইবে?

স্বামীজী। আচার্য শঙ্কর ঐরূপ ব'লে আবার জ্ঞানবিকাশকল্পে কর্মকে আপেক্ষিক সহায়কারী এবং সত্ত্বশুদ্ধির উপায় ব'লে নির্দেশ করেছেন। তবে শুদ্ধ জ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশ নেই—ভাষ্যকারের এ সিদ্ধান্তের আমি প্রতিবাদ করছি না। ক্রিয়া, কর্তা ও কর্ম-বোধ যতকাল মানুষের থাকবে, ততকাল সাধ্য কি—সে কাজ না ক'রে বসে থাকে? অতএব কর্মই যখন জীবের স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন যে-সব কর্ম এই আত্মজ্ঞানবিকাশকল্পে সহায়ক হয়, সেগুলি কেন ক'রে যা না?

---

১ গীতা, ১৮।৪৮

কর্মমাত্রই ভ্রমাত্মক—এ-কথা পারমার্থিকরূপে যথার্থ হলেও ব্যবহারে কর্মের বিশেষ উপযোগিতা আছে। তুই যখন আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবি, তখন কর্ম করা বা না করা তোর ইচ্ছাধীন হয়ে দাঁড়াবে। সেই অবস্থায় তুই যা করবি, তাই সৎ কর্ম হবে; তাতে জীবের, জগতের কল্যাণ হবে। ব্রহ্মবিকাশ হ'লে তোর শ্বাসপ্রশ্বাসের তরঙ্গ পর্যন্ত জীবের সহায়কারী হবে। তখন আর plan (মতলব) এঁটে কর্ম করতে হবে না। বুঝলি?

শিষ্য। আহা, ইহা বেদান্তের কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়কারী অতি সুন্দর মীমাংসা।

অনন্তর নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্বামীজী শিষ্যকে প্রসাদ পাইবার জন্য যাইতে বলিলেন। শিষ্যও যাইবার পূর্বে স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া করজোড়ে বলিল, 'মহাশয়, আপনার স্নেহাশীর্বাদে আমার যেন এ জন্মেই ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ হয়।' শিষ্যের মস্তকে হাত দিয়া স্বামীজী বলিলেন:

ভয় কি বাবা? তোরা কি আর এ জগতের লোক—না গেরস্ত, না সন্ন্যাসী! এই এক নূতন ঢং।

৩৬

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(জুন?), ১৯০১

স্বামীজীর শরীর অসুস্থ। আজ ৫।৭ দিন যাবৎ স্বামীজী কবিরাজী ঔষধ খাইতেছেন। এই ঔষধে জলপান একেবারে নিষিদ্ধ। দুগ্ধমাত্র পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইতেছে।

শিষ্য প্রাতেই মঠে আসিয়াছে। আসিবার কালে একটা রুই মাছ ঠাকুরের ভোগের জন্য আনিয়াছে। মাছ দেখিয়া স্বামী প্রেমানন্দ তাহাকে বলিলেন, 'আজও মাছ আনতে হয়? একে আজ রবিবার, তার উপর স্বামীজী অসুস্থ

—শুধু দুধ খেয়ে আজ ৫।৭ দিন আছেন।' শিষ্য অপ্রস্তুত হইয়া নীচে মাছ ফেলিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম-দর্শনমানসে উপরে গেল। শিষ্যকে দেখিয়া স্বামীজী সস্নেহে বলিলেন, 'এসেছিস? ভালই হয়েছে; তোর কথাই ভাবছিলুম।'

শিষ্য। শুনিলাম, শুধু দুধমাত্র পান করিয়া নাকি আজ পাঁচ-সাত দিন আছেন?

স্বামীজী। হাঁ, নিরঞ্জনের একান্ত অনুরোধে কবিরাজী ঔষধ খেতে হ'ল। ওদের কথা তো এড়াতে পারিনে।

শিষ্য। আপনি তো ঘণ্টায় পাঁচ-ছয় বার জলপান করিতেন। কেমন করিয়া একেবারে উহা ত্যাগ করিলেন?

স্বামীজী। যখন শুনলুম এই ঔষধ খেলে জল খেতে পাব না, তখনি দৃঢ় সঙ্কল্প করলুম—জল খাব না। এখন আর জলের কথা মনেও আসে না।

শিষ্য। ঔষধে রোগের উপশম হইতেছে তো?

স্বামীজী। উপকার অপকার—জানিনে। গুরুভাইদের আজ্ঞাপালন ক'রে যাচ্ছি।

শিষ্য। দেশী কবিরাজী ঔষধ বোধ হয় আমাদের শরীরের পক্ষে সমধিক উপযোগী।

স্বামীজী। আমার মত কিন্তু একজন scientific (বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিশারদ) চিকিৎসকের হাতে মরাও ভাল; layman (হাতুড়ে)—যারা বর্তমান science (বিজ্ঞান)-এর কিছুই জানে না, কেবল সেকেলে পাজিপুঁথির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে, তারা যদি দু-চারটে রোগী আরাম করেও থাকে, তবু তাদের হাতে আরোগ্যলাভ আশা করা কিছু নয়।

এইরূপ কথাবার্তা চলিয়াছে, এমন সময় স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীর কাছে আসিয়া বলিলেন যে, শিষ্য ঠাকুরের ভোগের জন্য একটা বড় মাছ আনিয়াছে, কিন্তু আজ রবিবার, কি করা যাইবে। স্বামীজী বলিলেন, 'চল্, কেমন মাছ দেখব।'

অনন্তর স্বামীজী একটা গরম জামা পরিলেন এবং দীর্ঘ একগাছা যষ্টি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে নীচের তলায় আসিলেন। মাছ দেখিয়া স্বামীজী আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'আজই ভাল ক'রে মাছ রেঁধে ঠাকুরকে ভোগ

যে।' স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন, 'রবিবারে ঠাকুরকে মাছ দেওয়া হয় না যে।' তদুত্তরে স্বামীজী বলিলেন, 'ভক্তের আনীত দ্রব্যে শনিবার-রবিবার নেই। ভোগ দিগে যা।' স্বামী প্রেমানন্দ আর আপত্তি না করিয়া স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিলেন এবং সেদিন রবিবার সত্ত্বেও ঠাকুরকে মৎস্যভোগ দেওয়া স্থির হইল।

মাছ কাটা হইলে ঠাকুরের ভোগের জন্য অগ্রভাগ রাখিয়া দিয়া স্বামীজী ইংরেজী ধরনে রাঁধিবেন বলিয়া কতকটা মাছ নিজে চাহিয়া লইলেন এবং আগুনের তাতে পিপাসার বৃদ্ধি হইবে বলিয়া মঠের সকলে তাঁহাকে রাঁধিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেও কোন কথা না শুনিয়া দুধ ভারমিসেলি দধি প্রভৃতি দিয়া চার-পাঁচ প্রকারে ঐ মাছ রাঁধিয়া ফেলিলেন। প্রসাদ পাইবার সময় স্বামীজী ঐ-সকল মাছের তরকারি আনিয়া শিষ্যকে বলিলেন, 'বাঙাল মৎস্যপ্রিয়। দেখ্ দেখি কেমন রান্না হয়েছে।' ঐ কথা বলিয়া তিনি ঐ-সকল ব্যঞ্জনের বিন্দু বিন্দু মাত্র নিজে গ্রহণ করিয়া শিষ্যকে স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন হয়েছে?' শিষ্য বলিল, 'এমন কখনও খাই নাই।' তাহার প্রতি স্বামীজীর অপার দয়ার কথা স্মরণ করিয়াই তখন তাহার প্রাণ পূর্ণ! ভারমিসেলি (vermicelli) শিষ্য ইহজন্মে খায় নাই। ইহা কি পদার্থ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, 'ওগুলি বিলিতী কেঁচো। আমি লণ্ডন থেকে শুকিয়ে এনেছি।' মঠের সন্ন্যাসিগণ সকলে হাসিয়া উঠিলেন; শিষ্য রহস্য বুঝিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিল।

কবিরাজী ঔষধের কঠোর নিয়ম পালন করিতে যাইয়া স্বামীজীর এখন আহার নাই এবং নিদ্রাদেবী তাঁহাকে বহুকাল হইল একরূপ ত্যাগই করিয়াছেন, কিন্তু এই অনাহার-অনিদ্রাতেও স্বামীজীর শ্রমের বিরাম নাই। কয়েক দিন হইল মঠে নূতন Encyclopædia Britannica (এনসাইক্লো-পেডিয়া ব্রিটানিকা) ক্রয় করা হইয়াছে। নূতন ঝকঝকে বইগুলি দেখিয়া শিষ্য স্বামীজীকে বলিল, 'এত বই এক জীবনে পড়া দুর্ঘট।' শিষ্য তখন জানে না যে, স্বামীজী ঐ বইগুলির দশ খণ্ড ইতোমধ্যে পড়িয়া শেষ করিয়া একাদশ খণ্ডখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।

স্বামীজী। কি বলছিস? এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস কর্—সব ব'লে দেবো।

শিষ্য। (অবাক হইয়া) আপনি কি এই বইগুলি সব পড়িয়াছেন?

স্বামীজী। না পড়লে কি বলছি?

অনন্তর স্বামীজীর আদেশ পাইয়া শিষ্য ঐ-সকল পুস্তক হইতে বাছিয়া বাছিয়া কঠিন কঠিন বিষয়সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আশ্চর্যের বিষয়, স্বামীজী ঐ বিষয়গুলির পুস্তকে নিবদ্ধ মর্ম তো বলিলেনই, তাহার উপর স্থানে স্থানে ঐ পুস্তকের ভাষা পর্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন। শিষ্য ঐ বৃহৎ দশ খণ্ড পুস্তকের প্রত্যেকখানি হইতেই দুই-একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিল এবং স্বামীজীর অসাধারণ ধী-ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া অবাক হইয়া বইগুলি তুলিয়া রাখিয়া বলিল, 'ইহা মানুষের শক্তি নয়!'

স্বামীজী। দেখলি, একমাত্র ব্রহ্মচর্যপালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল।

শিষ্য। আপনি যাহাই বলুন, মহাশয়, কেবল ব্রহ্মচর্যরক্ষার ফলে এরূপ অমানুষিক শক্তির স্ফুরণ কখনই সম্ভবে না। আরও কিছু চাই।

উত্তরে স্বামীজী আর কিছুই বলিলেন না।

অনন্তর স্বামীজী সর্বদর্শনের কঠিন বিষয়সকলের বিচার ও সিদ্ধান্তগুলি শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন। অন্তরে অন্তরে ঐ সিদ্ধান্তগুলি প্রবেশ করাইয়া দিবার জন্যই যেন আজ তিনি ঐগুলি ঐরূপ বিশদভাবে তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

এইরূপ কথাবার্তা চলিয়াছে, এমন সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করিয়া শিষ্যকে বলিলেন, 'তুই তো বেশ! স্বামীজীর অসুস্থ শরীর—কোথায় গল্পসল্প ক'রে স্বামীজীর মন প্রফুল্ল রাখবি, তা না তুই কি না ঐ-সব জটিল কথা তুলে স্বামীজীকে বকাচ্ছিস!' শিষ্য অপ্রস্তুত হইয়া আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিল। কিন্তু স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে বলিলেন, 'নে, রেখে দে তোদের কবিরাজী নিয়ম-ফিয়ম। এরা আমার সন্তান, এদের সদুপদেশ দিতে দিতে আমার দেহটা যায় তো বয়ে গেল।'

শিষ্য কিন্তু অতঃপর আর কোন দার্শনিক প্রশ্ন না করিয়া বাঙালদেশীয় কথা লইয়া হাসি-তামাসা করিতে লাগিল। স্বামীজীও শিষ্যের সঙ্গে রঙ্গ-রহস্যে যোগ দিলেন। কিছুকাল এইরূপে কাটিবার পর বঙ্গসাহিত্যে ভারতচন্দ্রের স্থান সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠিল।

প্রথম হইতে স্বামীজী ভারতচন্দ্রকে লইয়া নানা ঠাট্টাতামাসা আরম্ভ করিলেন এবং তখনকার সামাজিক আচার-ব্যবহার বিবাহসংস্কারাদি লইয়াও নানারূপ ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং সমাজে বাল্যবিবাহ-সমর্থনকারী ভারতচন্দ্রের কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ কাব্যাদি বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশের সভ্য সমাজে প্রশ্রয় পায় নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'ছেলেদের হাতে এ-সব বই যাতে না পড়ে, তাই করা উচিত।' পরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা তুলিয়া বলিলেন :

ঐ একটা অদ্ভুত genius (প্রতিভা) তোদের দেশে জন্মেছিল। 'মেঘনাদবধে'র মতো দ্বিতীয় কাব্য বাঙলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র ইওরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মাইকেল বড়ই শব্দাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী। তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস। আগে ভাল ক'রে দেখ্—লোকটা কি বলছে, তা না, যাই কিছু আগেকার মতো না হ'ল, অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগলো। এই 'মেঘনাদবধকাব্য'—যা তোদের বাঙলা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কিনা 'ছুঁচোবধকাব্য' লেখা হ'ল! তা যত পারিস লেখ্ না, তাতে কি? সেই 'মেঘনাদবধকাব্য' এখনও হিমাচলের মতো অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার খুঁত ধরতেই যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সে-সব critic (সমালোচক)দের মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন, তা সাধারণে কি বুঝবে? এই যে জি. সি. কেমন নূতন ছন্দে কত চমৎকার চমৎকার বই আজকাল লিখছে, তা নিয়েও তোদের অতিবুদ্ধি পণ্ডিতগণ কত criticise (সমালোচনা) করছে—দোষ ধরছে! জি. সি. কি তাতে ভ্রূক্ষেপ করে? পরে লোকে ঐসব বই appreciate (আদর) করবে।

এইরূপে মাইকেলের কথা হইতে হইতে তিনি বলিলেন, 'যা, নীচে লাইব্রেরী থেকে মেঘনাদবধকাব্য-খানা নিয়ে আয়।' শিষ্য মঠের লাইব্রেরী হইতে 'মেঘনাদবধকাব্য' লইয়া আসিলে বলিলেন, 'পড়্ দিকি—কেমন পড়তে জানিস ?'

শিষ্য বই খুলিয়া প্রথম সর্গের খানিকটা সাধ্যমত পড়িতে লাগিল। কিন্তু পড়া স্বামীজীর মনোমত না হওয়ায় তিনি ঐ অংশটি পড়িয়া দেখাইয়া শিষ্যকে পুনরায় উহা পড়িতে বলিলেন। শিষ্য এবার অনেকটা কৃতকার্য হইল দেখিয়া প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল্ দিকি—এই কাব্যের কোন অংশটি সর্বোৎকৃষ্ট ?'

শিষ্য কিছুই বলিতে না পারিয়া নির্বাক হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন :

যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, শোকে মুহ্যমানা মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর ক'রে ঠেলে ফেলে মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রী-পুত্র সব ভুলে যুদ্ধের জন্য গমনোদ্যত—সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা। 'যা হবার হোক গে ; আমার কর্তব্য আমি ভুলব না, এতে দুনিয়া থাক, আর যাক'—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ঐ অংশ লিখেছিলেন।

এই বলিয়া স্বামীজী সে অংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বামীজীর সেই বীরদর্পদ্যোতক পঠন-ভঙ্গী আজও শিষ্যের হৃদয়ে জলন্ত—জাগরূক রহিয়াছে।

৩৭

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০১

স্বামীজীর অসুখ এখনও একটু আছে। কবিরাজী ঔষধে অনেক উপকার হইয়াছে। মাসাধিক শুধু দুধ পান করিয়া থাকায় স্বামীজীর শরীরে আজকাল যেন চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং তাঁহার সুবিশাল নয়নের জ্যোতি অধিকতর বর্ধিত হইয়াছে।

আজ দুই দিন হইল শিষ্য মঠেই আছে। যথাসাধ্য স্বামীজীর সেবা করিতেছে। আজ অমাবস্যা। শিষ্য নির্ভয়ানন্দ-স্বামীর সহিত ভাগাভাগি করিয়া স্বামীজীর রাত্রিসেবার ভার লইবে, স্থির হইয়াছে। এখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

স্বামীজীর পদসেবা করিতে করিতে শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, যে আত্মা সর্বগ, সর্বব্যাপী, অণুপরমাণুতে অনুস্যূত ও জীবের প্রাণের প্রাণ হইয়া তাহার এত নিকটে রহিয়াছেন, তাঁহার অনুভূতি হয় না কেন?'

স্বামীজী। তোর যে চোখ আছে, তা কি তুই জানিস? যখন কেউ চোখের কথা বলে, তখন 'আমার চোখ আছে' ব'লে কতকটা ধারণা হয়; আবার চোখে বালি পড়ে যখন চোখ কর্‌কর্‌ করে, তখন চোখ যে আছে, তা ঠিক ঠিক ধারণা হয়। সেইরূপ অন্তর হইতে অন্তরতম এই বিরাট আত্মার বিষয় সহজে বোধগম্য হয় না। শাস্ত্র বা গুরুমুখে শুনে খানিকটা ধারণা হয় বটে, কিন্তু যখন সংসারের তীব্র শোকদুঃখের কঠোর কশাঘাতে হৃদয় ব্যথিত হয়, যখন আত্মীয়স্বজনের বিয়োগে জীব আপনাকে অবলম্বনশূন্য জ্ঞান করে, যখন ভাবী জীবনের দুরতিক্রমণীয় দুর্ভেদ্য অন্ধকারে তার প্রাণ আকুল হয়, তখনি জীব এই আত্মার দর্শনে উন্মুখ হয়। এইজন্য দুঃখ আত্মজ্ঞানের অনুকূল। কিন্তু ধারণা থাকা চাই। দুঃখ পেতে পেতে কুকুর-বেড়ালের মতো যারা মরে, তারা কি আর মানুষ? মানুষ হচ্ছে সেই, যে এই সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব-প্রতিঘাতে অস্থির হয়েও বিচারবলে ঐ-সকলকে নশ্বর ধারণা ক'রে আত্মরতিপর হয়। মানুষে ও অন্য জীব-জানোয়ারে এইটুকু প্রভেদ।

যে জিনিসটা যত নিকটে, তার তত কম অনুভূতি হয়। আত্মা অন্তর হ'তে অন্তরতম, তাই অমনস্ক চঞ্চলচিত্ত জীব তাঁর সন্ধান পায় না। কিন্তু সমনস্ক, শান্ত ও জিতেন্দ্রিয় বিচারশীল জীব বহির্জগৎ উপেক্ষা ক'রে অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে করতে কালে এই আত্মার মহিমা উপলব্ধি ক'রে গৌরবান্বিত হয়। তখনি সে আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং 'আমিই সেই আত্মা', 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' প্রভৃতি বেদের মহাবাক্য-সকল প্রত্যক্ষ অনুভব করে। বুঝলি?

শিষ্য। আজ্ঞা, হাঁ। কিন্তু মহাশয়, এ দুঃখকষ্ট-তাড়নার মধ্য দিয়া আত্মজ্ঞানলাভের ব্যবস্থা কেন? সৃষ্টি না হইলেই তো বেশ ছিল। আমরা সকলেই তো এককালে ব্রহ্মে বর্তমান ছিলাম। ব্রহ্মের এইরূপ সিসৃক্ষাই[1] বা কেন? আর এই দ্বন্দ্ব-ঘাত-প্রতিঘাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ জীবের এই জন্ম-মরণসঙ্কুল পথে গতাগতিই বা কেন?

স্বামীজী। লোকে মাতাল হ'লে কত খেয়াল দেখে। কিন্তু নেশা যখন ছুটে যায়, তখন সেগুলো মাথার ভুল ব'লে বুঝতে পারে। অনাদি অথচ সান্ত এই অজ্ঞান-বিলসিত সৃষ্টি-ফিষ্টি যা কিছু দেখছিস, সেটা তোর মাতাল অবস্থার কথা; নেশা ছুটে গেলে তোর ঐ-সব প্রশ্নই থাকবে না।

শিষ্য। মহাশয়, তবে কি সৃষ্টি-স্থিতি এ-সব কিছুই নাই?

স্বামীজী। থাকবে না কেন রে? যতক্ষণ তুই এই দেহবুদ্ধি ধরে 'আমি আমি' করছিস, ততক্ষণ সবই আছে। আর যখন তুই বিদেহ আত্মরতি আত্মক্রীড়, তখন তোর পক্ষে এ-সব কিছু থাকবে না; সৃষ্টি জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি আছে কি না—এ প্রশ্নেরও তখন আর অবসর থাকবে না। তখন তোকে বলতে হবে—

ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ।
অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদদ্ভুতম্॥[2]

শিষ্য। জগতের জ্ঞান একেবারে না থাকিলে 'কুত্র লীনমিদং জগৎ' কথাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

---

১ সৃজনের ইচ্ছা

২ বিবেকচূড়ামণি, ৪৮৪

স্বামীজী। ভাষায় ঐ ভাবটা প্রকাশ ক'রে বোঝাতে হচ্ছে, তাই ঐরূপ বলা হয়েছে। যেখানে ভাব ও ভাষার প্রবেশাধিকার নেই, সেই অবস্থাটা ভাব ও ভাষায় প্রকাশ করতে গ্রন্থকার চেষ্টা করছেন, তাই জগৎ কথাটা যে নিঃশেষে মিথ্যা, সেটা ব্যাবহারিকরূপেই বলেছেন; পারমার্থিক সত্তা জগতের নেই, সে কেবলমাত্র 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' ব্রহ্মের আছে। বল্, তোর আর কি বলবার আছে। আজ তোর তর্ক নিরস্ত ক'রে দেবো।

ঠাকুরঘরে আরাত্রিকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মঠের সকলেই ঠাকুরঘরে চলিলেন। শিষ্য স্বামীজীর ঘরেই বসিয়া রহিল দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'ঠাকুরঘরে গেলিনি?'

শিষ্য। আমার এখানে থাকিতেই ভাল লাগিতেছে।

স্বামীজী। তবে থাক্।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য ঘরের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আজ অমাবস্যা, আঁধারে চারিদিক যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে।—আজ কালীপূজার দিন।'

স্বামীজী শিষ্যের ঐ কথায় কিছু না বলিয়া জানালা দিয়া পূর্বাকাশের পানে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন, 'দেখছিস, অন্ধকারের কি এক অদ্ভুত গম্ভীর শোভা!' কথা কয়টি বলিয়া সেই গভীর তিমিররাশির মধ্যে দেখিতে দেখিতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এখন সকলেই নিস্তব্ধ, কেবল দূরে ঠাকুরঘরে ভক্তগণপঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তবমাত্র শিষ্যের কর্ণগোচর হইতেছে। স্বামীজীর এই অদৃষ্টপূর্ব গাম্ভীর্য ও গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠনে বহিঃপ্রকৃতির নিস্তব্ধ স্থির ভাব দেখিয়া শিষ্যের মন এক প্রকার অপূর্ব ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইবার পরে স্বামীজী আস্তে আস্তে গাহিতে লাগিলেন:

'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥'

গীত সাঙ্গ হইলে স্বামীজী ঘরে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে, 'মা, মা, কালী কালী' বলিতে লাগিলেন। ঘরে তখন আর কেহই নাই। কেবল শিষ্য স্বামীজীর আজ্ঞাপালনের জন্য অবস্থান করিতেছে।

স্বামীজীর সে সময়ের মুখ দেখিয়া শিষ্যের বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেন এখনও কোন এক দূরদেশে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্য তাঁহার ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া পীড়িত হইয়া বলিল, 'মহাশয়, এইবার কথাবার্তা বলুন।'

স্বামীজী তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়াই যেন মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'যাঁর লীলা এত মধুর, সেই আত্মার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য কত দূর বল্ দিকি ?' শিষ্য তখনও তাঁহার সেই দূর দূর ভাব সম্যক্ অবগত হয় নাই দেখিয়া বলিল, 'মহাশয়, ও-সব কথায় এখন আর দরকার নাই; কেনই বা আজ আপনাকে অমাবস্যা ও কালীপূজার কথা বলিলাম—সেই অবধি আপনার যেন কেমন একটা পরিবর্তন হইয়া গেল!

স্বামীজী শিষ্যের ভাবগতিক দেখিয়া গান ধরিলেন:

'কখন কি রঙ্গে থাকো মা, শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী,
—কালী সুধা-তরঙ্গিণী॥'

গান সমাপ্ত হইলে বলিতে লাগিলেন:

এই কালীই লীলারূপী ব্রহ্ম। ঠাকুরের কথা, 'সাপ চলা, আর সাপের স্থির ভাব'—শুনিস নি ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী। এবার ভাল হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পূজো ক'রব! রঘুনন্দন বলেছেন, 'নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্'—এবার তাই ক'রব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পূজো করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্না হন। মা'র ছেলে বীর হবে—মহাবীর হবে। নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহাপ্রলয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিল। স্বামীজী শুনিয়া বলিলেন, 'যা, নীচে প্রসাদ পেয়ে শীগগীর আসিস।'

৩৮

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০১

স্বামীজী আজকাল মঠেই আছেন। শরীর তত সুস্থ নহে; তবে সকালে সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হন। শিষ্য আজ শনিবার মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাঁহার শারীরিক কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

স্বামীজী। এ শরীরের তো এই অবস্থা! তোরা তো কেউই আমার কাজে সহায়তা করতে অগ্রসর হচ্ছিস না। আমি একা কি ক'রব বল্? বাঙলা দেশের মাটিতে এবার এই শরীরটা হয়েছে, এ শরীর দিয়ে কি আর বেশী কাজ-কর্ম চলতে পারে? তোরা সব এখানে আসিস—শুদ্ধ আধার, তোরা যদি আমার এইসব কাজে সহায় না হ'স তো আমি একা কি ক'রব বল্?

শিষ্য। মহাশয়, এইসকল ব্রহ্মচারী ত্যাগী পুরুষেরা আপনার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমার মনে হয়, আপনার কার্যে ইঁহারা প্রত্যেকে জীবন দিতে পারেন; তথাপি আপনি ঐ কথা বলিতেছেন কেন?

স্বামীজী। কি জানিস, আমি চাই a band of young Bengal (একদল যুবক বাঙালী); এরাই দেশের আশা-ভরসাস্থল। চরিত্রবান্, বুদ্ধিমান্, পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্তী যুবকগণের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা—আমার idea (ভাব)গুলি যারা work out (কাজে পরিণত) ক'রে নিজেদের ও দেশের কল্যাণসাধনে জীবনপাত করতে পারবে। নতুবা দলে দলে কত ছেলে আসছে ও আসবে। তাদের মুখের ভাব তমোপূর্ণ, হৃদয় উদ্যমশূন্য, শরীর অপটু, মন সাহসশূন্য। এদের দিয়ে কি কাজ হয়? নচিকেতার মতো শ্রদ্ধাবান্ দশ-বারোটি ছেলে পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা ক'রে দিতে পারি।

শিষ্য। মহাশয়, এত যুবক আপনার নিকট আসিতেছে, ইহাদের ভিতর ঐরূপ স্বভাববিশিষ্ট কাহাকেও কি দেখিতে পাইতেছেন না?

স্বামীজী। যাদের ভাল আধার বলে মনে হয়, তাদের মধ্যে কেউ বা বে ক'রে ফেলেছে, কেউ বা সংসারের মান-যশ-ধন-উপার্জনের চেষ্টায় বিকিয়ে গিয়েছে; কারও বা শরীর অপটু। তারপর বাকি অধিকাংশই উচ্চ ভাব নিতে অক্ষম। তোরা আমার ভাব নিতে সক্ষম বটে, কিন্তু তোরাও তো কার্যক্ষেত্রে সে-সকল এখনও বিকাশ করতে পারছিস না। এইসব কারণে মনে সময় সময় বড়ই আক্ষেপ হয়; মনে হয়, দৈব-বিড়ম্বনে শরীরধারণ ক'রে কোন কাজই ক'রে যেতে পারলুম না। অবশ্য এখনও একেবারে হতাশ হইনি, কারণ ঠাকুরের ইচ্ছা হ'লে এইসব ছেলেদের ভেতর থেকেই কালে মহা মহা ধর্মবীর বেরুতে পারে —যারা ভবিষ্যতে আমার idea (ভাব) নিয়ে কাজ করবে।

শিষ্য। আমার মনে হয়, আপনার উদার ভাব সকলকেই একদিন না একদিন লইতে হইবে। ঐটি আমার দৃঢ় ধারণা। কারণ, স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, সকল দিকে সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই আপনার চিন্তাপ্রবাহ ছুটিয়াছে। কি জীবসেবা, কি দেশকল্যাণব্রত, কি ব্রহ্মবিদ্যা-চর্চা, কি ব্রহ্মচর্য—সর্বত্রই আপনার ভাব প্রবেশ করিয়া উহাদের ভিতর একটা অভিনবত্ব আনিয়া দিয়াছে! আর দেশের লোকে কেহ বা আপনার নাম প্রকাশ্যে করিয়া, আবার কেহ বা আপনার নামটি গোপন করিয়া নিজেদের নামে আপনার ঐ ভাব ও মতই সকল বিষয়ে গ্রহণ করিতেছে এবং সাধারণে উপদেশ করিতেছে।

স্বামীজী। আমার নাম না করলে তাতে কি আর আসে যায়? আমার idea (ভাব) নিলেই হ'ল। কামকাঞ্চনত্যাগী হয়েও শতকরা নিরানব্বই জন সাধু নাম-যশে বদ্ধ হয়ে পড়ে। Fame, that last infirmity of noble mind[১] (যশের আকাঙ্ক্ষাই মহৎ ব্যক্তিদের শেষ দুর্বলতা)—পড়েছিস না? একেবারে ফলকামনাশূন্য হয়ে কাজ ক'রে যেতে হবে। ভাল-মন্দ—লোকে দুই তো বলবেই, কিন্তু ideal (উচ্চাদর্শ) সামনে রেখে আমাদের সিঙ্গির মতো কাজ ক'রে যেতে হবে; তাতে 'নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তুবন্তু'[২] (পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিন্দা বা স্তুতি যাহাই করুক)।

১ *Lycidas*—Milton

২ নীতিশতকম্, ভর্তৃহরি

শিষ্য। আমাদের পক্ষে এখন কিরূপ আদর্শ গ্রহণ করা উচিত?

স্বামীজী। মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ করতে হবে। দেখ্ না, রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙিয়ে চলে গেল! জীবন-মরণে দৃক্‌পাত নেই—মহা জিতেন্দ্রিয়, মহা বুদ্ধিমান্! দাস্যভাবের ঐ মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠন করতে হবে। ঐরূপ হলেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ কালে আপনা-আপনি হয়ে যাবে। দ্বিধাশূন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞাপালন আর ব্রহ্মচর্য-রক্ষা—এই হচ্ছে secret of success (সফল হবার একমাত্র রহস্য); 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' (এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই)। হনুমানের একদিকে যেমন সেবাভাব, অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোকসন্ত্রাসী সিংহবিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না! রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা—ব্রহ্মত্ব-শিবত্ব-লাভে পর্যন্ত উপেক্ষা! শুধু রঘুনাথের আদেশপালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। এরূপ একাগ্রনিষ্ঠ হওয়া চাই। খোল-করতাল বাজিয়ে লম্ফঝম্প ক'রে দেশটা উৎসন্ন গেল। একে তো এই dyspeptic (পেটরোগা) রোগীর দল, তাতে আবার লাফালে-ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি, দেখবি খোল-করতালই বাজছে! ঢাকঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তূরীভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ-সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানষি বাজনা শুনে শুনে, কীর্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল। এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে? কবিকল্পনাও এ ছবি আঁকতে হার মেনে যায়! ডমরু শিঙা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে, 'মহাবীর, মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দে দিগ্‌দেশ কম্পিত করতে হবে। যে-সব music-এ (গীতবাদ্যে) মানুষের soft feelings (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে, সে-সব কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে। খেয়াল-টপ্পা বন্ধ ক'রে ধ্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর

মহাপ্রাণতা আনতে হবে। এইরূপ ideal follow (আদর্শ অনুসরণ) করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ। তুই যদি একা এ-ভাবে চরিত্র গঠন করতে পারিস, তা হ'লে তোর দেখাদেখি হাজার লোক ঐরূপ করতে শিখবে। কিন্তু দেখিস, ideal (আদর্শ) থেকে কখন যেন এক পা-ও হটিসনি। কখন সাহসহীন হবিনি। খেতে-শুতে-পরতে, গাইতে-বাজাতে, ভোগে-রোগে কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিবি। তবে তো মহাশক্তির কৃপা হবে।

শিষ্য। মহাশয়, এক এক সময়ে কেমন হীনসাহস হইয়া পড়ি।

স্বামীজী। তখন এরূপ ভাববি—'আমি কার সন্তান? তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীন বুদ্ধি, হীন সাহস!' হীন বুদ্ধি, হীন সাহসের মাথায় লাথি মেরে 'আমি বীর্যবান্, আমি মেধাবান্, আমি ব্রহ্মবিৎ, আমি প্রজ্ঞাবান্' বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি। 'আমি অমুকের চেলা, কামকাঞ্চনজিৎ ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী'—এইরূপ অভিমান খুব রাখবি। এতে কল্যাণ হবে। ঐ অভিমান যার নেই, তার ভেতরে ব্রহ্ম জাগেন না। রামপ্রসাদের গান শুনিসনি? তিনি বলতেন, 'এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।' এইরূপ অভিমান সর্বদা মনে জাগিয়ে রাখতে হবে। তা হ'লে আর হীন বুদ্ধি, হীন ভাব নিকটে আসবে না। কখনও মনে দুর্বলতা আসতে দিবিনি। মহাবীরকে স্মরণ করবি—মহামায়াকে স্মরণ করবি। দেখবি সব দুর্বলতা, সব কাপুরুষতা তখনই চলে যাবে।

ঐরূপ বলিতে বলিতে স্বামীজী নীচে আসিলেন। মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে যে আমগাছ আছে, তাহারই তলায় একখানা ক্যাম্পখাটে তিনি অনেক সময় বসিতেন; অদ্যও সেখানে আসিয়া পশ্চিমাস্যে উপবেশন করিলেন। তাঁহার নয়নে মহাবীরের ভাব যেন তখনও ফুটিয়া বাহির হইতেছে। উপবিষ্ট হইয়াই উপস্থিত সন্ন্যাসি-ও ব্রহ্মচারিগণকে দেখাইয়া তিনি শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন:

এই যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! একে উপেক্ষা ক'রে যারা অন্য বিষয়ে মন দেয়, ধিক্ তাদের! করামলকবৎ এই যে ব্রহ্ম! দেখতে পাচ্ছিসনে?—এই—এই!

এমন হৃদয়স্পর্শী ভাবে স্বামীজী কথাগুলি বলিলেন যে, শুনিয়াই উপস্থিত সকলে 'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে!'—সহসা গভীর ধ্যানে মগ্ন। কাহারও মুখে

কথাটি নাই! স্বামী প্রেমানন্দ তখন গঙ্গা হইতে কমণ্ডলু করিয়া জল লইয়া ঠাকুরঘরে উঠিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াও স্বামীজী 'এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম' বলিতে লাগিলেন। ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারও তখন হাতের কমণ্ডলু হাতে বদ্ধ হইয়া রহিল, একটা মহা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া তিনিও তখনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন! এইরূপে প্রায় ১৫ মিনিট গত হইলে স্বামীজী স্বামী প্রেমানন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'যা, এখন ঠাকুরপূজায় যা।' স্বামী প্রেমানন্দের তবে চেতনা হয়! ক্রমে সকলের মনই আবার 'আমি-আমার' রাজ্যে নামিয়া আসিল এবং সকলে যে যাহার কার্যে গমন করিল। সেদিনের সেই দৃশ্য শিষ্য ইহজীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য-সমভিব্যাহারে স্বামীজী বেড়াইতে গেলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিলেন, 'দেখলি, আজ কেমন হ'ল? সবাইকে ধ্যানস্থ হ'তে হ'ল। এরা সব ঠাকুরের সন্তান কি না, বলবামাত্র এদের তখনই তখনই অনুভূতি হয়ে গেল।'

শিষ্য। মহাশয়, আমাদের মতো লোকের মনও যখন নির্বিষয় হইয়া গিয়াছিল, তখন ওঁদের কা কথা। আনন্দে আমার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। এখন কিন্তু ঐ ভাবের আর কিছুই মনে নাই—যেন স্বপ্নবৎ হইয়া গিয়াছে।

স্বামীজী। সব কালে হয়ে যাবে। এখন কাজ কর্। এই মহামোহগ্রস্ত জীবসমূহের কল্যাণের জন্য কোন কাজে লেগে যা। দেখবি ও-সব আপনা-আপনি হয়ে যাবে।

শিষ্য। মহাশয়, অত কর্মের মধ্যে যাইতে ভয় হয়—সে সামর্থ্যও নাই। শাস্ত্রেও বলে 'গহনা কর্মণো গতিঃ।'

স্বামীজী। তোর কি ভাল লাগে?

শিষ্য। আপনার মতো সর্বশাস্ত্রার্থদর্শীর সঙ্গে বাস ও তত্ত্ববিচার করিব, আর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা এ শরীরেই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিব। এ ছাড়া কোন বিষয়েই আমার উৎসাহ হয় না। বোধ হয় যেন অন্য কিছু করিবার সামর্থ্যও আমাতে নাই।

স্বামীজী। ভাল লাগে তো তাই করে যা। আর তোর সব শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত

লোকেদের জানিয়ে দে, তা হলেই অনেকের উপকার হবে। শরীর যতদিন আছে, ততদিন কাজ না ক'রে তো কেউ থাকতে পারে না। সুতরাং যে কাজে পরের উপকার হয়, তাই করা উচিত। তোর নিজের অনুভূতি এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তবাক্যে অনেক বিবিদিষুর উপকার হ'তে পারে। ঐ-সব লিপিবদ্ধ ক'রে যা। এতে অনেকের উপকার হ'তে পারে।

শিষ্য। অগ্রে আমারই অনুভূতি হউক, তখন লিখিব। ঠাকুর বলিতেন যে, চাপরাস না পেলে কেহ কাহারও কথা লয় না।

স্বামীজী। তুই যে-সব সাধনা ও বিচারের stage (অবস্থা) দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিস, জগতে এমন লোক অনেক থাকতে পারে, যারা ঐ stage (অবস্থা)-এ পড়ে আছে; ঐ অবস্থা পার হয়ে অগ্রসর হ'তে পারছে না। তোর experience (অনুভূতি) ও বিচার-প্রণালী লিপিবদ্ধ হ'লে তাদেরও তো উপকার হবে। মঠে সাধুদের সঙ্গে যে-সব চর্চা করিস, সেই বিষয়গুলি সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ ক'রে রাখলে অনেকের উপকার হ'তে পারে।

শিষ্য। আপনি যখন আজ্ঞা করিতেছেন, তখন ঐ বিষয়ে চেষ্টা করিব।

স্বামীজী। যে সাধনভজন বা অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় না, মহামোহগ্রস্ত জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় না, কামকাঞ্চনের গণ্ডি থেকে মানুষকে বের হ'তে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল কি? তুই বুঝি মনে করিস—একটি জীবের বন্ধন থাকতে তোর মুক্তি আছে? যত কাল তার উদ্ধার না হচ্ছে, তত কাল তোকেও জন্ম নিতে হবে তাকে সাহায্য করতে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি করাতে। প্রতি জীব যে তোরই অঙ্গ। এইজন্যই পরার্থে কর্ম। তোর স্ত্রী-পুত্রকে আপনার জেনে তুই যেমন তাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা করিস, প্রতি জীবে যখন তোর ঐরূপ টান হবে, তখন বুঝব—তোর ভেতর ব্রহ্ম জাগরিত হচ্ছেন, not a moment before (তার এক মুহূর্ত আগে নয়)। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে এই সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা জাগরিত হ'লে তবে বুঝব, তুই ideal-এর (আদর্শের) দিকে অগ্রসর হচ্ছিস।

শিষ্য। এটি তো মহাশয় ভয়ানক কথা—সকলের মুক্তি না হইলে ব্যক্তিগত মুক্তি হইবে না! কোথাও তো এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনি নাই!

স্বামীজী। এক class (শ্রেণীর) বেদান্তবাদীদের ঐরূপ মত আছে। তাঁরা বলেন, 'ব্যষ্টিগত মুক্তি—মুক্তির যথার্থ স্বরূপ নয়, সমষ্টিগত মুক্তিই মুক্তি।' অবশ্য ঐ মতের দোষগুণ যথেষ্ট দেখানো যেতে পারে।

শিষ্য। বেদান্তমতে ব্যষ্টিভাবই তো বন্ধনের কারণ। সেই উপাধিগত চিৎসত্তাই কামকর্মাদিবশে বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হন। বিচারবলে উপাধিশূন্য হইলে, নির্বিষয় হইলে প্রত্যক্ চিন্ময় আত্মার বন্ধন থাকিবে কিরূপে? যাহার জীবজগদাদিবোধ থাকে, তাহার মনে হইতে পারে—সকলের মুক্তি না হইলে তাহার মুক্তি নাই। কিন্তু শ্রবণাদি-বলে মন নিরুপাধিক হইয়া যখন প্রত্যগ্‌ব্রহ্মময় হয়, তখন তাহার নিকট জীবই বা কোথায়, আর জগৎই বা কোথায়?—কিছুই থাকে না। তাহার মুক্তিতত্ত্বের অবরোধক কিছুই হইতে পারে না।

স্বামীজী। হাঁ, তুই যা বলছিস, তাই অধিকাংশ বেদান্তবাদীর সিদ্ধান্ত। উহা নির্দোষও বটে। ওতে ব্যক্তিগত মুক্তি অবরুদ্ধ হয় না। কিন্তু যে মনে করে—আমি আব্রহ্ম জগৎটাকে আমার সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে মুক্ত হবো, তার মহাপ্রাণতাটা একবার ভেবে দেখ্ দেখি।

শিষ্য। মহাশয়, উহা উদারভাবের পরিচায়ক বটে, কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

স্বামীজী শিষ্যের কথাগুলি শুনিতে পাইলেন না, অন্যমনে কোন বিষয় ইতঃপূর্বে ভাবিতেছিলেন বলিয়া বোধ হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, 'ওরে, আমাদের কি কথা হচ্ছিল?' যেন পূর্বের সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। শিষ্য ঐ বিষয় স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় স্বামীজী বলিলেন, 'দিনরাত ব্রহ্মবিষয়ের অনুধ্যান করবি। একান্তমনে ধ্যান করবি। আর ব্যুত্থানকালে হয় কোন লোকহিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করবি, না হয় মনে মনে ভাববি—জীবের, জগতের উপকার হোক, সকলের দৃষ্টি ব্রহ্মাবগাহী হোক। ঐরূপ ধারাবাহিক চিন্তাতরঙ্গের দ্বারাই জগতের উপকার হবে। জগতের কোন অনুষ্ঠানই নিরর্থক হয় না, তা সেটি কাজই হোক, আর চিন্তাই হোক। তোর চিন্তাতরঙ্গের প্রভাবে হয়তো আমেরিকায় কোন লোকের চৈতন্য হবে।'

শিষ্য। মহাশয়, আমার মন যাহাতে যথার্থ নির্বিষয় হয়, সে বিষয়ে আমাকে আশীর্বাদ করুন—এই জন্মেই যেন তাহা হয়।

স্বামীজী। তা হবে বইকি। ঐকান্তিকতা থাকলে নিশ্চয় হবে।

শিষ্য। আপনি মনকে ঐকান্তিক করিয়া দিতে পারেন; সে শক্তি আছে, আমি জানি। আমাকে ঐরূপ করিয়া দিন, ইহাই প্রার্থনা।

এইরূপ কথাবার্তা হইতে হইতে শিষ্যসহ স্বামীজী মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দশমীর জ্যোৎস্নার রজতধারায় মঠের উদ্যান যেন প্লাবিত হইতেছিল।

৩৯

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০১

বেলুড় মঠ স্থাপিত হইবার সময় নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের আচার-ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীজী-কর্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচারনিষ্ঠা সর্বথা প্রতিপালিত হয় না এবং ভক্ষভোজ্যাদির বাছ-বিচার নাই—প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়া নানা স্থানে আলোচনা চলিত এবং ঐ কথায় বিশ্বাসী হইয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দুনামধারী অনেকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের কার্যকলাপের অযথা নিন্দাবাদ করিত। নৌকায় করিয়া মঠে আসিবার কালে শিষ্য সময়ে সময়ে ঐরূপ সমালোচনা স্বকর্ণে শুনিয়াছে। তাহার মুখে স্বামীজী কখন কখন ঐ-সকল সমালোচনা শুনিয়া বলিতেন, 'হাতী চলে বাজারমে, কুত্তা ভোঁকে হাজার। সাধুনকো দুর্ভাব নহি, যব নিন্দে সংসার॥'[1] কখনও বলিতেন, 'দেশে কোন নূতন ভাব প্রচার হওয়ার সময় তার বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থীদের আন্দোলন প্রকৃতির নিয়ম। জগতের ধর্ম-সংস্থাপকমাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হয়েছে।' আবার কখনও বলিতেন, 'Persecution (অন্যায় অত্যাচার) না হ'লে জগতের হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তস্তলে সহজে প্রবেশ করতে পারে না।' সুতরাং সমাজের তীব্র কটাক্ষ ও সমালোচনাকে

---

১ তুলসীদাস

স্বামীজী তাঁহার নবভাব-প্রচারের সহায় বলিয়া মনে করিতেন, কখনও উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন না বা তাঁহার আশ্রিত গৃহী ও সন্ন্যাসিগণকে প্রতিবাদ করিতে দিতেন না। সকলকে বলিতেন, 'ফলাভিসন্ধিহীন হয়ে কাজ ক'রে যা, একদিন ওর ফল নিশ্চয়ই ফলবে।' স্বামীজীর শ্রীমুখে এ-কথাও সর্বদা শুনা যাইত, 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।'

হিন্দুসমাজের এই তীব্র সমালোচনা স্বামীজীর লীলাবসানের পূর্বে কিরূপে অন্তর্হিত হয়, আজ সেই বিষয়ে কিছু লিপিবদ্ধ হইতেছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মে কি জুন মাসে শিষ্য একদিন মঠে আসিয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে দেখিয়াই বলিলেন: ওরে, একখানা রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব' শীগ্গীর আমার জন্যে নিয়ে আসবি।

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়। কিন্তু রঘুনন্দনের স্মৃতি—যাহাকে কুসংস্কারের ঝুড়ি বলিয়া বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহা লইয়া আপনি কি করিবেন?

স্বামীজী। কেন? রঘুনন্দন তদানীন্তন কালের একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন; প্রাচীন স্মৃতিসকল সংগ্রহ ক'রে হিন্দুর দেশকালোপযোগী নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। সমস্ত বাঙলা দেশ তো তাঁর অনুশাসনেই আজকাল চলছে। তবে তাঁর তৈরী হিন্দুজীবনের গর্ভাধান থেকে শ্মশানান্ত আচার-প্রণালীর কঠোর বন্ধনে সমাজ উৎপীড়িত হয়েছিল। শৌচ-প্রস্রাবে, খেতে-শুতে, অন্য সকল বিষয়ের তো কথাই নেই, সব্বাইকে তিনি নিয়মে বদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। সময়ের পরিবর্তনে সে বন্ধন বহুকাল স্থায়ী হ'তে পারলো না। সর্বদেশে সর্বকালে ক্রিয়াকাণ্ড, সমাজের আচার-প্রণালী সর্বদাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। একমাত্র জ্ঞানকাণ্ডই পরিবর্তিত হয় না। বৈদিক যুগেও দেখতে পাবি ক্রিয়াকাণ্ড ক্রমেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু উপনিষদের জ্ঞানপ্রকরণ আজ পর্যন্ত একভাবে রয়েছে। তবে তার interpreters (ব্যাখ্যাতা) অনেক হয়েছে—এইমাত্র।

শিষ্য। আপনি রঘুনন্দনের স্মৃতি লইয়া কি করিবেন?

স্বামীজী। এবার মঠে দুর্গোৎসব করবার ইচ্ছে হচ্ছে। যদি খরচার সঙ্কুলান হয় তো মহামায়ার পূজো ক'রব। তাই দুর্গোৎসব-বিধি পড়বার ইচ্ছে হয়েছে। তুই আগামী রবিবারে যখন আসবি, তখন ঐ পুঁথিখানি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসবি।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

পরের রবিবারে শিষ্য রঘুনন্দনকৃত 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব' ক্রয় করিয়া স্বামীজীর জন্য মঠে লইয়া আসিল। গ্রন্থখানি আজিও মঠের লাইব্রেরিতে রহিয়াছে। স্বামীজী পুস্তকখানি পাইয়া বড়ই খুশী হইলেন এবং ঐ দিন হইতে উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া চার পাঁচ দিনেই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ফেলিলেন। শিষ্যের সঙ্গে সপ্তাহান্তে দেখা হইবার পর বলিলেন: তোর দেওয়া রঘুনন্দনের স্মৃতিখানি সব পড়ে ফেলেছি। যদি পারি তো এবার মার পূজো ক'রব। রঘুনন্দন বলেছেন, 'নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্'—মার ইচ্ছা হয় তো তাও ক'রব।

* * *

স্বামীজী মঠে প্রথম দুর্গাপূজা করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-জননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অনুমতিক্রমে স্থির হইল, তাঁহারই নামে সংকল্প করিয়া পূজা হইবে। কলিকাতা কুমারটুলী হইতে প্রতিমা আনা হইল। ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল পূজক, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা সাধক ঈশ্বর ভট্টাচার্য তন্ত্রধারক হইলেন। যে বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া স্বামীজী একদিন গান গাহিয়াছিলেন, 'বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন'—সেইখানেই বোধনাধিবাসের সান্ধ্যপূজা সম্পন্ন হইল। যথাশাস্ত্র মায়ের পূজা নির্বাহিত হইল; শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অনভিমত বলিয়া পশুবলিদান হয় নাই। গরীব-দুঃখীদিগকে নারায়ণজ্ঞানে পরিতোষপূর্বক ভোজন করানো দুর্গোৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল। বেলুড় বালি ও উত্তরপাড়ার পরিচিত অপরিচিত অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা সানন্দে পূজায় যোগদান করেন এবং পূজা দর্শন করিয়া তাঁহাদের ধারণা জন্মে যে মঠের সন্ন্যাসীরা যথার্থ হিন্দুসন্ন্যাসী।

মহাষ্টমীর পূর্বরাত্রে স্বামীজীর জ্বর হওয়ায় পরদিন পূজায় যোগদান করিতে পারেন নাই; সন্ধিক্ষণে উঠিয়া মহামায়ার চরণে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

করেন। নবমীরাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া দু-একটি গান গাহিলেন। পূজা-শেষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দ্বারা যজ্ঞদক্ষিণান্ত করা হইল। দুর্গাপূজার পর মঠে লক্ষ্মী- ও শ্যামাপূজাও যথাশাস্ত্র নির্বাহিত হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে স্বামীজী তাঁহার গর্ভধারিণীর ইচ্ছায় বাল্য-কালের এক 'মানত' পূজা সম্পন্ন করিতে কালীঘাটে গিয়া গঙ্গাস্নানান্তে ভিজা-কাপড়ে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করেন। মায়ের পাদপদ্মের সম্মুখে তিনবার গড়াগড়ি দেন, সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং নাটমন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে অনাবৃত চত্বরে বসিয়া নিজেই হোম করেন। এই-সকল কথা বলিবার পর স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখলুম; আমাকে বিলাত-প্রত্যাগত বিবেকানন্দ ব'লে জেনেও মন্দিরের অধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ করতে কোন বাধাই দেননি; বরং পরম সমাদরে মন্দিরমধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ পূজো করতে সাহায্য করেছিলেন।'

বেদান্তবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও স্বামীজী আচার্য শঙ্করের মতো পূজানুষ্ঠানাদির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও অনুরাগী ছিলেন।

৪০

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—মার্চ, ১৯০২

আজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহামহোৎসব—এই উৎসবই স্বামীজী শেষ দেখিয়া গিয়াছেন। উৎসবের কিছু পূর্ব হইতে স্বামীজীর শরীর অসুস্থ। উপর হইতে নামেন না, চলিতে পারেন না, পা ফুলিয়াছে। ডাক্তারেরা বেশী কথাবার্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।

শিষ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে সংস্কৃত ভাষায় একটি স্তব রচনা করিয়া উহা ছাপাইয়া আনিয়াছে। আসিয়াই স্বামিপাদপদ্ম দর্শন করিতে উপরে গিয়াছে। স্বামীজী মেজেতে অর্ধ-শায়িত অবস্থায় বসিয়াছিলেন। শিষ্য আসিয়াই স্বামীজীর শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ও মস্তকে স্পর্শ করিল এবং আস্তে আস্তে পায়ে

হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। স্বামীজী শিষ্য-রচিত স্তবটি পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্বে তাহাকে বলিলেন, 'খুব আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলিয়ে দে, পা ভারি টাটিয়েছে।' শিষ্য তদনুরূপ করিতে লাগিল।

স্তব-পাঠান্তে স্বামীজী হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, 'বেশ হয়েছে।'

স্বামীজীর শারীরিক অসুস্থতা এতদূর বাড়িয়াছে যে, তাঁহাকে দেখিয়া শিষ্যের বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

স্বামীজী। (শিষ্যের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া) কি ভাবছিস? শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। তোদের ভেতরে আমার ভাবগুলির কিছু-কিছুও যদি ঢুকুতে পেরে থাকি, তা হলেই জানবো দেহটা ধরা সার্থক হয়েছে।

শিষ্য। আমরা কি আপনার দয়ার উপযুক্ত আধার? নিজগুণে দয়া করিয়া যাহা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে হয়।

স্বামীজী। সর্বদা মনে রাখিস, ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে দীক্ষিত না হ'লে ব্রহ্মাদিরও মুক্তির উপায় নেই।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার শ্রীমুখ হইতে ঐ কথা নিত্য শুনিয়া এত দিনেও উহার ধারণা হইল না, সংসারাসক্তি গেল না—ইহা কি কম পরিতাপের কথা! আশ্রিত দীন সন্তানকে আশীর্বাদ করুন, যাহাতে শীঘ্র উহা প্রাণে প্রাণে ধারণা হয়।

স্বামীজী। ত্যাগ নিশ্চয় আসবে, তবে কি জানিস 'কালেনাত্মনি বিন্দতি'—সময় না এলে হয় না। কতকগুলি প্রাগ্‌জন্ম-সংস্কার কেটে গেলেই ত্যাগ ফুটে বেরোবে।

কথাগুলি শুনিয়া শিষ্য অতি কাতরভাবে স্বামীজীর পাদপদ্ম ধারণ করিয়া বলিতে লাগিল, 'মহাশয়, এ দীন দাসকে জন্মে জন্মে পাদপদ্মে আশ্রয় দিন—ইহাই একান্ত প্রার্থনা। আপনার সঙ্গে থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানলাভেও আমার ইচ্ছা হয় না।'

স্বামীজী উত্তরে কিছুই না বলিয়া অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। শিষ্যের মনে হইল, তিনি যেন দূরদৃষ্টি-চক্রবালে তাঁহার ভাবী জীবনের ছবি দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, 'লোকের গুলতোন দেখে কী আর হবে? আজ আমার কাছে থাক্। আর নিরঞ্জনকে ডেকে দোরে

বসিয়ে দে, কেউ যেন আমার কাছে এসে বিরক্ত না করে।' শিষ্য দৌড়িয়া গিয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে স্বামীজীর আদেশ জানাইল। তিনিও সকল কার্য উপেক্ষা করিয়া, মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া, হাতে লাঠি লইয়া স্বামীজীর ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন।

অনন্তর ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শিষ্য পুনরায় স্বামীজীর কাছে আসিল। মনের সাধে আজ স্বামীজীর সেবা করিতে পারিবে ভাবিয়া তাহার মন আনন্দে উৎফুল্ল! স্বামীজীর পদসেবা করিতে করিতে সে বালকের ন্যায় যত মনের কথা স্বামীজীকে খুলিয়া বলিতে লাগিল, স্বামীজীও হাস্যমুখে তাহার প্রশ্নাদির উত্তর ধীরে ধীরে দিতে লাগিলেন। এইরূপে সেদিন কাটিতে লাগিল।

স্বামীজী। আমার মনে হয়, এভাবে এখন আর ঠাকুরের উৎসব না হয়ে অন্য-ভাবে হয় তো বেশ হয়। একদিন নয়, চার-পাঁচ দিন ধরে উৎসব হবে। ১ম দিন হয়তো শাস্ত্রাদি-পাঠ ও ব্যাখ্যা হ'ল। ২য় দিন বেদবেদান্তাদির বিচার ও মীমাংসা হ'ল। ৩য় দিন Question-Class (প্রশ্নোত্তর) হ'ল। তার পরদিন চাই কি Lecture (বক্তৃতা) হ'ল। শেষ দিনে এখন যেমন মহোৎসব হয়, তেমনি হ'ল। দুর্গাপূজা যেমন চার দিন ধ'রে হয়, তেমনি। ঐরূপে উৎসব করলে শেষ দিন ছাড়া অপর কয়দিন অবশ্য ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী ভিন্ন আর কেউ বোধ হয় বড় একটা আসতে পারবে না। তা নাই বা এল। বহু লোকের গুলতোন হলেই যে ঠাকুরের ভাব খুব প্রচার হ'ল, তা তো নয়।

শিষ্য। মহাশয়, ইহা আপনার সুন্দর কল্পনা; আগামী বারে তাহাই করা যাইবে। আপনার ইচ্ছা হইলে সব হইবে।

স্বামীজী। আর বাবা, ও-সব করতে মন যায় না। এখন থেকে তোরা ও-সব করিস।

শিষ্য। মহাশয়, এবার কীর্তনের অনেক দল আসিয়াছে।

ঐ কথা শুনিয়া স্বামীজী উহা দেখিবার জন্য ঘরের দক্ষিণদিকের মধ্যের জানালার রেলিং ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সমাগত অগণিত ভক্ত-মণ্ডলীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ দেখিয়াই আবার বসিলেন। দাঁড়াইয়া কষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া শিষ্য তাঁহার মস্তকে আস্তে আস্তে ব্যজন করিতে লাগিল।

স্বামীজী। তোরা হচ্ছিস ঠাকুরের লীলার actors (অভিনেতা)। এর পরে আমাদের কথা তো ছেড়েই দে, লোকে তোদের নাম করবে। এই যে-সব স্তব লিখছিস, এর পর লোকে ভক্তিমুক্তিলাভের জন্ত এইসব স্তব পাঠ করবে। জানবি, আত্মজ্ঞানলাভই পরম সাধন। অবতার-পুরুষরূপী জগদ্গুরুর প্রতি ভক্তি হলেই ঐ জ্ঞান কালে আপনিই ফুটে বেরোবে।

শিষ্য। (অবাক হইয়া) মহাশয়, আমার ঐ জ্ঞান লাভ হইবে তো?

স্বামীজী। ঠাকুরের আশীর্বাদে তোর জ্ঞান-ভক্তি হবে। কিন্তু সংসারাশ্রমে তোর বিশেষ কোন সুখ হবে না।

শিষ্য। (বিষণ্ণ ও চিন্তিত ভাবে) আপনি যদি দয়া করিয়া মনের বন্ধনগুলি কাটিয়া দেন তবেই উপায়; নতুবা এ দাসের উপায়ান্তর নাই। আপনি শ্রীমুখের বাণী দিন, যেন এই জন্মেই মুক্ত হয়ে যাই।

স্বামীজী। ভয় কি? যখন এখানে এসে পড়েছিস, তখন নিশ্চয় হয়ে যাবে।

শিষ্য। (স্বামীজীর পাদপদ্ম ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) এবার আমায় উদ্ধার করিতে হইবেই হইবে।

স্বামীজী। কে কার উদ্ধার করতে পারে বল্? গুরু কেবল কতকগুলি আবরণ দূর ক'রে দিতে পারে। ঐ আবরণগুলো গেলেই আত্মা আপনার গৌরবে আপনি জ্যোতিষ্মান্ হয়ে সূর্যের মতো প্রকাশ পান।

শিষ্য। তবে শাস্ত্রে কৃপার কথা শুনতে পাই কেন?

স্বামীজী। কৃপা মানে কি জানিস? যিনি আত্ম-সাক্ষাৎকার করেছেন, তাঁর ভেতরে একটা মহাশক্তি খেলে। তাঁকে centre (কেন্দ্র) ক'রে কিছুদূর পর্যন্ত radius (ব্যাসার্ধ) নিয়ে যে একটা circle (বৃত্ত) হয়, সেই circle-এর (বৃত্তের) ভেতর যারা এসে পড়ে, তারা ঐ আত্মবিৎ সাধুর ভাবে অনুপ্রাণিত হয় অর্থাৎ ঐ সাধুর ভাবে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। সুতরাং সাধন-ভজন না করেও তারা অপূর্ব আধ্যাত্মিক ফলের অধিকারী হয়। একে যদি কৃপা বলিস তো বল্।

শিষ্য। এ ছাড়া আর কোনরূপ কৃপা নাই কি, মহাশয়?

স্বামীজী। তাও আছে। যখন অবতার আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত মুমুক্ষু পুরুষেরা সব তাঁর লীলার সহায়তা করতে শরীর ধারণ ক'রে

আসেন। কোটি জন্মের অন্ধকার কেটে এক জন্মে মুক্ত ক'রে দেওয়া কেবল মাত্র অবতারেরাই পারেন। এরই মানে কৃপা। বুঝলি ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু যাহারা তাঁহার দর্শন পাইল না, তাহাদের উপায় কি ?

স্বামীজী। তাদের উপায় হচ্ছে—তাঁকে ডাকা। ডেকে ডেকে অনেকে তাঁর দেখা পায়, ঠিক এমনি আমাদের মতো শরীর দেখতে পায় এবং তাঁর কৃপা পায়।

শিষ্য। মহাশয়, ঠাকুরের শরীর যাইবার পর আপনি তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন কি ?

স্বামীজী। ঠাকুরের শরীর যাবার পর, আমি কিছুদিন গাজীপুরে পওহারী বাবার সঙ্গ করি। পওহারী বাবার আশ্রমের অনতিদূরে একটা বাগানে ঐ সময় আমি থাকতুম। লোকে সেটাকে ভূতের বাগান ব'লত। কিন্তু আমার তাতে ভয় হ'ত না; জানিস তো আমি ব্রহ্মদৈত্য, ভূত-ফুতের ভয় বড় রাখিনি। ঐ বাগানে অনেক নেবুগাছ, বিস্তর ফ'লত। আমার তখন অত্যন্ত পেটের অসুখ, আবার তার ওপর সেখানে রুটি ভিন্ন অন্য কিছু ভিক্ষা মিলত না। কাজেই হজমের জন্য খুব নেবু খেতুম। পওহারী বাবার কাছে যাতায়াত ক'রে তাঁকে খুব ভাল লাগলো। তিনিও আমায় খুব ভালবাসতে লাগলেন। একদিন মনে হ'ল, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে এত কাল থেকেও এই রুগ্ন শরীরটাকে দৃঢ় করবার কোন উপায়ই তো পাইনি। পওহারী বাবা শুনেছি, হঠযোগ জানেন। এঁর কাছে হঠযোগের ক্রিয়া জেনে নিয়ে, শরীরটাকে দৃঢ় ক'রে নেবার জন্য এখন কিছুদিন সাধন ক'রব। জানিস তো আমার বাঙালের মতো রোক। যা মনে ক'রব, তা করবই। যে দিন দীক্ষা নেবো মনে করেছি, তার আগের রাত্রে একটা খাটিয়ায় শুয়ে ভাবছি, এমন সময় দেখি—ঠাকুর আমার দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে আছেন, যেন বিশেষ দুঃখিত হয়েছেন। তাঁর কাছে মাথা বিকিয়েছি, আবার অপর একজনকে গুরু ক'রব—এই কথা মনে হওয়ায় লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। এইরূপে বোধ হয় ২।৩ ঘণ্টা গত হ'ল; তখন কিন্তু আমার মুখ থেকে কোন কথা বেরোল না।

তারপর হঠাৎ তিনি অন্তর্হিত হলেন। ঠাকুরকে দেখে মন এক-রকম হয়ে গেল, কাজেই সে দিনের মতো দীক্ষা নেবার সঙ্কল্প স্থগিত রাখতে হ'ল। দু-এক দিন বাদে আবার পওহারী বাবার নিকট মন্ত্র নেবার সঙ্কল্প উঠল। সেদিন রাত্রেও আবার ঠাকুরের আবির্ভাব হ'ল—ঠিক আগের দিনের মতো। এইভাবে উপর্যুপরি একুশ দিন ঠাকুরের দর্শন পাবার পর, দীক্ষা নেবার সঙ্কল্প একেবারে ত্যাগ করলুম। মনে হ'ল, যখনই মন্ত্র নেব মনে করছি, তখনই যখন এইরূপ দর্শন হচ্ছে, তখন মন্ত্র নিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হবে না।

শিষ্য। মহাশয়, ঠাকুরের শরীর-রক্ষার পর কখনও তাঁহার সঙ্গে আপনার কোন কথা হয়েছিল কি?

স্বামীজী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। খানিক বাদে শিষ্যকে বলিলেন: ঠাকুরের যারা দর্শন পেয়েছে, তারা ধন্য! 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।' তোরাও তাঁর দর্শন পাবি। যখন এখানে এসে পড়েছিস, তখন তোরা এখানকার লোক। 'রামকৃষ্ণ' নাম ধ'রে কে যে এসেছিলেন, কেউ চিনলে না। এই যে তাঁর অন্তরঙ্গ, সাঙ্গোপাঙ্গ—এরাও তাঁর ঠাওর পায়নি। কেউ কেউ কিছু কিছু পেয়েছে মাত্র। পরে সকলে বুঝবে। এই যে রাখাল-টাখাল যারা তাঁর সঙ্গে এসেছে—এদেরও ভুল হয়ে যায়। অন্যের কথা আর কি ব'লব!

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে আঘাত করায় শিষ্য উঠিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে এসেছে?' তিনি বলিলেন, 'ভগিনী নিবেদিতা ও অপর দু-চার জন ইংরেজ মহিলা।' শিষ্যের মুখে ঐ কথা শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'ঐ আলখাল্লাটা দে তো।' শিষ্য উহা আনিয়া দিলে তিনি সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া বসিলেন এবং শিষ্য দ্বার খুলিয়া দিল। ভগিনী নিবেদিতা ও অপর মহিলারা প্রবেশ করিয়া মেজেতেই বসিলেন এবং স্বামীজীর শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সামান্য কথাবার্তার পরে চলিয়া গেলেন। স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'দেখছিস্, এরা কেমন সভ্য! বাঙালী হ'লে আমার অসুখ দেখেও অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বকাত।' শিষ্য আবার দরজা বন্ধ করিয়া স্বামীজীকে তামাক সাজিয়া দিল।

বেলা প্রায় ২॥টা; লোকের খুব ভিড় হইয়াছে। মঠের জমিতে তিল-পরিমাণ স্থান নাই। কত কীর্তন, কত প্রসাদ-বিতরণ হইতেছে—তাহার সীমা নাই! স্বামীজী শিষ্যের মন বুঝিয়া বলিলেন, 'একবার নয় দেখে আয়, খুব শীগগীর আসবি কিন্তু।' শিষ্যও আনন্দে বাহির হইয়া উৎসব দেখিতে গেল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে পূর্ববৎ বসিয়া রহিলেন।

আন্দাজ দশ মিনিট বাদে শিষ্য ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজীকে উৎসবের ভিড়ের কথা বলিতে লাগিল।

স্বামীজী। কত লোক হবে?

শিষ্য। পঞ্চাশ হাজার।

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই জনসঙ্ঘ দেখিয়া বলিলেন, 'বড়জোর তিরিশ হাজার।'

উৎসবের ভিড় ক্রমে কমিয়া আসিল। বেলা ৪॥টার সময় স্বামীজীর ঘরের দরজা জানালা সব খুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় কাহাকেও তাঁহার নিকটে যাইতে দেওয়া হইল না।

৪১

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০২

পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিবার পর স্বামীজী মঠেই থাকিতেন এবং মঠের কাজের তত্ত্বাবধান করিতেন; কখন কখন কোন কাজ স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। কখন নিজ হস্তে মঠের জমি কোপাইতেন, কখন গাছপালা ফল-ফুলের বীজ রোপণ করিতেন, আবার কখন বা চাকর-বাকরের ব্যারাম হওয়ায় ঘরদ্বারে ঝাঁট পড়ে নাই দেখিয়া নিজ হস্তে ঝাঁটা ধরিয়া ঐসকল পরিষ্কার করিতেন। যদি কেহ তাহা দেখিয়া বলিতেন, 'আপনি কেন!' তাহা হইলে স্বামীজী বলিতেন, 'তা হ'লই বা। অপরিষ্কার থাকলে মঠের সকলের যে অসুখ করবে!'

ঐ কালে তিনি মঠে কতকগুলি গাভী, হাঁস, কুকুর ও ছাগল পুষিয়াছিলেন। বড় একটা ছাগলকে 'হংসী' বলিয়া ডাকিতেন ও তারই দুধে প্রাতে চা খাইতেন। ছোট একটি ছাগলছানাকে 'মটরু' বলিয়া ডাকিতেন ও আদর করিয়া তাহার গলায় ঘুঙুর পরাইয়া দিয়াছিলেন। ছাগলছানাটা আদর পাইয়া স্বামীজীর পায়ে পায়ে বেড়াইত এবং স্বামীজী তাহার সঙ্গে পাঁচ বছরের বালকের মতো দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতেন। মঠদর্শনে নবাগত ব্যক্তিরা তাঁহার পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহাকে ঐরূপ চেষ্টায় ব্যাপৃত দেখিয়া অবাক হইয়া বলিত, 'ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!' কিছুদিন পরে 'মটরু' মরিয়া যাওয়ায় স্বামীজী বিষণ্ণচিত্তে শিষ্যকে বলিয়াছিলেন' 'দেখ্, আমি যেটাকেই একটু আদর করতে যাই, সেটাই মরে যায়।'

মঠের জমির জঙ্গল সাফ করিতে এবং মাটি কাটিতে প্রতি বছরেই কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামীজী তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন।

সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'কেষ্টা'। স্বামীজী কেষ্টাকে বড় ভালবাসিতেন। কথা কহিতে আসিলে কেষ্টা কখন কখন স্বামীজীকে বলিত, 'ওরে স্বামী বাপ, তুই আমাদের কাজের বেলা এখানকে আসিস না, তোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, পরে বুড়োবাবা এসে বকে।' কথা শুনিয়া স্বামীজীর চোখ ছলছল করিত এবং বলিতেন, 'না না, বুড়োবাবা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বকবে না; তুই তোদের দেশের দুটো কথা বল্।' ইহা বলিয়া তাহাদের সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা পাড়িতেন।

একদিন স্বামীজী কেষ্টাকে বলিলেন, 'ওরে, তোরা আমাদের এখানে খাবি?' কেষ্টা বলিল, 'আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন আর খাই না; এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া নুন খেলে জাত যাবেরে বাপ।' স্বামীজী বলিলেন, 'নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারি রেঁধে দেবে। তা হ'লে তো খাবি?' কেষ্টা ঐ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামীজীর আদেশে মঠে ঐ সাঁওতালদের জন্য লুচি, তরকারি, মেঠাই, মণ্ডা, দধি ইত্যাদি যোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাদের বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে কেষ্টা বলিল, 'হাঁরে স্বামী বাপ, তোরা এমন্ জিনিসটা কোথা পেলি? হামরা এমনটা কখনো খাইনি।' স্বামীজী তাহাদের পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া

বলিলেন, 'তোরা যে নারায়ণ; আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হ'ল।' স্বামীজী যে দরিদ্র-নারায়ণসেবার কথা বলিতেন, তাহা তিনি নিজে এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

আহারান্তে সাঁওতালরা বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। এমন সরল চিত্ত, এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা আর দেখিনি!' অনন্তর মঠের সন্ন্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন:

দেখ্, এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া প'রে আর কি হ'ল? 'পরহিতায়' সর্বস্ব-অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিস কখন কিছু ভোগ হয়নি। ইচ্ছা হয়—মঠ-ফঠ সব বিক্রি ক'রে দিই, এইসব গরীবদুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, আমরা তো গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না! আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি? ওদেশে যখন গিয়েছিলুম, মাকে কত বললুম, 'মা! এখানে লোক ফুলের বিছানায় শুচ্ছে, চর্ব-চুষ্য খাচ্ছে, কী না ভোগ করছে! আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে। মা! তাদের কোন উপায় হবে না?' ওদেশে ধর্ম-প্রচার করতে যাওয়ার আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে, এদেশের লোকের জন্য যদি অন্নসংস্থান করতে পারি।

দেশের লোকে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখবাজানো ঘণ্টানাড়া; ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা; সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে, চরিত্র ও সাধনা-বলে বড়লোকদের বুঝিয়ে, কড়িপাতি যোগাড় ক'রে নিয়ে আসি এবং দরিদ্র-নারায়ণদের সেবা ক'রে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

আহা, দেশে গরীব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মুদ্দাফরাশ একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে,—হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে! এই দেখ্ না—হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজ-অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া কৃশ্চান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিসনি কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চান হয়, আমাদের সহানুভূতি পায় না

ব'লে। আমরা দিনরাত কেবল তাদের বলছি—'ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে'। দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা, মার লাথি! ইচ্ছা হয়, তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডি ভেঙে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত-কাঙাল দীন-দরিদ্র আছিস্' ব'লে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হ'ল? হায়! এরা দুনিয়াদারি কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে—সকলে মিলে এদের চোখ খুলে। আমি দিব্য চোখে দেখছি, এদের ও আমার ভেতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হ'লে কোন দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—এ নিশ্চয় জানবি।

শিষ্য। মহাশয়, এ দেশের লোকের ভিতর এত বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাব! ইহাদের ভিতর সকলের মিল হওয়া যে বড় কঠিন ব্যাপার।

স্বামীজী। (সক্রোধে) কোন কাজ কঠিন ব'লে মনে করলে হেথায় আর আসিসনি। ঠাকুরের ইচ্ছায় সব দিক সোজা হয়ে যায়। তোর কাজ হচ্ছে দীনদুঃখীর সেবা করা জাতিবর্ণনির্বিশেষে। তার ফল কি হবে না হবে, ভেবে তোর দরকার কি? তোর কাজ হচ্ছে কাজ ক'রে যাওয়া, পরে সব আপনা-আপনি হয়ে যাবে। আমার কাজের ধারা হচ্ছে—গড়ে তোলা, যা আছে সেটাকে ভাঙা নয়। জগতের ইতিহাস পড়ে দেখ্, এক একজন মহাপুরুষ এক-একটা সময়ে এক-একটা দেশে যেন কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের ভাবে অভিভূত হয়ে শতসহস্র লোক জগতের হিতসাধন ক'রে গেছে। তোরা সব বুদ্ধিমান্ ছেলে, হেথায় এত দিন আসছিস। কি করলি বল্ দিকি? পরার্থে একটা জন্ম দিতে পারলিনি? আবার জন্মে এসে তখন বেদান্ত-ফেদান্ত পড়বি। এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা, তবে জানবো—আমার কাছে আসা সার্থক হয়েছে।

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী এলোথেলোভাবে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিলেন। কিছুক্ষণ বাদে বলিলেন:

আমি এত তপস্যা ক'রে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই।—'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। স্বামীজী দোতলায় উঠিলেন এবং বিছানায় শুইয়া শিষ্যকে বলিলেন, 'পা দুটো একটু টিপে দে।' শিষ্য অদ্যকার কথাবার্তায় ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া স্বয়ং অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, এখন সাহস পাইয়া প্রফুল্লমনে স্বামীজীর পদসেবা করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আজ যা বলেছি, সে-সব কথা মনে গেঁথে রাখবি। ভুলিসনি যেন।'

৪২

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০২

আজ শনিবার। সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিষ্য মঠে আসিয়াছে। মঠে এখন সাধন-ভজন জপ-তপস্যার খুব ঘটা। স্বামীজী আদেশ করিয়াছেন—কি ব্রহ্মচারী, কি সন্ন্যাসী সকলকেই অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ঠাকুরঘরে জপ-ধ্যান করিতে হইবে। স্বামীজীর তো নিদ্রা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে, রাত্রি তিনটা হইতে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকেন। একটা ঘণ্টা কেনা হইয়াছে; শেষরাত্রে সকলের ঘুম ভাঙাইতে ঐ ঘণ্টা মঠের প্রতি ঘরের নিকট সজোরে বাজানো হয়।

শিষ্য মঠে আসিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিবামাত্র তিনি বলিলেন:

ওরে, মঠে এখন কেমন সাধন-ভজন হচ্ছে! সকলেই শেষরাত্রে ও সন্ধ্যার সময় অনেকক্ষণ ধরে জপধ্যান করে। ঐ দেখ, ঘণ্টা আনা হয়েছে; ঐ দিয়ে সবার ঘুম ভাঙানো হয়। সকলকেই অরুণোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে উঠতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'সকাল-সন্ধ্যায় মন খুব সত্ত্বভাবাপন্ন থাকে, তখনই একমনে ধ্যান করতে হয়।'

ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরানগরের মঠে কত জপধ্যান করতুম। তিনটার সময় সব সজাগ হতুম। শৌচান্তে কেউ চান ক'রে, কেউ না ক'রে ঠাকুরঘরে গিয়ে ব'সে জপধ্যানে ডুবে যেতুম। তখন আমাদের ভেতর কি বৈরাগ্যের ভাব! দুনিয়াটা আছে কি নেই, তার হুঁশই ছিল না। শশী[১] চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের সেবা নিয়েই থাকত এবং বাড়ির গিন্নীর মতো ছিল। ভিক্ষাশিক্ষা ক'রে ঠাকুরের ভোগরাগের ও আমাদের খাওয়ানো-দাওয়ানোর যোগাড় ওই সব ক'রত। এমন দিনও গেছে, যখন সকাল থেকে বেলা ৪।৫টা পর্যন্ত জপধ্যান চলেছে। শশী খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ ব'সে থেকে শেষে কোনরূপে টেনে-হিঁচড়ে আমাদের জপধ্যান থেকে তুলে দিত। আহা! শশীর কি নিষ্ঠাই দেখেছি!

শিষ্য। মহাশয়, মঠের খরচ তখন কি করিয়া চলিত?

স্বামীজী। কি ক'রে চলবে কিরে? আমরা তো সাধু-সন্ন্যাসী লোক। ভিক্ষাশিক্ষা ক'রে যা আসত, তাতেই সব চ'লে যেত। আজ সুরেশ-বাবু বলরামবাবু নেই; তাঁরা দু-জনে থাকলে এই মঠ দেখে কত আনন্দ করতেন! সুরেশবাবুর নাম শুনেছিস তো? তিনি এই মঠের এক-রকম প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই বরানগরের মঠের সব খরচপত্র বহন করতেন। ঐ সুরেশ মিত্তিরই আমাদের জন্য তখন বেশী ভাবত। তার ভক্তিবিশ্বাসের তুলনা হয় না।

শিষ্য। মহাশয়, শুনিয়াছি—মৃত্যুকালে আপনারা তাঁহার সহিত বড় একটা দেখা করিতে যাইতেন না।

স্বামীজী। যেতে দিলে তো যাব। যাক, সে অনেক কথা। তবে এইটে জেনে রাখবি, সংসারে তুই বাঁচিস কি মরিস, তাতে তোর আত্মীয়-পরিজনদের বড় একটা কিছু আসে যায় না। তুই যদি কিছু বিষয়-আশয় রেখে যেতে পারিস তো তোর মরবার আগেই দেখতে পাবি, তা নিয়ে ঘরে লাঠালাঠি শুরু হয়েছে। তোর মৃত্যুশয্যায় সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই—স্ত্রী-পুত্র পর্যন্ত নয়। এরই নাম সংসার!

মঠের পূর্বাবস্থা সম্বন্ধে স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন:

১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

'খরচপত্রের অনটনের জন্ত কখন কখন মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি করতুম। শশীকে কিন্তু কিছুতেই ঐ বিষয়ে রাজী করাতে পারতুম না। শশীকে আমাদের মঠে central figure (কেন্দ্রস্বরূপ) ব'লে জানবি। এক একদিন মঠে এমন অভাব হয়েছে যে, কিছুই নেই। ভিক্ষা ক'রে চাল আনা হ'ল তো নুন নেই। এক একদিন শুধু নুন-ভাত চলেছে, তবু কারও ভ্রূক্ষেপ নেই; জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তখন সব ভাসছি। তেলাকুচোপাতা সেদ্ধ, নুন-ভাত—এই মাসাবধি চলেছে! আহা, সে-সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত—মানুষের কথা কি! এ কথাটা কিন্তু ধ্রুব সত্য যে, তোর ভেতর যদি বস্তু থাকে তো যত circumstances against (অবস্থা প্রতিকূল) হবে, তত ভেতরের শক্তির উন্মেষ হবে। তবে এখন যে মঠে খাট-বিছানা, খাওয়া-দাওয়ার সচ্ছল বন্দোবস্ত করেছি তার কারণ—আমরা যতটা সইতে পেরেছি, তত কি আর এখন যারা সন্ন্যাসী হ'তে আসছে তারা পারবে? আমরা ঠাকুরের জীবন দেখেছি, তাই দুঃখ-কষ্ট বড় একটা গ্রাহ্যের ভেতর আনতুম না। এখনকার ছেলেরা তত কঠোর করতে পারবে না। তাই একটু থাকবার জায়গা ও একমুঠো অন্নের বন্দোবস্ত করা—মোটা ভাত মোটা কাপড় পেলে ছেলেগুলো সাধন-ভজনে মন দেবে এবং জীবহিতকল্পে জীবনপাত করতে শিখবে।'

শিষ্য। মহাশয়, মঠের এ-সব খাটবিছানা দেখিয়া বাহিরের লোক কত কি বলে!

স্বামীজী। বলতে দে না। ঠাট্টা করেও তো এখানকার কথা একবার মনে আনবে! শত্রুভাবে শীগগীর মুক্তি হয়। ঠাকুর বলতেন, 'লোক না পোক'। এ কি বললে, ও কি বললে—তাই শুনে বুঝি চলতে হবে? ছিঃ ছিঃ!

শিষ্য। মহাশয়, আপনি কখন বলেন, 'সব নারায়ণ, দীন-দুঃখী আমার নারায়ণ' আবার কখন বলেন, 'লোক না পোক'—ইহার অর্থ বুঝিতে পারি না।

স্বামীজী। সকলেই যে নারায়ণ, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু সকল নারায়ণে তো criticise (সমালোচনা) করে না? কই, দীন-দুঃখীরা এসে মঠের খাট-ফাট দেখে তো criticise (সমালোচনা) করে না।

সংকার্য ক'রে যাব, যারা criticise (সমালোচনা) করবে তাদের দিকে দৃকপাতও ক'রব না—এই sense-এ (অর্থে) 'লোক না পোক' কথা বলা হয়েছে। যার ঐরূপ রোক আছে, তার সব হয়ে যায়, তবে কারো কারো বা একটু দেরিতে—এই যা তফাত ; কিন্তু হবেই হবে। আমাদের ঐরূপ রোক (জিদ) ছিল, তাই একটু-আধটু যা হয় হয়েছে। নতুবা কি সব দুঃখের দিনই না আমাদের গেছে ! এক সময়ে না খেতে পেয়ে রাস্তার ধারে একটা বাড়ির দাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, মাথার ওপর দিয়ে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল, তবে হুঁশ হয়েছিল ! অন্য এক সময়ে সারাদিন না খেয়ে কলকাতায় একাজ সেকাজ ক'রে বেড়িয়ে রাত্রি ১০।১১টার সময় মঠে গিয়ে তবে খেতে পেয়েছি—এমন এক দিন নয় !

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী অন্যমনা হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন :

ঠিক ঠিক সন্ন্যাস কি সহজে হয় রে ? এমন কঠিন আশ্রম আর নেই। একটু বেচালে পা পড়লে তো একেবারে পাহাড় থেকে খাদে পড়ল—হাত-পা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। একদিন আমি আগ্রা থেকে বৃন্দাবন হেঁটে যাচ্ছি। একটা কানাকড়িও সম্বল নেই। বৃন্দাবনের প্রায় ক্রোশাধিক দূরে আছি, রাস্তার ধারে একজন লোক বসে তামাক খাচ্ছে দেখে বড়ই তামাক খেতে ইচ্ছে হ'ল। লোকটাকে বললুম, 'ওরে ছিলিমটে দিবি ?' সে যেন জড়সড় হয়ে বললে, 'মহারাজ, হাম্ ভাঙ্গি (মেথর) হ্যায়।' সংস্কার কিনা ! —শুনেই পেছিয়ে এসে তামাক না খেয়ে পুনরায় পথ চলতে লাগলুম। খানিকটা গিয়েই মনে বিচার এল—তাইতো, সন্ন্যাস নিয়েছি ; জাত কুল মান —সব ছেড়েছি, তবুও লোকটা মেথর বলাতে পেছিয়ে এলুম ! তার ছোঁয়া তামাক খেতে পারলুম না ! এই ভেবে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল। তখন প্রায় এক পো পথ এসেছি, আবার ফিরে গিয়ে সেই মেথরের কাছে এলুম ; দেখি তখনও লোকটা সেখানে ব'সে আছে। গিয়ে তাড়াতাড়ি বললুম, 'ওরে বাপ, এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়।' তার আপত্তি গ্রাহ্য করলুম না। বললুম, ছিলিমে তামাক দিতেই হবে। লোকটা কি করে ?— অবশেষে তামাক সেজে দিল। তখন আনন্দে ধূমপান ক'রে বৃন্দাবনে এলুম। সন্ন্যাস নিয়ে জাতিবর্ণের পারে চলে গেছি কি-না পরীক্ষা ক'রে আপনাকে

দেখতে হয়। ঠিক ঠিক সন্ন্যাস-ব্রত রক্ষা করা কত কঠিন! কথায় ও কাজে একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই।

শিষ্য। মহাশয়, আপনি কখন গৃহীর আদর্শ এবং কখন ত্যাগীর আদর্শ আমাদিগের সম্মুখে ধারণ করেন; উহার কোন্‌টি আমাদিগের মতো লোকের অবলম্বনীয়?

স্বামীজী। সব শুনে যাবি; তারপর যেটা ভাল লাগে, সেটা ধরে থাকবি— bull-dog-এর (ডালকুত্তার) মতো কামড়ে ধরে পড়ে থাকবি।

বলিতে বলিতে শিষ্যসহ স্বামীজী নীচে নামিয়া আসিলেন এবং কখন মধ্যে মধ্যে 'শিব শিব' বলিতে বলিতে, আবার কখন বা গুনগুন করিয়া 'কখন কি রঙ্গে থাকো মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী' ইত্যাদি গান করিতে করিতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

৪৩

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০২

শিষ্য গত রাত্রে স্বামীজীর ঘরেই ঘুমাইয়াছে। রাত্রি ৪টার সময় স্বামীজী শিষ্যকে জাগাইয়া বলিলেন, 'যা, ঘণ্টা নিয়ে সব সাধু-ব্রহ্মচারীদের জাগিয়ে তোল্।' আদেশমত শিষ্য প্রথমতঃ উপরকার সাধুদের কাছে ঘণ্টা বাজাইল। পরে তাঁহারা সজাগ হইয়াছেন দেখিয়া নীচে যাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া সব সাধু-ব্রহ্মচারীদের তুলিল। সাধুরা তাড়াতাড়ি শৌচাদি সারিয়া, কেহ বা স্নান করিয়া, কেহ কাপড় ছাড়িয়া ঠাকুর-ঘরে জপধ্যান করিতে প্রবেশ করিলেন।

স্বামীজীর নির্দেশমত স্বামী ব্রহ্মানন্দের কানের কাছে খুব জোরে জোরে ঘণ্টা-বাজানোয় তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'বাঙালের জ্বালায় মঠে থাকা দায় হ'ল।' শিষ্যমুখে ঐ কথা শুনিয়া স্বামীজী খুব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'বেশ করেছিস।'

অতঃপর স্বামীজীও হাতমুখ ধুইয়া শিষ্যসহ ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ ঠাকুর-ঘরে ধ্যানে বসিয়াছেন। স্বামীজীর জন্য পৃথক আসন রাখা ছিল; তিনি তাহাতে উত্তরাস্তে উপবেশন করিয়া শিষ্যকে একখানি আসন দেখাইয়া বলিলেন, 'যা, ঐ আসনে ব'সে ধ্যান কর্।' মঠের বায়ুমণ্ডল যেন স্তব্ধ হইয়া গেল! এখনও অরুণোদয় হয় নাই, আকাশে তারা জ্বলিতেছে।

স্বামীজী আসনে বসিবার অল্পক্ষণ পরেই একেবারে স্থির শান্ত নিস্পন্দ হইয়া সুমেরুবৎ অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শ্বাস অতি ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। শিষ্য স্তম্ভিত হইয়া স্বামীজীর সেই নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অবস্থান নির্নিমেষে দেখিতে লাগিল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে স্বামীজী 'শিব শিব' বলিয়া ধ্যানোত্থিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু তখন অরুণরাগে রঞ্জিত, মুখ গম্ভীর, শান্ত, স্থির। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামীজী নীচে নামিলেন এবং মঠপ্রাঙ্গণে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শিষ্যকে বলিলেন:

দেখলি, সাধুরা আজকাল কেমন জপ-ধ্যান করে! ধ্যান গভীর হ'লে কত কি দেখতে পাওয়া যায়! বরানগরের মঠে ধ্যান করতে করতে একদিন ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ী দেখতে পেয়েছিলুম। একটু চেষ্টা করলেই দেখতে পাওয়া যায়। তারপর সুষুম্নার দর্শন পেলে যা দেখতে চাইবি, তাই দেখতে পাওয়া যায়। দৃঢ় গুরুভক্তি থাকলে সাধন-ভজন ধ্যান-জপ সব আপনা-আপনি আসে, চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।'

অনন্তর শিষ্য তামাক সাজিয়া স্বামীজীর কাছে পুনরায় আসিলে তিনি ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন:

'ভেতরে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মারূপ সিঙ্গি (সিংহ) রয়েছেন, ধ্যান-ধারণা ক'রে তাঁর দর্শন পেলেই মায়ার দুনিয়া উড়ে যায়। সকলের ভেতরেই তিনি সমভাবে আছেন; যে যত সাধনভজন করে, তার ভেতর কুণ্ডলিনী শক্তি তত শীঘ্র জেগে ওঠেন। ঐ শক্তি মস্তকে উঠলেই দৃষ্টি খুলে যায়—আত্ম-দর্শনলাভ হয়।'

শিষ্য। মহাশয়, শাস্ত্রে ঐ-সব কথা পড়িয়াছি মাত্র। প্রত্যক্ষ কিছুই তো এখনও হইল না।

স্বামীজী। 'কালেনাত্মনি বিন্দতি'—সময়ে হবেই হবে। তবে কারও শীগগীর, কারও বা একটু দেরীতে হয়। লেগে থাকতে হয়—নাছোড়বান্দা হয়ে। এর নাম যথার্থ পুরুষকার। তৈলধারার মতো মনটা এক বিষয়ে লাগিয়ে রাখতে হয়। জীবের মন নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, ধ্যানের সময়ও প্রথম প্রথম মন বিক্ষিপ্ত হয়। মনে যা ইচ্ছে উঠুক না কেন, কি কি ভাব উঠছে—সেগুলি তখন স্থির হয়ে বসে দেখতে হয়। ঐভাবে দেখতে দেখতেই মন স্থির হয়ে যায়, আর মনে নানা চিন্তাতরঙ্গ থাকে না। ঐ তরঙ্গগুলোই হচ্ছে মনের সঙ্কল্পবৃত্তি। ইতিপূর্বে যে-সকল বিষয় তীব্রভাবে ভেবেছিস, তার একটা মানসিক প্রবাহ থাকে, ধ্যানকালে ঐগুলি তাই মনে ওঠে। সাধকের মন যে ক্রমে স্থির হবার দিকে যাচ্ছে, ঐগুলি ওঠা বা ধ্যানকালে মনে পড়াই তার প্রমাণ। মন কখন কখন কোন ভাব নিয়ে একবৃত্তিস্থ হয়—তারই নাম সবিকল্প ধ্যান। আর মন যখন সর্ববৃত্তিশূন্য হয়ে আসে, তখন নিরাধার এক অখণ্ড বোধ-স্বরূপ প্রত্যক্‌চৈতন্যে গলে যায়, তার নামই বৃত্তিশূন্য নির্বিকল্প সমাধি। আমরা ঠাকুরের মধ্যে এ উভয় সমাধি মুহুর্মুহুঃ প্রত্যক্ষ করেছি। চেষ্টা ক'রে তাঁকে ঐ-সকল অবস্থা আনতে হ'ত না। আপনা-আপনি সহসা হয়ে যেত। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁকে দেখেই তো এ-সব ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিলুম। প্রত্যহ একাকী ধ্যান করবি। সব আপনা-আপনি খুলে যাবে। বিদ্যারূপিণী মহামায়া ভেতরে ঘুমিয়ে রয়েছেন, তাই সব জানতে পাচ্ছিস না। ঐ কুলকুণ্ডলিনীই হচ্ছেন তিনি। ধ্যান করবার পূর্বে যখন নাড়ী শুদ্ধ করবি, তখন মনে মনে মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীকে জোরে জোরে আঘাত করবি আর বলবি, 'জাগো মা, জাগো মা।' ধীরে ধীরে এ-সব অভ্যাস করতে হয়। Emotional side-টা (ভাব-প্রবণতা) ধ্যানের কালে একেবারে দাবিয়ে দিবি। ঐটেই বড় ভয়। যারা বড় emotional (ভাবপ্রবণ), তাদের কুণ্ডলিনী ফড়ফড় ক'রে ওপরে ওঠে বটে, কিন্তু উঠতেও যতক্ষণ নাবতেও ততক্ষণ। যখন নাবেন, তখন একেবারে সাধককে অধঃপাতে নিয়ে গিয়ে ছাড়েন। এজন্য ভাবসাধনার সহায় কীর্তন-ফীর্তনের একটা ভয়ানক দোষ আছে। নেচেকুঁদে সাময়িক উচ্ছ্বাসে ঐ শক্তির ঊর্ধ্বগতি হয় বটে, কিন্তু স্থায়ী

হয় না, নিম্নগামিনী হবার কালে জীবের ভয়ানক কামবৃত্তির আধিক্য হয়। আমার আমেরিকায় বক্তৃতা শুনে সাময়িক উচ্ছ্বাসে অনেকের ভাব হ'ত—কেউ বা জড়বৎ হয়ে যেত। অনুসন্ধানে পরে জানতে পেরেছিলাম, ঐ অবস্থার পরই অনেকের কাম-প্রবৃত্তির আধিক্য হ'ত। ঠিকঠিক ধ্যানধারণার অনভ্যাসেই ওরূপ হয়।

শিষ্য। মহাশয়, এ-সকল গুহ্য সাধন-রহস্য কোন শাস্ত্রে পড়ি নাই। আজ নূতন কথা শুনিলাম।

স্বামীজী। সব সাধন-রহস্য কি আর শাস্ত্রে আছে? এগুলি গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় চলে আসছে। খুব সাবধানে ধ্যানধারণা করবি। সামনে সুগন্ধি ফুল রাখবি, ধুনা জ্বালবি। যাতে মন পবিত্র হয়, প্রথমতঃ তাই করবি। গুরু-ইষ্টের নাম করতে করতে বলবি: জীব-জগৎ সকলের মঙ্গল হোক। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম অধঃ ঊর্ধ্ব—সব দিকেই শুভ সঙ্কল্পের চিন্তা ছড়িয়ে তবে ধ্যানে বসবি। এইরূপ প্রথম প্রথম করতে হয়। তারপর স্থির হয়ে বসে—যে-কোন মুখে বসলেই হ'ল—মন্ত্র দেবার কালে যেমনটা বলেছি, সেইরূপ ধ্যান করবি। একদিনও বাদ দিবিনি। কাজের ঝঞ্ঝাট থাকে তো অন্ততঃ পনর মিনিটে সেরে নিবি। একটা নিষ্ঠা না থাকলে কি হয় রে বাপ?

এইবার স্বামীজী উপরে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন:

তোদের অল্পেই আত্মদৃষ্টি খুলে যাবে। যখন হেথায় এসে পড়েছিস, তখন মুক্তি-ভুক্তি তো তোদের করতলে। এখন ধ্যানাদি করা ছাড়া আর্তনাদ-পূর্ণ সংসারের দুঃখও কিছু দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়ে লেগে যা দেখি। কঠোর সাধনা ক'রে এ দেহ পাত ক'রে ফেলেছি। এই হাড়মাসের খাঁচায় আর যেন কিছু নেই। তোরা এখন কাজে লেগে যা, আমি একটু জিরুই। আর কিছু না পারিস, এইসব যত শাস্ত্র-ফাস্ত্র পড়লি এর কথা জীবকে শোনাগে। এর চেয়ে আর দান নেই। জ্ঞান-দানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

৪৪

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০২

স্বামীজী মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শাস্ত্রালোচনার জন্য মঠে প্রতিদিন প্রশ্নোত্তর-ক্লাস হইতেছে। স্বামী শুদ্ধানন্দ, বিরজানন্দ ও স্বরূপানন্দ এই ক্লাসে প্রধান জিজ্ঞাসু। এরূপ শাস্ত্রালোচনাকে স্বামীজী 'চর্চা' শব্দে নির্দেশ করিতেন এবং চর্চা করিতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে সর্বদা বহুধা উৎসাহিত করিতেন। কোন দিন গীতা, কোন দিন ভাগবত, কোন দিন বা উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের আলোচনা হইতেছে। স্বামীজীও প্রায় নিত্যই তথায় উপস্থিত থাকিয়া প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। স্বামীজীর আদেশে একদিকে যেমন কঠোর নিয়মপূর্বক ধ্যান-ধারণা চলিয়াছে, অপরদিকে তেমনি শাস্ত্রালোচনার জন্য ঐ ক্লাসের প্রাত্যহিক অধিবেশন হইতেছে। তাঁহার শাসন সর্বদা শিরোধার্য করিয়া সকলেই তৎপ্রবর্তিত নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিতেন। মঠবাসিগণের আহার, শয়ন, পাঠ, ধ্যান—সকলই এখন কঠোর-নিয়মবদ্ধ।

আজ শনিবার। স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিবামাত্র শিষ্য জানিতে পারিল, তিনি তখনই বেড়াইতে বাহির হইবেন, স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন। শিষ্যের একান্ত বাসনা স্বামীজীর সঙ্গে যায়, কিন্তু অনুমতি না পাইলে যাওয়া কর্তব্য নহে—ভাবিয়া বসিয়া রহিল। স্বামীজী আলখাল্লা ও গৈরিক বসনের কান-ঢাকা টুপী পরিয়া একগাছি মোটা লাঠি হাতে করিয়া বাহির হইলেন—পশ্চাতে স্বামী প্রেমানন্দ। যাইবার পূর্বে শিষ্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'চল্ যাবি?' শিষ্য কৃতকৃতার্থ হইয়া স্বামী প্রেমানন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

কি ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজী অন্যমনে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিষ্য স্বামীজীর ঐরূপ ভাব দেখিয়া কথা কহিয়া তাঁহার চিন্তা ভঙ্গ করিতে সাহসী না হইয়া প্রেমানন্দ মহারাজের সহিত নানা গল্প করিতে করিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,

'মহাশয়, স্বামীজীর মহত্ত্ব সম্বন্ধে ঠাকুর আপনাদের কি বলিতেন, তাহাই বলুন।' স্বামীজী তখন কিঞ্চিৎ অগ্রবর্তী হইয়াছেন।

স্বামী প্রেমানন্দ। কত কি বলতেন তা তোকে একদিনে কি ব'লব? কখনও বলতেন, 'নরেন অখণ্ডের ঘর থেকে এসেছে।' কখনও বলতেন, 'ও আমার শ্বশুরঘর।' আবার কখনও বলতেন, 'এমনটি জগতে কখনও আসেনি—আসবে না।' একদিন বলেছিলেন, 'মহামায়া ওর কাছে যেতে ভয় পায়!' বাস্তবিকই উনি তখন কোন ঠাকুরদেবতার কাছে মাথা নোয়াতেন না। ঠাকুর একদিন সন্দেশের ভেতরে ক'রে ওঁকে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ খাইয়ে দিয়েছিলেন। পরে ঠাকুরের কৃপায় সব দেখে শুনে ক্রমে ক্রমে উনি সব মানলেন।

শিষ্য। মহাশয়, বাস্তবিকই কখন কখন মনে হয়, উনি মানুষ নহেন। কিন্তু আবার কথাবার্তা বলিবার এবং যুক্তি-বিচার করিবার কালে মানুষ বলিয়া বোধ হয়। এমনি মনে হয় যেন কোন আবরণ দিয়া সে সময় উনি আপনার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে দেন না!

প্রেমানন্দ। ঠাকুর বলতেন, 'ও যখনি জানতে পারবে—ও কে, তখনি আর এখানে থাকবে না, চলে যাবে।' তাই কাজকর্মের ভেতরে নরেনের মনটা থাকলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। ওকে বেশী ধ্যানধারণা করতে দেখলে আমাদের ভয় হয়।

এইবার স্বামীজী মঠাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ ও শিষ্যকে নিকটে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'কিরে, তোদের কি কথা হচ্ছিল?' শিষ্য বলিল, 'এই সব ঠাকুরের সম্বন্ধে নানা কথা হইতেছিল।' উত্তর শুনিয়াই স্বামীজী আবার অন্যমনে পথ চলিতে চলিতে মঠে ফিরিয়া'আসিলেন এবং মঠের আমগাছের তলায় যে ক্যাম্পখাটখানি তাঁহার বসিবার জন্য পাতা ছিল, তাহাতে উপবেশন করিলেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পরে মুখ ধুইয়া উপরের বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন:

তোদের দেশে বেদান্তবাদ প্রচার করতে লেগে যা না কেন? ওখানে ভয়ানক তন্ত্রমন্ত্রের প্রাদুর্ভাব। অদ্বৈতবাদের সিংহনাদে বাঙাল-দেশটা তোলপাড় ক'রে তোল্ দেখি, তবে জানব—তুই বেদান্তবাদী। ওদেশে

প্রথম একটা বেদান্তের টোল খুলে দে—তাতে উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র এইসব পড়া। ছেলেদের ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দে। আর বিচার ক'রে তান্ত্রিক পণ্ডিতদের হারিয়ে দে। শুনেছি, তোদের দেশে লোকে কেবল ন্যায়শাস্ত্রের কচকচি পড়ে। ওতে আছে কি? ব্যাপ্তিজ্ঞান আর অনুমান—এই নিয়েই হয়তো নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের মাসাবধি বিচার চলেছে! আত্মজ্ঞানলাভের তাতে আর কি বিশেষ সহায়তা হয় বল্? বেদান্ত-সিদ্ধান্ত ব্রহ্মতত্ত্বের পঠন-পাঠন না হ'লে কি আর দেশের উপায় আছে রে? তোদের দেশেই হোক বা নাগ-মহাশয়ের বাড়িতেই হোক একটা চতুষ্পাঠী খুলে দে। তাতে এইসব সংশাস্ত্র-পাঠ হবে, আর ঠাকুরের জীবন আলোচনা হবে। ঐরূপ করলে তোর নিজের কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে কত লোকের কল্যাণ হবে। তোর কীর্তিও থাকবে।

শিষ্য। মহাশয়, আমি নামযশের আকাঙ্ক্ষা রাখি না। তবে আপনি যেমন বলিতেছেন, সময়ে সময়ে আমারও ঐরূপ ইচ্ছা হয় বটে। কিন্তু বিবাহ করিয়া সংসারে এমন জড়াইয়া পড়িয়াছি যে, মনের কথা বোধ হয় মনেই থাকিয়া যাইবে।

স্বামীজী। বে করেছিস্ তো কি হয়েছে? মা-বাপ ভাই-বোনকে অন্নবস্ত্র দিয়ে যেমন পালন করছিস্, স্ত্রীকেও তেমনি করবি, বস্। ধর্মোপদেশ দিয়ে তাকেও তোর পথে টেনে নিবি। মহামায়ার বিভূতি ব'লে সম্মানের চক্ষে দেখবি। ধর্ম-উদ্‌যাপনে 'সহধর্মিণী' ব'লে মনে করবি। অন্য সময়ে অপর দশ জনের মতো দেখবি। এইরূপ ভাবতে ভাবতে দেখবি মনের চঞ্চলতা একেবারে মরে যাবে। ভয় কি?

স্বামীজীর অভয়বাণী শুনিয়া শিষ্য আশ্বস্ত হইল।

আহারান্তে স্বামীজী নিজের বিছানায় উপবেশন করিলেন। অপর সকলের প্রসাদ পাইবার তখনও সময় হয় নাই। সেজন্য শিষ্য স্বামীজীর পদসেবা করিবার অবসর পাইল।

স্বামীজীও তাহাকে মঠের সকলের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবার জন্য কথাচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, 'এইসব ঠাকুরের সন্তান দেখছিস, এরা সব অদ্ভুত ত্যাগী, এদের সেবা ক'রে লোকের চিত্তশুদ্ধি হবে—আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হবে। 'পরি-

প্রেমেন সেবয়া'—গীতার উক্তি শুনেছিস তো? এদের সেবা করবি, তা হলেই সব হয়ে যাবে। তোকে এরা কত স্নেহ করে, জানিস তো?'

শিষ্য। মহাশয়, ইঁহাদের কিন্তু বুঝা বড়ই কঠিন বলিয়া মনে হয়। এক এক জনের এক এক ভাব!

স্বামীজী। ঠাকুর ওস্তাদ মালী ছিলেন কিনা! তাই হরেক রকম ফুল দিয়ে এই সংঘরূপ তোড়াটি বানিয়ে গেছেন। যেখানকার যেটি ভাল, সব এতে এসে পড়েছে—কালে আরও কত আসবে। ঠাকুর বলতেন, 'যে একদিনের জন্যও অকপট মনে ঈশ্বরকে ডেকেছে, তাকে এখানে আসতেই হবে।' যারা সব এখানে রয়েছে, তারা এক একজন মহাসিংহ; আমার কাছে কুঁচকে থাকে ব'লে এদের সামান্য মানুষ ব'লে মনে করিসনি। এরাই আবার যখন বা'র হবে, তখন এদের দেখে লোকের চৈতন্য হবে। অনন্ত-ভাবময় ঠাকুরের অংশ ব'লে এদের জানবি। আমি এদের ঐ-ভাবে দেখি। ঐ যে রাখাল রয়েছে, ওর মতো spirituality (ধর্মভাব) আমারও নেই। ঠাকুর ছেলে ব'লে ওকে কোলে করতেন, খাওয়াতেন, একত্র শয়ন করতেন। ও আমাদের মঠের শোভা, আমাদের রাজা। ঐ বাবুরাম, হরি, সারদা, গঙ্গাধর, শরৎ, শশী, সুবোধ প্রভৃতির মতো ঈশ্বরবিশ্বাসী দুনিয়া ঘুরে দেখতে পাবি কি না সন্দেহ। এরা প্রত্যেকে ধর্ম-শক্তির এক একটা কেন্দ্রের মতো। কালে ওদেরও সব শক্তির বিকাশ হবে।

শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল; স্বামীজী আবার বলিলেন, 'তোদের দেশ থেকে নাগ-মশায় ছাড়া কিন্তু আর কেউ এল না। আর দু-একজন যারা ঠাকুরকে দেখেছিল, তারা তাঁকে ধরতে পারলে না।' নাগ-মহাশয়ের কথা স্মরণ করিয়া স্বামীজী কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া রহিলেন। স্বামীজী শুনিয়াছিলেন, এক সময়ে নাগ-মহাশয়ের বাড়িতে গঙ্গার উৎস উঠিয়াছিল। সেই কথাটি স্মরণ করিয়া শিষ্যকে বলিলেন, 'হ্যাঁরে, ঐ ঘটনাটা কিরূপ বল্ দিকি!'

শিষ্য। আমিও ঐ ঘটনা শুনিয়াছি মাত্র,—চক্ষে দেখি নাই। শুনিয়াছি, একবার মহাবারুণীযোগে পিতাকে সঙ্গে করিয়া নাগ-মহাশয় কলিকাতা

আসিবার জন্ত প্রস্তুত হন। কিন্তু লোকের ভিড়ে গাড়ি না পাইয়া তিন-চার দিন নারায়ণগঞ্জে থাকিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসেন। অগত্যা নাগ-মহাশয় কলিকাতা যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন এবং পিতাকে বলেন, 'মন শুদ্ধ হ'লে মা গঙ্গা এখানেই আসবেন।' পরে যোগের সময় বাড়ির উঠানের মাটি ভেদ করিয়া এক জলের উৎস উঠিয়াছিল—এইরূপ শুনিয়াছি। যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন। আমি তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার বহু পূর্বে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল।

স্বামীজী। তার আর আশ্চর্য কি? তিনি সিদ্ধসঙ্কল্প মহাপুরুষ; তাঁর জন্ত ঐরূপ হওয়া আমি আশ্চর্য মনে করি না।

বলিতে বলিতে স্বামীজী পাশ ফিরিয়া শুইয়া একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন। শিষ্য প্রসাদ পাইতে উঠিয়া গেল।

৪৫

স্থান—কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে মঠে

কাল—১৯০২

আজ বিকালে কলিকাতার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্য দেখিতে পাইল, কিছুদূরে একজন সন্ন্যাসী আহিরিটোলার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি নিকটস্থ হইলে শিষ্য দেখিল, সাধু আর কেহ নন—তাহারই গুরু, স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর বামহস্তে শালপাতার ঠোঙায় চানাচুর ভাজা; বালকের মতো উহা খাইতে খাইতে তিনি আনন্দে পথে অগ্রসর হইতেছেন। শিষ্য তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার হঠাৎ কলিকাতা-আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

স্বামীজী। একটা দরকারে এসেছিলুম। চল্, তুই মঠে যাবি? চারটি চানাচুর ভাজা খা না? বেশ নুন-ঝাল আছে।

শিষ্য হাসিতে হাসিতে প্রসাদ গ্রহণ করিল এবং মঠে যাইতে স্বীকৃত হইল।

স্বামীজী। তবে একখানা নৌকো দেখ্।

শিষ্য দৌড়িয়া নৌকা ভাড়া করিতে গেল। ভাড়া লইয়া মাঝিদের সহিত দরদস্তর চলিতেছে, এমন সময় স্বামীজীও তথায় আসিয়া পড়িলেন। মাঝি মঠে পৌছাইয়া দিতে আট আনা চাহিল। শিষ্য দুই আনা বলিল। 'ওদের সঙ্গে আবার কি দরদস্তর করছিস?' বলিয়া স্বামীজী শিষ্যকে নিরস্ত করিলেন এবং মাঝিকে 'যা, আট আনাই দেবো' বলিয়া নৌকায় উঠিলেন। ভাটার প্রবল টানে নৌকা অতি ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং মঠে পৌছিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগিল। নৌকামধ্যে স্বামীজীকে একা পাইয়া শিষ্য নিঃসঙ্কোচে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার বেশ সুযোগ লাভ করিল।

গত জন্মোৎসবের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদিগের মহিমা কীর্তন করিয়া শিষ্য যে স্তব ছাপাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠাইয়া স্বামীজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই তোর রচিত স্তবে যাদের যাদের নাম করেছিস, কি ক'রে জানলি—তাঁরা সকলেই ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ?'

শিষ্য। মহাশয়, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদিগের নিকট এতদিন যাতায়াত করিতেছি, তাঁহাদেরই মুখে শুনিয়াছি—ইহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত।

স্বামীজী। ঠাকুরের ভক্ত হ'তে পারে, কিন্তু সকল ভক্তই তো তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের ভেতর নয়? ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে আমাদের বলেছিলেন, 'মা দেখিয়ে দিলেন, এরা সকলেই এখানকার (আমার) অন্তরঙ্গ লোক নয়।' স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার ভক্তদের সম্বন্ধেই ঠাকুর সেদিন ঐরূপ বলেছিলেন।

অনন্তর ঠাকুর নিজ ভক্তদিগের মধ্যে যে ভাবে উচ্চাবচ শ্রেণী নির্দেশ করিতেন, সেই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজী ক্রমে গৃহস্থ ও সন্ন্যাস-জীবনের মধ্যে যে কতদূর প্রভেদ বর্তমান, তাহাই শিষ্যকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

স্বামীজী। কামিনী-কাঞ্চনের সেবাও করবে, আর ঠাকুরকেও বুঝবে—এ কি কখনও হয়েছে?—না, হ'তে পারে? ও-কথা কখনও বিশ্বাস করবিনি। ঠাকুরের ভক্তদের ভেতর অনেকে এখন 'ঈশ্বরকোটী' 'অন্তরঙ্গ' ইত্যাদি ব'লে আপনাদের প্রচার করছে। তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্য কিছুই নিতে পারলে না, অথচ বলে কিনা তারা সব ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত। ও-সব

কথা ঝেঁটিয়ে ফেলে দিবি। যিনি ত্যাগীর 'বাদশা', তাঁর কৃপা পেয়ে কি কেউ কখন কাম-কাঞ্চনের সেবায় জীবনযাপন করতে পারে?

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, যাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত নন?

স্বামীজী। তা কে বলছে? সকলেই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত ক'রে spirituality (ধর্মানুভূতি)র দিকে অগ্রসর হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। তারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত। তবে কি জানিস, সকলেই কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ নয়। ঠাকুর বলতেন, 'অবতারের সঙ্গে কল্পান্তরের সিদ্ধ ঋষিরা দেহধারণ ক'রে জগতে আগমন করেন। তাঁরাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদ। তাঁদের দ্বারাই ভগবান্ কার্য করেন বা জগতে ধর্মভাব প্রচার করেন।' এটা জেনে রাখবি—অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গ একমাত্র তাঁরাই, যাঁরা পরার্থে সর্বত্যাগী, যাঁরা ভোগসুখ কাকবিষ্ঠার মতো পরিত্যাগ ক'রে 'জগদ্ধিতায়' 'জীবহিতায়' জীবনপাত করেন। ভগবান্ ঈশার শিষ্যেরা সকলেই সন্ন্যাসী। শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য ও বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত সঙ্গীরা সকলেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরাই গুরুপরম্পরাক্রমে জগতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার ক'রে আসছেন। কোথায় কবে শুনেছিস—কামকাঞ্চনের দাস হয়ে থেকে মানুষ মানুষকে উদ্ধার করতে বা ঈশ্বরলাভের পথ দেখিয়ে দিতে পেরেছে? আপনি মুক্ত না হ'লে অপরকে কি ক'রে মুক্ত করবে? বেদ-বেদান্ত ইতিহাস-পুরাণ সর্বত্র দেখতে পাবি—সন্ন্যাসীরাই সর্বকালে সর্বদেশে লোকগুরুরূপে ধর্মের উপদেষ্টা হয়েছেন। History repeats itself—যথা পূর্বং তথা পরম্—এবারও তাই হবে। মহাসমন্বয়াচার্য ঠাকুরের কৃতী সন্ন্যাসী সন্তানগণই লোকগুরুরূপে জগতের সর্বত্র পূজিত হচ্ছে ও হবে। ত্যাগী ভিন্ন অন্যের কথা ফাঁকা আওয়াজের মতো শূন্যে লীন হয়ে যাবে। মঠের যথার্থ ত্যাগী সন্ন্যাসিগণই ধর্মভাব-রক্ষা ও প্রচারের মহাকেন্দ্রস্বরূপ হবে। বুঝলি?

শিষ্য। তবে ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তেরা যে তাঁহার কথা নানাভাবে প্রচার করিতেছে, সে-সব কি সত্য নয়?

স্বামীজী। একেবারে সত্য নয়—বলা যায় না; তবে তারা ঠাকুরের সম্বন্ধে যা বলে, তা সব partial truth (আংশিক সত্য)। যে যেমন আধার, সে

ঠাকুরের ততটুকু নিয়ে তাই আলোচনা করছে। ঐরূপ করাটা মন্দ নয়। তবে তাঁর ভক্তের মধ্যে এরূপ যদি কেহ বুঝে থাকেন যে, তিনি যা বুঝেছেন বা বলছেন, তাই একমাত্র সত্য, তবে তিনি দয়ার পাত্র। ঠাকুরকে কেউ বলছেন—তান্ত্রিক কৌল, কেউ বলছেন—চৈতন্যদেব 'নারদীয়া ভক্তি' প্রচার করতে জন্মেছিলেন, কেহ বলছেন—সাধনভজন করাটা ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাসের বিরুদ্ধ, কেউ বলছেন—সন্ন্যাসী হওয়া ঠাকুরের অভিমত নয়, ইত্যাদি কত কথা গৃহী ভক্তদের মুখে শুনবি; ও-সব কথায় কান দিবিনি। তিনি যে কি, কত কত পূর্বগ-অবতারগণের জমাটবাঁধা ভাবরাজ্যের রাজা, তা জীবনপাতী তপস্যা করেও একচুল বুঝতে পারলুম না! তাই তাঁর কথা সংযত হয়ে বলতে হয়। যে যেমন আধার, তাঁকে তিনি ততটুকু দিয়ে ভরপুর ক'রে গেছেন। তাঁর ভাবসমুদ্রের উচ্ছ্বাসের একবিন্দু ধারণা করতে পারলে মানুষ তখনি দেবতা হয়ে যায়। সর্বভাবের এমন সমন্বয় জগতের ইতিহাসে আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়? এই থেকেই বোঝ্—তিনি কে দেহ ধ'রে এসেছিলেন। অবতার বললে তাঁকে ছোট করা হয়। তিনি যখন তাঁর সন্ন্যাসী ছেলেদের বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন, তখন অনেক সময় নিজে উঠে চারিদিক খুঁজে দেখতেন—কোন গেরস্ত সেখানে আছে কি না। যদি দেখতেন—কেউ নেই বা আসছে না, তবেই জলন্ত ভাষায় ত্যাগ-তপস্যার মহিমা বর্ণন করতেন। সেই সংসার-বৈরাগ্যের প্রবল উদ্দীপনাতেই তো আমরা সংসারত্যাগী উদাসীন।

শিষ্য। গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি এত প্রভেদ রাখিতেন?

স্বামীজী। তা তাঁর গৃহী ভক্তদেরই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিস না। বুঝেই দেখ্ না কেন—তাঁর যে-সব সন্তান ঈশ্বরলাভের জন্য ঐহিক জীবনের সমস্ত ভোগ ত্যাগ ক'রে পাহাড়ে-পর্বতে, তীর্থে-আশ্রমে তপস্যায় দেহপাত করছে, তারা বড়—না যারা তাঁর সেবা বন্দনা স্মরণ মনন করছে অথচ সংসারের মায়ামোহ কাটিয়ে উঠতে পারছে না, তারা বড়? যারা আত্মজ্ঞানে জীবসেবায় জীবনপাত করতে অগ্রসর, যারা আকুমার ঊর্ধ্বরেতা, যারা ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্তিমান চলবিগ্রহ, তারা বড়—না

যারা মাছির মতো একবার ফুলে বসে, পরক্ষণেই আবার বিষ্ঠায় বসছে, তারা বড় ? এ-সব নিজেই বুঝে দেখ্।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, যাঁহারা তাঁহার (ঠাকুরের) কৃপা পাইয়াছেন, তাঁহাদের আবার সংসার কি ? তাঁহারা গৃহে থাকুন বা সন্ন্যাস অবলম্বন করুন, উভয়ই সমান—আমার এইরূপ বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী। তাঁর কৃপা যারা পেয়েছে, তাদের মন বুদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আসক্ত হ'তে পারে না। কৃপার test (পরীক্ষা) কিন্তু হচ্ছে কাম-কাঞ্চনে অনাসক্তি। সেটা যদি কারও না হয়ে থাকে, তবে সে ঠাকুরের কৃপা কখনই ঠিক ঠিক লাভ করেনি।

পূর্ব প্রসঙ্গ এইরূপে শেষ হইলে শিষ্য অন্য কথার অবতারণা করিয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, আপনি যে দেশবিদেশে এত পরিশ্রম করিয়া গেলেন, ইহার ফল কি হইল ?'

স্বামীজী। কি হয়েছে, তার কিছু কিছু মাত্র তোরা দেখতে পাবি। কালে পৃথিবীকে ঠাকুরের উদার ভাব নিতে হবে, তার সূচনা হয়েছে। এই প্রবল বন্যামুখে সকলকে ভেসে যেতে হবে।

শিষ্য। আপনি ঠাকুরের সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন। ঠাকুরের প্রসঙ্গ আপনার মুখে শুনিতে বড় ভাল লাগে।

স্বামীজী। এই তো কত কি দিনরাত শুনছিস। তাঁর উপমা তিনিই। তাঁর কি তুলনা আছে রে ?

শিষ্য। মহাশয়, আমরা তো তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আমাদের উপায় ?

স্বামীজী। তাঁর সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত এইসব সাধুদের সঙ্গলাভ তো করেছিস, তবে আর তাঁকে দেখলিনি কি ক'রে বল্ ? তিনি তাঁর ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে বিরাজ করছেন। তাঁদের সেবাবন্দনা করলে কালে তিনি revealed (প্রকাশিত) হবেন। কালে সব দেখতে পাবি।

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, আপনি ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত অন্য সকলের কথাই বলেন। আপনার নিজের সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা বলিতেন, সে কথা তো কোন দিন কিছু বলেন না।

স্বামীজী। আমার কথা আর কি ব'লব? দেখছিস তো, আমি তাঁর দৈত্যদানার ভেতরকার একটা কেউ হবো। তাঁর সামনেই কখন কখন তাঁকে গালমন্দ করতুম। তিনি শুনে হাসতেন।

বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল স্থির গম্ভীর হইল। গঙ্গার দিকে শূন্যমনে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। নৌকাও ক্রমে মঠে পৌঁছিল। স্বামীজী তখন আপন মনে গান ধরিয়াছেন—

'(কেবল) আশার আশা, ভবে আসা, আসামাত্র সার হ'ল।
এখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।' ইত্যাদি

গান শুনিয়া শিষ্য স্তম্ভিত হইয়া স্বামীজীর মুখপানে তাকাইয়া রহিল। গান সমাপ্ত হইলে স্বামীজী বলিলেন, 'তোদের বাঙালদেশে সুকণ্ঠ গায়ক জন্মায় না। মা-গঙ্গার জল পেটে না গেলে সুকণ্ঠ হয় না।'

এইবার ভাড়া চুকাইয়া স্বামীজী নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং জামা খুলিয়া মঠের পশ্চিম বারান্দায় বসিলেন। স্বামীজীর গৌরকান্তি এবং গৈরিকবসন সন্ধ্যার দীপালোকে অপূর্ব শোভা ধারণ করিল।

৪৬

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—জুন (শেষ সপ্তাহ), ১৯০২

আজ ১৩ই আষাঢ়। শিষ্য বালি হইতে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে মঠে আসিয়াছে। বালিতেই তখন তাহার কর্মস্থান। অদ্য সে অফিসের পোশাক পরিয়াই আসিয়াছে। উহা পরিবর্তন করিবার সময় পায় নাই। আসিয়াই স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া সে তাঁহার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিল। স্বামীজী বলিলেন, 'বেশ আছি। (শিষ্যের পোশাক দেখিয়া) তুই কোটপ্যাণ্ট পরিস্, কলার পরিসনি কেন?' ঐ কথা বলিয়াই নিকটস্থ স্বামী সারদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার যে-সব কলার আছে, তা

থেকে ছুটো কলার একে কাল দিস্ তো।' সারদানন্দ-স্বামীও স্বামীজীর আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলেন।

অতঃপর শিষ্য মঠের অন্য এক গৃহে উক্ত পোশাক ছাড়িয়া হাতমুখ ধুইয়া স্বামীজীর কাছে আসিল। স্বামীজী তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: আহার, পোশাক ও জাতীয় আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করলে ক্রমে জাতীয়ত্ব-লোপ হয়ে যায়। বিদ্যা সকলের কাছেই শিখতে পারা যায়। কিন্তু যে বিদ্যালাভে জাতীয়ত্বের লোপ হয়, তাতে উন্নতি হয় না—অধঃপাতের সূচনাই হয়।

শিষ্য। মহাশয়, অফিস-অঞ্চলে এখন সাহেবদের অনুমোদিত পোশাকাদি না পরিলে চলে না।

স্বামীজী। তা কে বারণ করছে? অফিস-অঞ্চলে কার্যানুরোধে ঐরূপ পোশাক পরবি বইকি। কিন্তু ঘরে গিয়ে ঠিক বাঙালী বাবু হবি। সেই কোঁচা-ঝুলানো, কামিজ-গায়, চাদর কাঁধে। বুঝলি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী। তোরা কেবল সার্ট (কামিজ) পরেই এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাস্—ওদেশে (পাশ্চাত্যে) ঐরূপ পোশাক প'রে লোকের বাড়ি যাওয়া ভারি অভদ্রতা—naked (নেংটো) বলে। সার্টের উপর কোট না পরলে, ভদ্রলোকের বাড়ি ঢুকতেই দেবে না। পোশাকের ব্যাপারে তোরা কি ছাই অনুকরণ করতেই শিখেছিস্! আজকালকার ছেলে-ছোকরারা যেসব পোশাক পরে, তা না এদেশী, না ওদেশী—এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

এইরূপ কথাবার্তার পর স্বামীজী গঙ্গার ধারে একটু পদচারণা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে কেবল শিষ্যই রহিল। শিষ্য সাধন' সম্বন্ধে একটি কথা এখন স্বামীজীকে বলিবে কি না, ভাবিতে লাগিল।

স্বামীজী। কি ভাবছিস্? বলেই ফেল্ না।

শিষ্য। (সলজ্জভাবে) মহাশয়, ভাবিতেছিলাম যে, আপনি যদি এমন একটা কোন উপায় শিখাইয়া দিতেন, যাহাতে খুব শীঘ্র মন স্থির হইয়া যায়, যাহাতে খুব শীঘ্র ধ্যানস্থ হইতে পারি, তবে খুব উপকার হয়। সংসারচক্রে পড়িয়া সাধন-ভজনের সময়ে মন স্থির করিতে পারা ভার।

শিষ্যের ঐরূপ দীনতা-দর্শনে সন্তোষ লাভ করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে সস্নেহে বলিলেন, 'খানিক বাদে আমি উপরে যখন একা থাকব, তখন তুই যাস্। ঐ বিষয়ে কথাবার্তা হবে এখন।'

শিষ্য আনন্দে অধীর হইয়া স্বামীজীকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল। স্বামীজী 'থাক্ থাক্' বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী উপরে চলিয়া গেলেন।

শিষ্য ইত্যবসরে নীচে একজন সাধুর সঙ্গে বেদান্তের বিচার আরম্ভ করিয়া দিল এবং ক্রমে দ্বৈতাদ্বৈতমতের বাগবিতণ্ডায় মঠ কোলাহলময় হইয়া উঠিল। গোলযোগ দেখিয়া স্বামী শিবানন্দ মহারাজ তাহাদের বলিলেন, 'ওরে, আস্তে আস্তে বিচার কর্; অমন চীৎকার করলে স্বামীজীর ধ্যানের ব্যাঘাত হবে।' শিষ্য ঐ কথা শুনিয়া স্থির হইল এবং বিচার সাঙ্গ করিয়া উপরে স্বামীজীর কাছে চলিল।

শিষ্য উপরে উঠিয়াই দেখিল—স্বামীজী পশ্চিমাস্যে মেজেতে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। মুখ অপূর্বভাবে পূর্ণ, যেন চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার সর্বাঙ্গ একেবারে স্থির—যেন 'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে'। স্বামীজীর সেই ধ্যানস্থ মূর্তি দেখিয়া সে অবাক হইয়া নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিল এবং বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও স্বামীজীর বাহ্য হুঁশের কোন চিহ্ন না দেখিয়া নিঃশব্দে ঐ স্থানে উপবেশন করিল। আরও অর্ধ ঘণ্টা অতীত হইলে স্বামীজীর ব্যাবহারিক জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের যেন একটু আভাস দেখা গেল; তাঁহার বদ্ধ পাণিপদ্ম কম্পিত হইতেছে, শিষ্য দেখিতে পাইল। উহার পাঁচ-সাত মিনিট বাদেই স্বামীজী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শিষ্যের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, 'কখন এখানে এলি?'

শিষ্য। এই কতক্ষণ আসিয়াছি।

স্বামীজী। তা বেশ। এক গ্লাস জল নিয়ে আয়।

শিষ্য তাড়াতাড়ি স্বামীজীর জন্য নির্দিষ্ট কুঁজো হইতে জল লইয়া আসিল। স্বামীজী একটু জল পান করিয়া গ্লাসটি শিষ্যকে যথাস্থানে রাখিতে বলিলেন। শিষ্য ঐরূপ করিয়া আসিয়া পুনরায় স্বামীজীর কাছে বসিল।

স্বামীজী। আজ খুব ধ্যান জমেছিল।

শিষ্য। মহাশয়, ধ্যান করিতে বসিলে মন যাহাতে ঐরূপ ডুবিয়া যায়, তাহা আমাকে শিখাইয়া দিন।

স্বামীজী। তোকে সব উপায় তো পূর্বেই ব'লে দিয়েছি, প্রত্যহ সেই প্রকার ধ্যান করবি। কালে টের পাবি। আচ্ছা, বল্ দেখি তোর কি ভাল লাগে?

শিষ্য। মহাশয়, আপনি যেরূপ বলিয়াছেন সেরূপ করিয়া থাকি, তথাপি আমার ধ্যান এখনও ভাল জমে না। কখন কখন আবার মনে হয়—কি হইবে ধ্যান করিয়া? অতএব বোধ হয় আমার ধ্যান হইবে না, এখন আপনার চিরসামীপ্যই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

স্বামীজী। ও-সব weakness-এর (দুর্বলতার) চিহ্ন। সর্বদা নিত্যপ্রত্যক্ষ আত্মায় তন্ময় হয়ে যাবার চেষ্টা করবি। আত্মদর্শন একবার হ'লে সব হ'ল—জন্ম-মৃত্যুর পাশ কেটে চলে যাবি।

শিষ্য। আপনি কৃপা করিয়া তাহাই করিয়া দিন। আপনি আজ নিরিবিলি আসিতে বলিয়াছিলেন, তাই আসিয়াছি। আমার যাতে মন স্থির হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু করিয়া দিন।

স্বামীজী। সময় পেলেই ধ্যান করবি। সুষুম্না-পথে মন যদি একবার চলে যায় তো আপনা-আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে—বেশী কিছু আর করতে হবে না।

শিষ্য। আপনি তো কত উৎসাহ দেন। কিন্তু আমার সত্য-বস্তু প্রত্যক্ষ হইবে কি?

স্বামীজী। হবে বইকি। আকীট-ব্রহ্মা সব কালে মুক্ত হয়ে যাবে—আর তুই হবিনি? ও-সব weakness (দুর্বলতা) মনেও স্থান দিবিনি।

পরে বলিলেন: শ্রদ্ধাবান্ হ, বীর্যবান্ হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর্, আর 'পরহিতায়' জীবনপাত কর্—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।

অতঃপর প্রসাদের ঘণ্টা পড়ায় বলিলেন, 'যা প্রসাদের ঘণ্টা পড়েছে।'

শিষ্য স্বামীজীর পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া কৃপাভিক্ষা করায় স্বামীজী শিষ্যের মস্তকে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, 'আমার আশীর্বাদে যদি তোর কোন উপকার হয় তো বলছি—ভগবান্ রামকৃষ্ণ তোকে কৃপা করুন। এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আমি জানি না।

শিষ্য এইবার আনন্দিত মনে নীচে নামিয়া আসিয়া শিবানন্দ মহারাজকে স্বামীজীর আশীর্বাদের কথা বলিল। স্বামী শিবানন্দ ঐ কথা শুনিয়া

বলিলেন, 'বাঃ বাঙাল, তোর সব হয়ে গেল। এর পর স্বামীজীর আশীর্বাদের ফল জানতে পারবি।'

আহারান্তে শিষ্য আর সে-রাত্রে উপরে যায় নাই। কারণ স্বামীজী আজ সকাল-সকাল নিদ্রা যাইবার জন্য শয়ন করিয়াছিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে শিষ্যকে কার্যানুরোধে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেই হইবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া সে উপরে স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, 'এখনি যাবি?'

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী। আগামী রবিবারে আসবি তো?

শিষ্য। নিশ্চয়।

স্বামীজী। তবে আয়; ঐ একখানি চলতি নৌকাও আসছে।

শিষ্য স্বামীজীর পাদপদ্মে এ-জন্মের মতো বিদায় লইয়া চলিল। সে তখনও জানে না যে, তাহার ইষ্টদেবের সঙ্গে স্থূলশরীরে তাহার এই শেষ[১] দেখা। স্বামীজী তাহাকে প্রসন্নবদনে বিদায় দিয়া পুনরায় বলিলেন, 'রবিবারে আসিস্।' শিষ্যও 'আসিব' বলিয়া নীচে নামিয়া গেল।

স্বামী সারদানন্দ তাহাকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন, 'ওরে, কলার ছড়া নিয়ে যা। নইলে স্বামীজীর বকুনি খেতে হবে।' শিষ্য বলিল, 'আজ বড়ই তাড়াতাড়ি, আর একদিন লইয়া যাইব—আপনি স্বামীজীকে এই কথা বলিবেন।'

চলতি নৌকার মাঝি ডাকাডাকি করিতেছে, সুতরাং শিষ্য ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতেই নৌকায় উঠিবার জন্য ছুটিল। শিষ্য নৌকায় উঠিয়াই দেখিতে পাইল, স্বামীজী উপরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। সে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। নৌকা ভাটার টানে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আহিরিটোলার ঘাটে পঁহুছিল।

---

১ ২০শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই—পরবর্তী শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বামীজী মহাসমাধিতে প্রবেশ করেন।

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে

প্রকাশকের নিবেদন হইতে

'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' ভগিনী নিবেদিতার 'Notes of some Wanderings with the Swami Vivekananda' নামক ইংরেজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।...

এই গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার গুরুদেবের সহিত আলমোড়া, নৈনীতাল প্রভৃতি স্থানে এবং কাশ্মীরের নানাস্থানে ভ্রমণের কয়েকখানি জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তবে ইহা সাধারণ ভ্রমণবৃত্তান্তের ন্যায় নহে। বর্তমান যুগের দুইজন মহামনীষীর ভাবের সংঘর্ষের চিত্র পুস্তকখানির[১] ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান।

নিবেদিতার সমুদয় কথাগুলিই ভাবপূর্ণ, এবং বর্ণনাপেক্ষা ইঙ্গিতের দ্বারাই পাঠকের হৃদয়ে নূতন নূতন ভাব ও চিন্তাতরঙ্গের সৃষ্টির চেষ্টা করে। নিবেদিতার নিজের ভাষায় তাঁহার এই গ্রন্থের প্রতিপাদিত বিষয় সম্বন্ধে আমরা বলি, 'এমন সব সময় আসিয়াছে, যাহা ভুলিবার নয়; এমন সব কথা শুনিয়াছি যাহা আমাদের সারা জীবন ধরিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।'...

কার্তিক, ১৩২৪

বশংবদ

প্রকাশক

১ বর্তমান সংগ্রহে প্রধানত স্বামীজীর কথাগুলিই চয়ন করা হইয়াছে, তৎসহ প্রয়োজনীয় পটভূমিকা সন্নিবেশিত আছে।

পূর্বভাষ

ব্যক্তিগণ—স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁহার গুরুভ্রাতৃবৃন্দ ও শিষ্যমণ্ডলী। কয়েক জন পাশ্চাত্য অভ্যাগত এবং শিষ্য—ধীরা মাতা, জয়া নাম্নী এক মহিলা ও নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম।

স্থান—ভারতের বিভিন্ন অংশ

কাল—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ

এ বৎসর দিনগুলি কি সুন্দরভাবেই না কাটিয়াছে! এই সময়েই যে আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে! প্রথমে নদীতীরে বেলুড়ের কুটীরে, তারপর হিমালয়-বক্ষে নৈনীতাল ও আলমোড়ায়, পরিশেষে কাশ্মীরে নানা স্থানে পরিভ্রমণ-কালে—সর্বত্রই এমন সব সময় আসিয়াছিল, যাহা কখনও ভুলিবার নয়, এমন সব কথা শুনিয়াছি, যাহা আমাদের সারা জীবন ধরিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।

বিরাট প্রতিভার বিশাল খেয়ালে আমরা কৌতুক করিয়াছি, বীরত্বের উচ্ছ্বাসে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছি,—এ সমস্ত দিব্য লীলায়, মনে হয়, শিশু ভগবান যেন জাগিয়া উঠিতেছেন, আর আমরা দাঁড়াইয়া সাক্ষিস্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়াছি।···

···দেখিতেছি নক্ষত্রালোকিত হিমাচল-অরণ্যানীর দৃশ্যাবলী আর দেখিতেছি দিল্লী এবং তাজের রাজভোগ্য সৌন্দর্যরাশি। স্মৃতির এই সকল নিদর্শন বর্ণনা করিতে কাহার না আগ্রহ হয়! কিন্তু বর্ণনায় উহা বিবর্ণ হইয়া উঠিবে—কেননা সে যে অসম্ভব! তাই স্মৃতির আলেখ্যে নয়, স্মৃতির আলোকেই তাহাদের অক্ষয় পুণ্যপ্রতিষ্ঠা। আর সেই প্রতিষ্ঠায় চিরসংযুক্ত হইয়া বিদ্যমান থাকিবে তথাকার কোমলহৃদয় শান্তপ্রকৃতি অধিবাসিবৃন্দ।

কিরূপ মানসিক অবস্থায় নূতন নূতন ধর্ম-বিশ্বাস প্রসূত হয়, এবং কী ধরনের মহাপুরুষেরা এইরূপ ধর্ম-বিশ্বাস সঞ্চারিত করেন—আমরা তাহা কতকটা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কারণ, আমরা এমন এক মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছি, যিনি সকল রকম লোককেই নিজের কাছে আকর্ষণ করিতেন, সকলের বক্তব্য শুনিতেন, সকলের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেন, কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করেন নাই।

বিদেশীর উপহাসস্থল, কিন্তু দেশবাসীর পূজাস্পদ ভিক্ষুকের বেশে তাঁহাকে আমরা দেখিয়াছি ; তাই মনে হয়—শ্রমলব্ধ জীবিকা, সামান্ত কুটীরে বাস, এবং শস্যক্ষেত্রবাহী সাধারণ পথ—কেবল এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক দৃশ্যপটের মধ্যেই এমন জীবনের প্রকৃত শোভা ফুটিতে পারে।

তাঁহার স্বদেশবাসী বিদ্বান্ রাষ্ট্রনীতি-বিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে যেমন ভালবাসিতেন, নিরক্ষর অজ্ঞেরাও তাঁহাকে তেমনি ভালবাসিত। তাঁহার নৌকার মাঝি-মাল্লারা পথ চাহিয়া থাকিত, কতক্ষণে তিনি আবার নৌকায় ফিরিয়া আসিবেন। যে গৃহে তিনি অতিথি হইতেন, সেই গৃহের পরিচারক ভৃত্যদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত, কে আগে তাঁহার সেবা করিবে। আর এই সকল ব্যাপার সর্বদাই যেন একটা খেলার আবরণে জড়িত থাকিত। 'তাহারা যে ভগবানের খেলার সঙ্গী'—এই ভাব তাহাদের মনে স্বতই জাগরূক থাকিত।

যাঁহারা এরূপ শুভমুহূর্তের আস্বাদ পাইয়াছেন, জীবন তাঁহাদের নিকট অধিকতর মূল্যবান্, অধিকতর মধুময়। দীর্ঘ নিরানন্দ রজনীর তালবন-সঞ্চারী বায়ুও উদ্বেগ ও আশঙ্কার পরিবর্তে তাঁহাদের কর্ণে শান্তিময় 'শিব! শিব!' বাণী ধ্বনিত করিয়া তোলে।

১

স্থান—বেলুড়ে গঙ্গাতীরে একখানি ছোট বাড়ি

কাল—মার্চ হইতে ১১ই মে পর্যন্ত

গঙ্গাতীরস্থ বাড়িখানির সম্বন্ধে স্বামীজী একজনকে বলিয়াছিলেন, 'ধীরা-মাতার ক্ষুদ্র বাড়িখানি তোমার স্বর্গ বলিয়া মনে হইবে। কারণ, ইহার আগাগোড়া সবটাই ভালবাসা-মাখা।'

বাস্তবিকই তাই। ভিতরে এক অবিচ্ছিন্ন মেলা-মেশার ভাব, এবং বাহিরে প্রতি জিনিসটি সমান সুন্দর; শ্যামল বিস্তৃত শষ্পরাজি, উন্নত নারিকেল বৃক্ষগুলি, বনমধ্যস্থ ছোট ছোট বাদামী রঙের গ্রামগুলি—সবই সুন্দর!

যাঁহাদের মনে অতীতের স্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে, এমন অনেকে মাঝে মাঝে আসিতেন, এবং আমরা স্বামীজীর অষ্টবর্ষব্যাপী ভ্রমণের কিছু কিছু বিবরণ শুনিতে পাইতাম; গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন-কালে তাঁহার নাম-পরিবর্তনের কথা, তাঁহার নির্বিকল্প সমাধির কথা, এবং যাহা বাক্যের অতীত ও সাধারণ দৃষ্টির বহির্ভূত, যাহা কেবল প্রেমিক হৃদয়েরই অনুভবগম্য, পরার্থে স্বামীজীর সেই পবিত্র মর্মবেদনার কথাও আমরা শ্রবণ করিতাম। আর স্বয়ং স্বামীজী তথায় আসিতেন, উমামহেশ্বরের ও রাধাকৃষ্ণের গল্প বলিতেন, কত গান ও কবিতার আংশিক আবৃত্তি করিতেন।

বেশীর ভাগ, তিনি আজ একটি, কাল একটি—এইরূপ করিয়া ভারতীয় ধর্মগুলিই আমাদের নিকট বর্ণনা করিতেন,—তাঁহার যখন যেমন খেয়াল হইত; যেন তদনুসারেই কোন একটিকে বাছিয়া লইতেন। কিন্তু তিনি কেবল যে ধর্মবিষয়ক উপদেশই আমাদিগকে দিতেন, তাহা নহে। কখনও ইতিহাস, কখনও লৌকিক উপকথা, কখনও বা বিভিন্ন সমাজ, জাতিবিভাগ ও লোকাচারের বহুবিধ উদ্ভট পরিণতি ও অসঙ্গতি—এ সকলেরও আলোচনা হইত। বাস্তবিক তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মনে হইত, যেন ভারতমাতা শেষ এবং শ্রেষ্ঠ পুরাণ-স্বরূপ হইয়া তাঁহার শ্রীমুখাবলম্বনে স্বয়ং প্রকটিত হইতেছেন।

ভারত-সংক্রান্ত বিষয়ে, যাহা কিছু পাশ্চাত্য মনের পক্ষে আস্বাদ করা অসম্ভব বলিয়া তাঁহার বোধ হইত, সেগুলিকে শিক্ষার প্রারম্ভেই খুব

করিয়া বাড়াইয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন। এইরূপে, হয়তো তিনি হরগৌরীমিলনাত্মক একটি কবিতা[1] আবৃত্তি করিতেন :

কস্তূরিকাচন্দনলেপনায়ৈ,
শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ,
কপালমালাপরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।
... ...

... ...
চাম্পেয়গৌরার্ধশরীরকায়ৈ,
কর্পূরগৌরার্ধশরীরকায়।
ধম্মিল্লবত্যৈ চ জটাধরায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ,
বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

আলোচনার বিষয় যাহাই হউক না কেন, উহা সর্বদাই পরিণামে অন্তর অন্তরের কথায় পর্যবসিত হইত। সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান—যে-কোন তত্ত্বের বিচারেই তিনি প্রবৃত্ত হউন না কেন, সেটি যে সেই চরম অনুভূতিরই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র, তাহা তিনি সদাই আমাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতেন। তাঁহার চক্ষে কোন জিনিসই ধর্মের এলাকার বহির্ভূত ছিল না। বন্ধনমাত্রকেই তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, এবং যাহারা 'শৃঙ্খলকে পুণ্যের আবরণে ঢাকিতে চাহে' তাহাদিগকে তিনি ভয়ানক লোক বলিয়া গণ্য করিতেন; কিন্তু তাই বলিয়া উচ্চ স্তরের রসশিল্পের এবং এই বিষয়ের মধ্যে প্রকৃত সমালোচক যে ব্যবধান দেখিতে পান, তাহা কখনও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। একদিন আমরা কয়েক জন ইওরোপীয় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। স্বামীজী সেদিন পারসিক কবিতার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন :

'প্রিয়তমের মুখের একটি তিলের বদলে আমি সমরকন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত!'

—এই পদটি আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি সহসা সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, 'দেখ, যে লোক একটা প্রেমসঙ্গীতের মাধুর্য বুঝিতে পারে না, তাহার জন্য আমি এক কানাকড়িও দিতে রাজী নই।' তাঁহার কথাবার্তা সরস

১ অর্ধনারীশ্বরস্তোত্রম্—শঙ্করাচার্য

উক্তিসমূহে পূর্ণ থাকিত। সেই দিনই অপরাহ্ণে, কোন রাজনৈতিক বিষয়ের বিচার করিতে করিতে তিনি বলিলেন, 'দেখা যাইতেছে যে, একটি জাতিগঠনের পক্ষে সাধারণ প্রীতির ন্যায় একটা সাধারণ বিরাগেরও আবশ্যকতা আছে!'

কয়েক মাস পরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'যাহার জগতে কোন বিশেষ কাজ করিবার আছে, তাহার কাছে আমি কখনও উমা এবং মহেশ্বর ভিন্ন অন্য দেবদেবীর কথা বলি না। কারণ, মহেশ্বর এবং জগন্মাতা হইতেই কর্মবীরগণের উদ্ভব।' ভগবানের প্রতি উদ্দাম প্রেমে আত্মহারা হওয়া যে কি জিনিস, তাহার আভাস তিনি না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাই তিনি আমাদের কাছে এই সব গানও সুর-সংযোগে গাহিতেন:

'প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী,
প্রেমের দ্বারে আছে দ্বারী, করে মোহন বাঁশরী,
বাঁশী বলচে রে সদাই, প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই,
কারু যেতে মানা নাই!
ডাকচে বাঁশী—আয় পিপাসী জয় রাধে নাম গান ক'রে।'[১]

তিনি তাঁহার বন্ধু-রচিত[২] গোপগোপীগণের উত্তর-প্রত্যুত্তর-সূচক ভাব-গম্ভীর গীতটিও গাহিয়া শুনাইতেন:

'পরমাত্মন পীতবসন নবঘনশ্যামকায়।
কালা ব্রজের রাখাল ধরে রাধার পায়।
বন্দ প্রাণ নন্দদুলাল নমো নমো পদপঙ্কজে,
মরি মরি মরি, বাঁকা নয়ন গোপীর মন মজে।
পাণ্ডবসখা সারথি রথে, বাঁশী বাজায় ব্রজের ঘাটে পথে।
যজ্ঞেশ্বর বীতভয় হর যাদবরায়,
প্রেমে রাধা ব'লে নয়ন ভেসে যায়।'

২৫শে মার্চ। প্রাতে কুটীরে আসিয়া সকালের দিকে কয়েক ঘণ্টা সেখানে অতিবাহিত করা, আবার বৈকালে পুনরায় আসা—ইহাই স্বামীজীর এই সময়ের নিয়ম ছিল। কিন্তু এইরূপ সাক্ষাতের দ্বিতীয় দিন সকালে—শুক্রবার

১ কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'নিমাই-সন্ন্যাস' নাটক হইতে

২ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ঈশাহিগণের জ্ঞাপনোৎসবের[১] দিন—তিনি ফিরিবার সময় আমাদের তিন জনকে সঙ্গে করিয়া মঠে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে ঠাকুরঘরে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানান্তে একজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিলেন। সেই প্রভাতটি জীবনে সর্বাপেক্ষা আনন্দময় প্রভাত! পূজাশেষে আমরা উপর তলায় গেলাম। স্বামীজী যোগী শিবের ন্যায় জটা, বিভূতি ও হাড়ের কুণ্ডল পরিধান করিয়া একঘণ্টাকাল ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র-সংযোগে ভারতীয় গীত গাহিলেন।

তার পর সন্ধ্যার সময় গঙ্গাবক্ষে আমাদের নৌকায় বসিয়া তিনি আমাদের নিকট অকপটভাবে তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে দায়রূপে প্রাপ্ত সেই মহৎকার্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন এবং ভাবনাবিষয়ক অনেক কথা বলিলেন।

আর এক সপ্তাহ পরেই তিনি দার্জিলিং যাত্রা করিলেন।

৩রা মে। তারপর আমাদের মধ্যে দুইজন পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর গৃহে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। তখনকার রাজনীতিক গগন তমসাচ্ছন্ন। একটা ঝড়ের সূচনা দেখা যাইতেছিল। ইতিপূর্বেই প্লেগ, আতঙ্ক এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিজ নিজ ভীষণ মূর্তি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আচার্যদেব আমাদের দুইজনকে লক্ষ্য করিয়া বললেন, 'মা কালীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি লোক ব্যঙ্গ করে। কিন্তু ঐ দেখ, আজ মা প্রজাগণের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়াছেন। ভয়ে তাহারা কূলকিনারা দেখিতে পাইতেছে না এবং মৃত্যুর দণ্ডদাতা সৈনিকবৃন্দের ডাক পড়িয়াছে। কে বলিতে পারে যে, ভগবান্ শুভের ন্যায় অশুভ রূপেও আত্মপ্রকাশ করেন না! কিন্তু কেবল হিন্দুই তাঁহাকে অশুভ রূপেও পূজা করিতে সাহস করে।'

মহামারী দেখা দিয়াছিল এবং জনসাধারণকে সাহস দিবার জন্য ব্যবস্থাও চলিতেছিল। যতদিন এই আশঙ্কা সব দিক আতঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল, ততদিন স্বামীজী কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। এই আশঙ্কা কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই সুখের দিনগুলিও অন্তর্হিত হইল। আমাদেরও যাত্রা করিবার সময় আসিল।

---

১ The Day of Annunciation—যেদিন দেবদূত আসিয়া ঈশা-জননী মেরীকে পুত্রের জন্মকথা জ্ঞাপন করেন।

স্থান—হিমালয়

কাল—১১ই হইতে ২৫শে মে পর্যন্ত

আমরা একটি বড় দল, অথবা প্রকৃতপক্ষে দুইটি দল, বুধবার সন্ধ্যাকালে হাওড়া স্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া শুক্রবার প্রাতে হিমালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

তিনটি ঘটনা নৈনীতালকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল—খেতড়ির রাজাকে আমাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়া আচার্যদেবের আহ্লাদ; দুইজন বাইজীর আমাদিগের নিকট সন্ধান জানিয়া লইয়া স্বামীজীর নিকট গমন এবং অন্যের নিষেধ সত্ত্বেও স্বামীজীর তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করা; আর, একজন মুসলমান ভদ্রলোকের এই উক্তি: 'স্বামীজী, যদি ভবিষ্যতে কেহ আপনাকে অবতার বলিয়া দাবি করেন, স্মরণ রাখিবেন যে, আমি মুসলমান হইয়াও তাঁহাদের সকলের অগ্রণী।'

এই নৈনীতালেই স্বামীজী রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন, তাহাতে তিনি তিনটি বিষয় এই আচার্যের শিক্ষার মূলসূত্র বলিয়া নির্দেশ করেন: তাঁহার বেদান্ত গ্রহণ, স্বদেশপ্রেম প্রচার, এবং হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে ভালবাসা। এইসকল বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের উদারতা ও ভবিষ্যদ্দর্শিতা যে কার্যপ্রণালীর সূচনা করিয়াছিল, তিনি নিজে মাত্র তাহাই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া দাবি করিতেন।

নর্তকীদ্বয়-সংক্রান্ত ঘটনাটি আমাদের নৈনী-সরোবরের উপরে অবস্থিত মন্দিরদ্বয় দর্শন উপলক্ষে ঘটিয়াছিল। এইস্থানে আমরা দুইজন বাইজীকে পূজায় রত দেখিলাম। পূজান্তে তাহারা আমাদের নিকট আসিল, এবং আমরা ভাঙা ভাঙা ভাষায় তাহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। স্বামীজী তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে অস্বীকার করায় উপস্থিত জনমণ্ডলীর মনোমধ্যে একটা আন্দোলন চলিয়াছিল। খেতড়ির বাইজীর যে গল্প তিনি বারংবার করিতেন, তাহা প্রথমবার সম্ভবতঃ এই নৈনীতালের বাইজীদের প্রসঙ্গেই বলিয়াছিলেন। খেতড়ির সেই বাইজীকে দেখিতে যাইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া

তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে অনেক অনুরোধে তথায় গমন করেন এবং তাহার সঙ্গীতটি শ্রবণ করেন :

প্রভু মেরা অবগুণ চিত ন ধরো, সমদরশী হৈ নাম তুম্‌হারো।
এক লোহ পূজামে রহত হৈ, এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নেহী হোয়, দুঁহু এক কাঞ্চন করো॥
এক নদী এক নহর বহত মিলি নীর ভয়ো।
জব মিলে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গানাম পরো॥
এক মায়া, এক ব্রহ্ম, কহত সুরদাস ঝগরো।
অজ্ঞানসে ভেদ হোয়, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥

অতঃপর আচার্যদেব নিজ মুখে বলিয়াছেন, যেন তাঁহার চক্ষের সম্মুখ হইতে একটি পর্দা উঠিয়া গেল এবং সবই যে এক বই দুই নহে—এই উপলব্ধি করিয়া তিনি তারপর আর কাহাকেও মন্দ বলিয়া দেখিতেন না।

যখন আমরা নৈনীতাল হইতে আলমোড়া যাত্রা করিলাম তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, এবং বনপথ অতিবাহন করিতে করিতেই রাত্রি হইয়া গেল। অবশেষে বৃক্ষরাজির অন্তরালে পর্বতগাত্রে অপরূপভাবে স্থাপিত একটি ডাকবাংলায় পৌঁছিলাম। স্বামীজী কিয়ৎক্ষণ পরে দলবলসহ তথায় পৌঁছিলেন। তাঁহার বদন আনন্দোৎফুল্ল, স্বীয় অতিথিগণের স্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক প্রত্যেক খুঁটিনাটির দিকে তাঁহার পূর্ণ দৃষ্টি।

প্রাতরাশের সময় আমাদের নিকট আসিয়া কয়েক ঘণ্টা কথাবার্তায় কাটাইয়া দেওয়া স্বামীজীর পুরাতন অভ্যাস ছিল। আমাদের আলমোড়া পৌঁছিবার দিন হইতেই স্বামীজী এই অভ্যাস পুনরায় শুরু করিলেন। তখন (এবং সকল সময়ই) তিনি অতি অল্প সময় ঘুমাইতেন এবং মনে হয়, তিনি যে এত প্রাতে আমাদের নিকট আসিতেন, তাহা অনেক সময় আরও সকালে সন্ন্যাসিগণের সহিত তাঁহার এক প্রস্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিবার মুখে। কখনও কখনও, কিন্তু কালেভদ্রে, বৈকালেও আমরা তাঁহার দেখা পাইতাম, হয় তিনিই বেড়াইতে বাহির হইতেন, নয় তো আমরা নিজেরাই, তিনি যেখানে দলবলসহ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের গৃহে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতাম।

আলমোড়ার এই প্রাতঃকালীন কথোপকথনগুলিতে একটি নূতন এবং অননুভূতপূর্ব ব্যাপার আসিয়া জুটিয়াছিল। উহার স্মৃতি কষ্টকর হইলেও শিক্ষাপ্রদ। স্বামীজী উল্লাসের সহিত তাঁহার দীক্ষিতা এক ইংরেজ মহিলাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তুমি এখন কোন্ জাতিভুক্তা? উত্তর শুনিয়া স্বামীজী বিস্মিত হইলেন, দেখিলেন তিনি ইংরেজের জাতীয় পতাকাকে কি প্রগাঢ় ভক্তি ও পূজার চক্ষে দেখেন; দেখিলেন যে একজন ভারতীয় নারীর তাঁহার ইষ্টদেবতার প্রতি যে ভাব, ইহারও এই পতাকার প্রতি অনেকটা সেই ভাব। স্বামীজী বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'বাস্তবিকই, তোমার যেরূপ স্বজাতিপ্রেম,' উহা তো পাপ! অধিকাংশ লোকই যে স্বার্থের প্ররোচনায় কাজ করিয়া থাকে, আমি চাই, তুমি এইটুকু বোঝ; কিন্তু তুমি ক্রমাগত ইহাকে উল্টাইয়া দিয়া বলিয়া থাকো যে, একটি জাতিবিশেষের সকলেই দেবতা। অজ্ঞতাকে এরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা তো শয়তানি!'

সুতরাং আলমোড়ার এই প্রাতঃকালীন আলোচনাসমূহ আমাদের সামাজিক, সাহিত্যিক ও ললিতকলা-বিষয়ক বদ্ধমূল পূর্ব সংস্কারগুলির সহিত সঙ্ঘর্ষের আকার ধারণ করিত, অথবা তাহাতে ভারতীয় এবং ইওরোপীয় ইতিহাস ও উচ্চ উচ্চ ভাবের তুলনা চলিত, এবং অনেক সময় অতি মূল্যবান্ প্রাসঙ্গিক মন্তব্যও শুনিতে পাইতাম। স্বামীজীর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, কোন দেশবিশেষ বা সমাজবিশেষের মধ্যে অবস্থানকালে তিনি উহার দোষগুলিকে প্রকাশ্যে এবং তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেন, কিন্তু তথা হইতে চলিয়া আসিবার পর যেন সেখানকার গুণ ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁহার মনে নাই, এইরূপই বোধ হইত।

৩

স্থান—আলমোড়া
কাল—মে ও জুন

প্রথম দিন সকালের কথোপকথনের বিষয় ছিল—সভ্যতার মূল আদর্শ: প্রতীচ্যে সত্য, প্রাচ্যে ব্রহ্মচর্য। হিন্দু-বিবাহ-রীতিগুলিকে তিনি এই বলিয়া সমর্থন করিলেন যে, তাহারা এই আদর্শের অনুসরণে জন্মিয়াছে এবং সর্ববিধ সংহতিগঠনেই স্ত্রীলোকের রক্ষাবিধানের প্রয়োজন আছে। সমস্ত বিষয়টির অদ্বৈতবাদের সহিত কি সম্বন্ধ, তাহাও তিনি বিশ্লেষণপূর্বক দেখাইলেন।

আর একদিন সকালে তিনি এই বলিয়া কথা আরম্ভ করিলেন: যেমন জগতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি মুখ্যজাতি আছে, তেমনি চারিটি মুখ্যজাতীয় কার্যও আছে—ধর্মসম্বন্ধীয় কার্য অর্থাৎ পৌরোহিত্য, যাহা হিন্দুরা নিষ্পন্ন করিতেছে; সামরিক কার্য, যাহা রোমক সাম্রাজ্যের হস্তে ছিল; বাণিজ্যবিষয়ক কার্য, যাহা আজকালকার ইংলণ্ড করিতেছে; এবং প্রজাতন্ত্রমূলক কার্য, যাহা আমেরিকা ভবিষ্যতে সম্পন্ন করিবে। এই স্থলে তিনি, কিরূপে আমেরিকা অতঃপর শূদ্রজাতির স্বাধীনতা এবং একযোগে কার্যকারণরূপ সমস্যাগুলি পূরণ করিবে, সে বিষয়ে কল্পনাসহায়ে ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যিনি আমেরিকাবাসী নন, এরূপ একজন শ্রোতার দিকে ফিরিয়া মার্কিন জাতি কিরূপ বদান্যতার সহিত সেখানকার আদিম অধিবাসিগণের জন্য বন্দোবস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে বর্ণনা করিলেন।

তিনি উল্লাসপূর্বক ভারতবর্ষের অথবা মোগলবংশের ইতিহাসের সার সঙ্কলন করিয়া দিতেন। মোগলগণের গরিমা স্বামীজী শতমুখে বর্ণনা করিতেন। এই সারা গ্রীষ্ম-ঋতুটিতে তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দিল্লী ও আগ্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন। একবার তিনি তাজমহলকে এইরূপ বর্ণনা করেন, 'ক্ষীণালোক, তারপর আরও ক্ষীণালোক—আর সেখানে একটি সমাধি!'—আর একবার তিনি সাজাহানের কথা বলিতে বলিতে সহসা উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, 'আহা, তিনিই মোগলকুলের ভূষণস্বরূপ ছিলেন!

অমন সৌন্দর্যানুরাগ ও সৌন্দর্যবোধ ইতিহাসে আর দেখা যায় না। আবার নিজেও একজন কলাবিদ্ লোক ছিলেন! আমি তাঁহার স্বহস্তচিত্রিত একখানি পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি, সেখানি ভারতবর্ষের কলা-সম্পদের অঙ্গবিশেষ। কি প্রতিভা!' আকবরের প্রসঙ্গ তিনি আরও বেশী করিয়া করিতেন। আগ্রার সন্নিকটে সেকেন্দ্রার সেই গম্বুজবিহীন অনাচ্ছাদিত সমাধির পাশে বসিয়া আকবরের কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর কণ্ঠ যেন অশ্রুগদগদ হইয়া আসিত।

সর্ববিধ বিশ্বজনীন ভাবও আচার্যদেবের হৃদয়ে উদিত হইত। একদিন তিনি চীনদেশকে জগতের কোষাগার বলিয়া বর্ণনা করিলেন; এবং বলিলেন, তত্রত্য মন্দিরগুলির দ্বারদেশের উপরিভাগে প্রাচীন বাঙলা-লিপি খোদিত দেখিয়া তাঁহার রোমাঞ্চ হইয়াছিল।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি সুদূর ইটালি পর্যন্ত চলিয়া যাইতেন। ইটালি তাঁহার নিকট 'ইওরোপের সকল দেশের শীর্ষস্থানীয়, ধর্ম ও শিল্পের দেশ, একাধারে সাম্রাজ্যসংহতি ও ম্যাটসিনির জন্মভূমি, এবং উচ্চভাব সভ্যতা ও স্বাধীনতার প্রসূতি!'

একদিন শিবাজী ও মহারাষ্ট্র-জাতি সম্বন্ধে এবং কিরূপে শিবাজী সাধুবেশে বর্ষব্যাপী ভ্রমণের ফলে রায়গড় প্রত্যাবর্তন করেন, সে বিষয়ে কথা হইল। স্বামীজী বলিলেন, 'আজও পর্যন্ত ভারতের কর্তৃপক্ষ সন্ন্যাসীকে ভয় করে, পাছে তাহার গৈরিক বসনের নীচে আর একজন শিবাজী লুক্কায়িত থাকে।'

অনেক সময়, 'আর্যগণ কাহারা এবং তাঁহাদের লক্ষণ কি?'—এই প্রশ্ন তাঁহার পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করিত। তাঁহাদের উৎপত্তি-নির্ণয় এক জটিল সমস্যা—এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া তিনি কিরূপে সুইজারলণ্ডে থাকিয়াও বোধ করিতেন যেন চীনদেশে রহিয়াছেন—উভয় জাতির আকৃতিগত সাদৃশ্য এত বেশী, সে গল্পও আমাদের নিকট করিতেন। নরওয়ের কতক অংশের সম্বন্ধেও এটি সত্য বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। তারপর দেশভেদে আকৃতিভেদ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য এবং সেই হুজারিদেশীয় পণ্ডিতের মর্মস্পর্শী গল্প (যিনি 'তিব্বতই হূনদিগের আদিস্থান' এই আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং দার্জিলিং-এ যাঁহার সমাধি আছে)—এইরূপ নানা কথা শুনিতে পাইতাম।

কখনও কখনও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণের বিরোধের আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজী ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসকে এতদুভয়ের সংঘর্ষ মাত্র বলিয়া বর্ণনা করিতেন; এবং জাতির উন্নতিশীল, এবং শৃঙ্খল-অপনয়নকারী প্রেরণাসমূহ ক্ষত্রিয়গণের মধ্যেই চিরকাল নিহিত ছিল, তাহাও বলিতেন। আধুনিক বাঙলার কায়স্থগণই যে মৌর্যরাজত্বের পূর্বতন ক্ষত্রিয়কুল, তাঁহার এই বিশ্বাসের অনুকূলে তিনি উৎকৃষ্ট যুক্তির অবতারণা করিতে পারিতেন। তিনি এই দুই পরস্পরবিরোধী সভ্যতাদর্শের এইরূপ চিত্র উপস্থাপিত করিতেন: একটি প্রাচীন, গভীর এবং পরম্পরাগত আচার-ব্যবহারের প্রতি চিরবর্ধমান-শ্রদ্ধাসম্পন্ন; অপরটি স্পর্ধাশীল, আবেগপ্রবণ এবং উদারদৃষ্টি-সম্পন্ন। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান বুদ্ধ—ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণকুলে না জন্মিয়া যে ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেটি ঐতিহাসিক উন্নতির এক গভীর নিয়মেরই ফলস্বরূপ। এই আপাত-বিসংবাদী সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাত হইবামাত্র বৌদ্ধধর্ম এক জাতিভেদধ্বংসী সূত্ররূপে প্রতীয়মান হইত—,'ক্ষত্রিয়কুল কর্তৃক উদ্ভাবিত ধর্ম' ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাংঘাতিক প্রতিপক্ষস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইত।

বুদ্ধ সম্বন্ধে স্বামীজী যে সময় কথা কহিতেন, সেটি একটি মাহেন্দ্রক্ষণ; কারণ জনৈক শ্রোত্রী স্বামীজীর একটি কথা হইতে বৌদ্ধধর্মের ব্রাহ্মণ্য-প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবটিই তাঁহার মনোগত ভাব, এই ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, 'স্বামীজী! আমি জানিতাম না যে, আপনি বৌদ্ধ!' উক্ত নাম শ্রবণে তাঁহার মুখমণ্ডল দিব্যভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আমি বুদ্ধের দাসানুদাসগণের দাস। তাঁহার মতো কেহ কখনও জন্মিয়াছেন কি? স্বয়ং ভগবান হইয়াও তিনি নিজের জন্য একটি কাজও করেন নাই,—আর কি হৃদয়! সমস্ত জগৎটাকে তিনি ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছেন। এত দয়া যে, রাজপুত্র এবং সন্ন্যাসী হইয়াও একটি ছাগশিশুকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত! এত প্রেম যে, এক ব্যাঘ্রীর ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য স্বীয় শরীর পর্যন্ত দান করিয়াছিলেন, এবং আশ্রয়দাতা এক চণ্ডালের জন্য আত্মবলি দিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন! আর আমার বাল্যকালে এক দিন তিনি আমার গৃহে আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহার পাদমূলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়াছিলাম! কারণ, আমি বুঝিয়াছিলাম ভগবান বুদ্ধই স্বয়ং আসিয়াছেন!'

অনেক বার—কখনও বেলুড়ে অবস্থানকালে এবং কখনও তাহার পরে, তিনি এই ভাবে বুদ্ধদেবের কথা বলিয়াছিলেন। একদিন তিনি আমাদিগকে—যিনি মুখ্যবারাঙ্গনা হইয়াও বুদ্ধকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইয়াছিলেন, সেই রূপসী অম্বাপালীর উপাখ্যান প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়া বলেন।

একদিন প্রাতঃকালে এক সর্বাপেক্ষা অধিক নূতনত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা হইয়াছিল। সেদিনকার দীর্ঘ আলোচনার বিষয় ছিল 'ভক্তি'—প্রেমাস্পদের সহিত সম্পূর্ণ তাদাত্ম্য, যাহা চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভূম্যধিকারী ভক্তবীর রায় রামানন্দের মুখে এরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে :

পাহলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল ;
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
না সো রমণ, না হাম রমণী
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি।[১]

সেই দিন প্রাতঃকালেই তিনি পারস্যের বাব-পন্থিগণের (Babists) কথা বলিয়াছিলেন—সেই পরার্থে আত্মবলিদানের যুগের কথা, যখন স্ত্রীজাতিকর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া পুরুষগণ কাজ করিত এবং তাহাদিগকে ভক্তির চক্ষে দেখিত। এবং নিশ্চিত সেই সময়েই তিনি বলিয়াছিলেন, প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া ভালবাসিতে পারে বলিয়াই তরুণবয়স্কগণের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠতা, এবং তাহাদের মধ্যে ভাবী মহৎকার্যের বীজ সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে—ইহাই তাঁহার ধারণা।

আর একদিন অরুণোদয়কালে উদ্যান হইতে যখন ঊষার আলোকরঞ্জিত চিরতুষাররাশি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, সেই সময় স্বামীজী আসিয়া শিব ও উমা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলাপ করিতে করিতে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'ঐ যে ঊর্ধ্বে শ্বেতকায় তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি, উহাই শিব ; আর তাঁহার উপর যে আলোকসম্পাত হইয়াছে, তাহাই জগজ্জননী!' কারণ, এই সময়ে এই চিন্তাই তাঁহার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল যে, ঈশ্বরই জগৎ—তিনি জগতের ভিতরে বা বাহিরে নহেন, আর জগৎও ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে, পরন্তু ঈশ্বরই এই জগৎ এবং যাহা কিছু আছে সব।

১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ।

একদিন সন্ধ্যাকালে পরমহংস শুকের আখ্যানটি আমরা শুনিয়াছিলাম।

বাস্তবিক, শুকই ছিলেন স্বামীজীর মনের মতো যোগী। তাঁহার নিকট শুক সেই সর্বোচ্চ অপরোক্ষানুভূতির আদর্শরূপ, যাহার তুলনায় জীবজগৎ ছেলেখেলা মাত্র! বহুদিন পরে আমরা শুনিলাম যে, শ্রীরামকৃষ্ণ কিশোর স্বামীজীকে 'যেন আমার শুকদেব' এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। 'অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা'—গীতার প্রকৃত অর্থ আমি জানি এবং শুক জানে, আর ব্যাস জানিলেও জানিতে পারেন। ভগবদ্-গীতার গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ এবং শুকের মাহাত্ম্য-দ্যোতক এই শিববাক্য দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার মুখে যে অপূর্ব ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা আমি কখনই ভুলিতে পারিব না; তিনি যেন আনন্দ-সমুদ্রের গভীর তলদেশ পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

আর একদিন স্বামীজী, হিন্দু-সভ্যতার চিরন্তন উপকূলে—আধুনিক চিন্তাতরঙ্গরাজির বহুদূরব্যাপী প্লাবনের প্রথম ফলস্বরূপ বঙ্গদেশে যে-সকল উদারহৃদয় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কথা বলিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের কথা আমরা ইতিপূর্বেই নৈনীতালে তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে তিনি সাগ্রহে বলিলেন, 'উত্তর ভারতে আমার বয়সের এমন একজন লোকও নাই, যাহার উপর তাঁহার প্রভাব না পড়িয়াছে!' এই দুই ব্যক্তি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যে একই অঞ্চলে মাত্র কয়েক ক্রোশের ব্যবধানে জন্মিয়াছেন, এ কথা মনে হইলে তিনি যারপরনাই আনন্দ অনুভব করিতেন।

স্বামীজী এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমাদের নিকট 'বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনকারী এবং বহুবিবাহ-রোধকারী মহাবীর' বলিয়া উল্লেখ করিলেন। কিন্তু সে-সম্বন্ধে তাঁহার একটি প্রিয় গল্প ছিল, সেই দিনকার ঘটনাটি এই :

একদিন তিনি ব্যবস্থাপক সভা হইতে—এই চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছেন, ঐরূপ স্থানে সাহেবী পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত কি না, এমন সময় তিনি দেখিলেন যে, ধীরে সুস্থে এবং গুরুগম্ভীর চালে গৃহগমনরত এক স্থূল-কায় মোগলের নিকট এক ব্যক্তি দ্রুতপদে আসিয়া সংবাদ দিল, 'মহাশয় আপনার বাড়িতে আগুন লাগিয়াছে!' এই সংবাদে মোগলপ্রবরের গতির লেশমাত্রও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিল না; ইহা দেখিয়া সংবাদবাহক ইঙ্গিতে ঈষৎ বিজ্ঞজনোচিত

বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রভু ক্রোধে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'পাজি! খানকয়েক বাখারি পুড়িয়া যাইতেছে বলিয়া তুই আমায় বাপ-পিতামহের চাল ছাড়িয়া দিতে বলিস!'—এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাহার পশ্চাতে আসিতে আসিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন যে, ধুতি চাদর এবং চটি জুতা কোনক্রমে ছাড়া হইবে না; ফলে দরবার যাত্রাকালে একটা জামা ও একজোড়া জুতা পর্যন্ত পরিলেন না।

'বালবিধবাগণের বিবাহ চলিতে পারে কি না?'—মাতার এইরূপ সাগ্রহ প্রশ্নের শাস্ত্রপাঠার্থ বিদ্যাসাগরের একমাসের জন্য নির্জনগমনের চিত্রটি খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। নির্জনবাসের পর তিনি 'শাস্ত্র এরূপ পুনর্বিবাহের প্রতিপক্ষ নহেন,' এই মত প্রকাশ করিয়া এ-বিষয়ে পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরযুক্ত সম্মতি-পত্র সংগ্রহ করিলেন। পরে কতিপয় দেশীয় রাজা ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়ায় পণ্ডিতগণ নিজ নিজ স্বাক্ষর প্রত্যাহার করিলেন; সুতরাং সরকার বাহাদুর এই আন্দোলনের স্বপক্ষে সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প না হইলে ইহা কখনই আইনরূপে পরিণত হইত না। স্বামীজী আরও বলিলেন, 'আর আজকাল এই সমস্যা সামাজিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হইয়া বরং একটা অর্থনীতিসংক্রান্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'

যে ব্যক্তি কেবল নৈতিক বলে বহুবিবাহকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি যে প্রভূত আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারিলাম। যখন শুনিলাম যে, এই মহাপুরুষ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে অনাহারে এবং রোগে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় মর্মাহত হইয়া 'আর ভগবান মানি না' বলিয়া সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয়বাদের চিন্তাস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তখন 'পোশাকী' মতবাদের উপর ভারতবাসীর কিরূপ অনাস্থা, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া আমরা যারপরনাই বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলাম।

বাঙলার শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে একজনের নাম স্বামীজী ইহার নামের সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেন, তিনি ডেভিড হেয়ার; সেই বৃদ্ধ স্কটল্যাণ্ডবাসী নিরীশ্বরবাদী—মৃত্যুর পর যাঁহাকে কলিকাতার যাজকবৃন্দ ঈশাহিজনোচিত সমাধি-দানে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বিসূচিকারোগাক্রান্ত এক পুরাতন ছাত্রের শুশ্রূষা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার নিজ

ছাত্রগণ তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া এক সমতল ভূমিখণ্ডে সমাধিস্থ করিল, এবং উক্ত সমাধি তাহাদের নিকট এক তীর্থে পরিণত হইল। সেই স্থানই আজ শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া কলেজ স্কোয়ার নামে অভিহিত হইয়াছে, আর তাঁহার বিদ্যালয়ও আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত, এবং আজিও কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ তীর্থের ন্যায় তাঁহার সমাধিস্থান দর্শনে গিয়া থাকে।

এইদিন আমরা কথাবার্তার মধ্যে কোন সুযোগে স্বামীজীকে জেরা করিয়া বসিলাম—ঈশাহিধর্ম তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিনা। এইরূপ সমস্যা যে কেহ সাহস করিয়া উত্থাপন করিতে পারিয়াছে, ইহা শুনিয়া তিনি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না; এবং আমাদিগকে খুব গৌরবের সহিত বলিলেন যে, তাঁহার পুরাতন শিক্ষক স্কটল্যাণ্ডবাসী হেষ্টিসাহেবের সহিত মেলামেশাতেই ঈশাহি প্রচারকগণের সহিত তাঁহার একমাত্র সংস্পর্শলাভ ঘটিয়াছিল। এই উষ্ণমস্তিষ্ক বৃদ্ধ অতি সামান্য ব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন এবং নিজ গৃহকে তাঁহার ছাত্রগণেরই গৃহ বলিয়া মনে করিতেন। তিনিই প্রথমে স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইতে বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভারত-প্রবাসের শেষভাগে বলিতেন, 'হাঁ বাবা, তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে! তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে! সত্যই সব ঈশ্বর!' স্বামীজী সানন্দে বলিলেন, 'আমি তাঁহার সম্পর্কে গৌরবান্বিত, তিনি যে আমাকে তেমন ঈশাহিভাবাপন্ন করিয়াছিলেন, এ-কথা তোমরা বলিতে পার কি? আমার তো মনে হয় না।'

লঘুতর প্রসঙ্গেও আমরা চমৎকার চমৎকার গল্প শুনিতাম। তাহার একটি: আমেরিকায় এক নগরে স্বামীজী এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে বাস করিতেন। সেখানে তাঁহাকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে হইত, এবং রন্ধনকালে এক অভিনেত্রী এবং এক দম্পতির সহিত তাঁহার প্রায়ই দেখা হইত। অভিনেত্রী প্রত্যহ একটি করিয়া পেরু কাবাব করিয়া খাইত এবং সেই দম্পতি লোকের ভূত নামাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। স্বামীজী ঐ লোকটিকে তাঁহার লোক-ঠকানো ব্যবসা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ভর্ৎসনা-সহকারে বলিতেন, 'তোমার এরূপ করা কখনও উচিত নহে।' অমনি স্ত্রীটি পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া সাগ্রহে বলিত, 'হাঁ, মহাশয়! আমিও তো উহাকে ঠিক ঐ কথাই

বলিয়া থাকি ; কারণ উনিই যত ভূত সাজিয়া মরেন, আর টাকাকড়ি যা কিছু তা মিসেস উইলিয়াম্‌স্‌ই লইয়া যায়।'

এক ইঞ্জিনিয়র যুবকের গল্পও বলিয়াছিলেন। লোকটি লেখাপড়া জানিত। একদিন ভুতুড়ে কাণ্ডের অভিনয়কালে স্থূলকায়া মিসেস উইলিয়াম্‌স্‌ পর্দার আড়াল হইতে তাহার ক্ষীণকায়া জননীরূপে আবির্ভূতা হইলে সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'মা, মা, তুমি প্রেতরাজ্যে গিয়া কি মোটাই হইয়াছ!' স্বামীজী বলিলেন, 'এই দৃশ্য দেখিয়া আমি মর্মাহত হইলাম ; কারণ আমার মনে হইল যে, লোকটার মাথা একেবারে বিগড়াইয়াছে!' কিন্তু স্বামীজী হটিবার পাত্র নহেন। তিনি সেই ইঞ্জিনিয়র যুবককে এক রুশদেশীয় চিত্রকরের গল্প বলিলেন। চিত্রকর এক কৃষকের মৃত পিতার আলেখ্য অঙ্কিত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং আকৃতির পরিচয়স্বরূপে এইমাত্র শুনিয়াছিলেন, 'তোমায় তো বাপু—কতবার বলিলাম, তাঁর নাকের উপর একটি আঁচিল ছিল!' অবশেষে চিত্রকর এক সাধারণ কৃষকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাহার নাসিকাদেশে এক বৃহৎ আঁচিল বসাইয়া দিয়া সংবাদ দিলেন, 'ছবি প্রস্তুত' এবং কৃষকপুত্রকে উহা দেখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সে আসিয়া কিছুক্ষণ চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর শোকবিহ্বল চিত্তে বলিয়া উঠিল, 'বাবা! বাবা! তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর তুমি কত বদলে গেছ!' এই ঘটনার পরে ইঞ্জিনিয়র যুবক আর স্বামীজীর সঙ্গে বাক্যালাপ করিত না।

যাহা হউক, এই প্রকার সাধারণভাবে চিত্তাকর্ষক নানা বিষয় থাকা সত্ত্বেও স্বামীজীর মনের ভিতর এই সময় একটা সংগ্রাম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনে নির্যাতনের কথা আশ্চর্যভাবে তিনি অনেকবার বলিয়াছিলেন ; এবং তাঁহার বিশ্রাম ও শান্তির যে একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল—এ বিষয়ে তিনি দুই একটি কথা বলিয়াছিলেন বটে, অতি অল্প হইলেও তাহাই যথেষ্ট। তিনি কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'নির্জন-বাসের জন্য আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, আমি একাকী বনাঞ্চলে যাইয়া শান্তিলাভ করিব।'

তারপর ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া, তিনি মাথার উপর তরুণচন্দ্রের দীপ্তি দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'মুসলমানগণ শুক্লপক্ষীয় শশিকলাকে শ্রদ্ধার চক্ষে

দেখিয়া থাকেন। আইস, আমরাও নবীন শশিকলার সহিত নবজীবন আরম্ভ করি!'—এই বলিয়া তিনি তাঁহার মানস-কন্যাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

২৫শে মে। তিনি যেদিন যাত্রা করিলেন, সেদিন বুধবার। শনিবারে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্বেও তিনি প্রতিদিন দশঘণ্টা করিয়া অরণ্যানীর নির্জনতার মধ্যে বাস করিতেন বটে, কিন্তু রাত্রিকালে নিজ তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলে চারিদিক হইতে এত লোক সঙ্গলাভের জন্য সাগ্রহে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিত যে, তাঁহার ভাব ভঙ্গ হইয়া যাইত, এবং সেই জন্যই তিনি এইরূপে পলায়ন করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার মুখমণ্ডলে জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিয়াছেন যে, তিনি এখনও সেই পুরাতন, নগ্নপদে ভ্রমণক্ষম এবং শীতাতপ- ও অল্পাহার-সহিষ্ণু সন্ন্যাসীই আছেন; প্রতীচ্য-বাস তাঁহার ক্ষতি করিতে পারে নাই।

২রা জুন। শুক্রবার প্রাতঃকালে আমরা বসিয়া কাজ কর্ম করিতেছিলাম, এমন সময়ে এক 'তার' আসিল। তারটি একদিন দেরিতে আসিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল—'কল্য রাত্রে উতকামণ্ডে গুডউইনের দেহত্যাগ হইয়াছে।' সে অঞ্চলে যে (typhoid) মহামারীর সূত্রপাত হইতেছিল, আমাদের বন্ধু তাহারই করালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন; তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীজীর কথা কহিয়াছিলেন।

৫ই জুন। রবিবার সন্ধ্যার সময় স্বামীজী স্বীয় আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের ফটক এবং উঠান হইয়াই তাঁহার রাস্তা। তিনি সেই রাস্তা ধরিয়া আসিলেন এবং সেই প্রাঙ্গণে আমরা মুহূর্তেকের জন্য বসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিলাম। তিনি দুঃসংবাদের বিষয় জানিতেন না, কিন্তু ইতিপূর্বেই যেন এক গভীর বিষাদচ্ছায়া তাঁহাকেও আচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং অনতি-বিলম্বেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তিনি আমাদিগকে সেই মহাপুরুষের[১] কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, যিনি গোখুরা সর্প কর্তৃক দষ্ট হইয়া এইমাত্র বলিয়াছিলেন, 'প্রেমময়ের নিকট হইতে দূত আসিয়াছে,' এবং যাঁহাকে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। তিনি বলিলেন, এইমাত্র আমি এক

১ পওহারী বাবা

পত্র পাইলাম, তাহাতে লেখা আছে 'পওহারী বাবা নিজ দেহ দ্বারা তাঁহার যজ্ঞসমূহের পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছেন। হোমাগ্নিতে তিনি স্বীয় দেহ ভস্মীভূত করিয়াছেন।' তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, 'স্বামীজী! এটি কি অত্যন্ত খারাপ কাজ হয় নাই?'

স্বামীজী গভীর আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন, 'তাহা আমি জানি না। তিনি এত বড় মহাপুরুষ ছিলেন যে, আমি তাঁহার কার্যকলাপ বিচার করিবার অধিকারী নহি। তিনি কি করিতেছিলেন, তাহা তিনিই জানিতেন।'

৬ই জুন। পরদিন প্রাতে তিনি খুব সকাল সকাল আসিলেন। দেখিলাম, তিনি এক গভীরভাবে ভাবিত। পরে বলিলেন যে, তিনি রাত্রি চারিটা হইতেই জাগরিত এবং একজন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া গুডউইন-সাহেবের মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে দিয়াছে। আঘাতটি তিনি নীরবে সহিয়া লইলেন, কয়েক দিন পরে তিনি যে-স্থানে প্রথম ইহা পাইয়াছিলেন, সে-স্থানেই আর থাকিতে চাহিলেন না; বলিলেন, তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত শিষ্যের আকৃতি রাতদিন তাঁহার মনে পড়িতেছে, এবং ইহা যে দুর্বলতা, এ-কথাও জ্ঞাপন করিলেন। ইহা যে দোষাবহ, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি বলিলেন যে, কাহারও স্মৃতি দ্বারা এইরূপে পীড়িত হওয়াও যা, আর ক্রমবিকাশের উচ্চতর সোপানে মৎস্য কিংবা কুক্কুরসুলভ লক্ষণগুলি অবিকল বজায় রাখাও তাই, ইহাতে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র নাই। মানুষকে এই ভ্রম জয় করিতে হইবে এবং জানিতে হইবে যে, মৃতব্যক্তিগণ যেমন আগে ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনি এইখানে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতি এবং বিচ্ছেদটাই শুধু কাল্পনিক। আবার পরক্ষণেই কোন ব্যক্তি-বিশেষের (সগুণ ঈশ্বরের) ইচ্ছানুসারে এই জগৎ পরিচালিত হইতেছে, এইরূপ নির্বুদ্ধিতামূলক কল্পনার বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'গুডউইনকে মারিয়া ফেলার জন্য এরূপ এক ঈশ্বরকে যুদ্ধে নিপাত করাটা মানুষের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে নহে কি!—গুডউইন বাঁচিয়া থাকিলে কত বড় বড় কাজ করিতে পারিত!'

স্বামীজীর এই উক্তিটির সহিত, এক বৎসর পরে যে আর একটি উক্তি শুনিয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা যে-

সকল অলীক কল্পনা সহায়ে সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করি, তাহা দেখিয়া ঠিক এইরূপ তীব্র বিস্ময়ের সহিত তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'দেখ, প্রত্যেক ক্ষুদ্র শাসক এবং কর্মচারীর জন্য অবসর ও বিশ্রামের সময় নির্দিষ্ট আছে। আর চিরন্তন শাসক ঈশ্বরই বুঝি শুধু চিরকাল বিচারাসনে বসিয়া থাকিবেন, তাঁহার আর কখনও ছুটি মিলিবে না!'

কিন্তু এই প্রথম কয়েক ঘণ্টা স্বামীজী তাঁহার বিয়োগদুঃখে অটল রহিলেন এবং আমাদের সহিত বসিয়া ধীরভাবে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। সেদিন প্রাতঃকালে তিনি ক্রমাগত ভক্তি যে তপস্যায় পরিণত হয় সেই কথা বলিতে লাগিলেন, কিরূপে প্রগাঢ় ভগবৎ-প্রেমের খরতর প্রবাহ মানুষকে ব্যক্তিত্বের সীমা ছাড়াইয়া বহুদূর ভাসাইয়া লইয়া গেলেও আবার তাহাকে এমন একস্থানে ছাড়িয়া দিয়া যায়, যেখানে সে ব্যক্তিত্বের মধুর বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ছটফট করে।

সেদিন সকালের ত্যাগসম্বন্ধীয় উপদেশসমূহ শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজনের নিকট অতি কঠিন বলিয়া বোধ হইল; পুনরায় তিনি আসিলে উক্ত মহিলা তাঁহাকে বলিলেন, 'আমার ধারণা—অনাসক্ত হইয়া ভালবাসায় কোনরূপ দুঃখোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, এবং ইহা স্বয়ংই সাধ্যস্বরূপ।'

হঠাৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া স্বামীজী তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এই যে ত্যাগ-রহিত ভক্তির কথা বলিতেছ, এটা কি? ইহা অত্যন্ত হানিকর!' সত্যই যদি অনাসক্ত হইতে হয়, তবে কিরূপ কঠোর আত্মসংযমের অভ্যাস আবশ্যক, কিরূপে স্বার্থপর উদ্দেশ্যগুলির আবরণ উন্মোচন করা চাই এবং অতি কুসুম-কোমল হৃদয়েরও যে, যে-কোন মুহূর্তে সংসারের পাপ-কালিমায় কলুষিত হইবার আশঙ্কা বর্তমান, এই সম্বন্ধে তিনি সেইখানে এক ঘণ্টা বা ততোধিক কাল দাঁড়াইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি সেই ভারতবর্ষীয়া সন্ন্যাসিনীর কথা উল্লেখ করিলেন, যিনি মানুষ কখন ধর্মপথে আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ জ্ঞান করিতে পারে, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর-স্বরূপ 'এক খুরি ছাই' প্রেরণ করিয়াছিলেন। রিপুগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুদীর্ঘ ও ভয়ঙ্কর, এবং যে-কোন মুহূর্তেই বিজেতার বিজিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।

বহু সপ্তাহ পরে কাশ্মীরে যখন তিনি পুনরায় (ত্যাগ সংযম দীনতার) কথা কহিতেছিলেন, সেই সময় আমাদের মধ্যে একজন সাহস করিয়া তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তিনি এইরূপে যে-ভাবের উদ্রেক করিয়া দিতেছেন, উহা ইওরোপ যে দুঃখ-উপাসনাকে রোগীর লক্ষণ বলিয়া অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে, তাহাই কিনা?

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বামীজী উত্তর করিলেন, 'আর সুখের পূজাটাই বুঝি ভারি উঁচুদরের জিনিস?' তারপর একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, 'কিন্তু আসল কথা এই যে, আমরা দুঃখেরও পূজা করি না, সুখেরও পূজা করি না। এই উভয়ের মধ্য দিয়া যাহা সুখদুঃখের অতীত, তাহাই লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য।'

৯ই জুন। এই বৃহস্পতিবার প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কথাবার্তা হইল। জন্মগত হিন্দুশিক্ষাদীক্ষার জন্য স্বামীজীর মনের এক বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি হয়তো একদিন কোন একটি ভাবে ভাবিত হইয়া সেই ভাবের গুণব্যাখ্যা করিলেন, আবার পর দিনই হয়তো উহাকে কঠোরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। এইরূপ চিন্তা-প্রণালীর প্রথম আভাস তিনি বাল্যকালে তাঁহার আচার্যদেবের নিকট পাইয়াছিলেন। কোন এক ধর্মভাবের ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা-বিষয়ে সন্দিহান হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'কি! তাহা হইলে তুমি কি মনে কর না যে, যাহারা এরূপ সব ভাবের ধারণা করিতে পারিত, তাহারাই সেই সব ভাবের মূর্তিমান বিগ্রহ ছিল?'

যেমন খ্রীষ্টের অস্তিত্ব-বিষয়ে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেও তিনি কখন কখন তাঁহার স্বভাবসুলভ সাধারণ সন্দেহের ভাবে কথাবার্তা বলিতেন: 'ধর্মাচার্যগণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও মহম্মদই সৌভাগ্যক্রমে 'শত্রু-মিত্র' দুই-ই পাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের জীবনের ঐতিহাসিক অংশে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। আর শ্রীকৃষ্ণ, তিনি তো সকলের চেয়ে বেশী অস্পষ্ট। কবি, রাখাল, শক্তিশালী শাসক, যোদ্ধা এবং ঋষি—হয়তো এই সব ভাবগুলি একত্র করিয়া গীতাহস্তে এক সুন্দরমূর্তিতে পরিণত করা হইয়াছিল।'

আজ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের মধ্যে আদর্শস্থানীয় বলিয়া বর্ণিত হইলেন, পরবর্তী অপূর্ব চিত্রে ভগবান সারথিবেশে অশ্বগুলিকে সংযত করিয়া রণক্ষেত্রের চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং নিমেষে ব্যূহসংস্থান লক্ষ্য

করিয়া লইয়া শিষ্যস্থানীয় রাজপুত্রকে গীতার গভীর আধ্যাত্মিক সত্যগুলি শুনাইতে আরম্ভ করিলেন।

স্বামীজী একটা কথা বারংবার বলিতেন যে, ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণবগণ কল্পনামূলক গীতিকাব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এই কয় দিবস যাবৎ স্বামীজী কোথাও গিয়া একাকী বাস করিবার জন্য ছটফট করিতেছিলেন। যে-স্থানে তিনি গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছেন, সেই স্থান তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এবং পত্র আদান-প্রদানে সেই ক্ষত ক্রমাগত নূতন হইয়া উঠিতেছিল। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বাহির হইতে কেবল ভক্তিময় বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভিতরে তিনি পূর্ণ জ্ঞানময় ছিলেন; কিন্তু তিনি (স্বামীজী) নিজে বাহ্যতঃ কেবল জ্ঞানময় বলিয়া মনে হইলেও ভিতরে ভক্তিতে পূর্ণ, এবং সেইজন্য মাঝে মাঝে তাঁহাতে নারীজনসুলভ দুর্বলতা ও কোমলতার ভাব দেখা যাইত।

একদিন তিনি কোন একজনের লেখার কয়েকটি ত্রুটিপূর্ণ পঙ্‌ক্তি লইয়া গেলেন এবং উহাকে একটি ক্ষুদ্র কবিতারূপে[১] ফিরাইয়া আনিলেন। সেটি স্বামিহীনা গুডউইন-জননীকে তাঁহার পুত্রের স্মরণে স্বামীজী-প্রদত্ত চিহ্নস্বরূপে প্রেরিত হইল।

সংশোধনের পর আসল কবিতাটির কিছুই রহিল না বলিয়া এবং যাঁহার লেখা সংশোধিত হইল, তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, তিনি আগ্রহ-সহকারে অনেকক্ষণ ধরিয়া 'কেবল ছন্দ ও মাত্রা মিলাইয়া কথা গাঁথা অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণভাবে অনুভব করা কত বড় জিনিস'—তাহাই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

১০ই জুন। আলমোড়া-বাসের শেষদিন অপরাহ্নে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রাণঘাতিনী পীড়ার গল্প শুনিলাম। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আহূত হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া রোগটিকে রোহিণী নামক ব্যাধি (Cancer) বলিয়া নির্দেশ করেন এবং ফিরিবার পূর্বে শিষ্যগণকে বহুবার

১ দ্রষ্টব্য—বীরবাণী বা Complete Works: Requiescat in Pace কবিতা; এই গ্রন্থাবলীর ৭ম খণ্ডে উহার অনুবাদ 'শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম'।

বুঝাইয়া দেন—ইহা সংক্রামক রোগ। অর্ধ ঘণ্টা পরে 'নরেন্দ্র' (তখন তাঁহার ঐ নাম ছিল) আসিয়া দেখিলেন, শিষ্যেরা একত্র হইয়া ঐ-বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। ডাক্তার কি বলিয়া গিয়াছেন নিবিষ্টচিত্তে শুনিয়া তারপর মেঝের দিকে তাকাইয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ের গোড়ায় ভুক্তাবশিষ্ট পায়সের বাটিটি দেখিতে পাইলেন। গলদেশের খাদ্যবাহী নলীটির সংকোচন বশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ উক্ত পায়স গলাধঃকরণ করিবার জন্য অনেকবার ব্যর্থচেষ্টা করিয়াছিলেন, সুতরাং উহা তাঁহার মুখ হইতে বার বার বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, এবং ঐ দুঃসাধ্য রোগের বীজাণুপূর্ণ শ্লেষ্মা ও পুঁজ নিশ্চয়ই তাহার সহিত ছিল। 'নরেন্দ্র' বাটিটি উঠাইয়া লইয়া সর্বসমক্ষে উহা নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। ক্যান্সারের সংক্রামকতার কথা আর কখনও শিষ্যগণের মধ্যে উত্থাপিত হয় নাই।

৪

কাঠগুদামের পথে

১১ই জুন। শনিবার প্রাতে আমরা আলমোড়া ত্যাগ করিলাম। কাঠগুদাম পৌঁছিতে আমাদের আড়াই দিন লাগিয়াছিল।

রাস্তার এক স্থানে এক অদ্ভুত রকমের পুরানো পানচাকীর এবং শূন্য কামারশালের কাছে আসিয়া স্বামীজী ধীরামাতাকে বলিলেন, 'লোকে বলে, এই পার্বত্য অঞ্চলে একজাতীয় গন্ধর্বসদৃশ অশরীরী জীবের বাস। আমি একটি সত্য ঘটনা জানি, তাহাতে এক ব্যক্তি এইখানে প্রথমে ঐ সকল মূর্তির দর্শন পান এবং তাহার বহু পরে এই জনশ্রুতির বিষয় অবগত হন।'

এখন গোলাপের মরসুম উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অপর এক প্রকার ফুল (কামিনী ফুল) ফুটিয়া রহিয়াছে, স্পর্শমাত্রেই উহা ঝরিয়া পড়ে। ভারতীয় কাব্যজগতের সহিত ইহার স্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত বলিয়া স্বামীজী উহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন।

১৩ই জুন। রবিবার অপরাহ্ণে আমরা সমতল ভূমির সন্নিকটে একটি হ্রদ ও জলপ্রপাতের উপরিভাগে একস্থানে বিশ্রাম করিলাম। সেইখানে স্বামীজী আমাদের জন্য রুদ্র-স্তুতিটির অনুবাদ করিলেন :

'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

আবিরাবির্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

—আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও, আমাদিগকে তম হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, আমাদিগকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও, আমাদিগের নিকট আবির্ভূত হও, আবির্ভূত হও, আমাদিগের নিকট আগমন কর। হে রুদ্র, তোমার যে করুণাপূর্ণ দক্ষিণমুখ, তদ্দ্বারা আমাদিগকে নিত্য রক্ষা কর।

'আবিরাবির্ম এধি'—এই অংশের অনুবাদে তিনি অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, ইহার অনুবাদ এইরূপ দিবেন কি না: 'আমাদের অন্তস্তলে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হও।' কিন্তু অবশেষে তিনি আমাদের নিকট তাঁহার চিন্তার কারণ ব্যক্ত করিয়া সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, 'ইহার আসল মানে এই, আমাদেরই ভিতর দিয়া আমাদের নিকট আইস।' ইহার আরও আক্ষরিক অনুবাদ এইরূপ হইবে, 'হে রুদ্র, তুমি কেবল তোমার নিজের নিকটেই প্রকাশিত আছ, তুমি আমাদের নিকটেও আত্মপ্রকাশ কর।' এক্ষণে তাঁহার অনুবাদটিকে সমাধি-কালীন অনুভূতিরই এক ক্ষিপ্র ও সাক্ষাৎ প্রতিরূপ মাত্র বলিয়া মনে করি। উহা যেন সংস্কৃতের মধ্য হইতে সজীব হৃদয়টিকে পৃথক্ করিয়া লইয়া তাহাকেই পুনরায় ইংরেজী ভাষার আবরণে প্রকাশ করিতেছে।

বাস্তবিক সে অপরাহ্ণটি যেন অনুবাদের শুভলগ্ন বলিয়া মনে হইল, এবং তিনি হিন্দুদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত অতি সুন্দর মন্ত্রগুলির অন্যতম মন্ত্রটির[১] কিছু কিছু আমাদের নিকটে অনুবাদ করিয়া দিলেন :

১ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তমুতোষসি মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।

[ইংরাজী অনুবাদের বাঙ্গালা না দিয়া একটা স্বতন্ত্র অনুবাদ দেওয়া হইল।—অনুবাদক]

আমি পরব্রহ্মকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ; বায়ুসকল আমার অনুকূল হউক, নদীসকল অনুকূল হউক, ওষধিসকল অনুকূল হউক, রাত্রি ও উষা আমাদের অনুকূল হউক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের অনুকূল হউক, দ্যৌরূপী পিতা আমাদের অনুকূল হউন, বনস্পতিসকল আমাদের অনুকূল হউক, সূর্য আমাদের অনুকূল হউন, গোসকলও আমাদের অনুকূল হউক। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

পরে স্বামীজী খেতড়ির নর্তকীর নিকট সুরদাসের যে গানটি শুনিয়াছিলেন, সেটি আমাদের নিকট পুনরায় গাহিলেন :

প্রভু মেরা অবগুণ চিত ন ধরো,
সমদরশী হৈ নাম তুম্‌হারো, ইত্যাদি—[১]।

সেই দিন কি আর এক দিন, তিনি আমাদের নিকট কাশীর সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা বলিলেন, যিনি তাঁহাকে একপাল বানর কর্তৃক উত্ত্যক্ত দেখিয়া, এবং তিনি পশ্চাৎপদ হইয়া ফিরিয়া পলাইতে পারেন, এই আশঙ্কা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, 'সর্বদা জানোয়ারগুলার সম্মুখীন হইও।'

বড় আনন্দেই আমরা উক্ত কয়দিন পথ চলিয়াছিলাম। প্রতিদিনই চটিতে পৌছিয়া দুঃখ বোধ হইত। এই সময়ে রেলযোগে 'তরাই' নামক সেই ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত ভূখণ্ড অতিক্রম করিতে আমাদের একটি সারা বিকাল লাগিয়াছিল, এবং স্বামীজী আমাদের স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ইহাই বুদ্ধের জন্মভূমি।

[১] সম্পূর্ণ গানটি এই খণ্ডের ২৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৫

স্থান—বেরিলী হইতে বারামুল্লা
কাল—১৪ই হইতে ২০শে জুন

১৪ই জুন। পরদিন আমরা পঞ্জাব প্রবেশ করিলাম ; এই ঘটনায় স্বামীজী অতিশয় উল্লসিত হইলেন। এই প্রদেশের প্রতি তাঁহার এত প্রীতি ছিল যে, উহা ঠিক যেন তাঁহার জন্মভূমি বলিয়া বোধ হইত। স্বামীজী বলিলেন, 'এখানে মেয়েরা চরকা কাটিতে কাটিতে তাহার 'সোঽহং সোঽহং' ধ্বনি শুনিয়া থাকে।' বলিতে বলিতে সহসা বিষয়ান্তর আলোচনায় তিনি সুদূর অতীতে চলিয়া গেলেন এবং আমাদের সমক্ষে যবনগণের সিন্ধুনদ-তীরে অভিযান, চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব এবং বৌদ্ধসাম্রাজ্যের বিস্তার, এই সকল মহান্ ঐতিহাসিক দৃশ্যাবলী একে একে উদ্ঘাটন করিতে লাগিলেন। এই গ্রীষ্মে তিনি যেমন করিয়া হউক আটক পর্যন্ত গিয়া, যেখানে বিজয়ী সেকেন্দর প্রতিহত হইয়াছিলেন, সেই স্থানটি স্বচক্ষে দর্শন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি আমাদের নিকট গান্ধার-ভাস্কর্যের বর্ণনা করিলেন (তিনি নিশ্চয়ই সেগুলিকে পূর্ব বৎসর লাহোরের যাদুঘরে দেখিয়া থাকিবেন) এবং 'কলাবিদ্যা-সম্বন্ধে ভারতবর্ষ চিরকাল যবনগণের শিষ্যত্ব করিয়াছে'—ইওরোপীয়গণের এই অর্থহীন অন্যায় দাবি নিরাকরণ করিতে করিতে তিনি যারপরনাই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। গোধূলির আলোকে এই সকল পার্বত্য ভূখণ্ডের কোন একটি অতিক্রমকালে স্বামীজী আমাদিগকে তাঁহার সেই বহুদিন পূর্বের অপূর্ব দর্শনের কথা বলিলেন। তিনি তখন সবেমাত্র সন্ন্যাস-জীবনে পদার্পণ করিয়াছেন এবং পরে তাঁহার বরাবর এই বিশ্বাস ছিল যে, সংস্কৃতে মন্ত্র আবৃত্তি করিবার প্রাচীন রীতি তিনি এই ঘটনা হইতেই পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, 'সন্ধ্যা হইয়াছে ; আর্যগণ সবেমাত্র সিন্ধুনদ-তীরে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহা সেই যুগের সন্ধ্যা। দেখিলাম, বিশাল নদের তীরে বসিয়া এক বৃদ্ধ। অন্ধকার-তরঙ্গের পর অন্ধকার-তরঙ্গ আসিয়া তাঁহার উপর পড়িতেছে, আর তিনি ঋগ্বেদ হইতে আবৃত্তি করিতেছেন। তার পর আমি সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম এবং আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলাম। বহু প্রাচীনকালে আমরা যে সুর ব্যবহার করিতাম, ইহা সেই সুর।'

এই আলোচনা-প্রসঙ্গে আর একদিন তিনি বলিতেছিলেন, 'শঙ্করাচার্য বেদের ধ্বনিটিকে ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন, উহাই আমাদের জাতীয় তান। বলিতে কি, আমার চিরন্তন ধারণা—' বলিতে বলিতে হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন আবেগময় হইয়া আসিল এবং দৃষ্টি যেন সুদূরে নিবদ্ধ হইল—'আমার চিরন্তন ধারণা এই যে, তাঁহারও শৈশবে আমার মতো কোন এক অলৌকিক দর্শনলাভ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল, এবং তিনি ঐরূপে সেই প্রাচীন তানকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহা সত্য হউক বা না হউক, বেদ ও উপনিষৎসমূহের সৌন্দর্যকে স্পন্দিত করাই তাঁহার সমগ্র জীবনের কাজ।'

রাওলপিণ্ডি হইতে মরী পর্যন্ত আমরা টঙ্গায় গেলাম এবং কাশ্মীরযাত্রার পূর্বে তথায় কয়েক দিন অতিবাহিত করিলাম। এইখানে স্বামীজী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি তিনি প্রাচীনপন্থিগণের মধ্যে—কোন ইওরোপীয়কে শিষ্যরূপে বা স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণ করাইতে কোন চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহা বাঙলা দেশে করাই ভাল। পঞ্জাবে বিদেশীয়দিগের প্রতি অবিশ্বাস এত প্রবল যে, সেখানে এরূপ কোন কার্যের সফলতার সম্ভাবনা নাই। মধ্যে মধ্যে এই সমস্যাটি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিত; এবং তিনি কখন কখন বলিতেন যে, বাঙালীরা রাজনীতি-বিষয়ে ইংরেজের বিরোধী, অথচ উভয়ের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও বিশ্বাসের একটা প্রবণতা রহিয়াছে; ইহা আপাতবিরুদ্ধ হইলেও সত্য।

অপরাহ্ণের অনেকটা সময় আমরা ঝড়ের জন্য ঘরের মধ্যে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ডুলাইএ আমাদের হিন্দুধর্ম-বিষয়ক জ্ঞানলাভের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া গেল। কারণ, স্বামীজী গম্ভীর ও বিশদভাবে এই ধর্মের আধুনিক অধোগতির কথা আমাদিগকে বলিলেন, এবং উহাতে যে-সকল কুরীতি বামাচার নামে প্রচলিত রহিয়াছে, সেগুলির প্রতি স্বীয় আপোষহীন বিরোধিতার কথাও উল্লেখ করিলেন।

যিনি কাহাকেও নিরাশ করা সহ্য করিতে পারিতেন না, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ এই সব কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'ঠাকুর বলিতেন—হাঁ, তা বটে, কিন্তু প্রত্যেক বাড়িরই একটা পায়খানার দুয়ারও তো আছে!' এই বলিয়া স্বামীজী দেখাইয়া দিলেন যে, সকল দেশেই যে-

সকল সম্প্রদায়ে কদাচারের ভিতর দিয়া ধর্মলাভের চেষ্টা করা হয়, তাহারা এই শ্রেণীভুক্ত।

আমরা স্বামীজীর সহিত পালা করিয়া টঙ্গায় যাইবার ব্যবস্থা করিলাম, এবং এই পরবর্তী দিনটি যেন অতীত স্মৃতির আলোচনাতেই পূর্ণ ছিল।

তিনি ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে—'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সত্তার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, এবং প্রেমই যে পাপের একমাত্র ঔষধ, তাহাও বলিলেন। তাঁহার স্কুলের একজন সহপাঠী বড় হইয়া ধনশালী হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গেল। রোগটির ঠিক পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল না; উহার ফলে দিন দিন তাঁহার সামর্থ্য এবং জীবনীশক্তির ক্ষয় হইতেছিল, এবং চিকিৎসকগণের নৈপুণ্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিল। অবশেষে 'স্বামীজী চিরকাল ধর্মভাবাপন্ন' ইহা জানা থাকায় এবং অন্য সব উপায় বিফল হইলে মানুষ ধর্মের আশ্রয় লয় বলিয়া তিনি স্বামীজীকে একবার আসিতে অনুরোধ করিয়া লোক পাঠাইলেন। আচার্যদেব তথায় পৌঁছিলে একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটিল।

'যিনি ব্রহ্মকে আপনা হইতে অন্যত্র জানেন, ব্রহ্ম তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন; যিনি ক্ষত্রিয়কে আপনা হইতে অন্যত্র জানেন, ক্ষত্রিয় তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন; এবং যিনি লোকসকলকে আপনা হইতে অন্যত্র ভাবেন, লোকসকল তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন।'—এই শ্রুতিবাক্য[১] তাঁহার মনে পড়িল এবং রোগীও ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। পরে স্বামীজী বলিলেন, 'সুতরাং যদিও আমি অনেক সময় তোমাদের মনের মতো কথা বলি না, বা রাগিয়া কথা বলি, তথাপি মনে রাখিও যে, প্রেম ভিন্ন অন্য কিছু প্রচার করা আদৌ আমার অন্তরের ভাব নহে। আমরা যে পরস্পরকে ভালবাসি, এইটুকু হৃদয়ঙ্গম হইলেই এই সব গণ্ডগোল মিটিয়া যাইবে!'

সম্ভবতঃ সেই দিনই (অথবা পূর্বদিনও হইতে পারে) তিনি 'মহাদেব'-প্রসঙ্গে আমাদের নিকট বলিলেন যে, শৈশবে তাঁহার জননী পুত্রের দুষ্টামি দেখিয়া হতাশ হইয়া বলিতেন, 'এত জপ, এত উপবাসের ফলে শিব কিনা একটি পুণ্যাত্মার পরিবর্তে তোকে—ভূতকে পাঠাইলেন!' অবশেষে তিনি যে সত্য..

১ 'ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ।'—বৃহদারণ্যক, ৪।৫।৭

সত্যই শিবের একটি ভূত, এই ধারণা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। তাঁহার মনে হইল, যেন কোন সাজার নিমিত্ত তিনি কিছুদিনের জন্য শিবলোক হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন, আর তাঁহার জীবনের একমাত্র চেষ্টা হইবে—সেখানে ফিরিয়া যাওয়া।

তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রথম আচার-মর্যাদালঙ্ঘন পাঁচ বৎসর বয়সে হইয়াছিল। সেই সময় তিনি খাইতে খাইতে ডান হাত এঁটো-মাখা থাকিলে বাঁ হাতে জলের গেলাস তুলিয়া লওয়া কেন অধিক পরিচ্ছন্নতার কাজ হইবে না, এই মর্মে তাঁহার মাতার সহিত এক তুমুল তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই দুষ্টামি অথবা এই জাতীয় অন্য সব দুষ্টামির জন্য জননীর অমোঘ ঔষধ ছিল—বালককে জলের কলের নীচে বসাইয়া দেওয়া, এবং তাঁহার মস্তকে শীতল জলধারা পড়িতে থাকিলে 'শিব! শিব!' উচ্চারণ করা। স্বামীজী বলিলেন যে, এই উপায়টি কখনও বিফল হইত না। মাতার জপ তাঁহাকে তাঁহার নির্বাসনের কথা মনে পড়াইয়া দিত, এবং তিনি মনে মনে 'না, না, এবার আর নয়!' এই বলিয়া আবার শান্ত এবং বাধ্য হইতেন।

মহাদেবের প্রতি তাঁহার অপরিসীম ভালবাসা ছিল, এবং একদা তিনি ভারতের ভাবী স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, যদি তাহারা তাহাদের নূতন নূতন কর্তব্যের মধ্যে মনে করিয়া মধ্যে মধ্যে শুধু 'শিব! শিব!' বলে, তাহা হইলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট পূজা করা হইবে। তাঁহার নিকট হিমালয়ের বাতাস পর্যন্ত সেই অনাদি অনন্ত ধ্যানের বিষয়ীভূত মূর্তি দ্বারা ওতপ্রোত, যে ধ্যান সুখচিন্তার দ্বারা ভগ্ন হইবার নহে; এবং তিনি বলিলেন যে, এই গ্রীষ্ম ঋতুতেই তিনি প্রথম সেই প্রাকৃতিক কাহিনীর অর্থ বুঝিলেন, যাহাতে মহাদেবের মস্তকে এবং সমতল প্রদেশে অবতরণের পূর্বে, শিবের জটার মধ্যে সুরধুনীর ইতস্ততঃ সঞ্চরণ কল্পিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে, তিনি বহুদিন ধরিয়া পর্বতমধ্যবাহিনী নদী ও জলপ্রপাতসকল কি কথা বলে, ইহা জানিবার জন্য অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে জানিয়াছিলেন যে, ইহা সেই অনাদি অনন্ত 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনি! তিনি একদিন শিবের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'হ্যাঁ, তিনিই মহেশ্বর, শান্ত, সুন্দর এবং মৌন! আর আমি তাঁহার পরম ভক্ত।'

আর এক সময় তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল—বিবাহ কিরূপে ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধেরই আদর্শস্বরূপ। তিনি উৎসাহভরে বলিলেন, 'এই জন্যই, যদিও মাতার স্নেহ কতকাংশে এতদপেক্ষা মহত্তর, তথাপি পৃথিবীসুদ্ধ লোক স্বামী-স্ত্রীর প্রেমকেই আদর্শ বলিয়া ধরিয়া থাকে। অপর কোন প্রেমেই এরূপ মনের মতন করিয়া গড়িয়া লইবার অপূর্ব শক্তি নাই। প্রেমাস্পদকে যেমনটি কল্পনা করা যায়, সত্য সত্যই সে ঠিক তেমনটিই হইয়া উঠে, এই প্রেমে প্রেমাস্পদকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়।'

পরে কথাপ্রসঙ্গে জাতীয় আদর্শের কথা উঠিল, এবং বিদেশপ্রত্যাগত পান্থ কিরূপ আনন্দের সহিত আবার স্বদেশের নরনারীকে স্বাগত জানায়, স্বামীজী তাহার উল্লেখ করিলেন। সারা জীবন ধরিয়া মানুষ অজ্ঞাতসারে এই শিক্ষালাভ করিয়া আসে যে, সে স্বদেশবাসীর মুখে এবং আকৃতিতে ভাবের মৃদুতম আলোড়নটি পর্যন্ত বুঝিতে পারে।

পথে যাইতে যাইতে আমাদের পুনরায় একদল পাদচারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহাদের কৃচ্ছ্রানুরাগ দেখিয়া স্বামীজী কঠোর তপস্যাকে 'বর্বরতা' বলিয়া তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। যাত্রিগণ তাহাদের আদর্শের নামে ধীরে ধীরে ক্রোশের পর ক্রোশ পথ অতিবাহন করিতেছে, এই দৃশ্যে তাঁহার মনে কষ্টকর স্মৃতি-পরম্পরার উদয় হইল, এবং মানব-সাধারণের পক্ষ হইতে তিনি ধর্মের উৎপীড়নে অধীর হইয়া উঠিলেন। পরে আবার ঐ ভাব যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল, তেমনই হঠাৎ চলিয়া গেল এবং তাহার পরিবর্তে এই 'বর্বরতা' না থাকিলে যে বিলাস আসিয়া মানুষের সমুদয় মনুষ্যত্ব অপহরণ করিত, এই ধারণা ঠিক তেমনই দৃঢ়তার সহিত উল্লিখিত হইল।

৬

কাশ্মীর উপত্যকা

স্থান—বিতস্তা নদী (বারামুল্লা হইতে শ্রীনগর)

কাল—২০শে হইতে ২২শে জুন

'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়' পরম উল্লাসে এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজী আমাদের ডাকবাংলার কামরায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং ছাতাটি জানুদ্বয়ের উপর রাখিয়া উপবেশন করিলেন; কোন সঙ্গী না লইয়া আসায় তাঁহাকেই সাধারণ ছোট-খাট কাজগুলি সম্পাদন করিতে হইতেছিল, তিনি ডোঙা ভাড়া করা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু বাহির হইয়াই হঠাৎ একজন লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি স্বামীজীর নাম শ্রবণে কাজের সমস্ত ভার নিজের উপর লইয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং দিনটি আমাদের আনন্দে কাটিয়াছিল। আমরা সামাভারে তৈরী কাশ্মীরী চা পান করিলাম, এবং ঐ দেশের মোরব্বা খাইলাম। পরে প্রায় চারিটার সময় আমরা তিনডোঙ্গা-বিশিষ্ট এক ক্ষুদ্র নৌ-বহর অধিকার করিলাম এবং আর বিলম্ব না করিয়া শ্রীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রথম সন্ধ্যাটিতে আমরা স্বামীজীর জনৈক বন্ধুর বাগানের পাশে নঙ্গর করিয়াছিলাম।

পরদিন আমরা তুষারমণ্ডিত পর্বতরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত এক মনোরম উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। ইহাই 'কাশ্মীর উপত্যকা' নামে পরিচিত; কিন্তু হয়তো 'শ্রীনগর উপত্যকা' বলিলে ইহার ঠিক ঠিক পরিচয় দেওয়া হয়।

সেই প্রথম প্রভাতে ক্ষেত্রের উপর দিয়া লম্বা এক চোট ভ্রমণের পর আমরা এক বিস্তৃত গোচারণ-ভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড চেনার গাছের নিকট উপস্থিত হইলাম। সত্য সত্যই দেখিলাম, যেন এই গাছের কোটরে প্রবাদোক্ত বিশটা গরু স্থান পাইতে পারে! কিরূপে ইহাকে এক সাধু-নিবাসের উপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে, স্বামীজী এই স্থাপত্যবিষয়ক আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। বাস্তবিকই এ সজীব বৃক্ষটির কোটরে একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্মিত হইতে পারিত; পরে তিনি ধ্যানের কথা বলিতে লাগিলেন;

ফলে দাঁড়াইল এই যে, ভবিষ্যতে চেনার গাছ দেখিলেই ঐ কথার স্মৃতি উহাকে পবিত্রতায় মণ্ডিত করিয়া দিবে!

তাঁহার সহিত আমরা নিকটস্থ গোলাবাড়িতে প্রবেশ করিলাম। সেখানে দেখিলাম, তরুতলে বসিয়া এক পরমসুশ্রী বর্ষীয়সী রমণী। তাঁহার মাথায় কাশ্মীরীনারী-সুলভ লাল টুপী এবং শ্বেত অবগুণ্ঠন। তিনি বসিয়া পশম হইতে সুতা কাটিতেছিলেন এবং তাঁহার চারি পাশে তাঁহার দুই পুত্রবধূ এবং তাহাদের ছেলেপিলেরা তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে। স্বামীজী পূর্ব শরৎ ঋতুতে আর একবার এই গোলাবাড়িতে আসিয়াছিলেন, এবং সেই অবধি এই বৃদ্ধাটির স্বধর্মে আস্থা এবং গৌরব-বোধের কথা অনেকবার বলিয়াছিলেন। সে-বার তিনি জল খাইতে চাহিয়াছিলেন, এবং তিনিও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জল দিয়াছিলেন। বিদায় লইবার পূর্বে তিনি তাঁহাকে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'মা, আপনি কোন ধর্মাবলম্বিনী?' সগর্বে জয়ের উল্লাসে উচ্চকণ্ঠে বৃদ্ধা উত্তর দিয়াছিলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! প্রভুর কৃপায় আমি মুসলমানী!' এক্ষণে এই মুসলমান পরিবারের সকলে মিলিয়া স্বামীজীকে পুরাতন বন্ধুরূপে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তিনি যে বন্ধুগণকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিও সর্ববিধ সৌজন্য-প্রকাশে রত হইলেন।

শ্রীনগর পৌঁছিতে দুই তিন দিন লাগিয়াছিল, এবং একদিন সন্ধ্যাকালে আহারের পূর্বে ক্ষেতের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে আমাদের মধ্যে একজন (যিনি কালীঘাট দেখিয়াছিলেন) আচার্যদেবের নিকট অভিযোগ করিলেন যে, কালীঘাটে ভক্তির অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস তাঁহার বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল, এবং বলিয়া উঠিলেন, 'প্রতিমার সম্মুখে লোকে ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হয় কেন?' স্বামীজী একটা তিলের ক্ষেতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছিলেন, 'তিল আর্যগণের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তৈলবাহী বীজ,' কিন্তু এই প্রশ্নে তিনি হস্তস্থিত ক্ষুদ্র নীল ফুলটি ফেলিয়া দিলেন, পরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া প্রশান্ত গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'এই পর্বতমালার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া আর সেই প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া কি একই কথা নয়?'

আচার্যদেব আমাদিগের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, গ্রীষ্মাবসানের পূর্বেই তিনি আমাদিগকে কোন শান্তিপূর্ণ স্থানে লইয়া গিয়া ধ্যান শিক্ষা

দিবেন। স্থির হইল যে, আমরা প্রথমে দেশটি দেখিব—তারপর নির্জনবাস করিব।

শ্রীনগরে প্রথম রজনীতে আমরা কতিপয় বাঙালী রাজকর্মচারীর গৃহে ভোজন করিয়াছিলাম, এবং নানা কথার প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য অভ্যাগতগণের মধ্যে একজন মত প্রকাশ করিলেন, 'প্রত্যেক জাতির ইতিহাস কতকগুলি আদর্শের উদাহরণ এবং বিকাশস্বরূপ; উক্ত জাতির সকল লোকেরই সেই-গুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা উচিত।' আমরা দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিলাম যে, উপস্থিত হিন্দুগণ ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহাদের চক্ষে ইহা তো স্পষ্টই একটি বন্ধন, এবং মানবমন কখনই চিরকাল ইহার অধীন হইয়া থাকিতে পারে না। উক্ত মতের বন্ধনাত্মক অংশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহারা সমগ্র ভাবটির প্রতিই অবিচার করিলেন বলিয়া মনে হইল। অবশেষে স্বামীজী মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, 'তোমরা বোধ হয় স্বীকার করিবে যে, মানবপ্রকৃতির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শ্রেণীভাগের একক (unit) মনস্তাত্ত্বিক; ভৌগোলিক বিভাগ অপেক্ষা ইহা অধিকতর স্থায়ী। প্রণালী হিসাবে এই ভাবগত সাদৃশ্যগ্রহণকে একদেশবর্তিতামূলক সাদৃশ্যগ্রহণ অপেক্ষা চিরস্থায়ী করা যায়।' তারপর তিনি আমাদের সকলেরই পরিচিত দুই জনের কথা উল্লেখ করিলেন; তন্মধ্যে একজনকে—তিনি জীবনে যত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আদর্শস্থানীয় বলিয়া বরাবর মনে করিতেন অথচ তিনি একজন বঙ্গনারী; এবং আর একজনের জন্মভূমি পাশ্চাত্যে কিন্তু স্বামীজী বলিতেন যে, ঐ ব্যক্তি তাঁহার অপেক্ষাও ভাল হিন্দু। সব দিক ভাবিয়া দেখিলে এ অবস্থায় ইহাই কি সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় ছিল না যে, উহাদের একে অপরের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ আদর্শের যথাসম্ভব প্রসার বিধান করে?

৭

স্থান—শ্রীনগর

কাল—২২শে জুন হইতে ১৩ই জুলাই

প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্বামীজী পূর্বের ন্যায় আমাদের নিকট আসিয়া দীর্ঘকাল কথাবার্তা কহিতেন,—কখনও কাশ্মীর যে-সকল বিভিন্ন ধর্মযুগের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে, কখনও বা বৌদ্ধধর্মের নীতি, কখনও বা শিবোপাসনার ইতিহাস, আবার হয়তো বা কণিষ্কের সময়ে শ্রীনগরের অবস্থা—এই সকল বিষয়ের কথোপকথন চলিত।

একদিন তিনি আমাদের মধ্যে একজনের সহিত বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বলিলেন, 'আসল কথা এই যে, বৌদ্ধধর্ম অশোকের সময়ে এমন একটি মহদনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইয়াছিল, যাহার জন্য জগৎ এ যুগেই [সবেমাত্র আজকালই] উপযুক্ত হইয়াছে!'—তিনি সর্বধর্ম-সমন্বয়ের কথা বলিতেছিলেন। কিরূপে অশোকের ধর্মবিষয়ক একছত্রত্ব বার বার ঈশাহি ও মুসলমান ধর্মের তরঙ্গের পর তরঙ্গ দ্বারা চূর্ণ হইয়াছিল, কিরূপে আবার এতদুভয়ের প্রত্যেকেই মানবজাতির ধর্মবুদ্ধির উপর একচেটিয়া অধিকার দাবি করিত, অবশেষে কি উপায়ে এই মহাসমন্বয় স্বল্পকালমধ্যেই সম্ভবপর হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে—এই সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া তিনি এক অপূর্ব চিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিলেন।

আর একবার মধ্য-এসিয়ার দিগ্বিজয়ী বীর জেঙ্গিজ অথবা চেঙ্গিজ খাঁ সম্বন্ধে কথা হইল। তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'লোকে তাঁহাকে একজন নীচ পরপীড়ক বলিয়া উল্লেখ করে, তোমরা শুনিয়া থাকো; কিন্তু তাহা সত্য নহে! এইরূপ মহামনা ব্যক্তিগণ কখনও কেবল ধনলোলুপ বা নীচ হন না! তিনি এক রকম একত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার (সময়ের) জগৎকে তিনি এক করিতে চাহিতেছিলেন। নেপোলিয়নও সেই ছাঁচে গড়া লোক ছিলেন এবং সেকেন্দরও এই শ্রেণীর আর একজন। মাত্র এই তিন জন—অথবা হয়তো একই জীবাত্মা তিনটি পৃথক্ দিগ্বিজয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।' তারপর একমাত্র অবতার-আত্মা ঐশী শক্তি দ্বারা পূর্ণ হইয়া জীবব্রহ্মৈক্য-সংস্থাপনের নিমিত্ত বারংবার ধর্মজগতে

আবির্ভূত হইয়া আসিতেছেন বলিয়া তিনি যে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারই সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে 'প্রবুদ্ধ-ভারত' মাদ্রাজ হইতে মায়াবতীতে নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমে স্থানান্তরিত হওয়ায় আমরা সকলে প্রায়ই ইহার কথা ভাবিতাম।

স্বামীজী এই পত্রখানিকে বিশেষ ভালবাসিতেন। তৎপ্রদত্ত সুন্দর নামটিই তাহার পরিচয়। তাঁহার নিজের কয়েকখানি মুখপত্র থাকে, এজন্য তিনি সদাই উৎসুক ছিলেন। বর্তমান ভারতে শিক্ষাবিস্তারকল্পে মাসিক পত্রের কি মূল্য, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং অনুভব করিয়াছিলেন যে, বক্তৃতা এবং লোকহিতকর কার্যের ন্যায় এই উপায় দ্বারাও তাঁহার গুরুদেবের উপদেশাবলী প্রচার করা আবশ্যক। সুতরাং দিনের পর দিন তিনি যেমন বিভিন্ন কেন্দ্রের লোকহিতকর কাজগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা করিতেন, তাঁহার কাগজগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপই করিতেন। প্রতিদিন তিনি স্বামী স্বরূপানন্দের নব সম্পাদকত্বে আশু-প্রকাশোন্মুখ প্রথম সংখ্যাখানির বিষয়ে কথা পাড়িতেন! একদিন বৈকালে আমরা সকলে বসিয়া আছি, এমন সময়ে তিনি একখণ্ড কাগজ আমাদের নিকট আনিয়া বলিলেন, 'একখানি পত্র লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু উহা কবিতাকারে এরূপ দাঁড়াইল'—To the Awakened ...[1]

২৬শে জুন। আচার্যদেব আমাদের সকলকে ছাড়িয়া একাকী কোন শান্তিপূর্ণ স্থানে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা ইহা না জানিয়া তাঁহার সহিত ক্ষীরভবানী নামক শুভ্র প্রস্রবণগুলি দেখিতে যাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিলাম। শুনিলাম, ইতিপূর্বে কখনও কোন খ্রীষ্টান বা মুসলমান সেখানে পদার্পণ করে নাই, পরে আমরা ইহার দর্শনলাভে যে কতদূর কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত; কারণ ভগবান যেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এই নামটিই আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা পবিত্র হইয়া উঠিবে।

২৯শে জুন। আর একদিন আমরা নিজেরাই বিনা আড়ম্বরে দুই তিন সহস্র ফুট উচ্চ একটি ক্ষুদ্র পর্বতের শিখরদেশে খুব ভারী ভারী উপকরণে

---

১ দ্রষ্টব্য : Complete Works: অনুবাদ 'প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি', এই গ্রন্থাবলীর ৭ম খণ্ডে

গঠিত তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান নামক একক্ষুদ্র মন্দির দর্শন করিলাম। সেখানে শান্তি ও সৌন্দর্য বিরাজিত, নিম্নে বিখ্যাত ভাসমান উদ্যানগুলি চতুষ্পার্শ্বে বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, দেখা গেল। মন্দির ও স্মৃতিসৌধাদির নির্মাণোপযোগী স্থান-নির্বাচনে হিন্দুগণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, এই বিষয়টির অনুকূলে স্বামীজী যে তর্ক করিতেন, তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। লণ্ডনে তিনি যেমন একবার বলিয়াছিলেন যে, চারিদিকের দৃশ্য উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই ঋষিগণ গিরিশীর্ষে বাস করিতেন, তেমনি এখন একটির পর একটি করিয়া ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তসহকারে দেখাইয়া দিলেন যে, ভারতবাসিগণ চিরকাল অতি সুন্দর এবং প্রধান প্রধান স্থানগুলি পূজামন্দির নির্মাণপূর্বক পবিত্রতা-মণ্ডিত করিয়া তুলিতেন।

সেই সময়ের অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতি মনে পড়িতেছে, যথা:

'তুলসী জগমে আইয়ে সঁবসে মিলিয়ে ধায়।
ন জানৈ কেহি ভেকমে নারায়ণ মিলি যায়॥'

—তুলসী জগতে আসিয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাস করে। জানি না কোন্ রূপে নারায়ণ দেখা দেন!

'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥'

—একমাত্র দেবতা সর্বভূতে লুকাইয়া আছেন; তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্মনিয়ামক, সর্বভূতের আধার, সাক্ষী, চৈতন্যবিধায়ক, নিঃসঙ্গ এবং গুণরহিত।

'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং'—সেখানে সূর্য প্রকাশ পান না, চন্দ্র-তারকাও নহে।

কিরূপে একজন রাবণকে রামরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রতারণা করিবার পরামর্শ দিয়াছিল, আমরা সে গল্পও শুনিলাম। রাবণ উত্তর দিয়াছিলেন: আমি কি এ-কথা ভাবি নাই? কিন্তু কোন লোকের রূপ ধারণ করিতে হইলে তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে; আর রাম স্বয়ং ভগবান। সুতরাং যখন আমি তাঁহার ধ্যান করি, তখন ব্রহ্মপদও তুচ্ছ হইয়া যায়—তখন পরস্ত্রীর কথা কিরূপে ভাবিব?—'তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ?'

পরে স্বামীজী মন্তব্যস্বরূপে বলিলেন, 'সুতরাং দেখ, অত্যন্ত সাধারণ বা অপরাধীর জীবনেও এই সব উচ্চ ভাবের আভাস পাওয়া যায়।' পরদোষ-সমালোচনা সম্বন্ধে বরাবর এইরূপই হইত। তিনি চিরকাল মানবজীবনকে ঈশ্বরের প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, এবং কখনও কোন ঘোর দুষ্কার্যের বা দুষ্ট লোকের জঘন্য ও দুর্বৃত্ত ভাবটা লইয়া টানাটানি করিতেন না।

'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥'

—যাহা সর্বলোকের নিকট রাত্রি, সংযমী ব্যক্তি তাহাতে জাগরিত থাকেন; যাহাতে সকল লোক জাগরিত থাকে, তাহা তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট রাত্রি (নিদ্রা)-স্বরূপ।

একদিন টমাস আ কেম্পিসের কথা এবং কিরূপে তিনি নিজে গীতা ও 'ঈশানুসরণ' মাত্র সম্বল করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতেন—তাহা বলিতে বলিতে বলিলেন যে, এই পাশ্চাত্য সন্ন্যাসি-বরের নামের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত একটি কথা তাঁহার মনে পড়িল:

ওহে লোকশিক্ষকগণ, চুপ কর! হে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, তোমরাও থামো! প্রভো, শুধু তুমিই আমার অন্তরের অন্তরে কথা কও।

আবার আবৃত্তি করিতেন:

তপঃ ক্ব বৎসে ক্ব চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ॥[১]

—কঠোর দেহসাধ্য তপস্যাই বা কোথায়, আর তোমার এই সুকোমল দেহই বা কোথায়? সুকুমার শিরীষপুষ্প ভ্রমরেরই চরণপাত সহিতে পারে, কিন্তু পক্ষীর ভার কদাচ সহ্য করিতে পারে না। অতএব উমা, মা আমার, তুমি তপস্যায় যাইও না। আবার গাহিতেন:

এস মা, এস মা, ও হৃদয়রমা পরাণপুতলী গো,
হৃদয়-আসনে হও মা আসীন, নিরখি তোমারে গো।

১ কুমারসম্ভবম্, ৫।৪

আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে
জান গো জননী কি যাতনা সয়ে,
একবার হৃদয়-কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশো তাহে আনন্দময়ী।

প্রায়ই মধ্যে মধ্যে গীতা সম্বন্ধে (সেই বিস্ময়কর কবিতা, যাহাতে দুর্বলতা বা কাপুরুষত্বের এতটুকু চিহ্ন মাত্র নাই!) দীর্ঘ কথোপকথন হইত। একদিন তিনি বলিলেন যে, স্ত্রীলোক এবং শূদ্রের জ্ঞানচর্চায় অধিকার নাই—এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ, সকল উপনিষদের সারভাগ গীতায় নিহিত। বাস্তবিকই গীতা ব্যতীত উপনিষদ্ বুঝা একপ্রকার অসম্ভব; এবং স্ত্রীগণ ও সকল জাতিই মহাভারত-পাঠে[১] অধিকারী ছিল।

৪ঠা জুলাই। অতি উল্লাসের সহিত, গোপনে স্বামীজী এবং তাঁহার এক শিষ্যা (শিষ্যাগণের মধ্যে কেবল তিনিই আমেরিকাবাসী নহেন) ৪ঠা জুলাই তারিখে একটি উৎসব করিবার আয়োজন করিলেন। 'আমাদের আমেরিকার জাতীয় পতাকা নাই, এবং থাকিলে উহা দ্বারা আমাদের দলের অপর যাত্রিগণকে তাঁহাদের জাতীয়-উৎসব উপলক্ষে প্রাতরাশকালে অভিনন্দন করা যাইতে পারিত', এই বলিয়া একজন দুঃখ করিতেছেন—ইহা তিনি শুনিতে পান। ৩রা তারিখ অপরাহ্ণে মহা ব্যস্ততার সহিত তিনি এক কাশ্মীরী পণ্ডিত দরজীকে লইয়া আসিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, যদি এই ব্যক্তিকে পতাকাটি কিরূপ করিতে হইবে বলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে সানন্দে সেইরূপ করিয়া দিবে। ফলে তারকা ও ডোরা দাগগুলি (Stars and Stripes) অত্যন্ত আনাড়ীর মতো একখণ্ড বস্ত্রে আরোপিত হইল এবং উহা চিরশ্যামল গাছের (evergreen) কয়েকটি শাখার সহিত,' ভোজনাগাররূপে ব্যবহৃত নৌকাখানির শিরোভাগে পেরেক দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইল। এমন সময়ে আমেরিকাবাসিগণ স্বাধীনতা-লাভের দিবসে (Independence Day) প্রাতঃকালীন চা পান করিবার জন্য নৌকাখানিতে পদার্পণ করিলেন। স্বামীজী এই ক্ষুদ্র উৎসবটিতে উপস্থিত থাকিবার জন্য আর এক জায়গায় যাওয়া স্থগিত করিয়াছিলেন, এবং তিনি

[১] লক্ষণীয়: গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত।

অন্যান্য অভিভাবণের সহিত নিজে একটি কবিতা[1] উপহার দিলেন। সেগুলি এক্ষণে স্বাগত-স্বরূপে সর্বসমক্ষে পঠিত হইল : To the Fourth of July.

৫ই জুলাই। সেই দিন সন্ধ্যাকালে একজন, পাশ্চাত্যসমাজে প্রচলিত মেয়েলি শাস্ত্র অনুযায়ী পরিহাসচ্ছলে কবে তাঁহার বিবাহ হইবে দেখিবার জন্য নিজ থালায় কয়টি চেরী ফলের বিচি অবশিষ্ট আছে, গণিয়া দেখেন। স্বামীজী ইহাতে দুঃখিত হন। কি জানি কেন, স্বামীজী এই খেলাটিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লন এবং পরদিন প্রাতঃকালে যখন তিনি আসিলেন, তখন দেখিলাম, শ্রেষ্ঠ ত্যাগের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ উথলিয়া পড়িতেছে।

৬ই জুলাই। অপরাধীর সহিত যেন এক চিন্তা-ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার যে সহৃদয় বাসনা তাঁহাতে প্রায়ই পরিলক্ষিত হইত, সেই ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এই সব গার্হস্থ্য এবং বিবাহিত জীবনের ছায়া আমার মনে পর্যন্ত মাঝে মাঝে দেখা দেয়।' কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি, যাহারা গার্হস্থ্য জীবনের জয়গান করে, তাহাদের প্রতি দারুণ অবজ্ঞাভরে ত্যাগাদর্শের উপর জোর দিবার সময় যেন বহু উচ্চে উঠিয়া গেলেন। বলিয়া উঠিলেন, 'জনক হওয়া কি এত সোজা?—সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হইয়া রাজ-সিংহাসনে বসা? ধনের বা যশের অথবা স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কোন খেয়াল না রাখা?—পাশ্চাত্যে আমাকে বহু লোকে বলিয়াছে যে, তাহারা এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কিন্তু আমি এইটুকুমাত্র বলিতে পারিয়াছিলাম—এমন সব মহাপুরুষ তো ভারতবর্ষে জন্মান না।'

এবং তারপরে তিনি অন্য দিকটির কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রোতাদের মধ্যে একজনকে তিনি বলিলেন : এ-কথা মনে মনে বলিতে, এবং তোমার সন্তানদিগকে শিখাইতে কখনও ভুলিও না যে,

'মেরুসর্ষপয়োর্যদ্বৎ সূর্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥'

—মেরু এবং সর্ষপে যে প্রভেদ, সূর্য এবং খদ্যোতে যে প্রভেদ, সমুদ্র এবং ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে প্রভেদ, সন্ন্যাসী এবং গৃহীতেও সেই প্রভেদ।

১ দ্রষ্টব্য : Complete works ; অনুবাদ 'মুক্তি', এই গ্রন্থাবলীর ৭ম খণ্ডে।

'সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।'

—পৃথিবীতে সকল বস্তুই ভয়যুক্ত, মানবের পক্ষে বৈরাগ্যই ভয়রহিত।

ভণ্ড সাধুরাও ধন্য, এবং যাহারা ব্রত উদ্‌যাপন করিতে অক্ষম হইয়াছে, তাহারাও ধন্য; কারণ তাহারাও আদর্শের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছে, এবং এইরূপে কতকাংশে অপরের সফলতার কারণ। আমরা যেন কখনও আমাদের আদর্শ না ভুলি—কোন মতেই না ভুলি।

এই সব মুহূর্তে তিনি প্রতিপাদ্য ভাবটির সহিত সর্বতোভাবে এক হইয়া যাইতেন। এই সব কথাবার্তা যখন হয়, তখন আমরা ডালহ্রদ হইতে শ্রীনগরে ফিরিয়াছি। ডালহ্রদ দর্শনই আমাদের ৪ঠা জুলাই-এর উৎসবের প্রকৃত আনন্দ-অনুষ্ঠান।

পরবর্তী রবিবার, ১০ই জুলাই রাত্রে বিভিন্ন সূত্রে আমরা সংবাদ পাইলাম যে আচার্যদেব সোনমার্গের রাস্তা দিয়া অমরনাথ গিয়াছেন, এবং অপর একটি পথ দিয়া ফিরিবেন। কপর্দকমাত্র না লইয়া তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুশাসিত দেশীয় রাজ্যে এই ব্যাপার তাঁহার বন্ধুবর্গের কোন উদ্বেগের কারণ হয় নাই।

১৫ই জুলাই। শুক্রবার অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় আমরা নদীর অনুকূল স্রোতে কিয়দ্দূর যাইবার জন্য সবেমাত্র নৌকা খুলিয়াছি, এমন সময় ভৃত্যগণ দূরে তাহাদের কয়েকজন বন্ধুকে চিনিতে পারিল, এবং আমাদের সংবাদ দিল যে, স্বামীজীর নৌকা আমাদের অভিমুখে আসিতেছে।

এক ঘণ্টা পরেই তিনি আমাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং বলিলেন, ফিরিয়া আসিয়া তিনি আনন্দ অনুভব করিলেন। এবারকার গ্রীষ্ম ঋতুতে অস্বাভাবিক গরম পড়িয়াছিল, এবং কয়েকটি তুষারবর্ত্ম (glacier) ধসিয়া যাওয়ায় সোনমার্গ হইয়া অমরনাথ যাইবার রাস্তাটি দুর্গম হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনায় তিনি ফিরিয়া আসেন।

কিন্তু আমাদের কাশ্মীরবাসের কয়েক মাসে আমরা স্বামীজীর যে তিনটি মহান দর্শন ও ইহার ফলে বিপুল আনন্দোপলব্ধির পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহার প্রথমটির সূত্রপাত এই সময় হইতেই। যেন আমরা স্বচক্ষে তাঁহার গুরুদেবের সেই উক্তির সত্যতা অনুভব করিতে পারিতেছিলাম:

খানিকটা অজ্ঞান রহিয়াছে বটে। সেটুকু আমার ব্রহ্মময়ী মা-ই উহার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কাজ হইবে বলিয়া। কিন্তু উহা ফিন-ফিনে কাগজের পর্দার মতো, নিমিষের মধ্যেই ছিঁড়িয়া ফেলা যায়।

৮

স্থান—কাশ্মীর (পাণ্ড্রেস্থানের মন্দির)

কাল—১৬ই হইতে ১৯শে জুলাই

১৬ই জুলাই। পর দিবস জনৈকা শিষ্যার স্বামীজীর সহিত একখানি ছোট নৌকা করিয়া নদীবক্ষে গমনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। নৌকা স্রোতের অনুকূলে চলিতেছে, আর তিনিও রামপ্রসাদের গানগুলি একটির পর একটি গাহিয়া চলিয়াছেন, এবং মধ্যে মধ্যে একটু আধটু অনুবাদ করিয়া দিতেছেন:

'ভূতলে আনিয়ে মাগো করলি আমায় লোহা-পেটা,
(আমি) তবু কালী ব'লে ডাকি, মা, সাবাস আমার বুকের পাটা।'

অথবা, 'মন কেন রে ভাবিস এত,
যেন মাতৃহীন বালকের মতো' ইত্যাদি।

তারপর শিশু কুপিত হইলে যেমন গর্ব ও অভিমানভরে বলিয়া থাকে, সেই ভাবের একটি গান গাহিলেন। তাহার শেষভাগটি এই—

'আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব।'

১৭ই জুলাই। খুব সম্ভবতঃ ইহারই পরদিবস তিনি ধীরামাতার নৌকায় আসিয়া ভক্তি-প্রসঙ্গ করিতে থাকেন। প্রথমেই একাধারে হরগৌরীমিলনস্বরূপ সেই অদ্ভুত হিন্দুভাবটি কথিত হইল। তাহার কথাগুলি এখানে দেওয়া সহজ, কিন্তু সেই কণ্ঠস্বরের অভাবে কথাগুলি কিরূপ প্রাণহীন মনে হইতেছে। তাহা ছাড়া তখনকার চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্য কি অপরূপ ছিল!— ছবিখানির মতো শ্রীনগর, লম্বার্ডি দেশসুলভ সমুন্নতশির পপলার গাছগুলি,

এবং দূরে চির-তুষাররাশি! সেই নদীগর্ভ উপত্যকার মহান্ পর্বতরাজির পাদমূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে তিনি আবৃত্তি করিলেন :

কস্তূরিকাচন্দনলেপনায়ৈ, শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ, কপালমালাপরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

* * *

সদা শিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদাঽশিবানাং পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

এবং পরক্ষণেই সেই ভাবেরই আর একরূপ—অপর ভাবে মগ্ন হইয়া তিনি আবৃত্তি করিলেন :

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়;
বইছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়।
প্রেমের কিশোরী—প্রেম বিলাচ্ছেন সাধ করি,
রাধার প্রেমে বল্ রে হরি।
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেমতরঙ্গে প্রাণ মাতায়,
রাধার প্রেমে হরি বলে আয়, আয়, আয়॥

তিনি এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাতরাশ প্রস্তুত হইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত পড়িয়া রহিল, এবং অবশেষে 'যখন এই সব ভক্তির প্রসঙ্গ চলিতেছে, তখন আর খাবারের কি দরকার?' এই বলিয়া তিনি অনিচ্ছা-পূর্বক উঠিয়া গেলেন এবং অতি সত্বরই ফিরিয়া আসিয়া সেই বিষয়ের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু—হয় এই সময়েই, না হয় অপর কোন সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যাহার নিকট হইতে তিনি বড় বড় কার্যের প্রত্যাশা রাখেন, তাহার নিকট তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। কঠোর এবং আগ্রহবান্ কর্মীর জনক শিব, এবং কর্মীর পক্ষে তাঁহারই পদে উৎসর্গীকৃত হওয়া উচিত।

পরদিন তিনি আমাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি চমৎকার উপদেশ শুনাইলেন, তাহাতে অপরের সমালোচককে মৌমাছি বা মাছির সহিত তুলনা

করা হইয়াছে। যাহারা মধু অন্বেষণ করে, তাহারাই মৌমাছি; আর যাহারা বাছিয়া বাছিয়া ঘায়ে বসে, তাহারাই মাছি।

পরে আমরা ইসলামাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ঘটনাচক্রে ইহাই বাস্তবিক অমরনাথ-যাত্রা হইয়া দাঁড়াইল।

১৭শে জুলাই। প্রথম অপরাহ্নটিতে বিতস্তা নদীতীরে এক জঙ্গলের মধ্যে আমরা চির-অন্বেষিত পাণ্ড্রেত্থান মন্দির আবিষ্কার করিলাম। (পাণ্ড্রেত্থন কি পাণ্ড্রেস্থান—পাণ্ডবগণের স্থান?)···

স্বামীজীর চক্ষে স্থানটি ইতিহাসের অতি মধুর স্মৃতিবিজড়িত। ইহা বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ এবং ইতিপূর্বে তিনি কাশ্মীরের ইতিহাসকে যে চারিটি ধর্মযুগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, ইহা সেগুলিরই অন্যতম।

(১) বৃক্ষ ও সর্পপূজার যুগ,—এই সময় হইতেই নাগ-শব্দান্ত কুণ্ডনামগুলির প্রচলন, যথা বেরনাগ ইত্যাদি (২) বৌদ্ধধর্মের যুগ (৩) সৌরোপাসনার আকারে প্রচলিত হিন্দুধর্মের যুগ এবং (৪) মুসলমান-ধর্মের যুগ। তিনি বলিলেন, ভাস্কর্যই বৌদ্ধধর্মের বিশেষ শিল্প, এবং সূর্যচিহ্নিত চক্র অথবা পদ্ম ইহার খুব মামুলি কারুকার্যস্থানীয়। সর্পসম্বলিত মূর্তিগুলিতে বৌদ্ধধর্মের পূর্বেকার যুগের আভাস। কিন্তু সৌরোপাসনার কালে ভাস্কর্যের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছিল, এই নিমিত্ত সূর্যমূর্তিটি নৈপুণ্য-বর্জিত।···

তখন সূর্যাস্তের সময়—কি অপরূপ সূর্যাস্ত! পশ্চিম দিকের পর্বতগুলি গাঢ় লাল রঙে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। আরও উত্তরে বরফ ও মেঘে সেগুলি নীল দেখাইতেছিল। আকাশ হরিৎ এবং পীত, তাহার সহিত ঈষৎ লাল—উজ্জ্বল অগ্নিশিখার রঙের এবং ড্যাফোডিল ফুলের মতো হরিদ্রাবর্ণ; তাহার পিছনেই নীল এবং ওপলের মতো সাদা পটভূমি। আমরা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম; তারপরেই 'সুলেমানের সিংহাসন' (যাহা ইতিমধ্যেই আমাদের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ক্ষুদ্র তখ্‌ৎ) নজরে পড়িবামাত্র আচার্যদেব বলিয়া উঠিলেন, 'মন্দিরস্থাপনে হিন্দু কি প্রতিভারই বিকাশ দেখায়! যেখানে চমৎকার দৃশ্য, হিন্দু সেই স্থানটিই বাছিয়া লয়! দেখ, এই তখ্‌ৎ হইতে সমগ্র কাশ্মীরটি দেখিতে পাওয়া যায়। নীল জলরাশির মধ্য হইতে লোহিতাভ হরিপর্বত উঠিয়াছে, যেন মুকুট পরিয়া একটি সিংহ অর্ধশায়িতভাবে অবস্থান করিতেছে। আর মার্তণ্ডের মন্দিরের পাদমূলে একটি উপত্যকা রহিয়াছে!'

আমাদের নৌকাগুলিকে বনপ্রান্ত হইতে অনতিদূরে নজর করা হইয়াছিল, এবং আমরা দেখিতে পাইলাম যে, আমাদিগের সদ্য-আবিষ্কৃত নিস্তব্ধ দেবালয় এবং বুদ্ধমূর্তিটি স্বামীজীর মনে গভীর ভাবের উদ্রেক করিয়াছে। সেই দিন সন্ধ্যার সময় আমরা ধীরামাতার বজরায় একত্র হইলাম, এবং তত্রত্য কথোপকথনের কিয়দংশ এখানে লিপিবদ্ধ হইল।

ঈশাহি ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড বৌদ্ধধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড হইতেই উদ্ভূত, আচার্যদেব এই মর্মে বলিতেছিলেন, কিন্তু আমাদের একজন এই মতটি আদৌ মানিতে চাহে না।

উক্ত নারী। বৌদ্ধ কর্মকাণ্ডই বা কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজী। বৈদিক কর্মকাণ্ড হইতে।

প্রশ্নকর্ত্রী। অথবা ইহা দক্ষিণ ইওরোপেও প্রচলিত ছিল বলিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ভাল নয় কি যে, বৌদ্ধ ঈশাহি এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সবই এক সাধারণ ভূমি হইতে উদ্ভূত?

স্বামীজী। না, তাহা হইতেই পারে না! তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল! এমন কি, জাতি-বিভাগের বিরুদ্ধে পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম কিছু বলে নাই! অবশ্য জাতিবিভাগ তখনও কোন নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে নাই, এবং বুদ্ধদেব আদর্শটিকে পুনঃস্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন মাত্র। মনু বলিতেছেন, যিনি এই জীবনেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। বুদ্ধদেব সাধ্যমত এইটি কার্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র।

প্রশ্ন। কিন্তু ঈশাহি এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কি সম্বন্ধ? তাহারা এক—ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে? এমন কি, আমাদের পূজাপদ্ধতির যাহা মেরুদণ্ডস্বরূপ, আপনাদের ধর্মে তাহার নামগন্ধও নাই!

স্বামীজী। নিশ্চয় আছে! বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও ম্যাস (Mass) আছে, তাহাই দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করা, আর তোমাদের Blessed Sacrament আমাদের 'প্রসাদ'স্থানীয়। শুধু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রথানুযায়ী উহা হাঁটু গাড়িয়া, বসিয়া বসিয়া নিবেদন করা হয়। তিব্বতের লোক হাঁটু গাড়িয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও ধূপদীপ দান এবং গীতবাদ্যের প্রথা আছে।

প্রশ্ন। কিন্তু ঈশাহি ধর্মের মতো ইহাতে কোন প্রার্থনা আছে কি?

কেহ এই ভাবে আপত্তি তুলিলে স্বামীজী বরাবর তদুত্তরে কোন নির্ভীক আপাত-বিরুদ্ধ কিন্তু অভ্রান্ত মত প্রয়োগ করিতেন, এবং তাহার মধ্যে কোন অভিনব এবং অচিন্তিতপূর্ব সামান্যীকরণ নিহিত থাকিত।

স্বামীজী। না; আর ঈশাহি ধর্মেও কোনকালে ছিল না। এ তো ছাঁকা প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম, এবং প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম মুসলমানের নিকট হইতে—সম্ভবতঃ মুর জাতির প্রভাবের মধ্য দিয়া ইহা গ্রহণ করিয়াছিল।

পৌরোহিত্যের ভাব একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়া, সেটা একমাত্র মুসলমান ধর্মই করিয়াছে। যিনি অগ্রণী হইয়া প্রার্থনা পাঠ করেন, তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়ান এবং শুধু কোরান-পাঠই বেদী হইতে চলিতে পারে। প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম এই ভাবটিই আনিতে চেষ্টা করিয়াছে।

এমন কি, 'tonsure' পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, উহাই আমাদের মুণ্ডন। জাষ্টিনিয়ান দুইজন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে মুসার যুগে প্রচলিত বিধি-নিষেধ গ্রহণ করিতেছেন, এইরূপ একখানি চিত্র আমি দেখিয়াছি। তাহাতে সাধুদ্বয়ের মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডিত। বৌদ্ধযুগের প্রাক্কালীন হিন্দুধর্মে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী দুই-ই বর্তমান ছিল। ইওরোপ নিজ ধর্মসম্প্রদায়গুলি থিবেইড[1] হইতে পাইয়াছে।

প্রশ্ন। এই হিসাবে তাহা হইলে আপনি ক্যাথলিক ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডকে আর্য ক্রিয়াকাণ্ড বলিয়া স্বীকার করেন?

স্বামীজী। হাঁ। প্রায় সমগ্র ঈশাহি-ধর্মই আর্যধর্ম বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমার মনে হয়, খৃষ্ট বলিয়া কখনও কেহ ছিল না। ক্রীট দ্বীপের অদূরে সেই স্বপ্ন[2] দেখা অবধি আমার বরাবর এই সন্দেহ! আলেকজান্দ্রিয়ায়

১ স্ট্যাসিউস প্রণীত থীবস্-সম্বন্ধীয় ল্যাটিন কাব্য খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত। থীবস্ প্রাচীন গ্রীসের এক অংশের সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। সিংহাসনপ্রার্থী ভ্রাতৃদ্বয়ের যুদ্ধই উক্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

২ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে ভারত-প্রত্যাগমনের পথে নেপল্‌স্ হইতে পোর্ট সৈয়দ আসিবার সময় স্বামীজী স্বপ্ন দেখেন যে, এক শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, 'এই ক্রীট দ্বীপ' এবং তিনি যাহাতে পরে উহাকে চিনিতে পারেন, এই জন্য উক্ত দ্বীপের একটি স্থান তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। উক্ত স্বপ্নের মর্ম এই ছিল যে, ঈশাহি ধর্মের উৎপত্তি ক্রীট দ্বীপে এবং এই সম্বন্ধে সে তাঁহাকে দুইটি ইওরোপীয় শব্দ শুনাইল—তাহাদের মধ্যে একটি 'থেরাপিউট'

ভারতীয় এবং মিসরীয় ভাবের সংমিশ্রণ হয়; এবং উহাই য়াহুদী ও যাবনিক (গ্রীক) ধর্মের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া জগতে ঈশাহি ধর্ম নামে প্রচারিত হইয়াছে।

জানই তো যে, 'কার্যকলাপ' এবং 'পত্রাবলী' (Acts and Epistles) 'জীবনীচতুষ্টয়' (Four Gospels) হইতে প্রাচীনতর, এবং সেণ্ট জন্ একটা কল্পনা। মাত্র একজন লোক সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ—তিনি সেণ্ট পল। তিনিও আবার স্বচক্ষে ঘটনাগুলি দেখেন নাই…

না! ধর্মাচার্যগণের মধ্যে কেবল মাত্র বুদ্ধ এবং মহম্মদই স্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্তারূপে দণ্ডায়মান; কারণ সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা জীবদ্দশাতেই শত্রু-মিত্র উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে; যোগী, গোপ এবং পরাক্রান্ত নরপতি—এই সব একত্র হইয়া গীতাহস্তে একখানি নয়নাভিরাম মূর্তির সৃষ্টি করিয়াছে।

রেনাঁর (Renan) ঈশাজীবনী তো শুধু ফেনা। ইহা স্ট্রসের (Strauss) কাছে ঘেঁসিতে পারে না, স্ট্রসই সাঁচ্চা প্রত্নতত্ত্ববিৎ। ঈশার জীবনে দুইটি

(Therapeutae)—এবং বলিল, 'উভয়েই সংস্কৃতশব্দজ'। থেরাপিউটি শব্দের অর্থ—থেরা অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের পুত্র (শিষ্য) গণ (পিউটি, সংস্কৃত পুত্র-শব্দজ)। ইহা হইতে স্বামীজী যেন বুঝিয়া লইলেন যে, ঈশাহি ধর্ম বৌদ্ধধর্মের একদল প্রচারক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। ভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বৃদ্ধ আরও বলিল, 'প্রমাণ সব এইখানেই আছে, খুঁড়িলেই দেখিতে পাইবে।'

নিদ্রাভঙ্গে ইহা সামান্য স্বপ্ন নহে অনুভব করিয়া স্বামীজী শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং বাহির হইয়া ডেকের উপর আসিলেন। সেখানে তিনি দেখিতে পাইলেন একজন কর্মচারী তাহার পাহারা শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কয়টা বাজিয়াছে?' উত্তর হইল, 'রাত্রি দ্বিপ্রহর।' পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমরা এখন কোথায়?' তখন বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে উত্তর শুনিলেন, 'ক্রীটের পঞ্চাশ মাইল দূরে।'

এই স্বপ্ন তাঁহার উপর যেরূপ প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া আচার্যদেব নিজেই নিজেকে হাস্যাস্পদ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তিনি কখনও ইহাকে দূর করিয়া দিতে পারেন নাই। শব্দদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি যে হারাইয়া গিয়াছে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। স্বামীজী স্বীকার করিলেন যে, 'এই স্বপ্ন দেখিবার পূর্বে, কখনও তাঁহার ঈশা-চরিত্রের সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যতা বিষয়ে সন্দিহান হইবার খেয়ালই হয় নাই।' কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, হিন্দুদর্শন-মতে ভাববিশেষের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতাই আসল জিনিস, তাহার ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা নহে। স্বামীজী বাল্যকালে একদা শ্রীরামকৃষ্ণকে এই বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুদেব উত্তর দেন, 'যাঁহাদের মাথা হইতে এমন সব জিনিস বাহির হইয়াছে, তাঁহারা যে তাহাই ছিলেন, এ কথা কি তোমার মনে হয় না?'—লেখিকা

জিনিস জীবন্ত ব্যক্তিগত লক্ষণে ভূষিত—সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা সুন্দর উপাখ্যান, ব্যভিচার-অপরাধে ধৃতা সেই রমণী এবং কূপ-পার্শ্ববর্তিনী সেই নারী।

এই শেষোক্ত ঘটনাটির ভারতীয় জীবনের সহিত কি অদ্ভুত সঙ্গতি। একটি স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিয়া দেখিল, কূপের ধারে বসিয়া একজন পীতবাস সাধু তাহার নিকট জল চাহিলেন। তারপর তিনি তাহাকে উপদেশ দিলেন এবং তাহার মনের গোটাকয়েক কথা বলিয়া দিলেন।... শুধু ভারতীয় গল্পে উপসংহারটা এইরূপ হইবে যে, যখন উক্ত নারী গ্রামবাসিগণকে সাধু দেখিতে এবং সাধুর কথা শুনিবার জন্য ডাকিতে গেল, সেই অবসরে সাধুটি সুযোগ বুঝিয়া পলাইয়া বনমধ্যে আশ্রয় লইলেন।

মোটের উপর আমার মনে হয়, জ্ঞানবৃদ্ধ হিলেলই (Rabbi Hillel) ঈশার উপদেশাবলীর উদ্ভবকর্তা, আর ন্যাজারীন নামে এক বহু প্রাচীন, কিন্তু অখ্যাত য়াহুদী সম্প্রদায় ছিল, উহাই সহসা সেণ্ট পল (St. Paul) কর্তৃক যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এক পৌরাণিক ব্যক্তিকে আরাধনার কেন্দ্ররূপে জোগাইয়া দিয়াছে।

পুনরুত্থান (Resurrection) জিনিসটা তো বসন্ত-দাহ (Spring-cremation) প্রথারই রূপান্তরমাত্র। যাহাই হউক না কেন, দাহপ্রথা শুধু ধনী যবন (গ্রীক) ও রোমকগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, আর সূর্যঘটিত নব উপাখ্যানটি সেই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই উহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া থাকিবে।

কিন্তু বুদ্ধ! পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি নিজের জন্য একটিবারও নিঃশ্বাস লন নাই! সর্বোপরি, তিনি কখনও পূজা আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন: বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নহেন, উহা একটি অবস্থাবিশেষ। আমি দ্বার খুঁজিয়া পাইয়াছি। এস, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর!

তিনি 'পতিতা' অম্বাপালীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। প্রাণনাশ হইবে জানিয়াও তিনি অন্ত্যজের গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে অতিথিসংকারককে এই মহামুক্তি-দানের জন্য ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার

নিকট লোক পাঠান। সত্যলাভের পূর্বেও একটি ক্ষুদ্র ছাগ-শিশুর জন্ত ভালবাসা ও দয়ায় কাতর! তোমাদের স্মরণ আছে, কিরূপে রাজপুত্র এবং সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি নিজ মস্তক পর্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন,—যদি রাজা শুধু যে ছাগশিশুটিকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেটিকে মুক্তি দেন; এবং কিরূপে সেই রাজা তাঁহার অনুকম্পার নিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া উক্ত ছাগশিশুটির প্রাণ দান করেন। জ্ঞানবিচার এবং সহৃদয়তার এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখা যায় নাই! নিশ্চয়ই তাঁহার মতো আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি নাই।

৯

স্থান—কাশ্মীর (বিতস্তাতীরে)

কাল—২০শে হইতে ২৯শে জুলাই

২০শে জুলাই। সে দিন প্রাতঃকালে নদী প্রশস্ত, অগভীর এবং নির্মল ছিল। আমাদের দুইজন স্বামীজীর সহিত নদীর ধারে ধারে ক্ষেতের উপর দিয়া প্রায় তিন মাইল বেড়াইয়াছিলেন। স্বামীজী প্রথমে পাপবোধ সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করিলেন: কিরূপে উহা মিসর, শেম-বংশাধিষ্ঠিত জনপদসমূহ এবং আর্যভূমি, এই তিনেরই সহিত সংশ্লিষ্ট। বেদে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু অতি অল্পক্ষণের জন্য। বেদে শয়তানকে ক্রোধের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরে বৌদ্ধদের মধ্যে উহা কামের অধীশ্বর 'মার' নামে পরিচিত, এবং ভগবান্ বুদ্ধের একটি সর্বজনপ্রিয় নাম 'মারজিৎ'।[১] কিন্তু শয়তান যেন বাইবেলের হ্যামলেট, হিন্দুশাস্ত্রে ক্রোধের অধীশ্বর কখনও সেরূপে সৃষ্টিকে দুই ভাগ করিয়া ফেলে না। সে সর্বদাই মলিনতার (defilement) উদাহরণস্থল, কখনও দ্বৈতসত্তার নহে।

[১] দ্রষ্টব্য সংস্কৃত অভিধান 'অমরকোষ'। স্বামীজী চারি বৎসর বয়সে আধ আধ ভাষায় উহা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলেন। —লেখিকা

জরথুষ্ট্র কোন প্রাচীনতর ধর্মের সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার মতে অর্মাজ্‌দ্‌ এবং আহ্রিমান্‌ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নহে, তাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ দেবের বিকাশমাত্র। সেই প্রাচীনতর ধর্ম বৈদান্তিক না হইয়া যায় না। সুতরাং মিসরীয়গণ এবং শেম-বংশধরগণ পাপবাদ আঁকড়াইয়া থাকে, আর আর্যগণ—যথা ভারতবাসী এবং গ্রীক যবনগণ—শীঘ্রই উহা পরিত্যাগ করে। ভারতবর্ষে পুণ্য ও পাপ বিদ্যা ও অবিদ্যায় পরিণত হইল, উভয়কেই ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। আর্যগণের মধ্যে পারসিক এবং ইওরোপীয়গণ ধর্মচিন্তায় শেম-বংশধরগণের লক্ষণাক্রান্ত হইল; এই হেতুই তাহাদের মধ্যে পাপবোধ।

তারপরে এ সকল কথা ছাড়িয়া বিষয়ান্তরের—ভারতবর্ষ ও তাহার ভবিষ্যতের—প্রসঙ্গ উঠিল। এরূপ প্রায়ই ঘটিত। কোন জাতিতে বল সঞ্চার করিতে হইলে উহাকে কিরূপ ভাব দেওয়া উচিত? তাহার নিজের উন্নতির গতি একদিকে চলিতেছে, তাহাকে 'ক' বলা যাউক। যে নূতন বল সঞ্চারিত হইবে তাহা কি সঙ্গে সঙ্গে উহার কিঞ্চিৎ হ্রাসও করিবে, যেমন 'খ'? ইহার ফলে এতদুভয়ের মধ্যপথবর্তী এক উন্নতির সৃষ্টি হইবে যেমন 'গ'। ইহা তো জ্যামিতিক পরিবর্তনমাত্র। এরূপ তো চলিবে না। জাতীয় জীবন জৈবিক শক্তির ব্যাপার। আমাদিগকে সেই জীবনস্রোতটিতেই বলাধান করিতে হইবে, অবশিষ্ট কার্য উহা নিজে নিজেই করিয়া লইবে। বুদ্ধ 'ত্যাগ' প্রচার করিলেন এবং ভারত উহা শুনিল। তথাপি এক সহস্র বৎসর মধ্যে ভারত জাতীয় সম্পদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিল। ত্যাগই ভারতের জাতীয় জীবনের উৎস। সেবা ও মুক্তি তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। হিন্দুজননী সকলের শেষে ভোজন করেন। বিবাহ ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, উহা জাতি ও বর্ণের কল্যাণের নিমিত্ত। নব্য সংস্কারকগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি সমস্যা-পূরণের অনুপযোগী এক পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করিয়া জীবন আহুতি দিয়াছেন, আর সমস্ত জাতি তাঁহাদিগের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

খ

ক গ

তারপরে পুনরায় কথাবার্তার ভাব বদলাইয়া গেল, এবং কেবল হাসিঠাট্টা, কৌতুক এবং গল্পগুজব চলিতে লাগিল। আমরা শুনিতে শুনিতে হাসিয়া অধীর হইতেছিলাম। এমন সময় নৌকা আসিয়া পৌঁছিল এবং সে দিনের মতো কথাবার্তা শেষ হইল।

সেদিনকার সমস্ত বৈকাল এবং রাত্রি স্বামীজী পীড়িত হইয়া নিজ নৌকায় শুইয়াছিলেন। কিন্তু পরদিন যখন আমরা বিজবেহার মন্দিরে অবতরণ করিলাম—ইতিমধ্যেই সেখানে অমরনাথযাত্রীর ভিড় লাগিয়া গিয়াছে—তখন তিনি আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্ত মিলিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 'শীঘ্র সারিয়া উঠা এবং শীঘ্র অসুখে পড়া'—চিরকালই তাঁহার বিশেষত্ব ছিল, এ-কথা তিনিও নিজের সম্বন্ধে বলিতেন। উহার পর, দিবসের অধিকাংশ সময়ই তিনি আমাদের সহিত ছিলেন, এবং অপরাহ্ণে আমরা ইসলামাবাদ পৌঁছিলাম।

সেই দিন বৈকালে গোধূলির সময় আচার্যদেব ধীরামাতা ও জয়াকে নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন। তিনি দুই টুকরো পাথর হাতে লইয়া বলিতেছিলেন, 'সুস্থ অবস্থায় আমার মন এটা ওটা সেটা লইয়া থাকিতে পারে, অথবা আমার সঙ্কল্পের জোর কমিয়া গিয়াছে মনে হইতে পারে, কিন্তু এতটুকু যন্ত্রণা বা পীড়া আসুক দেখি, ক্ষণিকের জন্তও আমি মৃত্যুর সামনা-সামনি হই দেখি, অমনি আমি এই রকম শক্ত হইয়া যাই'—বলিয়া পাথর দুখানিকে পরস্পর ঠুকিলেন—'কারণ আমি ঈশ্বরের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছি।'

গাছগুলির নীচে ঘাসের উপর বসিয়া আমরা নানা কথা কহিতে লাগিলাম, এবং দু-একঘণ্টা আধা-হাল্কা আধা-গম্ভীর কথাবার্তা চলিল। বৃন্দাবনে বানরগুলা কিরূপ দুষ্টামি করিতে পারে, তাহার অনেক বর্ণনা শুনিলাম। এবং আমরা নানা প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম যে, পরিব্রাজক-জীবনে দুইটি বিভিন্ন ঘটনায় বিপদে যে সাহায্য আসিতেছে, স্বামীজী তাহা পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যৎ দর্শন সত্য হইয়াছিল। একবার তিনি কয়েক দিন ধরিয়া কিছু খাইতে পান নাই, এক রেল স্টেশনে ক্লান্তিতে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন; এমন সময়ে সহসা তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহাকে উঠিয়া কোন একটি রাস্তা দিয়া যাইতে হইবে, আর সেখানে তিনি একজন লোকের দেখা পাইবেন, যে তাঁহাকে সাহায্য করিবে। তিনি তদনুসারে কার্য করিলেন এবং এক থালা খাবার-হাতে একজন লোকের দেখা পাইলেন। এই ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, 'যাঁহার নিকট আমি প্রেরিত হইয়াছি, আপনিই কি তিনি?'

তারপরে একটি শিশু আমাদিগের নিকট আনীত হইল, তাহার হাত খুব কাটিয়া গিয়াছে। স্বামীজীও বৃদ্ধামহলে প্রচলিত একটি ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। ক্ষতস্থানটি তিনি জল দিয়া ধুইয়া, রক্ত পড়া বন্ধ করিবার জন্য এক টুকরা কাপড় পুড়াইয়া তাহার ছাই উক্তস্থানে চাপাইয়া দিলেন। গ্রামবাসিগণ আশ্বস্ত হইয়া শান্ত হইল, এবং সেই রাত্রির মতো আমাদের গল্প গুজব বন্ধ হইল।

২৩শে জুলাই। পরদিন প্রাতঃকালে হরেক রকমের একদল কুলি আমাদিগকে মার্তণ্ডের ধ্বংসাবশেষ দেখাইতে লইয়া যাইবার জন্য আপেল গাছ-গুলির নীচে একত্র হইয়াছিল। মার্তণ্ডমন্দির এক অদ্ভুত প্রাচীন সৌধ। উহাতে স্পষ্টই মন্দিরের অপেক্ষা মঠের লক্ষণ অধিক। উহা এক অপূর্ব স্থানে অবস্থিত এবং যে-সকল বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়া উহা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ঐগুলির বিভিন্ন নির্মাণপদ্ধতির স্পষ্ট একত্র সমাবেশ বশতই উহা আকর্ষণীয় হইয়াছিল। ...সূর্যাস্তের আলোয় অশ্বপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তন অতি রমণীয় হয়। পূর্ব এবং পরদিনের এই সমস্ত সময়ের মধ্যে যে-সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাদের কিছু কিছু অংশ এখনও মনে পড়িতেছে :

'কোন জাতিই, তা যবনই (Greek) হউন বা অন্য কোন জাতিই হউন, কোন কালে জাপানীদের ন্যায় স্বদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া যান নাই। তাঁহারা কথা লইয়া থাকেন না, তাঁহারা কাজে করেন—দেশের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দেন। আজকাল জাপানে এমন সব জমিদার আছেন—যাঁহারা সাম্রাজ্যের একত্ব-বিধানকল্পে বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদের জমিদারি ছাড়িয়া দিয়া কৃষিজীবী হইয়াছেন।[১] আর জাপানযুদ্ধে একটিও বিশ্বাসঘাতক পাওয়া যায় নাই। একবার সেটা ভাবিয়া দেখ!'

আবার কতকগুলি লোক ভাবপ্রকাশে অক্ষম—এই প্রসঙ্গে বলিলেন, 'আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি যে, লাজুক ও চাপা লোকেরা উত্তেজিত হইলে সবচেয়ে বেশী আসুরিক-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।'

আর একবার সন্ন্যাসজীবনের ও ব্রহ্মচর্যের বিধিনির্দেশ-প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 'যস্মাস্তিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যং চ স আত্মহা ভবেৎ'—যে সন্ন্যাসী সকামভাবে সুবর্ণ গ্রহণ করে, সে আত্মঘাতী ইত্যাদি।

---

১ জাপানী সামুরাইগণ তাঁহাদের জমিদারি ছাড়িয়া দেন নাই। তাঁহাদের রাজনীতিক বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন মাত্র।—নিবেদিতা

২৪শে জুলাই। অন্ধকার রাত্রি এবং অরণ্যানী, ক্রমরাজিতলে পাইন কাঠের এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড, দুই তিনটি তাঁবু অন্ধকারের মধ্যে সাদা হইয়া দণ্ডায়মান, দূরে অগ্নিকুণ্ডপার্শ্বে উপবিষ্ট ভৃত্যগণের আকৃতি ও কণ্ঠস্বর এবং তিনটি শিষ্যসহ আচার্যদেব—পরবর্তী চিত্রটি এইরূপই। সহসা আচার্যদেব আমাদের মধ্যে একজনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'কই, তুমি তো আজকাল তোমার ইস্কুলের কোন কথা বলো না, তুমি কি মাঝে মাঝে উহার কথা ভুলিয়া যাও?' পরে বলিতে লাগিলেন, 'দেখ, আমার ভাবিবার ঢের জিনিস রহিয়াছে। একদিন আমি মাদ্রাজের দিকে মন দিই, আর সেখানকার কাজের কথা ভাবি। আর একদিন আমি সব মনটা আমেরিকা বা ইংলণ্ড বা সিংহল অথবা কলিকাতায় দিই। এক্ষণে আমি তোমার ইস্কুলের কথা ভাবিতেছি।'

পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত একটি অস্থায়ী কার্য-প্রণালী যে অনেক চিন্তার পর স্থির হইয়াছে, উহার প্রারম্ভ যে সামান্য হইবে, শেষ পর্যন্ত সর্বগ্রাহী প্রসারতার ভাব বাতিল করিবার ঝোঁক এবং সমগ্র শিক্ষাদানচেষ্টাটিকে যে ধর্মজীবনের উপর এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে—এই সমস্ত কথা তিনি মনোযোগের সহিত শুনিয়া বলিলেন :

তুমি সেই উৎসাহ বজায় রাখিবার জন্যই সাম্প্রদায়িক ভাব আশ্রয় করিবে, নয় কি? সমস্ত সম্প্রদায়ের পারে চলিয়া যাইবার জন্য তুমি একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবে। হাঁ, আমি বুঝিতে পারিয়াছি।

কতকগুলি বাধা স্পষ্টতঃ থাকিবেই থাকিবে। নানা কারণে প্রস্তাবিত আয়তনে হয়তো অনুষ্ঠানটি প্রায় অসম্ভব শুনায়। কিন্তু এই মুহূর্তে শুধু এইটুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অনুষ্ঠানটি ঠিক ঠিক ভাবে সকল্প করা হয়, এবং কার্য-প্রণালী নির্দোষ হইলে উপায় উপকরণাদি জুটিবেই জুটিবে।—সব শুনিয়া তিনি একটু চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন :

তুমি আমাকে ইহার সমালোচনা করিতে বলিতেছ, কিন্তু তাহা আমি করিতে পারিব না। কারণ, আমি তোমাকে ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত—আমি যতটা অনুপ্রাণিত ঠিক ততটা অনুপ্রাণিত—বলিয়া মনে করি। অন্যান্য ধর্মে এবং আমাদের ধর্মে এইটুকুই প্রভেদ। অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণ বিশ্বাস করেন যে, ঐ-সকল ধর্মের সংস্থাপকগণ ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত, আমরাও ঐরূপ

বিশ্বাস করিয়া থাকি। কিন্তু আমিও তো তাঁহারই মতো অনুপ্রাণিত আর তুমিও আমারই মতো, আবার তোমার পরে তোমার বালিকারা এবং তাঁহাদের শিষ্যাগণও সেইরূপ হইবে। সুতরাং তুমি যাহা সর্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, আমি তাহাই করিতে তোমাকে সাহায্য করিব।

তারপর ধীরামাতা এবং জয়ার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, যে শিষ্যাটি নারীদের উন্নতি-বিধানের প্রতিনিধিরূপে দাঁড়াইবেন, তাঁহার উপর তিনি পাশ্চাত্যদেশে গমনকালে যে কি মহান দায়িত্ব অর্পণ করিয়া যাইবেন! উহা যে পুরুষগণের জন্য যে-কার্য অনুষ্ঠিত হইবে তদপেক্ষা গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ হইবে তাহাও বলিলেন। আমাদের মধ্যে উক্ত সেবিকাটির (worker) দিকে ফিরিয়া আরও বলিলেন, 'হাঁ, তোমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু যে জ্বলন্ত উৎসাহ দরকার—তাহা তোমার নাই। তোমাকে 'দগ্ধেন্ধনমিবানলম্' হইতে হইবে। শিব! শিব!'—এই বলিয়া মহাদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া তিনি আমাদিগের নিকট হইতে রাত্রির মতো বিদায় লইলেন এবং আমরাও অনতিবিলম্বে শয়ন করিলাম।

২৫শে জুলাই। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা তাঁবুগুলির মধ্যে একটিতে সকাল সকাল প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া অচ্ছাবল পর্যন্ত চলিলাম। আমাদের মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, কতকগুলি পুরাতন রত্ন হারাইয়া গিয়াছিল, সেগুলি পুনরায় পাওয়া গিয়াছে, তখন তাহাদের সবগুলিই উজ্জ্বল ও নূতন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া এই গল্প বলা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, 'অমন ভাল স্বপ্নের কথা বলিতে নাই!'

অচ্ছাবলে আমরা জাহাঙ্গীরের আরও অনেক বাগান দেখিতে পাইলাম।

আমরা বাগানগুলির চারিধারে বেড়াইলাম এবং একটি স্থির জলাশয়ে স্নান করিলাম। পরে আমরা প্রথম বাগানটিতে মধ্যাহ্নের পূর্বের জলযোগ সম্পন্ন করিলাম, এবং বৈকালে অশ্বপৃষ্ঠে ইসলামাবাদে নামিয়া আসিলাম।

উক্ত জলযোগ-কালে যখন সকলে বসিয়াছিলাম, তখন স্বামীজী তাঁহার কন্যাকে তাঁহার সঙ্গে অমরনাথ-গুহায় যাত্রা করিবার এবং তথায় মহাদেবের চরণে নিবেদিত হওয়ার জন্য আহ্বান করিলেন। ধীরামাতা সহাস্যে অনুমতি দিলেন, এবং পরবর্তী অর্ধঘণ্টা উল্লাস ও আনন্দ-জ্ঞাপনে অতীত হইল। ইতি-পূর্বেই বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, আমরা সকলেই পহলগাম পর্যন্ত যাইব এবং

সেখানে স্বামীজীর তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করিব। সুতরাং আমরা সেইদিন সন্ধ্যার সময় নৌকাগুলিতে পৌঁছিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া লইলাম এবং পত্রাদি লিখিলাম। পরদিন বৈকালে বওয়ান যাত্রা করিলাম।

১০

স্থান—কাশ্মীর (অমরনাথ)

কাল—২৯শে জুলাই হইতে ৮ই অগস্ট

২৯শে জুলাই। এই সময় হইতে আমরা স্বামীজীকে খুব কমই দেখিতে পাই। তিনি তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে খুব উৎসাহান্বিত ছিলেন, বেশীর ভাগ একাহারী হইয়া থাকিতেন, এবং সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য সঙ্গ বড় একটা চাহিতেন না। কোথাও তাঁবু খাটানো হইলে কখন কখন তিনি মালা হাতে সেখানে আসিতেন। বওয়ান জায়গাটি একটি পল্লীগ্রামের মেলার মতো—সমস্তটির উপর একটি ধর্মভাবের ছাপ রহিয়াছে, আর পুণ্য কুণ্ডগুলি ঐ ধর্মভাবের কেন্দ্রস্বরূপ। ইহার পর আমরা ধীরামাতার সহিত তাঁবুর দ্বারের নিকট গিয়া যে বহুসংখ্যক হিন্দীভাষী সাধু স্বামীজীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

বৃহস্পতিবারে আমরা পহলগামে পৌঁছিলাম; উপত্যকাটির নিম্নপ্রান্তে আমাদের ছাউনি পড়িল। দেখিলাম যে, আমাদিগকে আদৌ ঢুকিতে দেওয়া হইবে কিনা, সে-বিষয়ে স্বামীজীকে গুরুতর আপত্তিসমূহ নিরাকরণ করিতে হইতেছে। নাগা সাধুগণ তাঁহাকে সমর্থন করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'স্বামীজী, ইহা সত্য যে আপনার শক্তি আছে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করা আপনার উচিত নহে!' বলিবামাত্র স্বামীজী চুপ করিয়া গেলেন! যাহা হউক, সেদিন অপরাহ্ণে তিনি তাঁহার কন্যাকে আশীর্বাদলাভে ধন্য হইবার জন্য, ছাউনির চারিধারে ঘুরাইয়া আনিলেন,—প্রকৃতপক্ষে উহা ভিক্ষাবিতরণ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আর, লোকে

তাঁহাকে ধনী ঠাওরাইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহাকে শক্তিমান্ বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল বলিয়াই হউক, পরদিবস আমাদের তাঁবুটি ছাউনির পুরোভাগে একটি মনোহর পাহাড়ের উপর তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল।

পরবর্তী বিশ্রামস্থান চন্দনবাড়ি যাইবার রাস্তাটি কি সুন্দর! চন্দনবাড়ির একটি গভীর গিরিবর্ত্মের কিনারায় আমরা ছাউনি ফেলিলাম। সমস্ত বৈকাল ধরিয়া বৃষ্টি হইয়াছে, এবং স্বামীজী মাত্র পাঁচ মিনিটের কথাবার্তার জন্য আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

চন্দনবাড়ির সন্নিকটে স্বামীজী জেদ করিলেন, ইহাই আমার প্রথম তুষারবর্ত্ম, অতএব আমাকে উহা খালি পায় অতিক্রম করিতে হইবে। জ্ঞাতব্য প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির উল্লেখ করিতে তিনি ভুলিলেন না। ইহার পরেই বহুসহস্রফুট-ব্যাপী এক বিকট চড়াই আমাদের ভাগ্যে পড়িল। তারপর এক সরু পথ, পাহাড়ের পর পাহাড় ঘুরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে; সেই দীর্ঘ পথ ধরিয়া চলিলাম; এবং সর্বশেষে আর একটি খাড়া চড়াই। প্রথম পর্বতটির উপরিভাগের জমিটিকে একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাস (Edelweiss) ঠিক যেন গালিচা দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে। তারপরে রাস্তাটি শেষনাগ হইতে পাঁচশত ফুট উচ্চ দিয়া চলিয়াছে। শেষনাগের জল গতিহীন। অবশেষে আমরা তুষারমণ্ডিত শিখরগুলির মধ্যে ১৮০০০ ফুট উচ্চে এক ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় ছাউনি ফেলিলাম। ফার গাছগুলি বহু নিম্নে ছিল, সুতরাং সারা বৈকাল ও সন্ধ্যাবেলা কুলিরা চারিদিক হইতে জুনিপার গাছ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্থানীয় তহসিলদারের, স্বামীজীর এবং আমার তাঁবুগুলি খুব কাছাকাছি ছিল; সন্ধ্যাবেলায় সম্মুখভাগে এক বৃহৎ অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। আমাদের ছাউনি পড়িবার পর আমি আর স্বামীজীকে দেখি নাই।

পাঁচটি তটিনীর সম্মিলনস্থল 'পঞ্চতরণী' যাইবার রাস্তা এতটা দীর্ঘ ছিল না। অধিকন্তু ইহা শেষনাগ অপেক্ষা নীচু এবং এখানকার ঠাণ্ডাও বেশ শুষ্ক ও প্রীতিপদ। ছাউনির সম্মুখে এক কঙ্করময় শুষ্ক নদীগর্ভ, উহার মধ্য দিয়া পাঁচটি তটিনী চলিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিতেই—একটির পর অপরটিতে ভিজা কাপড়ে হাঁটিয়া গিয়া যাত্রিগণের স্নান করার বিধি। সম্পূর্ণরূপে লোকের নজর এড়াইয়া স্বামীজী কিন্তু এ-বিষয়ক নিয়মটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।

এই সকল উচ্চ স্থানে প্রায়ই দেখিতাম যে, আমরা তুষার-শৃঙ্গরাজির মহান্ পরিধির মধ্যে রহিয়াছি,—এই নির্বাক বিপুলায়তন পর্বতগুলিই হিন্দুমনে ভস্মানুলিপ্ত ভগবান্ শঙ্করের ভাব উদ্রেক করিয়া দিয়াছে।

২রা অগস্ট। ২রা অগস্ট মঙ্গলবার, অমরনাথের সেই মহোৎসব দিনে আমরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে যাত্রা করিলাম। সঙ্কীর্ণ উপত্যকাটিতে পৌঁছিলে সূর্যোদয় হইল। রাস্তার এই অংশটিতে যাতায়াত যে খুব নিরাপদ ছিল, তাহা নয়। কিন্তু যখন আমরা ডাণ্ডি ছাড়িয়া চড়াই করিতে আরম্ভ করিলাম, তখনই প্রকৃত বিপদের সূত্রপাত হইল। কোনমতে ওপারের উতারটির তলদেশে পৌঁছিয়া আমাদিগকে অমরনাথের গুহা পর্যন্ত ক্রোশের পর ক্রোশ তুষারবর্মের উপর দিয়া বহুকষ্টে যাইতে হইয়াছিল।

ক্লান্ত হইয়া স্বামীজী ইতিমধ্যে পিছনে পড়িয়াছিলেন। অনেক বিলম্বে তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং 'স্নান করিতে যাইতেছি' মাত্র এই কথা বলিয়া আমাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। অর্ধ ঘণ্টা পরে তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। সস্মিতবদনে তিনি প্রথমে অর্ধবৃত্তটির এক প্রান্তে, পরে অপর প্রান্তটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। স্থানটি বিশাল ছিল, এত বড় যে, সেখানে একটি গির্জা ধরিতে পারে, এবং সুবৃহৎ তুষারময় শিবলিঙ্গটি প্রগাঢ়চ্ছায় এক গহ্বরে অবস্থিত থাকায় যেন নিজ সিংহাসনেই অধিরূঢ় বলিয়া মনে হইতেছিল। কয়েক মিনিট কাটিয়া যাইবার পর তিনি গুহা ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন।

তাঁহার চক্ষে যেন স্বর্গের দ্বারসমূহ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তিনি সদাশিবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছেন। পরে বলিয়াছিলেন—পাছে তিনি 'মূর্ছিত হইয়া পড়েন' এইজন্য নিজেকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দৈহিক ক্লান্তি এত অধিক হইয়াছিল যে, জনৈক ডাক্তার পরে বলিয়াছিলেন—তাঁহার হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তৎপরিবর্তে উহা চিরদিনের মতো বর্ধিতায়তন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার গুরুদেবের সেই কথাগুলি কি অদ্ভুতভাবে প্রায় সফল হইয়াছিল, 'ও যখন নিজেকে জানতে পারবে, তখন আর এ শরীর রাখবে না!'

আধঘণ্টা পরে নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়া সেই সহৃদয় নাগা সন্ন্যাসী এবং আমার সহিত জলযোগ করিতে করিতে স্বামীজী বলিলেন,

'আমি কি আনন্দই উপভোগ করিয়াছি! আমার মনে হইতেছিল যে, তুষারলিঙ্গটি সাক্ষাৎ শিব। আর সেখানে কোন বিত্তাপহারী ব্রাহ্মণ ছিল না, কোন ব্যবসা ছিল না, খারাপ কোন কিছু ছিল না। [সেখানে] কেবল নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাব। আর কোন তীর্থক্ষেত্রেই আমি এত আনন্দ উপভোগ করি নাই।'

পরে তিনি প্রায়ই আমাদিগকে তাঁহার সেই চিত্তবিহ্বলকারী দর্শনের কথা বলিতেন; উহা যেন তাঁহাকে একেবারে স্বীয় ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে টানিয়া লইবে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি শ্বেত তুষারলিঙ্গটির কবিত্বের বর্ণনা করিতেন, এবং তিনিই ইঙ্গিত করিলেন, একদল মেষপালকই উক্ত স্থানটি প্রথম আবিষ্কার করিয়াছে। কোন এক নিদাঘ-দিবসে তাহারা নিজ নিজ মেষযূথের সন্ধানে বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছিল এবং এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, তাহারা অভ্রব-তুষাররূপী সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি সর্বদা ইহাও বলিতেন, 'সেইখানেই অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছেন।' আর আমাকে তিনি বলিলেন, 'তুমি এক্ষণে বুঝিতেছ না; কিন্তু তোমার তীর্থযাত্রাটি সম্পন্ন হইয়াছে, এবং ইহার ফল ফলিতেই হইবে। কারণ থাকিলেই কার্য হইবে নিশ্চিত। তুমি পরে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। ফল অবশ্যম্ভাবী।'

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা যে রাস্তা দিয়া পহলগামে প্রত্যাবর্তন করিলাম, তাহা কি সুন্দর রাস্তা! সেই রজনীতে তাঁবুতে ফিরিয়া আমরা তাঁবু উঠাইলাম এবং অনেক পরে পুরা এক চটিভর রাস্তা চলিয়া একটি তুষারময় গিরিসঙ্কটে রাত্রির জন্ম ছাউনি ফেলিলাম। এইখানে আমরা একজন কুলীকে কয়েক আনা পয়সা দিয়া একখানি চিঠি লইয়া আগে পাঠাইয়া দিলাম, কিন্তু পরদিন মধ্যাহ্নে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে, ইহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ সমস্ত প্রাতঃকাল ধরিয়া যাত্রিগণ দলে দলে আমাদের তাঁবুর নিকট দিয়া যাইবার সময় নিতান্ত বন্ধুভাবে, অপর সকলকে আমাদের সংবাদ দিবার জন্ম, এবং আমরা যে খুব শীঘ্রই আসিতেছি—এই কথা জানাইবার জন্ম, আমাদের তত্ত্ব লইয়া যাইতেছিল। প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের বহু পূর্বেই আমরা গাত্রোত্থান করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। সম্মুখে সূর্য উদিত হইতেছেন এবং পশ্চাতে চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন, এমন সময়ে আমরা হুতিয়ার তলাও

(Lake of Death) নামক হ্রদের উপরিভাগের রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। এই সেই হ্রদ—যেখানে এক বৎসর প্রায় চল্লিশ জন যাত্রী তাহাদেরই স্তোত্র-পাঠের কম্পনে স্থানচ্যুত একটি তুষারপ্রবাহ (avalanche) কর্তৃক সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিহত হইয়াছিল! একটি ক্ষুদ্র পগ্‌ডাণ্ডী পথ খাড়া পাহাড়ের গা দিয়া নীচে নামিয়াছে। অতঃপর আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম এবং ঐ পথে চলিয়া দূরত্ব যথেষ্ট কমাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ঐ পথ সকলকেই পায়ে হাঁটিয়া তাড়াতাড়ি কষ্টেসৃষ্টে ঠেলাঠেলি করিয়া অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তলদেশে গ্রামবাসিগণ প্রাতঃকালীন জলযোগের মতন একটা কিছু প্রস্তুত রাখিয়াছিল। স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল, চাপাটি সেঁকা হইতেছিল, এবং চা-ও প্রস্তুত ছিল, শুধু ঢালিলেই হইল। এখন হইতে যেখানে যেখানে রাস্তা পৃথক্ হইয়া গিয়াছে, সেইখানেই যাত্রিগণ দলে দলে মুখ্য দল হইতে পৃথক্ হইয়া যাইতে লাগিল, এবং এই সারা পথ ধরিয়া আমাদের মধ্যে যে একটি একত্বের ভাব জন্মিয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় পহলগামের উপরিভাগে আমরা এক গোল পাহাড়ের উপর পাইন কাঠের এক বৃহৎ অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া এবং শতরঞ্চি বিছাইয়া গল্প করিতে লাগিলাম; আমাদের বন্ধু সেই নাগা সন্ন্যাসীটি আমাদের সহিত যোগ দিলেন, এবং যথেষ্ট কৌতুক-পরিহাসাদি চলিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই আমাদের ক্ষুদ্র দলটি ব্যতীত আর সকলে চলিয়া গেল। আর আমরা বসিয়া এই সব দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিলাম—উপরে চন্দ্রদেব হাসিতেছেন, তুষারশৃঙ্গগুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া, নদী খরবেগে প্রবাহিতা, এবং চারিদিকে অসংখ্য পার্বত্য পাইন বৃক্ষ।

৮ই অগস্ট। পরদিন আমরা ইসলামাবাদ যাত্রা করিলাম, এবং সোমবার প্রভাতে প্রাতঃকালীন জলযোগে বসিয়াছি, এমন সময়ে মাঝিরা গুণ টানিয়া নৌকাগুলি নিরাপদে শ্রীনগরে আনিয়া লাগাইয়া দিল।

১১

স্থান—প্রত্যাবর্তনের পথে (শ্রীনগর)
কাল—৯ই হইতে ১৩ই আগস্ট

৯ই অগস্ট। এই সময়ে আচার্যদেব ক্রমাগত আমাদের নিকট বিদায় লইবার কথা বলিতেছিলেন। সুতরাং যখন আমি খাতায় 'রমতা সাধু বহতা পানি, ইস্‌মে ন কোই মৈল লখানি।'—এই বাক্যটি লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, তখন আমি স্পষ্ট জানি, ইহার অর্থ কি। 'যখনই আমায় কষ্ট সহ্য করিতে হয় এবং ভিক্ষোপজীবী হইতে হয়, তখনই আমি কত বেশী ভাল থাকি!' এই সাগ্রহ কাতরোক্তি, স্বাধীনতা এবং সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলামেশার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পদব্রজে স্বীয় দীর্ঘ দেশভ্রমণের চিত্রাঙ্কন এবং ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য পুনরায় আমাদিগের সহিত বারামুল্লায় সাক্ষাৎ, এই সবই উহার অর্থ।

যে নৌকার মাঝিরা স্বামীজীর আপনার হইয়া গিয়াছিল এবং যাহাদিগকে তিনি দুইটি ঋতু ধরিয়া সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাহারা আমাদিগের নিকট বিদায় লইল। সহৃদয়তা এবং ধৈর্যেরও যে বাড়াবাড়ি হইতে পারে, তাহারই প্রমাণস্বরূপ পরে তিনি তাঁহার সহিত মাঝিদের সম্বন্ধরূপ সমগ্র ব্যাপারটি উল্লেখ করিতেন।

১০ই অগস্ট। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আমরা সকলে একজনের সহিত দেখা করিবার জন্য বাহির হইলাম। ফিরিবার সময় তাঁহার শিষ্যা নিবেদিতাকে তাঁহার সহিত ক্ষেতগুলির উপর দিয়া বেড়াইয়া আসিবার জন্য ডাকিলেন। তাঁহার কথাবার্তা সমস্তই স্ত্রীশিক্ষা-কার্য ও সে-বিষয়ে তাহার অভিপ্রায় কি, এই-বিষয়ক ছিল। স্বদেশ এবং উহার ধর্মসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যে সমন্বয়মূলক, তাঁহার নিজের বিশেষত্ব শুধু এইটুকু যে, তিনি চাহেন—হিন্দুধর্ম নিষ্ক্রিয় না থাকিয়া সক্রিয় হউক এবং পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিবার সামর্থ্য উহার থাকুক; কেবল অস্পৃশ্যতাকেই তিনি অস্বীকার করিতেন, এই-সব সম্বন্ধে তিনি বলিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি গভীর ভাবের সহিত যাঁহারা খুব প্রাচীনপন্থী (Orthodox), তাঁহাদের অনেকের অসাধারণ ধর্মভাব সম্বন্ধে বলিলেন। বলিলেন, 'ভারতের অভাব কার্যকুশলতা (Practicality)। কিন্তু সেজন্য

ভারত যেন কখনও পুরাতন চিন্তাশীল জীবনের উপর তাহার অধিকার ছাড়িয়া না দেয়।'

'শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, সমুদ্রের ন্যায় গভীর এবং আকাশের ন্যায় উদার হওয়াই আদর্শ। কিন্তু প্রাচীনপন্থায় নিষ্ঠার আবরণে রক্ষিত হৃদয়ে এই যে গভীর অন্তর্জীবনের বিকাশ, ইহা কোন মুখ্য সম্পর্কের ফল নহে, গৌণ সম্পর্কের ফল মাত্র। আর যদি আমরা নিজেরা নিজেদের ঠিক করি, তাহা হইলে জগৎও ঠিক হইয়া যাইবে, কারণ আমরা সকলেই কি এক নহি? শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার ভিতরের নিগূঢ় তত্ত্বগুলির পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখিতেন; তথাপি বাহ্য দশায় তিনি পুরাদস্তুর কর্মতৎপর ও কর্মপটু ছিলেন।'

অতঃপর তিনি গুরুপূজারূপ সেই জটিল প্রশ্নটি সম্বন্ধে বলিলেন, 'আমার নিজের জীবন সেই মহাপুরুষের চরিত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দ্বারা চালিত কিন্তু এটি অপরের পক্ষে কতদূর খাটিবে, তাহা প্রত্যেকে নিজেনিজেই ঠিক করিয়া লইবে। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসকল শুধু যে একজন লোকের মধ্য দিয়াই জগতে প্রসারিত হয়, এমন নহে।'

১১ই অগস্ট। এই দিন করকোষ্ঠী দেখার জন্য আমাদের মধ্যে একজনকে স্বামীজীর নিকট ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, 'এ জিনিসটাকে সকলেই চায়, তবু সমগ্র ভারত ইহাকে হেয় জ্ঞান করে, ঘৃণা করে।' একজনের একটু বিশেষ ওকালতির উত্তরে বলিলেন, 'চেহারা দেখিয়া চরিত্র বলিয়া দেওয়াও আমি সমর্থন করি না। বলিতে কি, তোমাদের অবতার এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ যদি সিদ্ধাইগুলা না দেখাইতেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আরও বেশী সত্যসন্ধ বলিয়া মনে করিতাম। এই কার্যের জন্য বুদ্ধ এক ভিক্ষুকে সংঘচ্যুত করিয়াছিলেন।'

১২ই ও ১৩ই অগস্ট। স্বামীজী আজকাল একজন ব্রাহ্মণ পাচক রাখিয়াছেন। একজন মুসলমান পর্যন্ত তাঁহাকে রাঁধিয়া দিতে পারে, তাঁহার এইরূপ অভি-প্রায়ের বিরুদ্ধে অমরনাথযাত্রী সাধুগণের তর্কগুলি বড়ই মর্মস্পর্শী ছিল। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'অন্ততঃ শিখদের দেশে এটি করিবেন না, স্বামীজী!' এবং তিনিও অবশেষে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত তিনি তাঁহার মুসলমান মাঝির শিশু কন্যাটিকে উমারূপে পূজা করিতেছিলেন। ভালবাসা বলিতে সে শুধু সেবা করা বুঝিত, এবং স্বামীজীর কাশ্মীর ত্যাগের দিনে সেই ক্ষুদ্র শিশু

তাঁহার জন্য একথাল আপেল সানন্দে নিজে সমস্ত পথ হাঁটিয়া টঙ্গায় তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল। স্বামীজীকে তৎকালে সম্পূর্ণ উদাসীন বোধ হইলেও তিনি বালিকাকে কখনও ভুলিয়া যান নাই। কাশ্মীরে থাকিতে থাকিতেই তিনি একদিনকার কথা প্রায়ই সানন্দে স্মরণ করিতেন। বালিকা সে দিন নৌকার গুণ টানিবার রাস্তায় একটি নীলবর্ণের ফুল দেখিতে পায়, এবং সেখানে বসিয়া উহাকে একবার এধারে, একবার ওধারে আঘাত করিতে করিতে কুড়ি মিনিট কাল সেই ফুলটির সহিত একাকী কাটায়।

নদীতটে একখণ্ড জমি ছিল, তাহার উপর তিনটি চেনার গাছ জন্মিয়াছিল। ইহাদের কথা ভাবিলেই আমরা এই সময়ে এক বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতাম। কারণ কাশ্মীরের মহারাজা স্বামীজীকে উহা দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন এবং আমাদের যে ভাবী কার্যে 'দেশের লোকের দ্বারা, দেশের লোকের জন্য, এবং সেবক ও সেব্য—উভয়েরই প্রীতিকর'—এই মহান্ ভাব রূপায়িত হইবে, উক্ত স্থানটিকে তাহারই এক কর্ম-কেন্দ্র বলিয়া আমরা সকলে এক মানসচিত্র অঙ্কিত করিলাম।

নারীগণই গৃহনির্মাণস্থানের মাঙ্গলিক কার্য বিধান করিবেন, ভারতে প্রচলিত এই ধারণা জানা থাকায় একজন বলিয়া উঠিলেন, আমরা উক্ত স্থানে গিয়া কিছুক্ষণের জন্য ছাউনি ফেলিয়া উহাকে দখল করিয়া লইলে কিরূপ হয়? উক্ত স্থান ইওরোপীয়গণ কর্তৃক ব্যবহৃত ছাউনি ফেলিবার ছোটখাট স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

১২

স্থান—চেনার-তলে ছাউনি, শ্রীনগর
কাল—১৪ই অগস্ট হইতে ২০শে সেপ্টেম্বর

১৪ই অগস্ট—৩রা সেপ্টেম্বর। রবিবার প্রাতঃকাল; পরবর্তী অপরাহ্ণে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী আমাদের সহিত চা পান করিতে আসিতে সম্মত হন। একজন ইওরোপীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাই ছিল উদ্দেশ্য। তিনি বেদান্তের একজন অনুরাগী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এ-বিষয়ে স্বামীজীর কিন্তু কোন উৎসাহ দেখা গেল না। তিনি ঐ জিজ্ঞাসুকে বুঝাইবার জন্য যৎপরোনাস্তি ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা একেবারেই নিষ্ফল হইয়াছিল। অন্যান্য কথার সঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি তো চাই—নিয়মলঙ্ঘন করা সম্ভব হউক, কিন্তু তা হয় কই? যদি সত্য সত্যই আমরা কোন নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে তো আমরা মুক্ত হইয়া যাইতাম। যাহাকে আপনি নিয়ম-ভঙ্গ বলেন, উহা তো অন্য এক প্রকারে নিয়মপালন মাত্র।' তৎপরে তিনি তুরীয় অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যাঁহাকে তিনি কথাগুলি বলিলেন, তাঁহার শুনিবার কান ছিল না।

১৬ই সেপ্টেম্বর। মঙ্গলবারের দিন তিনি আর একবার মধ্যাহ্নভোজনে আমাদের ক্ষুদ্র ছাউনিতে আসিলেন। অপরাহ্ণে এমন জোরে বৃষ্টি শুরু হইল যে, তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া হইল না। নিকটে একখানি টডের 'রাজস্থান' পড়িয়াছিল, তাহাই উঠাইয়া লইয়া কথায় কথায় মীরাবাঈ-এর কথা পাড়িলেন। বলিলেন, 'বাঙলার আধুনিক জাতীয় ভাবসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ এই বইখানি হইতে গৃহীত।' যাহার সকল অংশই উত্তম এমন 'টডে'র মধ্যে—যিনি রানী হইয়াও রানীত্ব পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমিকাগণের সঙ্গে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই মীরাবাঈ-এর গল্পটি তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তিনি যে শরণাগতি, প্রার্থনাপরতা ও সর্বজীবে সেবা প্রচার করিয়াছিলেন, উহা যে শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত 'নামে রুচি জীবে দয়া'র বিরোধী, তাহাও উল্লেখ করিলেন। মীরাবাঈ স্বামীজীর অন্যতম প্রধান প্রেরণাদাত্রী। বিখ্যাত দস্যুদ্বয়ের হঠাৎ স্বভাব-

পরিবর্তন, এবং শেষে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বিগ্রহে লীন করিয়া ফেলিলেন—এইসব গল্পের কথা লোকে অন্যান্য সূত্রে অবগত আছে, সেগুলিকে তিনি মীরাবাঈ-এর গল্পের অন্তর্ভুক্ত করিতেন। একবার তিনি মীরাবাঈ-এর একটি গীত আবৃত্তি এবং অনুবাদ করিয়া একজন মহিলাকে শুনাইতেছেন, শুনিয়াছিলাম; আহা, যদি সবটা মনে রাখিতে পারিতাম! তাঁহার অনুবাদের প্রথমে কথাগুলি এই, 'ভাই লাগিয়া থাক, লাগিয়া থাক, লাগিয়া থাক!' এবং তাহার শেষ এই ছিল,—'সেই অন্ধা বন্ধা নামক দস্যু ভ্রাতৃদ্বয়, সেই নিষ্ঠুর সুজন কসাই এবং খেলার ছলে টিয়াপাখিকে কৃষ্ণনাম করিতে শিখাইয়াছিল সেই গণিকা, ইহারা যদি উদ্ধার পাইয়া থাকে, তবে সকলেরই আশা আছে।'[১]

আবার, আমি তাঁহাকে মীরাবাঈ-এর সেই অদ্ভুত গল্পটি বলিতে শুনিয়াছি। মীরাবাঈ বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া জনৈক বিখ্যাত সাধুকে[২] নিমন্ত্রণ করেন। বৃন্দাবনে পুরুষের সহিত নারীগণের সাক্ষাৎ অকর্তব্য, এই বলিয়া সাধু যাইতে অস্বীকার করেন। যখন তিনবার এইরূপ ঘটিল, তখন 'বৃন্দাবনে আর কেহ যে পুরুষ আছে, তাহা আমি জানিতাম না। আমার ধারণা ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষরূপে বিরাজিত!' এই বলিয়া মীরাবাঈ স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিলেন। যখন বিস্মিত সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তখন 'নির্বোধ, তুমি নাকি নিজেকে পুরুষ বলিয়া অভিহিত কর?'—এই বলিয়া তিনি স্বীয় অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণরূপে উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। আর যেমন সাধু সভয়ে চীৎকার করিয়া তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, অমনি তিনিও তাঁহাকে মাতা যেরূপে সন্তানকে আশীর্বাদ করেন, সেইরূপে আশীর্বাদ করিলেন।

১ মূল গীতটি এই : হরিসে লাগি রহোরে ভাই
তেরা বনত বনত বনি যাই।
অন্ধা তারে বন্ধা তারে তারে সুজন কসাই।
সুগা পড়ায়কে গণিকা তারে তারে মীরাবাঈ।

২ শ্রীচৈতন্যের প্রসিদ্ধ শিষ্য সনাতন গোস্বামী। তিনি বাঙলার নবাবের উজির পদ পরিত্যাগ করিয়া সাধু হইয়াছিলেন।

অদ্য স্বামীজী আকবরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, এবং উক্ত বাদশাহের সভাকবি তানসেনের রচিত তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণ-বিষয়ক একটি গীত আমাদের নিকট গাহিলেন।

তারপর স্বামীজী নানা কথা কহিতে কহিতে 'আমাদের জাতীয় বীর' প্রতাপসিংহের সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন : কেহ তাঁহাকে কখনও বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারে নাই। হাঁ, একবার মুহূর্তের জন্য তিনি পরাভব স্বীকার করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন বটে। একদিন চিতোর হইতে পলায়নের পর মহারানী স্বয়ং রাত্রের সামান্য খাবার প্রস্তুত করিয়াছেন, এমন সময়ে এক ক্ষুধিত মার্জার ছেলেদের জন্য যে রুটিখানি নির্দিষ্ট ছিল, তাহারই উপর ঝাপট মারিয়া সেখানি লইয়া গেল। মেবাররাজ স্বীয় শিশুসন্তানগুলিকে খাদ্যের জন্য কাঁদিতে দেখিলেন। তখন বাস্তবিকই তাঁহার বীরহৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। অদূরে স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তির চিত্র দেখিয়া তিনি প্রলুব্ধ হইলেন, এবং মুহূর্তের জন্য তিনি এই অসমান যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া আকবরের সহিত মিত্রতা-স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা কেবল এক মুহূর্তেরই জন্য। সনাতন বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর তাঁহার নিজ জনকে রক্ষা করিয়া থাকেন। উক্ত চিত্র প্রতাপের মানসপট হইতে অন্তর্হিত হইতে না হইতেই এক রাজপুত নরপতির নিকট হইতে দূত আসিয়া তাঁহাকে সেই প্রসিদ্ধ কাগজপত্রগুলি দিল। তাহাতে লেখা ছিল, 'বিধর্মীর সংস্পর্শে যাঁহার শোণিত কলুষিত হয় নাই, এরূপ লোক আমাদের মধ্যে মাত্র একজন আছেন। তাঁহারও মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়াছে, এ কথা যেন কেহ কখনও বলিতে না পারে।' পাঠ করিবামাত্র প্রতাপের হৃদয় সাহস এবং নূতন আত্মপ্রত্যয়ে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। তিনি বীরগর্বে দেশ হইতে শত্রুকুল নির্মূল করিয়া উদয়পুরে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

তারপর অনূঢ়া রাজনন্দিনী কৃষ্ণকুমারীর সেই অদ্ভুত গল্প শুনিলাম। একাধিক নরপতি এক সঙ্গে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিতেছিলেন। আর যখন তিনটি বৃহৎ বাহিনী পুরদ্বারে উপস্থিত, তাঁহার পিতা কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া কন্যাকে বিষ দিতে মনস্থ করিলেন। কৃষ্ণকুমারীর খুল্লতাতের উপর এই ভার অর্পিত হইল। বালিকা যখন নিদ্রিতা—সেই সময় খুল্লতাত উক্ত কার্য সম্পাদনার্থ তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সৌন্দর্য ও কোমল বয়স দেখিয়া এবং শিশুকালের মুখও মনে পড়ায়

তাঁহার যোদ্ধৃহৃদয় দমিয়া গেল এবং তিনি নির্দিষ্ট কার্য করিতে অক্ষম হইলেন। কোন শব্দ শুনিতে পাইয়া কৃষ্ণকুমারী জাগিয়া উঠিলেন এবং নির্ধারিত সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া হাত বাড়াইয়া বাটিটি লইলেন এবং হাসিতে হাসিতে সেই বিষ পান করিয়া ফেলিলেন। এরূপ ভূরি ভূরি গল্প আমরা শুনিতে লাগিলাম। কারণ, রাজপুত-বীরগণের এরূপ গল্প অসংখ্য।

২০শে সেপ্টেম্বর। শনিবারে স্বামীজী দুই দিনের জন্য আমেরিকার রাজদূত ও তাঁহার পত্নীর আতিথ্য স্বীকার করিতে ডাল হ্রদে গমন করিলেন। সোমবারে ফিরিয়া আসিলেন এবং মঙ্গলবারে স্বামীজী আমাদের নূতন 'মঠে' (আমরা ছাউনির ঐ আখ্যাই দিয়াছিলাম) আসিলেন এবং যাহাতে তিনি গাণ্ডেরবল যাত্রা করিবার পূর্বে কয়েক দিন আমাদের সহিত বাস করিতে পারেন—এই উদ্দেশ্যে তাঁহার নৌকাখানিকে আমাদের নৌকার খুব নিকটে লাগাইলেন।

সম্পাদক (স্বামী সারদানন্দ)-লিখিত পরিশিষ্ট

গাণ্ডেরবল হইতে স্বামীজী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন, এবং বিশেষ কোন কারণবশতঃ তিনি যে কয়েক দিনের মধ্যেই বাঙলা দেশে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। স্বামীজীর ইওরোপীয় সঙ্গিগণ ইতিপূর্বে শীত পড়িতেই লাহোর, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি উত্তর ভারতের মুখ্য নগরগুলি দেখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। অতএব সকলেই একত্র লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এখানে কয়জনকে উত্তর ভারতের স্থানাদি দর্শন করিবার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে রাখিয়া স্বামীজী সদলবলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

স্বামীজীর কথা

স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি[1]

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাস। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ বিজয় করিয়া সবে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। যখন হইতে স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের বিজয়কেতন উড়াইয়াছেন, তখন হইতেই তৎসম্বন্ধীয় যে-কোন বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করিতেছি। তখন ২।৩ বৎসর মাত্র কলেজ ছাড়িয়াছি, কোনরূপ অর্থোপার্জনাদিও করি না, সুতরাং কখনও বন্ধুবান্ধবদের বাটী গিয়া, কখনও বা বাটীর নিকটস্থ ধর্মতলায় 'ইণ্ডিয়ান মিরর' অফিসের বহির্দেশে বোর্ডসংলগ্ন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় স্বামীজীর সম্বন্ধে যে-কোন সংবাদ বা তাঁহার যে-কোন বক্তৃতা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করি। এইরূপে স্বামীজী ভারতে পদার্পণ করা অবধি সিংহলে বা মান্দ্রাজে যাহা কিছু বলিয়াছেন, প্রায় সব পাঠ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আলমবাজার মঠে গিয়া তাঁহার গুরুভাইদের নিকট এবং মঠে যাতায়াতকারী বন্ধুবান্ধবদের নিকটও তাঁহার অনেক কথা শুনিয়াছি ও শুনিতেছি। আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপত্রসমূহ যথা—বঙ্গবাসী, অমৃতবাজার, হোপ, থিওজফিস্ট প্রভৃতি—যাঁহার যেরূপ ভাব তদনুসারে কেহ বিদ্রূপচ্ছলে, কেহ উপদেশদানচ্ছলে, কেহ বা মুরুব্বিয়ানা ধরনে—যিনি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিতেছেন, তাহারও প্রায় কিছুই জানিতে বাকি নাই।

আজ সেই স্বামী বিবেকানন্দ শিয়ালদহ স্টেশনে তাঁহার জন্মভূমি কলিকাতা নগরীতে পদার্পণ করিবেন, আজ তাঁহার শ্রীমূর্তি-দর্শনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হইবে, তাই প্রত্যুষে উঠিয়াই শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এত প্রত্যূষেই স্বামীজীর অভ্যর্থনার্থ বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। অনেক পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতে লাগিল। দেখিলাম, ইংরেজীতে মুদ্রিত দুইটি কাগজ বিতরিত হইতেছে। পড়িয়া দেখিলাম, তাঁহার লণ্ডনবাসী ও আমেরিকাবাসী ছাত্রবৃন্দ বিদায়কালে

১ স্বামী শুদ্ধানন্দ-লিখিত প্রবন্ধ: ১৩২০ সালে আষাঢ় মাসের 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত।

তাঁহার গুণগ্রাম বর্ণন করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে অভিনন্দনপত্রদ্বয় প্রদান করেন, ঐ দুইটি তাহাই। ক্রমে স্বামীজীর দর্শনার্থী লোকসমূহ দলে দলে সমাগত হইতে লাগিল। স্টেশন-প্লাটফর্ম লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলেই পরস্পরকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, স্বামীজীর আসিবার আর কত বিলম্ব। শুনা গেল, তিনি একখানা স্পেশাল ট্রেনে আসিবেন, আসিবার আর বিলম্ব নাই। ঐ যে—গাড়ির শব্দ শুনা যাইতেছে, ক্রমে সশব্দে ট্রেন প্লাটফর্মে প্রবেশ করিল।

স্বামীজী যে গাড়িখানিতে ছিলেন, সেটি যেখানে আসিয়া থামিল, সৌভাগ্যক্রমে আমি ঠিক তাহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিলাম। যাই গাড়ি থামিল, দেখিলাম স্বামীজী দাঁড়াইয়া সমবেত সকলকে করজোড়ে প্রণাম করিলেন। এই এক প্রণামেই স্বামীজী আমার হৃদয় আকর্ষণ করিলেন। তখন ট্রেনমধ্যস্থ স্বামীজীর মূর্তি মোটামুটি দেখিয়া লইলাম। তারপরেই অভ্যর্থনা-সমিতির শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ আসিয়া তাঁহাকে ট্রেন হইতে নামাইয়া কিছু দূরবর্তী একখানি গাড়িতে উঠাইলেন। অনেকে স্বামীজীকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। সেখানে খুব ভিড় জমিয়া গেল। এদিকে দর্শকগণের হৃদয় হইতে স্বতই 'জয় স্বামী বিবেকানন্দজী কী জয়' 'জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কী জয়'—এই আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। আমিও প্রাণ ভরিয়া সেই আনন্দধ্বনিতে যোগ দিয়া জনতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে যখন স্টেশনের বাহিরে পঁহুছিয়াছি, তখন দেখি অনেকগুলি যুবক স্বামীজীর গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। আমিও তাহাদের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলাম, ভিড়ের জন্য পারিলাম না। সুতরাং সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া একটু দূরে দূরে স্বামীজীর গাড়ির সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। স্টেশনে স্বামীজীকে অভ্যর্থনার্থ একটি হরিনাম-সংকীর্তনদলকে দেখিয়াছিলাম। রাস্তায় একটি ব্যাণ্ড পার্টি বাজনা বাজাইতে বাজাইতে স্বামীজীর সঙ্গে চলিল, দেখিলাম। রিপন কলেজ পর্যন্ত রাস্তা নানাবিধ পতাকা, লতা, পাতা ও পুষ্পে সজ্জিত হইয়াছিল। গাড়ি আসিয়া রিপন কলেজের সম্মুখে দাঁড়াইল। এইবার স্বামীজীকে বেশ ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলাম। দেখিলাম, তিনি মুখ বাড়াইয়া কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন। মুখখানি

তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, যেন জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে, তবে পথের শ্রান্তিতে কিঞ্চিৎ ঘর্মাক্ত ও মলিন হইয়াছে মাত্র। দুইখানি গাড়ি—একটিতে স্বামীজী এবং মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার; মাননীয় চারুচন্দ্র মিত্র ঐ গাড়িতে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া জনতাকে নিয়মিত করিতেছেন। অপরটিতে গুডউইন, হ্যারিসন (সিংহল হইতে স্বামীজীর সঙ্গী জনৈক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সাহেব), জি. জি, কিডি ও আলাসিঙ্গা নামক তিনজন মাদ্রাজী শিষ্য এবং ত্রিগুণাতীত স্বামী।

যাহা হউক, অল্পক্ষণ গাড়ি দাঁড়াইবার পরই অনেকের অনুরোধে স্বামীজী রিপন কলেজ-বাটীতে প্রবেশ করিয়া সমবেত সকলকে সম্বোধন করিয়া দুই-তিন মিনিট ইংরেজীতে একটু বলিয়া আবার ফিরিয়া গাড়িতে উঠিলেন। এবার আর শোভাযাত্রা করা হইল না। গাড়ি বাগবাজারে পশুপতিবাবুর বাটীর দিকে ছুটিল। আমিও মনে মনে স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলাম।

* * *

আহারাদির পর মধ্যাহ্নে চাঁপাতলায় খগেনদের (স্বামী বিমলানন্দ) বাটীতে গেলাম। সেখান হইতে খগেন ও আমি তাহাদের একখানি টমটমে চড়িয়া পশুপতি বসুর বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। স্বামীজী উপরের ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন, বেশী লোকজনকে যাইতে দেওয়া হইতেছে না। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পরিচিত স্বামীজীর কয়েকজন গুরুভাই-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। স্বামী শিবানন্দ আমাদিগকে স্বামীজীর নিকট লইয়া গেলেন এবং পরিচয় করিয়া দিলেন—'এরা আপনার খুব admirer (মুগ্ধ ভক্ত)'।

স্বামীজী ও যোগানন্দ স্বামী পশুপতিবাবুর দ্বিতলস্থ একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পাশাপাশি দুইখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। অন্যান্য স্বামিগণ উজ্জ্বল গৈরিক-বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছিলেন। মেজে কার্পেট-মোড়া ছিল। আমরা প্রণাম করিয়া সেই কার্পেটের উপর উপবেশন করিলাম। স্বামীজী যোগানন্দ-স্বামীর সহিত তখন কথা কহিতেছিলেন। আমেরিকা-ইওরোপে স্বামীজী কি দেখিলেন, এই প্রসঙ্গ হইতেছিল। স্বামীজী বলিতেছিলেন:

দেখ্, যোগে, দেখলুম কি জানিস?—সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেলা করছে। আমাদের বাপ-দাদারা সেইটেকে religion-এর দিকে

manifest করেছিলেন, আর আধুনিক পাশ্চাত্যদেশীয়েরা সেইটেকেই মহারজোগুণের ক্রিয়ারূপে manifest করছে। বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেলা হচ্ছে মাত্র।

খগেনের দিকে চাহিয়া তাহাকে খুব রোগা দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'এ ছেলেটিকে বড় sickly দেখছি যে।'

স্বামী শিবানন্দ উত্তর করিলেন, 'এটি অনেক দিন থেকে chronic dyspepsia-তে (পুরানো অজীর্ণ রোগে) ভুগছে।'

স্বামীজী বলিলেন, 'আমাদের বাঙলা দেশটা বড় sentimental (ভাবপ্রবণ) কি-না, তাই এখানে এত dyspepsia.'

কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা প্রণাম করিয়া উঠিয়া বাটী ফিরিলাম।

স্বামীজী এবং তাঁহার শিষ্য মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। স্বামীজীর মুখের কথাবার্তা ভাল করিয়া শুনিবার জন্য ঐ স্থানে বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে করিয়া কয়েকদিন গিয়াছিলাম। তাহার যতগুলি স্মরণ হয়, এইবার তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব।

স্বামীজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কথোপকথন হয়—প্রথম এই বাগানবাটীর একটি ঘরে। স্বামীজী আসিয়া বসিয়াছেন, আমিও গিয়া প্রণাম করিয়া বসিয়াছি, সেখানে আর কেহ নাই। হঠাৎ কেন জানি না—স্বামীজী আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই কি তামাক খাস্?'

আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে না।'

তাহাতে স্বামীজী বলিলেন, 'হাঁ, অনেকে বলে—তামাকটা খাওয়া ভাল নয়; আমিও ছাড়বার চেষ্টা করছি।'

আর একদিন স্বামীজীর নিকট একটি বৈষ্ণব আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত স্বামীজী কথা কহিতেছেন। আমি একটু দূরে রহিয়াছি, আর কেহ নাই। স্বামীজী বলিতেছেন, 'বাবাজী, আমেরিকাতে আমি একবার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতা শুনে একজন পরমাসুন্দরী যুবতী—অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারিণী—সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে এক নির্জন দ্বীপে গিয়ে কৃষ্ণধ্যানে উন্মত্তা হলেন।' তারপর স্বামীজী ত্যাগ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, 'যে-সব ধর্মসম্প্রদায়ে

ত্যাগের ভাবের তেমন প্রচার নেই, তাদের ভেতর শীঘ্রই অবনতি এসে থাকে—যথা বল্লভাচার্য সম্প্রদায়।'

আর একদিন গিয়াছি। দেখি, অনেকগুলি লোক বসিয়া আছেন এবং একটি যুবককে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী কথাবার্তা কহিতেছেন। যুবকটি বেঙ্গল থিওজফিক্যাল সোসাইটির গৃহে থাকে। সে বলিতেছে, 'আমি নানা সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছি, কিন্তু সত্য কি, নির্ণয় করিতে পারিতেছি না।'

স্বামীজী অতি স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতেছেন, 'দেখ বাবা, আমারও একদিন তোমারই মতো অবস্থা ছিল—তা তোমার ভাবনা কি? আচ্ছা, ভিন্ন ভিন্ন লোকে তোমাকে কি কি বলেছিল এবং তুমি বা কি রকম করেছিলে বলো দেখি?'

যুবক বলিতে লাগিল, 'মহাশয়, আমাদের সোসাইটিতে ভবানীশঙ্কর নামক একজন পণ্ডিত প্রচারক আছেন, তিনি আমায় মূর্তিপূজার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির যে বিশেষ সহায়তা হয়, তা সুন্দররূপে বুঝিয়ে দিলেন, আমিও তদনুসারে দিন কতক খুব পূজা-অর্চনা করতে লাগলুম, কিন্তু তাতে শান্তি পেলুম না। সেই সময় একজন আমাকে উপদেশ দিলেন, দেখ, মনটাকে একেবারে শূন্য করবার চেষ্টা করো দেখি—তাতে পরম শান্তি পাবে। আমি দিন কতক সেই চেষ্টাই করতে লাগলুম, কিন্তু তাতেও আমার মন শান্ত হ'ল না। আমি, মহাশয়, এখনও একটি ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে যতক্ষণ সম্ভব বসে থাকি, কিন্তু শান্তিলাভ কিছুতেই হচ্ছে না। বলতে পারেন, কিসে শান্তি হয়?'

স্বামীজী স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'বাপু, আমার কথা যদি শোন, তবে তোমাকে আগে তোমার ঘরের দরজাটি খুলে রাখতে হবে। তোমার বাড়ির কাছে, পাড়ার কাছে কত অভাবগ্রস্ত লোক রয়েছে, তোমায় তাদের যথাসাধ্য সেবা করতে হবে। যে পীড়িত, তাকে ঔষধ পথ্য যোগাড় ক'রে দিলে এবং শরীরের দ্বারা সেবাশুশ্রূষা করলে। যে খেতে পাচ্ছে না, তাকে খাওয়ালে। যে অজ্ঞান, তাকে—তুমি যে এত লেখাপড়া শিখেছ, মুখে মুখে যতদূর হয় বুঝিয়ে দিলে। আমার পরামর্শ যদি চাও বাপু, তা হ'লে এইভাবে যথাসাধ্য লোকের সেবা করতে পারলে তুমি মনের শান্তি পাবে।'

যুবকটি বলিল, 'আচ্ছা মহাশয়, ধরুন আমি একজন রোগীর সেবা করতে গেলাম, কিন্তু তার জন্য রাত জেগে, সময়ে না খেয়ে, অত্যাচার ক'রে আমার নিজেরই যদি রোগ হয়ে পড়ে?'

স্বামীজী এতক্ষণ যুবকটির সহিত স্নেহপূর্ণ স্বরে সহানুভূতির সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন। এই শেষ কথাটিতে একটু বিরক্ত হইলেন, বোধ হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—'দেখ বাপু, রোগীর সেবা করতে গিয়ে তুমি তোমার নিজের রোগের আশঙ্কা ক'রছ, কিন্তু তোমার কথাবার্তা শুনে আর ভাবগতিক দেখে আমার বোধ হচ্ছে এবং উপস্থিত যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও সকলে বেশ বুঝতে পারছেন যে, তুমি এমন ক'রে রোগীর সেবা কোন কালে করবে না, যাতে তোমার নিজের রোগ হয়ে যাবে।'

যুবকটির সঙ্গে আর বিশেষ কথাবার্তা হইল না।

আর একদিন মাস্টার[১] মহাশয়ের সঙ্গে কথা হইতেছে। মাস্টার মহাশয় বলিতেছেন, 'দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বলো, সে তো মায়ার রাজ্যের কথা। যখন বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ, সমুদয় মায়ার বন্ধন কাটানো, তখন ও-সব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে লোককে ঐ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি?'

স্বামীজী বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিলেন, 'মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? আত্মা তো নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির জন্য চেষ্টা কি?

মাস্টার মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন।

টমাস আ কেম্পিস-এর 'Imitation of Christ'-এর প্রসঙ্গ উঠিল। স্বামীজী সংসারত্যাগ করিবার কিছু পূর্বে এই গ্রন্থখানি বিশেষভাবে চর্চা করিতেন এবং বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে তাঁহার গুরুভাইরাও স্বামীজীর দৃষ্টান্তে ঐ গ্রন্থটি সাধক-জীবনের বিশেষ সহায়ক জ্ঞানে সদা সর্বদা উহার আলোচনা করিতেন। স্বামীজী ঐ গ্রন্থের এরূপ অনুরাগী ছিলেন যে, তদানীন্তন 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' নামক মাসিকপত্রে উহার একটি সূচনা লিখিয়া 'ঈশানুসরণ' নামে ধারাবাহিক অনুবাদ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বোধ হয় স্বামীজীর উক্ত গ্রন্থের উপর এখন

১ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-প্রণেতা শ্রীম

কিরূপ ভাব আনিবার জন্য—উহার ভিতরে দীনতার যে উপদেশ আছে, তাহার প্রসঙ্গ পাড়িয়া বলিলেন, 'নিজেকে এইরূপ একান্ত হীন ভাবিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপে সম্ভবপর হইবে?' স্বামীজী শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমরা আবার হীন কিসে? আমাদের আবার অন্ধকার কোথায়? আমরা যে জ্যোতির রাজ্যে বাস করছি, আমরা যে জ্যোতির তনয়!'

গ্রন্থোক্ত ঐ প্রাথমিক সাধন-সোপান অতিক্রম করিয়া স্বামীজী সাধন-রাজ্যের কত উচ্চ ভূমিতে উপনীত হইয়াছেন!

আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতাম, সংসারের অতি সামান্য ঘটনাও তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারিত না, উহার সাহায্যেও তিনি উচ্চ ধর্মভাব-প্রচারের চেষ্টা করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়, মঠের প্রাচীন সাধুগণ যাঁহাকে 'রামলাল-দাদা' বলিয়া নির্দেশ করেন, দক্ষিণেশ্বর হইতে একদিন স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী একখানি চেয়ার আনাইয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন এবং স্বয়ং পায়চারি করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধাবিনম্র দাদা তাহাতে একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'আপনি বসুন, আপনি বসুন।' স্বামীজী কিন্তু কোনমতে ছাড়িবার পাত্র নহেন, অনেক বলিয়া কহিয়া দাদাকে চেয়ারে বসাইলেন এবং স্বয়ং বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।'

অনেকগুলি ছাত্র আসিয়াছে। স্বামীজী একখানি চেয়ারে ফাঁকায় বসিয়া আছেন। সকলেই তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার দুটা কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, অথচ সেখানে আর কোন আসন নাই, যাহাতে ছেলেদের বসিতে বলা যায়, কাজেই তাহাদিগকে ভূমিতে বসিতে হইল। স্বামীজীর মনে হইতেছিল, ইহাদিগকে বসিবার কোন আসন দিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু আবার বুঝি তাঁহার মনে অন্য ভাবের উদয় হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'তা বেশ, তোমরা বেশ বসেছ, একটু একটু তপস্যা করা ভাল।'

আমাদের পাড়ার চণ্ডীচরণ বর্ধনকে একদিন লইয়া গিয়াছি। চণ্ডীবাবু Hindu Boys' School নামক একটি ছোটখাট বিদ্যালয়ের স্বত্বাধিকারী, সেখানে ইংরেজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যাপনা করানো হয়। তিনি পূর্ব

হইতেই ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন, পরে স্বামীজীর বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া তাঁহার উপর খুব শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠেন।

চণ্ডীবাবু আসিয়া স্বামীজীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামীজী, কি রকম ব্যক্তিকে গুরু করা যেতে পারে?'

স্বামীজী বলিলেন, 'যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ ব'লে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু। দেখ না, আমার গুরু আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব ব'লে দিয়েছিলেন।'

চণ্ডীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা স্বামীজী, কৌপীন পরলে কি কাম-দমনের বিশেষ সহায়তা হয়?'

স্বামীজী বলিলেন, 'একটু-আধটু সাহায্য হ'তে পারে। কিন্তু যখন ঐ বৃত্তি প্রবল হয়ে উঠে, তখন কি বাপ, কৌপীনে আটকায়? মনটা ভগবানে একেবারে তন্ময় না হয়ে গেলে বাহ্য কোন উপায়ে কাম একেবারে যায় না। তবে কি জানো—যতক্ষণ লোকে সেই অবস্থা সম্পূর্ণ লাভ না করে, ততক্ষণ নানা বাহ্য উপায়-অবলম্বনের চেষ্টা স্বভাবতই ক'রে থাকে। আমার একবার এমন কামের উদয় হয়েছিল যে, আমি নিজের উপর মহা বিরক্ত হয়ে আগুনের মালসার উপর বসেছিলাম। শেষে ঘা শুকাতে অনেক দিন লাগে।'

চণ্ডীবাবু একটু ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া ইংরেজীতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'O Great Teacher, tear up the veil of hypocrisy and teach the world the one thing needful—how to conquer lust.'

স্বামীজী চণ্ডীবাবুকে শান্ত ও আশ্বস্ত করিলেন।

পরে Edward Carpenter-এর প্রসঙ্গ উঠিল। স্বামীজী বলিলেন, 'লণ্ডনে ইনি অনেক সময় আমার কাছে এসে বসে থাকতেন। আরও অনেক Socialist Democrat প্রভৃতি আসতেন। তাঁরা বেদান্তোক্ত ধর্মে তাঁদের নিজ নিজ মতের পোষকতা পেয়ে বেদান্তের উপর খুব আকৃষ্ট হতেন।'

স্বামীজী উক্ত কার্পেণ্টার সাহেবের 'Adam's Peak to Elephanta' নামক গ্রন্থখানি পড়িয়াছিলেন। এইবার উক্ত পুস্তকে মুদ্রিত চণ্ডীবাবুর ছবিটির কথা তাঁহার মনে পড়িল, বলিলেন, 'আপনার চেহারা যে বই-এ

আগেই দেখেছি।' আরও কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর সন্ধ্যা হইয়া যাওয়াতে স্বামীজী বিশ্রামের জন্য উঠিলেন। উঠিবার সময় চণ্ডীবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'চণ্ডীবাবু, আপনারা তো অনেক ছেলের সংস্রবে আসেন, আমায় গুটিকতক সুন্দর সুন্দর ছেলে দিতে পারেন?' চণ্ডীবাবু বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, স্বামীজীর কথার সম্পূর্ণ মর্ম পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই; স্বামীজী যখন বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিতেছেন, তখন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'সুন্দর ছেলের কথা কি বলছিলেন?'

স্বামীজী বলিলেন, 'চেহারা দেখতে ভাল, এমন ছেলে আমি চাচ্ছি না—আমি চাই বেশ সুস্থশরীর, কর্মঠ সৎপ্রকৃতি কতকগুলি ছেলে, তাদের trained করতে চাই, যাতে তারা নিজেদের মুক্তিসাধনের জন্য ও জগতের কল্যাণসাধনের জন্য প্রস্তুত হ'তে পারে।'

আর একদিন গিয়া দেখি, স্বামীজী ইতস্ততঃ বেড়াইতেছেন, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী[১] স্বামীজীর সহিত খুব পরিচিতভাবে আলাপ করিতেছেন। স্বামীজীকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমাদের অতিশয় কৌতূহল হইল। প্রশ্নটি এই: অবতার ও মুক্ত বা সিদ্ধ পুরুষে পার্থক্য কি? আমরা শরৎবাবুকে স্বামীজীর নিকট ঐ প্রশ্নটি উত্থাপিত করিতে বিশেষ অনুরোধ করাতে তিনি অগ্রসর হইয়া তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা শরৎবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বামীজীর নিকট যাইয়া তিনি ঐ প্রশ্নের কি উত্তর দেন, তাহা শুনিতে লাগিলাম। স্বামীজী উক্ত প্রশ্নের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, 'বিদেহমুক্তিই যে সর্বোচ্চ অবস্থা—এ আমার সিদ্ধান্ত, তবে সাধনাবস্থায় যখন ভারতের নানাদিকে ভ্রমণ করতুম, তখন কত গুহায় নির্জনে বসে কত কাল কাটিয়েছি, কতবার মুক্তিলাভ হ'ল না বলে প্রায়োপবেশন ক'রে দেহত্যাগ করবার সঙ্কল্প করেছি, কত ধ্যান—কত সাধন-ভজন করেছি, কিন্তু এখন আর মুক্তিলাভের জন্য সে বিজাতীয় আগ্রহ নাই। এখন কেবল মনে হয়, যত দিন পর্যন্ত পৃথিবীর একটা লোকও অমুক্ত থাকছে, ততদিন আমার নিজের মুক্তির কোন প্রয়োজন নেই।'

আমি স্বামীজীর উক্ত কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ের অপার করুণার কথা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলাম; আরও ভাবিতে লাগিলাম, ইনি কি নিজ

১ 'স্বামিশিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা

দৃষ্টান্ত দিয়া অবতারপুরুষের লক্ষণ বুঝাইলেন? ইনিও কি একজন অবতার? আরও মনে হইল, স্বামীজী এক্ষণে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার মুক্তির জন্য আর আগ্রহ নাই।

আর একদিন আমি ও খগেন (স্বামী বিমলানন্দ) সন্ধ্যার পর গিয়াছি। ঠাকুরের ভক্ত হরমোহনবাবু আমাদিগকে স্বামীজীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য বলিলেন, 'স্বামীজী, এঁরা আপনার খুব admirer এবং খুব বেদান্ত আলোচনা করেন।' স্বামীজী বেদান্তের কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'উপনিষদ কিছু পড়েছ?

আমি। আজ্ঞা হাঁ, একটু-আধটু দেখেছি।

স্বামীজী। কোন্ উপনিষদ পড়েছ?

আমি। কঠ উপনিষদ পড়েছি।

স্বামীজী। আচ্ছা, কঠ-টাই বলো, কঠ উপনিষদ খুব grand—কবিত্বপূর্ণ।

আমি। কঠটা মুখস্থ নেই—গীতা থেকে খানিকটা বলি।

স্বামীজী। আচ্ছা, তাই বলো।

তখন গীতার একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগস্থ 'স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা' হইতে আরম্ভ করিয়া অর্জুনের সমুদয় স্তবটা আওড়াইয়া দিলাম।

শুনিয়া স্বামীজী উৎসাহ দিবার জন্য 'বেশ, বেশ' বলিতে লাগিলেন। ইহার পরদিন বন্ধুবর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজীর দর্শনার্থ গিয়াছি। রাজেনকে বলিয়াছি, 'ভাই, কাল স্বামীজীর কাছে উপনিষদ নিয়ে বড় অপ্রস্তুত হয়েছি। তোমার নিকট উপনিষদ কিছু থাকে তো পকেটে ক'রে নিয়ে চল। যদি কালকের মতো উপনিষদের কথা পাড়েন তো তাই পড়লেই চলবে।' রাজেনের নিকট একখানি প্রসন্নকুমার শাস্ত্রীকৃত ঈশকেনকঠাদি উপনিষদ ও তাহার বঙ্গানুবাদ পকেট এডিশন ছিল, সেটি পকেটে করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। অদ্য অপরাহ্নে একঘর লোক বসিয়াছিলেন; যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। আজও কিরূপে ঠিক স্মরণ নাই—কঠ-উপনিষদের প্রসঙ্গ উঠিল। আমি অমনি তাড়াতাড়ি পকেট হইতে বাহির করিয়া ঐ উপনিষদের গোড়া হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পাঠের অন্তরালে স্বামীজী নচিকেতার শ্রদ্ধার কথা—যে শ্রদ্ধায় তিনি নির্ভীকচিত্তে যমভবনে যাইতেও সাহসী হইয়াছিলেন—বলিতে লাগিলেন। যখন

নচিকেতার দ্বিতীয় বর—স্বর্গপ্রাপ্তির কথা পড়া হইতে লাগিল, তখন সেইখানটা বেশী না পড়িয়া কিছু কিছু ছাড়িয়া দিয়া তৃতীয় বরের স্থানটা পড়িতে বলিলেন।

নচিকেতা বলিলেন, মৃত্যুর পর লোকের সন্দেহ—দেহ গেলে কিছু থাকে কি-না, তারপর যমের নচিকেতাকে প্রলোভন-প্রদর্শন ও নচিকেতার দৃঢ়ভাবে তৎসমুদয় প্রত্যাখ্যান। এইসব খানিকটা পড়া হইলে স্বামীজী তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় ঐ সম্বন্ধে কত কি বলিলেন।...

কিন্তু এই দুই দিনের উপনিষৎপ্রসঙ্গে স্বামীজীর উপনিষদে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কিয়দংশ আমার ভিতর সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল। কারণ, তাহার পর হইতে যখনই সুযোগ পাইয়াছি, পরম শ্রদ্ধার সহিত উপনিষদ অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। বিভিন্ন সময়ে তাঁহার মুখে উচ্চারিত অপূর্ব স্বর লয় তাল ও তেজস্বিতার সহিত পঠিত উপনিষদের এক একটি মন্ত্র যেন এখনও দিব্য কর্ণে শুনিতে পাই। যখন পরচর্চায় মগ্ন হইয়া আত্মচর্চা ভুলিয়া থাকি, তখন শুনিতে পাই—তাঁহার সেই সুপরিচিত কিন্নরকণ্ঠোচ্চারিত উপনিষদুক্ত বাণীর দিব্য গম্ভীর ঘোষণা:

'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ।'[১]

—সেই একমাত্র আত্মাকে জানো, অন্য বাক্য সব পরিত্যাগ কর, তিনিই অমৃতের সেতু।

যখন আকাশ ঘোরঘটাচ্ছন্ন হইয়া বিদ্যুল্লতা চমকিতে থাকে, তখন যেন শুনিতে পাই—স্বামীজী সেই আকাশস্থা সৌদামিনীর দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া বলিতেছেন:

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্,
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥[২]

—সেখানে সূর্যও প্রকাশ পায় না, চন্দ্র-তারাও নহে, এইসব বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না—এই সামান্য অগ্নির কথা কি? তিনি প্রকাশিত থাকাতে

১ মুণ্ডক, ২।২।৫ ২ কঠোপনিষদ্, ২।২।১৫

তাঁহার পশ্চাৎ সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে—তাঁহার প্রকাশে এই সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে।

অথবা যখন তত্ত্বজ্ঞানকে সুদূরপরাহত মনে করিয়া হৃদয় হতাশায় আচ্ছন্ন হয়, তখন যেন শুনিতে পাই—স্বামীজী আনন্দোৎফুল্লমুখে উপনিষদের এই আশ্বাসবাণী আবৃত্তি করিতেছেন :

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

*

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।[১]

—হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, তোমরা শ্রবণ কর। আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—যিনি আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় ও অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁহাকে জানিলেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে—মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

* * *

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ ভাগ। আলমবাজার মঠ। সবে চার-পাঁচ দিন হইল বাড়ি ছাড়িয়া মঠে রহিয়াছি। পুরাতন সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ, নির্মলানন্দ ও সুবোধানন্দ মাত্র আছেন। স্বামীজী দার্জিলিং হইতে আসিয়া পড়িলেন—সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, স্বামীজীর মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল, কিডি, জি. জি. প্রভৃতি।

স্বামী নিত্যানন্দ অল্প কয়েকদিন হইল স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইনি স্বামীজীকে বলিলেন, 'এখন অনেক নূতন নূতন ছেলে সংসার ত্যাগ ক'রে মঠবাসী হয়েছেন, তাঁদের জন্য একটা নির্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে বড় ভাল হয়।'

স্বামীজী তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, 'হাঁ, হাঁ—একটা নিয়ম করা ভাল বইকি। ডাক্ সকলকে।' সকলে আসিয়া বড়

১ শ্বেতাশ্বতর, ২।৫ ; ৩।৮

ঘরটিতে জমা হইলেন। তখন স্বামীজী বলিলেন, 'একজন কেউ লিখতে থাক্, আমি বলি।' তখন এ উহাকে সামনে ঠেলিয়া দিতে লাগিল—কেউ অগ্রসর হয় না, শেষে আমাকে ঠেলিয়া অগ্রসর করিয়া দিল। তখন মঠে লেখাপড়ার উপর সাধারণতঃ একটা বিতৃষ্ণা ছিল। সাধনভজন করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা—এইটিই সার, আর লেখাপড়াটা—উহাতে মানযশের ইচ্ছা আসিবে, যাহারা ভগবানের আদিষ্ট হইয়া প্রচারকার্যাদি করিবে, তাহাদের পক্ষে আবশ্যক হলেও সাধকদের পক্ষে উহার প্রয়োজন তো নাই-ই বরং উহা হানিকর—এই ধারণাই প্রবল ছিল। যাহা হউক, পূর্বেই বলিয়াছি, আমি কতটা forward ও বেপরোয়া—আমি অগ্রসর হইয়া গেলাম। স্বামীজী একবার শূন্যের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কি থাকবে?' (অর্থাৎ আমি কি মঠের ব্রহ্মচারিরূপে তথায় থাকিব অথবা দুই-এক দিনের জন্য মঠে বেড়াইতে আসিয়াছি, আবার চলিয়া যাইব?) সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যে একজন বলিলেন, 'হাঁ।' তখন আমি কাগজ কলম প্রভৃতি ঠিক করিয়া লইয়া গণেশের আসন গ্রহণ করিলাম। নিয়মগুলি বলিবার পূর্বে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'দেখ্ এইসব নিয়ম করা হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—সব নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করার মানে এই যে আমাদের স্বভাবতই কতকগুলি কু-নিয়ম রয়েছে—সু-নিয়মের দ্বারা সেই কু-নিয়মগুলিকে দূর ক'রে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।'

তারপর নিয়মগুলি লেখানো হইতে লাগিল। প্রাতে ও সায়াহ্নে জপ ধ্যান, মধ্যাহ্নে বিশ্রামান্তে নিজে নিজে শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও অপরাহ্ণে সকলে মিলিয়া একজন পাঠকের নিকট কোন নির্দিষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থাদি শুনিতে হইবে, এই ব্যবস্থা হইল। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্ণে একটু একটু করিয়া ডেলসার্ট ব্যায়াম করিতে হইবে, তাহাও নির্দিষ্ট হইল। মাদকদ্রব্যের মধ্যে তামাক ছাড়া আর কিছু চলিবে না—এই ভাবের একটি নিয়ম লেখা হইল। শেষে সমুদয় লেখানো শেষ করিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'দেখ্, একটু দেখে, শুনে নিয়মগুলি ভাল করে কপি ক'রে রাখ্—দেখিস, যদি কোন নিয়মটা

negative (নেতিবাচক) ভাবে লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে positive (ইতিবাচক) ক'রে দিবি।'

এই শেষোক্ত আদেশ-প্রতিপালনে আমাদিগকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। স্বামীজীর উপদেশ ছিল—লোককে খারাপ বলা বা তাহার বিরুদ্ধে কু-সমালোচনা করা, তাহার দোষ দেখানো, তাহাকে 'তুমি অমুক ক'রো না, তমুক ক'রো না'—এইরূপ negative উপদেশ দিলে তাহার উন্নতির বিশেষ সাহায্য হয় না; কিন্তু তাহাকে যদি একটা আদর্শ দেখাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই তাহার সহজে উন্নতি হইতে পারে, তাহার দোষগুলি আপনা-আপনি চলিয়া যায়। ইহাই স্বামীজীর মূল কথা। স্বামীজীর সব নিয়মগুলিকে positive করিয়া লইবার উপদেশে আমাদের মনে বারবার ঐ কথাই উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার আদেশমত যখন আমরা সব নিয়মগুলির মধ্য হইতে 'না' কথাটির সম্পর্ক রহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তখন দেখিলাম আর কোন নিয়মে কোন গোল নাই, কিন্তু মাদকদ্রব্যসম্বন্ধীয় নিয়মটাতেই একটু গোল। সেটি প্রথম এইভাবে লেখা হইয়াছিল—'মঠে তামাক ব্যতীত কেহ অন্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করিতে পারিবেন না।' যখন আমরা উহার মধ্যগত 'না' টিকে বাদ দিবার চেষ্টা করিলাম, তখন প্রথম দাঁড়াইল—'সকলে তামাক খাইবেন।' কিন্তু এরূপ বাক্যের দ্বারা সকলের উপর (যে না খায়, তাহারও উপর) তামাক খাইবার বিধি আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, শেষে অনেক মাথা খাটাইয়া নিয়মটি এইরূপ দাঁড়াইল—'মঠে কেবলমাত্র তামাক সেবন করিতে পারিবেন'। যাহা হউক এখন মনে হইতেছে আমরা একটা বিকট আপোষ করিয়াছিলাম। Detail-এর (খুঁটিনাটির) ভিতর আসিলে বিধিনিষেধের মধ্যে নিষেধটাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না; তবে ইহাও সত্য যে, এই বিধিনিষেধগুলি যত মূলভাবের অনুগামী হয়, ততই উহাতে অধিকতর উপযোগিতা দাঁড়ায়। আর স্বামীজীরও ঐরূপ অভিপ্রায়ই ছিল।

•

একদিন অপরাহ্ণে বড় ঘরে একঘর লোক। ঘরের মধ্যে স্বামীজী অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, নানা প্রসঙ্গ চলিতেছে। আমাদের বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ বসু (আলিপুর আদালতের স্বনামখ্যাত উকিল) মহাশয়ও

আছেন। তখন বিজয়বাবু সময়ে সময়ে নানা সভায়—এমন কি, কখন কখন কংগ্রেসে দাঁড়াইয়াও ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার এই বক্তৃতাশক্তির কথা কেহ স্বামীজীর নিকট উল্লেখ করিলে স্বামীজী বলিলেন, 'তা বেশ বেশ। আচ্ছা, অনেক লোক এখানে সমবেত আছেন—এখানে দাঁড়িয়ে একটু বক্তৃতা কর দেখি। আচ্ছা—soul (আত্মা) সম্বন্ধে তোমার যা idea (ধারণা), তাই খানিকটা বলো।' বিজয়বাবু নানা ওজর করিতে লাগিলেন—স্বামীজী এবং আর আর অনেকেও তাঁহাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অন্ততঃ ১৫ মিনিট অনুরোধ-উপরোধের পরও যখন কেহ তাঁহার সঙ্কোচ ভাঙিতে কৃতকার্য হইলেন না, তখন অগত্যা হার মানিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি বিজয়বাবু হইতে আমার উপর পড়িল। আমি মঠে যোগ দিবার পূর্বে কখন কখন ধর্মসম্বন্ধে বাঙলাভাষায় বক্তৃতা করিতাম, আর আমাদের এক ডিবেটিং ক্লাব ছিল, তাহাতে ইংরেজী বলিবার অভ্যাস করিতাম। আমার সম্বন্ধে এই-সকল বিষয় কেহ উল্লেখ করাতেই এবার আমার উপর চোট পড়িল, আর পূর্বেই বলিয়াছি আমি অনেকটা বেপরোয়া। আমাকে আর বেশী বলিতে হইল না। আমি একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িলাম এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদান্তর্গত আত্মতত্ত্বের বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মা সম্বন্ধে প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া যা মুখে আসিল বলিয়া গেলাম। ভাষা বা ব্যাকরণের ভুল হইতেছে বা ভাবের অসামঞ্জস্য হইতেছে, এ-সকল খেয়ালই করিলাম না। দয়ার সাগর স্বামীজী আমার এই হঠকারিতায় কিছু-মাত্র বিরক্ত না হইয়া আমায় খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আমার পরে স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত প্রকাশানন্দ স্বামী প্রায় ১০ মিনিটকাল ধরিয়া আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বলিলেন। তিনি স্বামীজীর বক্তৃতার প্রারম্ভের অনুকরণ করিয়া বেশ গম্ভীর স্বরে নিজ বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতারও খুব প্রশংসা করিলেন।

আহা! স্বামীজী বাস্তবিকই কাহারও দোষ দেখিতেন না। যাহার যেটুকু সামান্য গুণ বা শক্তি দেখিতেন, তাহাতেই উৎসাহ দিয়া যাহাতে তাহার ভিতরের অব্যক্ত শক্তিগুলি প্রকাশিত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেন।··· কোথায় পাইব এমন ব্যক্তি, যিনি শিষ্যবর্গকে লিখিতে পারেন, 'I want each one of my children to be a hundred times greater than I

could ever be. Everyone of you must be a giant—*must*, that is my word!'—আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকে, আমি যাহা হইতে পারিতাম, তদপেক্ষা শতগুণে বড় হও। তোমাদের প্রত্যেককেই শূরবীর হইতে হইবে—হইতেই হইবে, নহিলে চলিবে না।

সেই সময়ে স্বামীজীর ইংলণ্ডে প্রদত্ত জ্ঞানযোগসম্বন্ধীয় বক্তৃতাসমূহ লণ্ডন হইতে ই. টি. স্টার্ডি সাহেব কর্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইতেছে—মঠেও উহার দু-এক কপি প্রেরিত হইতেছে। স্বামীজী দার্জিলিং হইতে তখনও ফেরেন নাই—আমরা পরম আগ্রহসহকারে সেই উদ্দীপনাপূর্ণ অদ্বৈততত্ত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যা-স্বরূপ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতেছি। বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল ইংরেজী জানেন না, কিন্তু তাঁহার বিশেষ আগ্রহ 'নরেন' বেদান্তসম্বন্ধে বিলাতে কি বলিয়া লোককে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা শুনেন। তাঁহার অনুরোধে আমরা তাঁহাকে সেই পুস্তিকাগুলি পড়িয়া তাহার অনুবাদ করিয়া শুনাই। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন, 'তোমরা স্বামীজীর এই বক্তৃতাগুলির বাঙলা অনুবাদ কর না।' তখন আমরা অনেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত উক্ত pamphlet-গুলির মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা সেইখানি পছন্দ করিয়া অনুবাদ আরম্ভ করিলাম। ইতোমধ্যে স্বামীজী আসিয়া পড়িয়াছেন। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীকে বলিলেন, 'এই ছেলেরা তোমার বক্তৃতাগুলির অনুবাদ আরম্ভ করেছে।' পরে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তোমরা কে কি অনুবাদ করেছ, স্বামীজীকে শুনাও দেখি।' তখন সকলেই নিজ নিজ অনুবাদ আনিয়া কিছু কিছু স্বামীজীকে শুনাইল। স্বামীজীও অনুবাদ সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—এই শব্দের এইরূপ অনুবাদ হইলে ভাল হয়, এইরূপ দুই-একটি কথাও বলিলেন। একদিন স্বামীজীর কাছে কেবল আমিই রহিয়াছি, তিনি হঠাৎ আমায় বলিলেন, 'রাজযোগটা তর্জমা কর্ না।' আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদেশ স্বামীজী কেন করিলেন? বহুদিন পূর্ব হইতেই আমি রাজযোগের অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতাম, ঐ যোগের উপর কিছুদিন এত অনুরাগ হইয়াছিল যে, ভক্তি জ্ঞান বা কর্মযোগকে একরূপ অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতাম। মনে ভাবিতাম, মঠের সাধুরা যোগ-যাগ কিছু জানেন না, সেইজন্যই তাঁহারা

যোগসাধনে উৎসাহ দেন না। স্বামীজীর রাজযোগ গ্রন্থ পড়িয়া ধারণা হয় যে, স্বামীজী শুধু যে রাজযোগে বিশেষ পটু তাহা নহেন, উক্ত যোগ সম্বন্ধে আমার যে-সকল ধারণা ছিল, সে-সকল তো তিনি উত্তমরূপেই বুঝাইয়াছেন, তদ্ব্যতীত ভক্তি জ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য যোগের সহিত রাজযোগের সম্বন্ধও অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। স্বামীজীর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার ইহা অন্যতম কারণ হইয়াছিল। রাজযোগের অনুবাদ করিলে উক্ত গ্রন্থের উত্তম চর্চা হইবে এবং তাহাতে আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা হইবে, তদুদ্দেশ্যে কি তিনি আমাকে এই কার্যে প্রবৃত্ত করিলেন? অথবা বঙ্গদেশে যথার্থ রাজযোগের চর্চার অভাব দেখিয়া সর্বসাধারণের ভিতর উক্ত যোগের যথার্থ মর্ম প্রচার করিবার জন্যই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল? তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত একখানি পত্রে বলিয়াছেন, 'বাঙলা দেশে রাজযোগের চর্চার একান্ত অভাব—যাহা আছে, তাহা দমটানা ইত্যাদি বই আর কিছু নয়।'

যাহা হউক, স্বামীজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ততা প্রভৃতির কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

একদিন অপরাহ্ণে একঘর লোক বসিয়া আছে, স্বামীজীর খেয়াল হইল, গীতা পাঠ করিতে হইবে। অমনি গীতা আনা হইল। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া স্বামীজী গীতা সম্বন্ধে কি বলেন, শুনিতে লাগিলেন। গীতা সম্বন্ধে সেদিন তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা দুই-চারি দিন পরেই স্বামী প্রেমানন্দের আদেশে স্মরণ করিয়া যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। তাহা 'গীতাতত্ত্ব' নামে প্রথমে 'উদ্বোধনে'র দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত হয় এবং পরে 'ভারতে বিবেকানন্দে'র অঙ্গীভূত করা হয়।

যখন স্বামীজী আলোচনা আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি একজন কঠোর সমালোচক—কৃষ্ণার্জুন, ব্যাস, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ-পরম্পরা যখন তন্নতন্নরূপে বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখন সময়ে সময়ে বোধ হইতে লাগিল, এ ব্যক্তির নিকট অতি কঠোর সমালোচকও হার মানিয়া যায়। ঐতিহাসিক তত্ত্বের এইরূপ তীব্র বিশ্লেষণ করিলেন বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ে স্বামীজী নিজ মতামত বিশেষভাবে কিছু প্রকাশ না করিয়াই পরে

বুঝাইলেন, ধর্মের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক নাই। ঐতিহাসিক গবেষণায় শাস্ত্রবিবৃত ব্যক্তিগণ কাল্পনিক প্রতিপন্ন হইলেও সনাতন ধর্মের অঙ্গে তাহাতে একটা আঁচড়ও লাগে না। আচ্ছা, যদি ধর্মসাধনের সঙ্গে ঐতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক না রহিল, তবে ঐতিহাসিক গবেষণার কি কোন মূল্য নাই?—এই প্রশ্নের সমাধানে স্বামীজী বুঝাইলেন, নির্ভীকভাবে এইসকল ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানেরও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। উদ্দেশ্য মহান্ হইলেও তজ্জন্য মিথ্যা ইতিহাস রচনা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বরং যদি লোকে সর্ববিষয়ে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, তবে সে একদিন সত্যস্বরূপ ভগবানেরও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। তারপর গীতার মূলতত্ত্বস্বরূপ সর্বমতসমন্বয় ও নিষ্কাম কর্মের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে করিয়া শ্লোক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' ইত্যাদি অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধার্থ উত্তেজনা-বাক্য পড়িয়া তিনি স্বয়ং সর্বসাধারণকে যেভাবে উপদেশ দেন, তাহা তাঁহার মনে পড়িল— 'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে', এ তো তোমার সাজে না—তুমি সর্বশক্তিমান্, তুমি ব্রহ্ম, তোমাতে যে নানারূপ ভাববিকৃতি দেখিতেছি—তাহা তো তোমার সাজে না। প্রফেটের মতো ওজস্বিনী ভাষায় এই তত্ত্ব বলিতে বলিতে তাঁহার ভিতর হইতে যেন তেজ বাহির হইতে লাগিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'যখন অপরকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখতে হবে—তখন মহাপাপীকেও ঘৃণা করলে চলবে না।' 'মহাপাপীকে ঘৃণা ক'রো না'—এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখের যে ভাবান্তর হইল, সেই ছবি আমার হৃদয়ে এখনও মুদ্রিত হইয়া আছে—যেন তাঁহার মুখ হইতে প্রেম শতধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখখানা যেন ভালবাসায় ডগমগ করিতেছে—তাহাতে কঠোরতার লেশমাত্র নাই।

এই একটি শ্লোকের মধ্যেই স্বামীজী সমগ্র গীতার সার নিহিত দেখাইয়া শেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন, 'এই একটিমাত্র শ্লোক পড়লেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল হয়।'

একদিন ব্রহ্মসূত্র আনিতে বলিলেন। বলিলেন, 'ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য না পড়ে এখন স্বাধীনভাবে সকলে সূত্রগুলির অর্থ বুঝবার চেষ্টা কর্।' প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের সূত্রগুলি পড়া হইতে লাগিল। স্বামীজী যথাযথভাবে সংস্কৃত

উচ্চারণ শিক্ষা দিতে লাগিলেন; বলিলেন, 'সংস্কৃত ভাষা আমরা ঠিক ঠিক উচ্চারণ করি না, অথচ এর উচ্চারণ এত সহজ যে, একটু চেষ্টা করলে সকলেই শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ করতে পারে। কেবল আমরা ছেলেবেলা থেকে অন্যরূপ উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়েছি—তাই ঐ-রকম উচ্চারণ এখন আমাদের এত বিসদৃশ ও কঠিন বোধ হয়। আমরা 'আত্মা'-শব্দকে 'আত্‌মা' এইরূপ উচ্চারণ না ক'রে 'আত্তাঁ' এইভাবে উচ্চারণ করি কেন? মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে বলেছেন, অপশব্দ-উচ্চারণকারীরা ম্লেচ্ছ। আমরা সকলেই তো পতঞ্জলির মতে ম্লেচ্ছ হয়েছি। তখন নূতন ব্রহ্মচারি-সন্ন্যাসিগণ এক এক করিয়া যথাসাধ্য ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি পড়িতে লাগিলেন। পরে স্বামীজী যাহাতে সূত্রের প্রত্যেক শব্দটি ধরিয়া উহার অক্ষরার্থ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'সূত্রগুলি যে কেবল অদ্বৈতমতেরই পোষক, এ-কথা কে বললে? শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ছিলেন—তিনি সূত্রগুলিকে কেবল অদ্বৈতমতেই ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তোরা সূত্রের অক্ষরার্থ করবার চেষ্টা করবি—ব্যাসের যথার্থ অভিপ্রায় কি বোঝবার চেষ্টা করবি—উদাহরণস্বরূপ দেখ্—'অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি'[১]—এই সূত্রের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা আমার মনে হয় যে, এতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত উভয় বাদই ভগবান্ বেদব্যাস কর্তৃক সূচিত হয়েছে।'

স্বামীজী একদিকে যেমন গম্ভীরাত্মা ছিলেন, তেমনি অপরদিকে সুরসিকও ছিলেন। পড়িতে পড়িতে 'কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা' সূত্রটি আসিল। স্বামীজী এই সূত্রটি পাইয়াই স্বামী প্রেমানন্দের নিকট ইহার বিকৃত অর্থ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সূত্রটির প্রকৃত অর্থ এই—যখন উপনিষদে জগৎকারণের প্রসঙ্গ উঠাইয়া 'সোঽকাময়ত'—তিনি (সেই জগৎকারণ) কামনা করিলেন, এইরূপ কথা আছে, তখন 'অনুমানগম্য' (অচেতন) প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎকারণরূপে স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহারা শাস্ত্রগ্রন্থের নিজ নিজ অদ্ভুত রুচি অনুযায়ী কদর্থ করিয়া এমন পবিত্র সনাতন ধর্মকে ঘোর বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, যাহা কোন কালে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত ছিল না, স্বামীজী কি তাহাদিগকে উপহাস করিতেছিলেন?

---

১ ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১৯

যাহা হউক, পাঠ চলিতে লাগিল। ক্রমে 'শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ'[১] সূত্র আসিল। এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজী প্রেমানন্দ স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ্, তোর ঠাকুরও যে নিজেকে ভগবান্ বলতেন, সে ঐ ভাবে বলতেন।' এই কথা বলিয়াই কিন্তু স্বামীজী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর নাভিশ্বাসের সময় বলেছিলেন: যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ, তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।' এই বলিয়া আবার অন্য সূত্র পড়িতে বলিলেন।

স্বামীজীর অপার দয়া, তিনি আমাদিগকে সন্দেহ ত্যাগ করিতে বলেন নাই, ফস্ করিয়া কাহারও কথা বিশ্বাস করিতে বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'এই অদ্ভুত রামকৃষ্ণচরিত্র তোমার ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যতদূর সাধ্য আলোচনা কর, অধ্যয়ন কর—আমি তো তাঁহার লক্ষাংশের একাংশও এখনও বুঝতে পারিনি—ও যত বুঝবার চেষ্টা করবে, ততই সুখ পাবে, ততই মজবে।'

স্বামীজী একদিন আমাদের সকলকে ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া সাধনভজন শিখাইতে লাগিলেন। বলিলেন, 'প্রথম সকলে আসন ক'রে বস্; ভাব্—আমার আসন দৃঢ় হোক, এই আসন অচল অটল হোক, এর সাহায্যেই আমি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হবো।' সকলে বসিয়া কয়েক মিনিট এইরূপ চিন্তা করিলে তারপর বলিলেন, 'ভাব্—আমার শরীর নীরোগ ও সুস্থ, বজ্রের মতো দৃঢ়—এই দেহ-সহায়ে আমি সংসারের পারে যাব।' এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ভাবিতে বলিলেন, 'এইরূপ ভাব্ যে, আমার নিকট হ'তে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ যাচ্ছে—হৃদয়ের ভিতর হ'তে সমগ্র জগতের জন্য শুভকামনা হচ্ছে—সকলের কল্যাণ হোক, সকলে সুস্থ ও নীরোগ হোক। এইরূপ ভাবনার পর কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করবি; অধিক নয়, তিনটি প্রাণায়াম করলেই হবে। তারপর হৃদয়ে প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্টমূর্তির চিন্তা ও মন্ত্রজপ—এইটি আধঘণ্টা আন্দাজ করবি।' সকলেই স্বামীজীর উপদেশ-মত চিন্তাদির চেষ্টা করিতে লাগিল।

এইভাবে সমবেত সাধনানুষ্ঠান মঠে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর আদেশে নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে লইয়া

১ ঐ, ১।১।৩০

বহুকাল যাবৎ 'এইবার এইরূপ চিন্তা কর, তারপর এইরূপ কর' বলিয়া দিয়া এবং স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া স্বামীজীপ্রোক্ত সাধন-প্রণালী অভ্যাস করাইয়াছিলেন।

*   *   *

একদিন সকালবেলা, ৯টা-১০টার সময় আমি একটা ঘরে বসিয়া কি করিতেছি—হঠাৎ তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্মলানন্দ) আসিয়া বলিলেন, 'স্বামীজীর নিকট দীক্ষা নেবে?' আমিও বলিলাম, 'আজ্ঞা হাঁ।' ইতঃপূর্বে আমি কুলগুরু বা অপর কাহারও নিকট কোন প্রকার মন্ত্রগ্রহণ করি নাই। এক্ষণে নির্মলানন্দ স্বামীর এইরূপ অযাচিত আহ্বানে প্রাণে আর দ্বিধা রহিল না। 'লইব' বলিয়াই তাঁহার সঙ্গে ঠাকুরঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। জানিতাম না যে, সেদিন শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী দীক্ষা লইতেছেন—তখনও দীক্ষাদান শেষ হয় নাই বলিয়া, বোধ হয় ঠাকুরঘরের বাহিরে একটু অপেক্ষাও করিতে হইয়াছিল। তারপর শরৎবাবু বাহির হইয়া আসিবামাত্র তুলসী মহারাজ আমাকে লইয়া গিয়া স্বামীজীকে বলিলেন, 'এ দীক্ষা নেবে।' স্বামীজী আমাকে বসিতে বলিলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর সাকার ভাল লাগে, না নিরাকার ভাল লাগে?' আমি বলিলাম, 'কখন সাকার ভাল লাগে, কখনও বা নিরাকার ভাল লাগে।'

তিনি ইহার উত্তরে বলিলেন, 'তা নয়; গুরু বুঝতে পারেন, কার কি পথ; হাতটা দেখি।' এই বলিয়া আমার দক্ষিণ হস্ত কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া অল্পক্ষণ যেন ধ্যান করিতে লাগিলেন। তারপর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, 'তুই কখন ঘটস্থাপনা ক'রে পুজো করেছিস্?' আমি বাড়ি ছাড়িবার কিছু পূর্বে ঘটস্থাপনা করিয়া কোন্ পূজা অনেকক্ষণ ধরিয়া করিয়াছিলাম—তাহা বলিলাম। তিনি তখন একটি দেবতার মন্ত্র বলিয়া দিয়া উহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, 'এই মন্ত্রে তোর সুবিধে হবে। আর ঘটস্থাপনা ক'রে পুজো করলে তোর সুবিধে হবে।' তারপর আমার সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া পরে সম্মুখে কয়েকটি লিচু পড়িয়াছিল—সেইগুলি লইয়া আমায় গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ দিতে বলিলেন।

আমি দেখিলাম, যদি আমাকে ভগবচ্ছক্তিস্বরূপ কোন দেবতার উপাসনা করিতে হয়, তবে স্বামীজী যে দেবতার কথা আমায় উপদেশ দিলেন, তাহাই

আমার সম্পূর্ণ প্রকৃতিসঙ্গত। শুনিয়াছিলাম, যথার্থ গুরু শিষ্যের প্রকৃতি বুঝিয়া মন্ত্র দেন, স্বামীজীতে আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম।

দীক্ষাগ্রহণের কিছু পরে স্বামীজীর আহার হইল। স্বামীজীর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ আমি ও শরৎবাবু উভয়েই ধারণ করিলাম।

মঠে তখন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র বিনামূল্যে প্রদত্ত হইত, কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীদের এরূপ সংস্থান ছিল না যে, উহার ডাকখরচটা দেন। উক্ত পত্র পিয়ন দ্বারা বরাহনগর পর্যন্ত বিলি হইত। বরাহনগরে 'সেবালয়ের' প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রতী শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত একটি বিধবাশ্রম ছিল। তথায় একখানি করিয়া ঐ আশ্রমের জন্য উক্ত পত্র আসিত। 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র পিয়নের ঐ পর্যন্ত 'বিট' বলিয়া মঠের কাগজখানিও ঐখানে আসিত এবং তথা হইতে উহা প্রত্যহ মঠে লইয়া আসিতে হইত। উক্ত বিধবাশ্রমের উপর স্বামীজীর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহার আমেরিকায় অবস্থান-কালে এই আশ্রমের সাহায্যের জন্য স্বামীজী একটি benefit বক্তৃতা দেন এবং উক্ত বক্তৃতার টিকিট বেচিয়া যাহা কিছু আয় হয়, তাহা এই আশ্রমেই প্রদত্ত হয়। যাহা হউক, তখন মঠের বাজার করা, ঠাকুর-সেবার আয়োজন প্রভৃতি সমুদয় কার্যই কানাই মহারাজ বা স্বামী নির্ভয়ানন্দকে করিতে হইত। বলা বাহুল্য, এই 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কাগজ আনার ভারও তাঁহার উপরেই ছিল। তখন আমরা মঠে অনেকগুলি নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী জুটিয়াছি, কিন্তু তখনও মঠের প্রয়োজনীয় সমুদয় কর্মের একটা প্রণালীপূর্বক বিভাগ করিয়া সকলের উপর অল্পাধিক পরিমাণে কাজের ভার দেওয়া হয় নাই। সুতরাং নির্ভয়ানন্দ স্বামীকে যথেষ্ট কার্য করিতে হইতেছে। তাঁহারও তাই মনে হইয়াছে যে, তাঁহার কর্তব্য কার্যগুলির ভিতর কিছু কিছু যদি নূতন সাধুদের উপর দিতে পারেন, তবে তাঁহার কতকটা অবকাশ হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে বলিলেন, 'যেখানে ইণ্ডিয়ান মিরর আসে, তোমাকে সেস্থান দেখিয়ে আনবো—তুমি রোজ গিয়ে কাগজখানি এনো।' আমিও ইহা অতি সহজ কাজ জানিয়া এবং উহাতে একজনের কার্যভার কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে ভাবিয়া সহজেই স্বীকৃত হইলাম। একদিন দ্বিপ্রহরের প্রসাদ-ধারণান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর নির্ভয়ানন্দ আমাকে বলিলেন, 'চল,

সেই বিধবাশ্রমটি তোমায় দেখিয়ে দিই।' আমিও তাঁহার সহিত যাইতে উদ্যত হইয়াছি, ইতোমধ্যে স্বামীজী দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'বেদান্তপাঠ করা যাক্—আয়।' আমি অমুক কার্যে যাইতেছি—বলায় আর কিছু বলিলেন না। আমি কানাই মহারাজের সহিত বাহির হইয়া সেইস্থান চিনিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া মঠে আমাদের জনৈক ব্রহ্মচারী বন্ধুর নিকট শুনিলাম, আমি চলিয়া যাইবার কিছু পরে স্বামীজী অপরের নিকট বলিতেছিলেন, 'ছোঁড়াটা গেল কোথায়? স্ত্রীলোক দেখতে গেল নাকি?' এই কথা শুনিয়াই আমি কানাই মহারাজকে বলিলাম, 'ভাই, চিনে এলুম বটে কিন্তু কাগজ আনতে সেখানে আমার আর যাওয়া হবে না।'

শিষ্যগণের—বিশেষতঃ নূতন নূতন ব্রহ্মচারিগণের যাহাতে চরিত্ররক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে স্বামীজী এত সাবধান ছিলেন। কলিকাতায় বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মঠের কোন সাধু-ব্রহ্মচারী বাস করে বা রাত কাটায়—ইহা তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না, বিশেষ যেখানে স্ত্রীলোকদের সংস্পর্শে আসিতে হয়। ইহার শত শত উদাহরণ দেখিয়াছি।

যেদিন মঠ হইতে রওনা হইয়া আলমোড়া যাত্রার জন্য কলিকাতা যাইবেন, সেদিন সিঁড়ির পাশে বারান্দায় দাঁড়াইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত নূতন ব্রহ্মচারিগণকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমার কানে যেন এখনও বাজিতেছে:

দেখ্, বাবা, ব্রহ্মচর্য ব্যতীত কিছু হবে না। ধর্মজীবন লাভ করতে হ'লে ব্রহ্মচর্যই তার একমাত্র সহায়। তোরা স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে একদম আসবি না। আমি তোদের স্ত্রীলোকদের ঘেন্না করতে বলছি না, তারা সাক্ষাৎ ভগবতীস্বরূপা, কিন্তু নিজেদের বাঁচাবার জন্যে তাদের কাছ থেকে তোদের তফাত থাকতে বলছি। তোরা যে আমার লেকচারে পড়েছিস—সংসারে থেকেও ধর্ম হয় অনেক জায়গায় বলেছি, তাতে মনে করিসনি যে, আমার মতে ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস ধর্মজীবনের জন্য অত্যাবশ্যক নয়। কি ক'রব, সে সব লেকচারের শ্রোতৃমণ্ডলী সব সংসারী, সব গৃহী—তাদের কাছে যদি পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের কথা একেবারে বলি, তবে তার পরদিন থেকে আর কেউ আমার লেকচারে আসত না। তাদের মতে কতকটা সায় দিয়ে যাতে তাদের ক্রমশঃ পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের দিকে ঝোঁক হয়, সেইজন্যই ঐ ভাবে লেকচার দিয়েছি।

কিন্তু আমার ভেতরের কথা তোদের বলছি—ব্রহ্মচর্য ছাড়া এতটুকুও ধর্মলাভ হবে না। কায়মনোবাক্যে তোরা এই ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করবি।

*

একদিন বিলাত হইতে কি একখানা চিঠি আসিয়াছে, সেই চিঠিখানি পড়িয়া সেই প্রসঙ্গে ধর্মপ্রচারকের কি কি গুণ থাকিলে সে কৃতকার্য হইতে পারে, বলিতে লাগিলেন। নিজের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন: ধর্মপ্রচারকের এই এই গুলি খোলা থাকা আবশ্যক, এবং এই এই গুলি বন্ধ থাকা প্রয়োজন। তাহার মাথা, হৃদয় ও মুখ খোলা থাকা আবশ্যক, তাহার প্রবল মেধাবী হৃদয়বান্ ও বাগ্মী হওয়া উচিত, আর তাহার অধোদেশের কার্য যেন বন্ধ থাকে, যেন সে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যবান্ হয়। জনৈক প্রচারককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাহার অন্যান্য সমুদয় গুণ আছে, কেবল একটু হৃদয়ের অভাব—যাহা হউক, ক্রমে হৃদয়ও খুলিয়া যাইবে।

সেই পত্রে মিস নোবল[১] বিলাত হইতে শীঘ্র ভারতে রওনা হইবেন, এই সংবাদ ছিল। মিস নোবলের প্রশংসায় স্বামীজী শতমুখ হইলেন, বলিলেন, 'বিলেতের ভেতর এমন পূতচরিত্রা, মহানুভবা নারী খুব কম। আমি যদি কাল মরে যাই, এ আমার কাজ বজায় রাখবে।' স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

*

বেদান্তের শ্রীভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদক, স্বামীজীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রের প্রধান লেখক, মাদ্রাজের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুত রঙ্গাচার্য তীর্থভ্রমণোপলক্ষে শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন, স্বামীজীর নিকট পত্র আসিয়াছে। স্বামীজী মধ্যাহ্নে আমাকে বলিলেন, 'চিঠির কাগজ কলম এনে লেখ দিকি; আর একটু খাবার জল নিয়ে আয়।' আমি এক গ্লাস জল স্বামীজীকে দিয়া ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বলিলাম, 'আমার হাতের লেখা তত ভাল নয়।' আমি মনে করিয়াছিলাম, বিলাত বা আমেরিকায় কোন চিঠি লিখিতে হইবে। স্বামীজী অভয় দিয়া বলিলেন, 'লেখ্, foreign letter (বিলাতী চিঠি) নয়।' তখন আমি কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিলাম। স্বামীজী ইংরেজীতে বলিয়া

১ সিস্টার নিবেদিতা

যাইতে লাগিলেন, আমি লিখিতে লাগিলাম। অধ্যাপক রঙ্গাচার্যকে একখানি লেখাইলেন; আর একখানি পত্রও লেখাইয়াছিলেন কাহাকে—ঠিক মনে নাই। মনে আছে রঙ্গাচার্যকে অন্যান্য কথার ভিতর এই কথা লেখাইয়াছিলেন—বাঙলা দেশে বেদান্তের তেমন চর্চা নাই, অতএব আপনি যখন কলিকাতায় আসিতেছেন, তখন 'give a rub to the people of Calcutta'—কলিকাতাবাসীকে একটু উসকাইয়া দিয়া যান। কলিকাতায় যাহাতে বেদান্তের চর্চা বাড়ে, কলিকাতাবাসী যাহাতে একটু সচেতন হয়, তজ্জন্য স্বামীজীর কি দৃষ্টি ছিল! নিজের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে চিকিৎসকগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী কলিকাতায় দুইটি মাত্র বক্তৃতা দিয়াই স্বয়ং বক্তৃতাদানে বিরত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি যখনই সুবিধা পাইতেন তখনই কলিকাতাবাসীর ধর্মভাব জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেন। স্বামীজীর এই পত্রের ফলেই ইহার কিছুকাল পরে কলিকাতাবাসিগণ স্টার-রঙ্গমঞ্চে উক্ত পণ্ডিতবরের 'The Priest and the Prophet' (পুরোহিত ও ঋষি) নামক সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

*

একটি বয়স্ক বাঙ্গালী যুবক এই সময় মঠে আসিয়া তথায় সাধুরূপে বাস করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। স্বামীজী ও মঠের অন্যান্য সাধুবর্গ তাহার চরিত্র পূর্ব হইতেই বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাহাকে আশ্রম-জীবনের অনুপযুক্ত জানিয়া কেহই তাহাকে মঠভুক্ত করিতে সম্মত ছিলেন না। তাহার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, 'মঠে যে-সকল সাধু আছেন, তাঁহাদের সকলের যদি মত হয়, তবে তোমায় রাখতে পারি।' এই কথা বলিয়া পুরাতন সাধুবর্গকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একে মঠে রাখতে তোমাদের কার কিরূপ মত?' তখন সকলেই একবাক্যে তাহাকে রাখিতে অমত প্রকাশ করিলে উক্ত যুবককে আর মঠে রাখা হইল না।

*

একদিন অপরাহ্নে স্বামীজী মঠের বারান্দায় আমাদিগের সকলকে লইয়া বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছেন—সন্ধ্যা হয় হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইহার কিছুকাল পূর্বে প্রচার-কার্যের জন্য স্বামীজী কর্তৃক মাদ্রাজে প্রেরিত হওয়ায় তাঁহার অপর একজন গুরুভ্রাতা তখন মঠে পূজা আরাত্রিকাদি কার্যভার

লইয়াছেন। আরাত্রিকাদি কার্যে যাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিত, তাহাদিগকেও লইয়া স্বামীজী বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ উক্ত গুরুভ্রাতা আসিয়া নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন, 'চল হে চল, আরতি করতে হবে, চল।' তখন একদিকে স্বামীজীর আদেশে সকলে বেদান্তপাঠে নিযুক্ত, অপর দিকে ইঁহার আদেশে ঠাকুরের আরাত্রিকে যোগদান করিতে হইবে—নূতন সাধুরা একটু গোলে পড়িয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন স্বামীজী তাঁহার ঐ গুরুভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, 'এই যে বেদান্ত পড়া হচ্ছিল, এটা কি ঠাকুরের পূজা নয়? কেবল একখানা ছবির সামনে সলতে-পোড়া নাড়লে আর ঝাঁজ পিটলেই মনে করছিস বুঝি ভগবানের যথার্থ আরাধনা হয়? তোরা অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি—।' এইরূপ বলিতে বলিতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে উক্তরূপে বেদান্তপাঠে ব্যাঘাত দেওয়াতে আরও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ফলে বেদান্তপাঠ বন্ধ হইয়া গেল—কিছুক্ষণ পরে আরতিও শেষ হইল। আরতির পরে কিন্তু উক্ত গুরুভ্রাতাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না, তখন স্বামীজীও অতিশয় ব্যাকুল হইয়া 'সে কোথায় গেল, সে কি আমার গালাগাল খেয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গেল?'—ইত্যাদি বলিতে বলিতে সকলকেই চতুর্দিকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। বহুক্ষণ পরে তাঁহাকে মঠের উপরের ছাদে চিন্তান্বিত ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া স্বামীজীর নিকট লইয়া আসা হইল। তখন স্বামীজীর ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহাকে কত যত্ন করিলেন, তাঁহাকে কত মিষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন! গুরুভাই-এর প্রতি স্বামীজীর অপূর্ব ভালবাসা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বুঝিলাম, গুরুভাইগণের উপর স্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা। কেবল যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের নিষ্ঠা বজায় রাখিয়া উদারতর হইতে পারেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা। পরে স্বামীজীর মুখে অনেকবার শুনিয়াছি, যাঁহাকে স্বামীজী বেশী গালাগাল দিতেন, তিনিই তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র।

*

একদিন বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি আমাকে বলিলেন, 'দেখ্, মঠের একটা ডায়েরী রাখবি, আর হপ্তায় হপ্তায় মঠের একটা ক'রে রিপোর্ট পাঠাবি।' স্বামীজীর এই আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল।

স্বামীজীর কথা[1]

আমি নিজে অবশ্য বেদের ততটুকু মানি, যতটুকু যুক্তির সঙ্গে মেলে। বেদের অনেক অংশ তো স্পষ্টই স্ববিরোধী। Inspired বা প্রত্যাদিষ্ট বলতে পাশ্চাত্যদেশে যেরূপ বুঝায়, বেদকে আমাদের শাস্ত্রে সেরূপভাবে প্রত্যাদিষ্ট বলে না। তবে উহা কি? না, ভগবানের সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি। এই জ্ঞানসমষ্টি যুগারম্ভে প্রকাশিত বা ব্যক্ত এবং যুগাবসানে সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত ভাব ধারণ করে। যুগের আরম্ভ হ'লে উহা আবার প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রের এই কথাগুলি অবশ্য ঠিক, কিন্তু কেবল 'বেদ' নামধেয় গ্রন্থগুলিই এই জ্ঞানসমষ্টি, এ কথা মনকে আঁখিঠারা মাত্র। মনু এক স্থলে বলেছেন, বেদের যে অংশ যুক্তির সঙ্গে মেলে তাই বেদ, অপরাংশ বেদ নয়। আমাদের অনেক দার্শনিকেরও এই মত।

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যত তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে, তার মোদ্দাকথা এই যে এতে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের স্থান নেই। আমরা আনন্দের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করতে খুব প্রস্তুত আছি।

বেদান্তের প্রথম কথা হচ্ছে—সংসার দুঃখময়, শোকের আগার, অনিত্য ইত্যাদি। বেদান্ত প্রথম খুললেই 'দুঃখ দুঃখ' শুনে লোক অস্থির হয়, কিন্তু তার শেষে পরম সুখ—যথার্থ সুখের কথা পাওয়া যায়। বিষয়-জগৎ, ইন্দ্রিয়-জগৎ থেকে যে যথার্থ সুখ হ'তে পারে, এ কথা আমরা অস্বীকার করি, আর বলি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতেই যথার্থ সুখ। আর এই সুখ, এই আনন্দ সব মানুষের ভেতরই আছে। আমরা জগতে যে 'সুখবাদ' দেখতে পাই, যে মতে বলে জগৎটা পরম সুখের স্থান, তাতে মানুষকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ক'রে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়।

আমাদের দর্শনে ত্যাগের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। বাস্তবিক ত্যাগ ব্যতীত আমাদের কোন দর্শনেরই লক্ষ্য বস্তু পাওয়া অসম্ভব। কারণ ত্যাগ মানেই হচ্ছে—আসল সত্য যে আত্মা, তার প্রকাশের সাহায্য করা। উহা

[1] স্বামী শুদ্ধানন্দজীর চয়ন

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চায়, তার ভাব এই যে, সে সত্য-জগতের জ্ঞান লাভ করে।

জগতে যত শাস্ত্র আছে, তার মধ্যে বেদই কেবল বলেন যে, বেদপাঠ—অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা হচ্ছে, যার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়। সে পড়েও হয় না, বিশ্বাস করেও হয় না, তর্ক করেও হয় না, সমাধি-অবস্থা লাভ করলে তবে সেই পরমপুরুষকে জানা যায়।

জ্ঞানলাভ হ'লে আর সাম্প্রদায়িকতা থাকে না; তা ব'লে জ্ঞানী কোন সম্প্রদায়কে যে ঘৃণা করেন, তা নয়। সব নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং এক হয়ে যায়, সেইরূপ সব সম্প্রদায়—সব মতেই জ্ঞান লাভ হয়, তখন আর কোন মতভেদ থাকে না।

জ্ঞানী বলেন, সংসার ত্যাগ করতে হবে। তার মানে এ নয় যে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে ভাসিয়ে বনে চলে যেতে হবে। প্রকৃত ত্যাগ হচ্ছে সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাকা।

মানুষের পুনঃ পুনঃ জন্ম কেন হয়? পুনঃ পুনঃ শরীর-ধারণে দেহমনের বিকাশ হবার সুবিধে হয়, আর ভেতরের ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ হ'তে থাকে।

বেদান্ত মানুষের বিচার-শক্তিকে যথেষ্ট আদর ক'রে থাকেন বটে, কিন্তু আবার এও বলেন যে, যুক্তি-বিচারের চেয়েও বড় জিনিস আছে।

ভক্তিলাভ কিরূপে হয়?—ভক্তি তোমার ভেতরেই আছে, কেবল তার ওপর কামকাঞ্চনের একটা আবরণ পড়ে রয়েছে, তা সরিয়ে ফেললেই ভক্তি আপনা-আপনি প্রকাশ হবে।

জিব চললেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় চলবে।

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম—এই চার রাস্তা দিয়েই মুক্তিলাভ হয়। যে যে-পথের উপযুক্ত, তাকে সেই পথ দিয়েই যেতে হবে, কিন্তু বর্তমান কালে কর্মযোগের ওপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিতে হবে।

ধর্ম একটা কল্পনার জিনিস নয়, প্রত্যক্ষ জিনিস। যে একটা ভূতও দেখেছে, সে অনেক বই-পড়া পণ্ডিতের চেয়ে বড়।

এক সময়ে স্বামীজী কোন লোকের খুব প্রশংসা করেন, তাতে তাঁর নিকটস্থ জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'কিন্তু সে আপনাকে মানে না।' তাতে তিনি ব'লে

উঠলেন; 'আমাকে মানতে হবে, এমন কিছু লেখাপড়া আছে? সে ভাল কাজ করছে, এই জন্যে সে প্রশংসার পাত্র।'

আসল ধর্মের রাজ্য যেখানে, সেখানে লেখাপড়ার প্রবেশাধিকার নেই।

কেউ কেউ বলেন, আগে সাধন ভজন ক'রে সিদ্ধ হও, তারপর কর্ম করবার অধিকার; কেউ কেউ বা বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম করতে হবে। এর সামঞ্জস্য কোথায়?

—তোমরা দুটো জিনিস গোল ক'রে ফেলছ। কর্ম মানে—এক জীব-সেবা, আর এক প্রচার। প্রকৃত প্রচারে অবশ্য সিদ্ধপুরুষ ছাড়া কারও অধিকার নেই। সেবায় কিন্তু সকলের অধিকার; শুধু অধিকার নয়, সেবা করতে সকলে বাধ্য, যতক্ষণ তারা অপরের সেবা নিচ্ছে।

ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভেতর যেদিন থেকে বড়লোকের খাতির আরম্ভ হবে, সেই দিন থেকে তার পতন আরম্ভ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে ভাবের (feelings) যেরূপ বিকাশ হয়েছিল, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না।

অসৎ কর্ম করতে ইচ্ছা হয়, গুরুজনের সামনে করবে।

গোঁড়ামি দ্বারা খুব শীঘ্র ধর্ম-প্রচার হয় বটে, কিন্তু সকলকে মতের স্বাধীনতা দিয়ে একটা উচ্চপথে তুলে দিতে দেরী হলেও পাকা ধর্ম-প্রচার হয়।

সাধনের জন্য যদি শরীর যায়, গেলই বা।

সাধুসঙ্গে থাকতে থাকতেই (ধর্মলাভ) হয়ে যাবে।

গুরুর আশীর্বাদে শিষ্য না পড়েও পণ্ডিত হয়ে যায়।

গুরু কাকে বলা যায়?—যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ ব'লে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু।

আচার্য যে-সে হ'তে পারেন না, কিন্তু মুক্ত অনেকে হ'তে পারে। মুক্ত যে, তার কাছে সমুদয় জগৎ স্বপ্নবৎ, কিন্তু আচার্যকে উভয় অবস্থার মাঝখানে থাকতে হয়। তাঁর জগৎকে সত্য জ্ঞান করা চাই, না হ'লে তিনি কেন উপদেশ দেবেন? আর যদি তাঁর স্বপ্নজ্ঞান না হ'ল, তবে তিনি তো সাধারণ লোকের মতো হয়ে গেলেন, তিনি কি শিক্ষা দেবেন? আচার্যকে শিষ্যের পাপের ভার নিতে হয়। তাতেই শক্তিমান্ আচার্যদের শরীরে ব্যাধি-আদি

হয়। কিন্তু কাঁচা হ'লে তাঁর মনকে পর্যন্ত তারা আক্রমণ করে, তিনি পড়ে যান। আচার্য যে-সে হতে পারেন না।

এমন সময় আসবে, যখন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে সেবা করা কোটি কোটি ধ্যানের চেয়ে বড় ব'লে বুঝতে পারবে।

স্বামীজীর সহিত কয়েক দিন[১]

বেলগাঁ—১৮৯২ খৃঃ ১৮ই অক্টোবর, মঙ্গলবার। প্রায় দুই ঘণ্টা হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। এক স্থূলকায় প্রসন্নবদন যুবা সন্ন্যাসী আমার পরিচিত জনৈক দেশীয় উকিলের সহিত আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উকিল বন্ধুটি বলিলেন, 'ইনি একজন বিদ্বান্ বাঙালী সন্ন্যাসী, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।' ফিরিয়া দেখিলাম—প্রশান্তমূর্তি, দুই চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুতের আলো বাহির হইতেছে, গোঁফদাড়ি কামানো, অঙ্গে গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে মহারাষ্ট্রীয় দেশের বাহানা চটিজুতা, মাথায় গেরুয়া কাপড়েরই পাগড়ি। সন্ন্যাসীর সে অপরূপ মূর্তি স্মরণ হইলে এখনও যেন তাঁহাকে চোখের সামনে দেখি।

কিছুক্ষণ পরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয় কি তামাক খান? আমি কায়স্থ, আমার একটি ভিন্ন আর হুঁকা নাই। আপনার যদি আমার হুঁকায় তামাক খাইতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে তামাক সাজিয়া দিতে বলি।' তিনি বলিলেন, 'তামাক চুরুট—যখন যাহা পাই, তখন তাহাই খাইয়া থাকি, আর আপনার হুঁকায় খাইতে কিছুই আপত্তি নাই।' তামাক সাজাইয়া দিলাম।

তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিতে বলিলাম ও তাঁহার জিনিসপত্র আমার বাসায় আনাইব কি-না জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'আমি উকিল বাবুর বাড়িতে বেশ আছি। আর বাঙালী দেখিয়াই তাঁহার নিকট হইতে

১ বোম্বাই প্রদেশে বেলগাঁও-এর ফরেস্ট অফিসার হরিপদ মিত্র-লিখিত।

চলিয়া আসিলে তাঁহার মনে দুঃখ হইবে; কারণ তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত স্নেহ ও ভক্তি করেন—অতএব আসিবার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে।'

সে রাত্রে বড় বেশী কথাবার্তা হইল না; কিন্তু দুই-চারি কথা যাহা বলিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝিলাম, তিনি আমা অপেক্ষা হাজারগুণে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্; ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা উপার্জন করিতে পারেন, তথাপি টাকাকড়ি ছোঁন না, এবং সুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী।

আমার বাসায় থাকিবেন না জানিয়া পুনরায় বলিলাম, 'যদি চা খাইবার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে কল্য প্রাতে আমার সহিত চা খাইতে আসিলে সুখী হইব।' তিনি আসিতে স্বীকার করিলেন এবং উকিলটির সহিত তাঁহার বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। রাত্রে তাঁহার বিষয় অনেক ভাবিলাম; মনে হইল—এমন নিস্পৃহ, চিরসুখী, সদা সন্তুষ্ট, প্রফুল্লমুখ পুরুষ তো কখন দেখি নাই।

পরদিন ১৯শে অক্টোবর। প্রাতে ৬টার সময় উঠিয়া স্বামীজীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আটটা বাজিয়া গেল, কিন্তু স্বামীজীর দেখা নাই। আর অপেক্ষা না করিয়া আমি একটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী যেখানে ছিলেন সেখানে গেলাম। গিয়া দেখি এক মহাসভা; স্বামীজী বসিয়া আছেন এবং নিকটে অনেক সম্ভ্রান্ত উকিল ও বিদ্বান্ লোকের সহিত কথাবার্তা চলিতেছে। স্বামীজী কাহারও সহিত ইংরেজীতে, কাহারও সহিত সংস্কৃতে এবং কাহারও সহিত হিন্দুস্থানীতে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর একটুমাত্র চিন্তা না করিয়াই একেবারে দিতেছেন। আমার ন্যায় কেহ কেহ হক্স্লের ফিলজফিকে প্রামাণিক মনে করিয়া তদবলম্বনে স্বামীজীর সহিত তর্ক করিতে উদ্যত। তিনি কিন্তু কাহাকেও ঠাট্টাচ্ছলে, কাহাকেও গম্ভীরভাবে যথাযথ উত্তর দিয়া সকলকেই নিরস্ত করিতেছেন। আমি যাইয়া প্রণাম করিলাম এবং অবাক হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—ইনি কি মনুষ্য, না দেবতা?

কোন গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ উকিল প্রশ্ন করিলেন, 'স্বামীজী, সন্ধ্যা আহ্নিক প্রভৃতির মন্ত্রাদি সংস্কৃতভাষায় রচিত; আমরা সেগুলি বুঝি না। আমাদের ঐ-সকল মন্ত্রোচ্চারণে কিছু ফল আছে কি?'

স্বামীজী উত্তর করিলেন, 'অবশ্যই উত্তম ফল আছে ; ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া ঐ কয়টি সংস্কৃত মন্ত্রাদি তো ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারো, তথাপি লও না। ইহা কাহার দোষ? আর যদি মন্ত্রের অর্থ নাই বুঝিতে পারো, যখন সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে বসো, তখন ধর্ম-কর্ম করিতেছি মনে কর, না—কিছু পাপ করিতেছ মনে কর? যদি ধর্ম-কর্ম করিতেছি মনে করিয়া বসো, তাহা হইলে উত্তম ফল লাভ করিতে উহাই যে যথেষ্ট।'

অন্য একজন এই সময়ে সংস্কৃতে বলিলেন, 'ধর্ম সম্বন্ধে কথোপকথন ম্লেচ্ছভাষায় করা উচিত নহে ; অমুক পুরাণে এইরূপ লেখা আছে।'

স্বামীজী উত্তর করিলেন, 'যে-কোন ভাষাতেই হোক ধর্মচর্চা করা যায়' এবং এই বাক্যের সমর্থন শ্রুতি প্রভৃতির বচন প্রমাণস্বরূপ দিয়া বলিলেন, 'হাইকোর্টের নিষ্পত্তি নিম্ন আদালত দ্বারা খণ্ডন হইতে পারে না।'

এইরূপে নয়টা বাজিয়া গেল। যাঁহাদের অফিস বা কোর্টে যাইতে হইবে তাঁহারা চলিয়া গেলেন, কেহ বা তখনও বসিয়া রহিলেন। স্বামীজীর দৃষ্টি আমার উপর পড়ায়, পূর্বদিনের চা খাইতে যাবার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন, 'বাবা, অনেক লোকের মন ক্ষুণ্ণ করিয়া যাইতে পারি নাই, মনে কিছু করিও না।' পরে আমি তাঁহাকে আমার বাসায় আসিয়া থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় অবশেষে বলিলেন, 'আমি যাঁহার অতিথি, তাঁহার মত করিতে পারিলে আমি তোমারই নিকট থাকিতে প্রস্তুত।' উকিলটিকে বিশেষ বুঝাইয়া স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া আমার বাসায় আসিলাম। সঙ্গে মাত্র একটি কমণ্ডলু ও গেরুয়া কাপড়ে বাঁধা একখানি পুস্তক। স্বামীজী তখন ফ্রান্স-দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। পরে বাসায় আসিয়া দশটার সময় চা খাওয়া হইল ; তাহার পরেই আবার এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলও চাহিয়া খাইলেন। আমার নিজের মনে যে-সমস্ত কঠিন সমস্যা ছিল সে-সকল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সহসা ভরসা হইতেছে না বুঝিতে পারিয়া তিনি নিজেই আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দুই কথাতেই বুঝিয়া লইলেন।

ইতঃপূর্বে 'টাইম্‌স' সংবাদপত্রে একজন একটি সুন্দর কবিতায় ঈশ্বর কি, কোন্ ধর্ম সত্য প্রভৃতি তত্ত্ব বুঝিয়া ওঠা অত্যন্ত কঠিন, লিখিয়াছিলেন ; সেই কবিতাটি আমার তখনকার ধর্মবিশ্বাসের সহিত ঠিক মিল হওয়ায়

আমি উহা যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম; তাহাই তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। পড়িয়া তিনি বলিলেন, 'লোকটা গোলমালে পড়িয়াছে।' আমারও ক্রমে সাহস বাড়িতে লাগিল। 'ঈশ্বর দয়াময় ও ন্যায়বান্, এককালে দুই-ই হইতে পারেন না'—খ্রীষ্টান মিশনরীদের সহিত এই তর্কের মীমাংসা হয় নাই; মনে করিলাম, এ সমস্যাপূরণ স্বামীজীও করিতে পারিবেন না।

স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'তুমি তো Science (বিজ্ঞান) অনেক পড়িয়াছ, দেখিতেছি। প্রত্যেক জড়পদার্থে দুইটি opposite forces—centripetal and centrifugal কি act করে না? যদি দুইটি opposite forces (বিপরীত শক্তি) জড়বস্তুতে থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে দয়া ও ন্যায় opposite (বিপরীত) হইলেও কি ঈশ্বরে থাকা সম্ভব নয়? All I can say is that you have a very poor idea of your God.'

আমি তো নিস্তব্ধ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস—Truth is absolute (সত্য নিরপেক্ষ)। সমস্ত ধর্ম কখন এককালে সত্য হইতে পারে না। তিনি সে-সব প্রশ্নের উত্তরে বললেন:

আমরা যে বিষয়ে যাহা কিছু সত্য বলিয়া জানি বা পরে জানিব, সে-সকলই আপেক্ষিক সত্য (Relative truths). Absolute truth-এর (নিরপেক্ষ সত্যের) ধারণা করা আমাদের সীমাবদ্ধ মন-বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব। অতএব সত্য Absolute (নিরপেক্ষ) হইলেও বিভিন্ন মন-বুদ্ধির নিকট বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। সত্যের সেই বিভিন্ন আকার বা ভাবগুলি নিত্য (Absolute) সত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত থাকে বলিয়া সে সকলগুলিই এক দরের বা এক শ্রেণীর। যেমন দূর এবং সন্নিকট স্থান হইতে photograph (ফটো) লইলে একই সূর্যের ছবি নানারূপ দেখায়, মনে হয়—প্রত্যেক ছবিটাই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সূর্যের—তদ্রূপ; আপেক্ষিক সত্য (Relative truth)-সকল, নিত্য সত্যের (Absolute truth) সম্পর্কে ঠিক ঐ ভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক ধর্মই নিত্য সত্যের আভাস বলিয়া সত্য।

বিশ্বাসই ধর্মের মূল বলায় স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'রাজা হইলে আর খাওয়া-পরার কষ্ট থাকে না, কিন্তু রাজা হওয়া যে কঠিন; বিশ্বাস কি কখন জোর করিয়া হয়? অনুভব না হইলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হওয়া

অসম্ভব।' কোন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে 'সাধু' বলায় তিনি উত্তর করিলেন, 'আমরা কি সাধু? এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁহাদের দর্শন বা স্পর্শমাত্রেই দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়।'

'সন্ন্যাসীরা এরূপ অলস হইয়া কেন কালক্ষেপ করেন? অপরের সাহায্যের উপর কেন নির্ভর করিয়া থাকেন? সমাজের হিতকর কোন কাজকর্ম কেন করেন না?'—প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, 'আচ্ছা, বলো দেখি—তুমি এত কষ্টে অর্থ উপার্জন করিতেছ, তাহার যৎসামান্য অংশ কেবল নিজের জন্য খরচ করিতেছ; বাকি কতক অন্য কতকগুলি লোককে আপনার মনে ক'রে তাহাদের জন্য খরচ করিতেছ। তাহারা সেজন্য না তোমার কৃত উপকার মানে, না যাহা ব্যয় কর তাহাতে সন্তুষ্ট! বাকি যকের মতো প্রাণপণে জমাইতেছ; তুমি মরিয়া গেলে অন্য কেহ তাহা ভোগ করিবে, আর হয়তো আরো টাকা রাখিয়া যাও নাই বলিয়া গালি দিবে। এই তো গেল তোমার হাল। আর আমি ও-সব কিছু করি না। ক্ষুধা পাইলে পেট চাপড়াইয়া, হাত মুখে তুলিয়া দেখাই; যাহা পাই, তাহা খাই; কিছুই কষ্ট করি না, কিছুই সংগ্রহ করি না। আমাদের ভিতর কে বুদ্ধিমান?—তুমি না আমি?' আমি তো শুনিয়া অবাক্, ইহার পূর্বে আমার সম্মুখে এরূপ স্পষ্ট কথা বলিতে তো কাহারও সাহস দেখি নাই।

আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রামের পর পুনরায় সেই বন্ধু উকিলটির বাসায় যাওয়া হইল ও তথায় অনেক বাদানুবাদ ও কথোপকথন চলিল। রাত্রি নয়টার সময় স্বামীজীকে লইয়া পুনরায় আমার বাসায় ফিরিলাম। আসিতে আসিতে বলিলাম, 'স্বামীজী, আপনার আজ তর্কবিতর্কে অনেক কষ্ট হইয়াছে।'

তিনি বলিলেন, 'বাবা, তোমরা যেরূপ utilitarian (উপযোগবাদী), যদি আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমরা কি আমাকে এক মুঠা খাইতে দাও? আমি এইরূপ গল্ গল্ করিয়া বকি, লোকের শুনিয়া আমোদ হয়, তাই দলে দলে আসে। কিন্তু জেনো, যে-সকল লোক সভায় তর্কবিতর্ক করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহারা বাস্তবিক সত্য জানিবার ইচ্ছায় ওরূপ করে না। আমিও বুঝিতে পারি, কে কি ভাবে কি কথা বলে এবং তাহাকে সেইরূপ উত্তর দিই।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা স্বামীজী, সকল প্রশ্নের অমন চোখা চোখা উত্তর আপনার তখনি যোগায় কিরূপে?'

তিনি বলিলেন, 'ঐ-সকল প্রশ্ন তোমাদের পক্ষে নূতন; কিন্তু আমাকে কত লোকে কতবার ঐ প্রশ্নসকল জিজ্ঞাসা করেছে, আর সেগুলির কতবার উত্তর দিয়াছি।'

রাত্রে আহার করিতে বসিয়া আবার কত কথা কহিলেন। পয়সা না ছুঁইয়া দেশভ্রমণে কত জায়গায় কত কি ঘটনা ঘটিয়াছে, সে-সব বলিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইল—আহা! ইনি কতই কষ্ট, কতই উৎপাত না জানি সহ্য করিয়াছেন! কিন্তু তিনি সে-সব যেন কত মজার কথা, এইরূপ ভাবে হাসিতে হাসিতে সমুদয় বলিতে লাগিলেন। কোথাও তিন দিন উপবাস, কোন স্থানে লঙ্কা খাইয়া এমন পেটজ্বালা যে, এক বাটি তেঁতুল গোলা খাইয়াও থামে না, কোথাও 'এখানে সাধু-সন্ন্যাসী জায়গা পায় না'—এই বলিয়া অপরের তাড়না, বা গুপ্ত পুলিসের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভৃতি, যাহা শুনিলে আমাদের গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়, সেই-সব ঘটনা তাঁহার পক্ষে যেন তামাসা মাত্র।

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার বিছানা করিয়া দিয়া আমিও ঘুমাইতে গেলাম, কিন্তু সে রাত্রে আর ঘুম হইল না। ভাবিতে লাগিলাম, এত বৎসরের কঠোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস স্বামীজীকে দেখিয়া ও তাঁহার দুই-চার কথা শুনিয়াই সব দূর হইল! আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই নাই। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, আমাদের কেন—আমাদের চাকর-বাকরেরও তাঁহার প্রতি এত ভক্তি-শ্রদ্ধা হইল যে, তাহাদের সেবায় ও আগ্রহে স্বামীজীকে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতে হইত।

২০শে অক্টোবর। সকালে উঠিয়া স্বামীজীকে নমস্কার করিলাম। এখন সাহস বাড়িয়াছে, ভক্তিও হইয়াছে। স্বামীজীও অনেক বন, নদী, অরণ্যের বিবরণ আমার নিকট শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন; এই শহরে আজ তাঁহার চার দিন বাস হইল। পঞ্চম দিনে তিনি বলিলেন, 'সন্ন্যাসীদের নগরে তিন দিনের বেশী ও গ্রামে এক দিনের বেশী থাকিতে নাই। আমি শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করিতেছি।' কিন্তু আমি ও-কথা কোনমতেই শুনিব না, উহা তর্ক করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চাই। পরে অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন, 'এক স্থানে

অধিক দিন থাকিলে মায়া মমতা বাড়িয়া যায়। আমরা গৃহ ও আত্মীয় বন্ধু ত্যাগ করিয়াছি, সেইরূপ মায়ায় মুগ্ধ হইবার যত উপায় আছে, তাহা হইতে দূরে থাকাই আমাদের পক্ষে ভাল।'

আমি বলিলাম, 'আপনি কখনও মুগ্ধ হইবার নন।' পরিশেষে আমার অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া আরও দুই-চার দিন থাকিতে স্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে আমার মনে হইল, স্বামীজী যদি সাধারণের জন্য বক্তৃতা দেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার লেকচার শুনি এবং অপর কত লোকেরও কল্যাণ হয়। অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু লেকচার দিলে হয়তো নামযশের ইচ্ছা হইবে, এই বলিয়া তিনি কোনমতে উহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তবে সভায় প্রশ্নের উত্তর দান (conversational meeting) করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, এ কথা জানাইলেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী Pickwick Papers[১] হইতে দুই-তিন পাতা মুখস্থ বলিলেন। আমি উহা অনেকবার পড়িয়াছি, বুঝিলাম—পুস্তকের কোন্ স্থান হইতে তিনি আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া আমার বিশেষ আশ্চর্য বোধ হইল। ভাবিলাম, সন্ন্যাসী হইয়া সামাজিক গ্রন্থ হইতে কি করিয়া এতটা মুখস্থ করিলেন? পূর্বে বোধ হয় অনেকবার ঐ পুস্তক পড়িয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, 'দুইবার পড়িয়াছি—একবার স্কুলে পড়িবার সময় ও আজ পাঁচ-ছয় মাস হইল আর একবার।'

অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তবে কেমন করিয়া স্মরণ রহিল? আমাদের কেন থাকে না?'

স্বামীজী বলিলেন, 'একান্ত মনে পড়া চাই; আর খাদ্যের সারভাগ হইতে প্রস্তুত রেতের অপচয় না করিয়া পুনরায় উহা assimilate করা চাই।'

আর একদিন স্বামীজী মধ্যাহ্নে একাকী বিছানায় শুইয়া একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতেছিলেন। আমি অন্য ঘরে ছিলাম। হঠাৎ এরূপ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন যে, আমি এ হাসির বিশেষ কোন কারণ আছে ভাবিয়া তাঁহার ঘরের দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, বিশেষ কিছু হয় নাই। তিনি যেমন বই পড়িতেছিলেন, তেমনি পড়িতেছেন।

১ Charles Dickens-লিখিত

প্রায় ১৫ মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলাম, তথাপি তিনি আমায় দেখিতে পাইলেন না। বই ছাড়া অন্য কোন দিকে তাঁহার মন নাই। পরে আমাকে দেখিয়া ভিতরে আসিতে বলিলেন এবং আমি কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি শুনিয়া বলিলেন, 'যখন যে কাজ করিতে হয়, তখন তাহা একমনে, একপ্রাণে—সমস্ত ক্ষমতার সহিত করিতে হয়। গাজিপুরের পওহারী বাবা ধ্যান-জপ পূজা-পাঠ যেমন একমনে করিতেন, তাঁহার পিতলের ঘটিটি মাজাও ঠিক তেমনি একমনে করিতেন। এমনি মাজিতেন যে, সোনার মতো দেখাইত।'

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'স্বামীজী, চুরি করা পাপ কেন? সকল ধর্মে চুরি করিতে নিষেধ করে কেন? আমার মনে হয়, ইহা আমাদের, উহা অপরের—ইত্যাদি মনে করা কেবল কল্পনামাত্র। কই আমায় না জানাইয়া আমার আত্মীয় বন্ধু কেহ আমার কোন দ্রব্য ব্যবহার করিলে তো উহা চুরি করা হয় না। তাহার পর পশু-পক্ষী-আদি আমাদের কোন জিনিস নষ্ট করিলে তাহাকেও তো চুরি বলি না।'

স্বামীজী বলিলেন, 'অবশ্য সর্বাবস্থায় সকল সময়ে মন্দ এবং পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এমন কোন জিনিস বা কার্য নাই। আবার অবস্থাভেদে প্রত্যেক জিনিস মন্দ এবং প্রত্যেক কার্যই পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে যাহাতে অপর কাহারও কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয় এবং যাহা করিলে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার দুর্বলতা আসে, সে কর্ম করিবে না; উহাই পাপ, আর তদ্বিপরীত কর্মই পুণ্য। মনে কর, তোমার কোন জিনিস কেহ চুরি করিলে তোমার দুঃখ হয় কি-না? তোমার যেমন সমস্ত জগতেরও তেমনি জানিবে। এই দুই-দিনের জগতে সামান্য কিছুর জন্য যদি তুমি এক প্রাণীকে দুঃখ দিতে পারো, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতে তুমি কি মন্দ কর্ম না করিতে পারিবে? আবার পাপ-পুণ্য না থাকিলে সমাজ চলে না। সমাজে থাকিতে হইলে তাহার নিয়মাদি পালন করা চাই। বনে গিয়া উলঙ্গ হইয়া নাচো ক্ষতি নাই—কেহ তোমাকে কিছু বলিবে না; কিন্তু শহরে ঐরূপ করিলে পুলিসের দ্বারা ধরাইয়া তোমায় কোন নির্জন স্থানে বন্ধ করিয়া রাখাই উচিত।'

স্বামীজী অনেক সময় ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভিতর দিয়া বিশেষ শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরু হইলেও তাঁহার কাছে বসিয়া থাকা মাস্টারের কাছে বসার মতো

ছিল না। খুব রঙ্গরস চলিতেছে ; বালকের মতো হাসিতে হাসিতে ঠাট্টার ছলে কত কথাই কহিতেছেন, সকলকে হাসাইতেছেন ; আবার তখনই এমনি গম্ভীরভাবে জটিল প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন যে, উপস্থিত সকলে অবাক হইয়া ভাবিত,—ইঁহার ভিতর এত শক্তি! এই তো দেখিতে-ছিলাম, আমাদের মতোই একজন! সকল সময়েই তাঁহার নিকট লোকে শিক্ষা লইতে আসিত। সকল সময়েই তাঁহার দ্বার অবারিত ছিল। নানা লোকে নানা ভাবেও আসিত,—কেহ বা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে, কেহ বা খোশগল্প শুনিতে, কেহ বা তাঁহার নিকট আসিলে অনেক ধনী বড়-লোকের সহিত আলাপ করিতে পারিবে বলিয়া, আবার কেহ বা সংসার-তাপে জর্জরিত হইয়া তাঁহার নিকট দুই দণ্ড জুড়াইবে এবং জ্ঞান ও ধর্ম লাভ করিবে বলিয়া। কিন্তু তাঁহার এমনি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, যে যে-ভাবেই আসুক না কেন, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিতেন এবং তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মর্মভেদী দৃষ্টির হাত হইতে কাহারও এড়াইবার বা কিছু গোপন করিবার সাধ্য ছিল না। এক সময়ে কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর একমাত্র সন্তান ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা এড়াইবে বলিয়া স্বামীজীর নিকট ঘন ঘন আসিতে লাগিল এবং সাধু হইবে, এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। সে আবার আমার এক বন্ধুর পুত্র। আমি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঐ ছেলেটি আপনার কাছে কি মতলবে এত বেশী বেশী আসে? উহাকে কি সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ দিবেন? উহার বাপ আমার একজন বন্ধু।'

স্বামীজী বলিলেন, 'উহার পরীক্ষা কাছে, পরীক্ষা দিবার ভয়ে সাধু হইবার ইচ্ছা। আমি উহাকে বলিয়াছি, এম্-এ. পাস করিয়া সাধু হইতে আসিও ; বরং এম্-এ. পাস করা সহজ, কিন্তু সাধু হওয়া তদপেক্ষা কঠিন।'

স্বামীজী আমার বাসায় যতদিন ছিলেন, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার কথোপকথন শুনিতে যেন সভা বসিয়া যাইত, এতই অধিক লোকসমাগম হইত। ঐ সময় এক দিন আমার বাসায় একটি চন্দনগাছের তলায় তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, জন্মেও তাহা ভুলিতে পারিব না। সে প্রসঙ্গের উত্থাপনে অনেক কথা বলিতে হইবে।...

কিছু পূর্ব হইতে আমার স্ত্রীর ইচ্ছা হয়, গুরুর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করে। আমার তাহাতে আপত্তি ছিল না। তবে আমি তাহাকে বলিয়া-

ছিলাম, 'এমন লোককে গুরু করিও, যাঁহাকে আমিও ভক্তি করিতে পারি। গুরু বাড়ি ঢুকিলেই যদি আমার ভাবান্তর হয়, তাহা হইলে তোমার কিছুই আনন্দ বা উপকার হইবে না। কোন সৎপুরুষকে যদি গুরুরূপে পাই, তাহা হইলে উভয়ে মন্ত্র লইব, নতুবা নহে।' সেও তাহা স্বীকার করে। স্বামীজীর আগমনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই সন্ন্যাসী যদি তোমার গুরু হন, তাহা হইলে তুমি শিষ্যা হইতে ইচ্ছা কর কি?' সেও সাগ্রহে বলিল, 'উনি কি গুরু হইবেন? হইলে তো আমরা কৃতার্থ হই।'

স্বামীজীকে একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'স্বামীজী, আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন?' স্বামীজী প্রার্থনা জানাইবার আদেশ করিলে আমাদের উভয়কে দীক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, 'গৃহস্থের পক্ষে গৃহস্থ গুরুই ভাল।' গুরু হওয়া বড় কঠিন, শিষ্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে হয়, দীক্ষার পূর্বে গুরুর সহিত শিষ্যের অন্ততঃ তিনবার সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক—প্রভৃতি নানা কথা কহিয়া আমায় নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। যখন দেখিলেন, আমি কোনপ্রকারে ছাড়িবার নহি, তখন অগত্যা স্বীকার করিলেন এবং ২৫শে অক্টোবর, ১৮৯২ আমাদের দীক্ষাপ্রদান করিলেন। এখন আমার ভারি ইচ্ছা হইল, স্বামীজীর ফটো তুলিয়া লই। তিনি সহজে স্বীকৃত হইলেন না। পরে অনেক বাদানুবাদের পর আমার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া ২৮শে তারিখে ফটো তোলাইতে সম্মত হইলেন এবং ফটো লওয়া হইল। ইতঃপূর্বে তিনি এক ব্যক্তির আগ্রহসত্ত্বেও ফটো তুলিতে দেন নাই বলিয়া দুই কপি ফটো তাহাকে পাঠাইয়া দিবার কথা আমাকে বলিলেন। আমিও সে কথা সানন্দে স্বীকার করিলাম।

একদিন স্বামীজী বলিলেন, 'তোমার সহিত জঙ্গলে তাঁবু খাটাইয়া আমার কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা। কিন্তু চিকাগোয় ধর্মসভা হইবে, যদি তাহাতে যাইবার সুবিধা হয় তো সেখানে যাইব।' আমি চাঁদার লিস্ট করিয়া টাকা-সংগ্রহের প্রস্তাব করায় তিনি কি ভাবিয়া স্বীকার করিলেন না। এই সময় স্বামীজীর ব্রতই ছিল, টাকাকড়ি স্পর্শ বা গ্রহণ করিবেন না। আমি অনেক অনুরোধ করিয়া তাঁহার মারহাট্টি জুতার পরিবর্তে এক জোড়া জুতা ও একগাছি বেতের ছড়ি দিয়াছিলাম। ইতঃপূর্বে কোলাপুরের রানী অনেক অনুরোধ করিয়াও স্বামীজীকে কিছুই গ্রহণ করাইতে না পারিয়া

অবশেষে দুইখানি গেরুয়া বস্ত্র পাঠাইয়া দেন। স্বামীজীও গেরুয়া দুইখানি গ্রহণ করিয়া যে বস্ত্রগুলি পরিধান করিয়াছিলেন, সেগুলি সেইখানেই ত্যাগ করেন এবং বলেন, সন্ন্যাসীর বোঝা যত কম হয় ততই ভাল।

ইতঃপূর্বে আমি ভগবদ্‌গীতা অনেক বার পড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বুঝিতে না পারায় পরিশেষে উহাতে বুঝিবার বড় কিছু নাই মনে করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। স্বামীজী গীতা লইয়া আমাদিগকে এক দিন বুঝাইতে লাগিলেন। তখন দেখিলাম, উহা কি অদ্ভুত গ্রন্থ! গীতার মর্ম গ্রহণ করিতে তাঁহার নিকটে যেমন শিখিয়াছিলাম, তেমনি আবার অন্যদিকে জুল ভার্ন (Jules Verne)-এর Scientific Novels এবং কার্লাইল (Carlyle)-এর Sartor Resartus তাঁহার নিকটেই পড়িতে শিখি।

তখন স্বাস্থ্যের জন্য ঔষধাদি অনেক ব্যবহার করিতাম। সে কথা জানিতে পারিয়া একদিন তিনি বলিলেন, 'যখন দেখিবে কোন রোগ এত প্রবল হইয়াছে যে, শয্যাশায়ী করিয়াছে আর উঠিবার শক্তি নাই, তখনই ঔষধ খাইবে, নতুবা নহে। Nervous debility (স্নায়বিক দুর্বলতা) প্রভৃতি রোগের শতকরা ৯০টা কাল্পনিক। ঐ-সকল রোগের হাত হইতে ডাক্তারেরা যত লোককে বাঁচান, তার চাইতে বেশী লোককে মারেন। আর ওরূপ সর্বদা রোগ রোগ করিয়াই বা কি হইবে? যত দিন বাঁচো আনন্দে কাটাও। তবে যে আনন্দে একবার সন্তাপ আসিয়াছে, তাহা আর করিও না। তোমার আমার মতো একটা মরিলে পৃথিবীও আপনার কেন্দ্র হইতে দূরে যাইবে না, বা জগতের কোন বিষয়ের কিছু ব্যাঘাত হইবে না।'

এই সময়ে আবার অনেক কারণ বশতঃ উপরিস্থ কর্মচারী সাহেবদের সহিত আমার বড় একটা বনিত না। তাঁহারা সামান্য কিছু বলিলে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিত এবং এমন ভাল চাকরি পাইয়াও একদিনের জন্য সুখী হই নাই। তাঁহাকে এ-সমস্ত কথা বলায় তিনি বলিলেন, 'কিসের জন্য চাকরি করিতেছ? বেতনের জন্য তো? বেতন তো মাসে মাসে ঠিক পাইতেছ, তবে কেন মনে কষ্ট পাও? আর ইচ্ছা হইলে যখন চাকরি ছাড়িয়া দিতে পারো, কেহ বাঁধিয়া রাখে নাই, তখন বিষম বন্ধনে পড়িয়াছি ভাবিয়া দুঃখের সংসারে আরও দুঃখ বাড়াও কেন? আর এক কথা, বলো দেখি যাহার জন্য বেতন পাইতেছ,

আফিসের সেই কাজগুলি করিয়া দেওয়া ছাড়া তোমার উপরওয়ালা সাহেবদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য কখনও কিছু করিয়াছ কি? কখনও সেজন্য চেষ্টা কর নাই, অথচ তাহারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নহে বলিয়া তাহাদের উপর বিরক্ত! ইহা কি বুদ্ধিমানের কাজ? জানিও, আমরা অন্যের উপর হৃদয়ের যে ভাব রাখি, তাহাই কাজে প্রকাশ পায়; আর প্রকাশ না করিলেও তাহাদের ভিতরে আমাদের উপর ঠিক সেই ভাবের উদয় হয়। আমাদের ভিতরকার ছবিই জগতে প্রকাশ রহিয়াছে—আমরা দেখি। আপ্ ভালা তো জগৎ ভালা—এ-কথা যে কতদূর সত্য কেহই জানে না। আজ হইতে মন্দটি দেখা একেবারে ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা কর। দেখিবে, যে পরিমাণে তুমি উহা করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে তাহাদের ভিতরের ভাব এবং কার্যও পরিবর্তিত হইয়াছে।' বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে আমার ঔষধ খাইবার বাতিক দূর হইল এবং অপরের উপর দোষদৃষ্টি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করায় ক্রমে জীবনের একটা নূতন পৃষ্ঠা খুলিয়া গেল।

একবার স্বামীজীর নিকট ভালই বা কি এবং মন্দই বা কি—এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত করায় তিনি বলিলেন, 'যাহা অভীষ্ট কার্যের সাধনভূত তাহাই ভাল; আর যাহা তাহার প্রতিরোধক তাহাই মন্দ। ভাল-মন্দের বিচার আমরা জায়গা উঁচু-নিচু-বিচারের ন্যায় করিয়া থাকি। যত উপরে উঠিবে তত দুই-ই এক হইয়া যাইবে। চন্দ্রে পাহাড় ও সমতল আছে—বলে, কিন্তু আমরা সব এক দেখি, সেইরূপ।' স্বামীজীর এই এক অসাধারণ শক্তি ছিল—যে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তাহার উপযুক্ত উত্তর তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভিতর হইতে এমন যোগাইত যে, মনের সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া যাইত।

আর একদিনের কথা—কলিকাতায় একটি লোক অনাহারে মারা গিয়াছে, খবরের কাগজে এই কথা পড়িয়া স্বামীজী এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, তাহা বলিবার নহে। বার বার বলিতে লাগিলেন, এইবার বা দেশটা উৎসন্ন যায়! কেন—জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন: দেখিতেছ না, অন্যান্য দেশে কত poor-house, work-house, charity fund প্রভৃতি সত্ত্বেও শত শত লোক প্রতিবৎসর অনাহারে মরে, খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কিন্তু এক মুষ্টিভিক্ষার পদ্ধতি থাকায় অনাহারে লোক

মরিতে কখন শোনা যায় নাই। আমি এই প্রথম কাগজে এ কথা পড়িলাম যে, দুর্ভিক্ষ ভিন্ন অন্য সময়ে কলিকাতায় অনাহারে লোক মরে।

ইংরেজী শিক্ষার কৃপায় আমি দুই চারি পয়সা ভিক্ষুককে দান করাটা অপব্যয় মনে করিতাম। মনে হইত, ঐরূপে যৎসামান্য যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাতে তাহাদের কোন উপকার তো হয়ই না, বরং বিনা পরিশ্রমে পয়সা পাইয়া, তাহা মদ-গাঁজায় খরচ করিয়া তাহারা আরও অধঃপাতে যায়। লাভের মধ্যে দাতার কিছু মিছে খরচ বাড়িয়া যায়। সেজন্য আমার মনে হইত, লোককে কিছু কিছু দেওয়া অপেক্ষা একজনকে বেশী দেওয়া ভাল। স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন: ভিখারী আসিলে যদি শক্তি থাকে তো যাহা হয় কিছু দেওয়া ভাল। দেবে তো দু-একটি পয়সা; সেজন্য সে কিসে খরচ করিবে, সদ্ব্যয় হইবে কি অপব্যয় হইবে, এ-সব লইয়া এত মাথা ঘামাইবার দরকার কি? আর সত্যই যদি সেই পয়সা গাঁজা খাইয়া উড়ায়, তাহা হইলেও তাহাকে দেওয়ায় সমাজের লাভ বই লোকসান নাই। কেন না, তোমার মতো লোকেরা তাহাকে দয়া করিয়া কিছু কিছু না দিলে সে উহা তোমাদের নিকট হইতে চুরি করিয়া লইবে। তাহা অপেক্ষা দুই পয়সা ভিক্ষা করিয়া গাঁজা টানিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহা কি তোমাদেরই ভাল নহে? অতএব ঐ-প্রকার দানেও সমাজের উপকার বই অপকার নাই।

প্রথম হইতেই স্বামীজীকে বাল্যবিবাহের উপর ভারি চটা দেখিয়াছি। সর্বদাই সকল লোককে বিশেষতঃ বালকদের সাহস বাঁধিয়া সমাজের এই কলঙ্কের বিপক্ষে দাঁড়াইতে এবং উদ্যোগী হইতে উপদেশ দিতেন। স্বদেশের প্রতি এরূপ অনুরাগও কোন মানুষের দেখি নাই। পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিবার পর যাঁহারা স্বামীজীর প্রথম দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন না—সেখানে যাইবার পূর্বে তিনি সন্ন্যাস-আশ্রমের কঠোর নিয়মাদি পালন করিয়া, কাঞ্চনমাত্র স্পর্শ না করিয়া কতকাল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মতো শক্তিমান্ পুরুষের এত বাঁধাবাঁধি নিয়মাদির আবশ্যক নাই—কোন লোক এক বার এই কথা বলায় তিনি বলেন: দেখ, মন বেটা বড় পাগল—ঘোর মাতাল, চুপ ক'রে কখনই থাকে না, একটু সময় পেলেই আপনার পথে টেনে নিয়ে যাবে। সেই জন্য সকলেরই

বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতরে থাকা আবশ্যক। সন্ন্যাসীরও সেই মনের উপর দখল রাখিবার জন্য নিয়মে চলিতে হয়। সকলেই মনে করেন, মনের উপর তাঁহাদের খুব দখল আছে; তবে ইচ্ছা করিয়া কখন একটু আলগা দেন মাত্র। কিন্তু কাহার কতটা দখল হইয়াছে, তাহা একবার ধ্যান করিতে বসিলেই টের পাওয়া যায়। এক বিষয়ের উপর চিন্তা করিব মনে করিয়া বসিলে দশ মিনিটও ঐ বিষয়ে একক্রমে মন স্থির রাখা যায় না। প্রত্যেকেই মনে করেন, তিনি স্ত্রৈণ নন, তবে আদর করিয়া স্ত্রীকে আধিপত্য করিতে দেন মাত্র। মনকে বশে রাখিয়াছি মনে করাটা ঠিক ঐ রকম। মনকে বিশ্বাস করিয়া কখন নিশ্চিন্ত থাকিও না।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম—স্বামীজী, দেখিতেছি ধর্ম ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে অনেক লেখাপড়া জানা আবশ্যক।

তিনি বলিলেন: নিজে ধর্ম বুঝিবার জন্য লেখাপড়ার আবশ্যক নাই। কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে হইলে উহার বিশেষ আবশ্যক। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব 'রামকেষ্ট' বলিয়া সহি করিতেন, কিন্তু ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহা অপেক্ষা কে বুঝিয়াছিল?

আমার বিশ্বাস ছিল, সাধু-সন্ন্যাসীর স্থূলকায় ও সদা সন্তুষ্টচিত্ত হওয়া অসম্ভব। একদিন হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা বলায় তিনিও বিদ্রূপচ্ছলে উত্তর করিলেন: ইহাই আমার Famine Insurance Fund—যদি পাঁচ-সাত দিন খাইতে না পাই, তবু আমার চর্বি আমাকে জীবিত রাখিবে। তোমরা একদিন না খাইলেই সব অন্ধকার দেখিবে। আর যে ধর্ম মানুষকে সুখী করে না, তাহা বাস্তবিক ধর্ম নহে, dyspepsia (অজীর্ণতা)-প্রসূত রোগবিশেষ বলিয়া জানিও।

স্বামীজী সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদিন একটি গান আরম্ভও করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস'; তারপর শুনিবার আমার অবসরই বা কোথায়? তাঁহার কথা ও গল্পই আমাদিগকে মোহিত করিয়াছিল।

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা—Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুই-

চারি কথায় বুঝাইয়া দিতেন। আবার ধর্মবিষয়ক মীমাংসাও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ও দৃষ্টান্তে বিশদভাবে বুঝাইতে এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের যে একই লক্ষ্য—একই দিকে গতি, তাহা দেখাইতে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা আর কাহারও দেখি নাই।

লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিয়াছিলেন: পর্যটনকালে সন্ন্যাসীদের দেশ-বিদেশের নানাপ্রকার দূষিত জল পান করিতে হয়; তাহাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষ-নিবারণের জন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা, চরস প্রভৃতি নেশা করিয়া থাকে। আমিও সেইজন্য এত লঙ্কা খাই।

রাজোয়ারা ও খেতড়ির রাজা, কোলাপুরের ছত্রপতি ও দাক্ষিণাত্যের অনেক রাজা-রাজড়া তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন; তাঁহাদেরও তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অসামান্য ত্যাগী হইয়া রাজা-রাজড়ার সহিত অত মেশামেশি তিনি কেন করেন, এ-কথা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইত না। কোন কোন নির্বোধ লোক এ-জন্য তাঁহাকে কটাক্ষ করিতেও ছাড়িত না।

কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিলেন: হাজার হাজার দরিদ্র লোককে উপদেশ দিয়া সৎকার্য করাইতে পারিলে যে ফল হইবে, একজন শ্রীমান্ রাজাকে সেইদিকে আনিতে পারিলে তদপেক্ষা কত অধিক ফল হইবে। ভাবো দেখি! গরীব প্রজার ইচ্ছা হইলেও সৎকার্য করিবার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র সহস্র প্রজার মঙ্গলবিধানের ক্ষমতা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে, কেবল উহা করিবার ইচ্ছা নাই। সেই ইচ্ছা যদি কোনরূপে তাহার ভিতর একবার জাগাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধীন সকল প্রজার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এবং জগতের কত বেশী কল্যাণ হইবে।

বাগ্‌বিতণ্ডায় ধর্ম নাই, ধর্ম অনুভব-প্রত্যক্ষের বিষয়, এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি কথায় কথায় বলিতেন: Test of pudding lies in eating, অনুভব কর; তাহা না হইলে কিছুই বুঝিবে না। তিনি কপট সন্ন্যাসীদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। বলিতেন, ঘরে থাকিয়া মনের উপর অধিকার স্থাপন করিয়া তবে বাহিরে যাওয়া ভাল; নতুবা নবানুরাগটুকু কমিবার পর প্রায় গাঁজাখোর সন্ন্যাসীদের দলে মিশিয়া পড়িতে হয়।

আমি বলিলাম, কিন্তু ঘরে থাকিয়া সেটি হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন; সর্বভূতকে সমান চোখে দেখা, রাগ-দ্বেষ ত্যাগ করা প্রভৃতি যে-সকল কাজ ধর্মলাভের প্রধান সহায়—আপনি যাহা বলেন, তাহা যদি আমি আজ হইতে অনুষ্ঠান করিতে থাকি, তবে কাল হইতে আমার চাকর ও অধীন কর্মচারিগণ এবং দেশের লোকেও আমাকে এক দণ্ড শান্তিতে থাকিতে দিবে না।

উত্তরে তিনি পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্প ও সন্ন্যাসীর গল্পটি বলিয়া বলিলেন: কখন ফোঁস ছেড়ো না, আর কর্তব্য পালন করিতেছ মনে করিয়া সকল কর্ম করিও। কেহ দোষ করে, দণ্ড দিবে; কিন্তু দণ্ড দিতে গিয়া কখন রাগ করিও না। পরে পূর্বের প্রসঙ্গ পুনরায় উঠাইয়া বলিলেন:

এক সময়ে আমি এক তীর্থস্থানের পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের অতিথি হইয়াছিলাম; লোকটির বেশ ধর্মজ্ঞান ও ভক্তি ছিল। তাঁহার বেতন ১২৫৲ টাকা, কিন্তু দেখিলাম, তাঁহার বাসার খরচ মাসে দুই-তিন শত টাকা হইবে। যখন বেশী জানাশুনা হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার তো আয় অপেক্ষা খরচ বেশী দেখিতেছি—চলে কিরূপে?' তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'আপনারাই চালান। এই তীর্থস্থলে যে-সকল সাধু-সন্ন্যাসী আসেন, তাঁহাদের ভিতরে সকলেই কিছু আপনার মতো নন। সন্দেহ হইলে তাঁহাদের নিকট কি আছে না আছে, তল্লাস করিয়া থাকি। অনেকের নিকট প্রচুর টাকাকড়ি বাহির হয়। যাহাদিগকে চোর সন্দেহ করি, তাহারা টাকাকড়ি ফেলিয়া পালায়, আর আমি সেই সমস্ত আত্মসাৎ করি। অপর ঘুষঘাস কিছু লই না।'

স্বামীজীর সহিত একদিন 'অনন্ত' (Infinity) সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। সেই কথাটি বড়ই সুন্দর ও সত্য; তিনি বলিলেন, 'There can be no two infinities.' আমি সময় অনন্ত (time is infinite) ও আকাশ অনন্ত (space is infinite) বলায় তিনি বলেন: আকাশ অনন্তটা বুঝিলাম, কিন্তু সময় অনন্তটা বুঝিলাম না। যাহা হউক, একটা পদার্থ অনন্ত, এ কথা বুঝি, কিন্তু দুইটা জিনিস অনন্ত হইলে কোন্‌টা কোথায় থাকে? আর একটু এগোও, দেখিবে—সময়ও যাহা, আকাশও তাহাই; আরও অগ্রসর হইয়া বুঝিবে, সকল পদার্থই অনন্ত, এবং সেইসকল অনন্ত পদার্থ একটা বই দুইটা দশটা নয়।

এইরূপে স্বামীজীর পদার্পণে ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত আমার বাসায় আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল। ২৭শে তারিখে বলিলেন, 'আর থাকিব না; রামেশ্বর যাইব মনে করিয়া অনেক দিন হইল এই দিকে চলিতেছি। যদি এই ভাবে অগ্রসর হই, তাহা হইলে এ জনমে আর রামেশ্বর পৌছানো হইবে না।' আমি অনেক অনুরোধ করিয়াও আর রাখিতে পারিলাম না। ২৭শে অক্টোবর মেল ট্রেনে, তিনি মর্মাগোয়া যাত্রা করিবেন, স্থির হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কত লোককে মোহিত করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে গাড়িতে বসাইয়া আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম ও বলিলাম, 'স্বামীজী, জীবনে আজ পর্যন্ত কাহাকেও আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করি নাই, আজ আপনাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলাম।'

*

স্বামীজীর সহিত আমার তিনবার মাত্র দেখা হয়। প্রথম—আমেরিকা যাইবার পূর্বে; সে-বারকার দেখার কথা অনেকটা বলিলাম। দ্বিতীয়—যখন তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত এবং আমেরিকা যাত্রা করেন তাহার কিছু পূর্বে। তৃতীয় এবং শেষবার দেখা হয় তাঁহার দেহত্যাগের ছয়-সাত মাস পূর্বে। এই কয়বারে তাঁহার নিকট যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। যাহা মনে আছে, তাহার ভিতর সাধারণ-পাঠকের উপযোগী বিষয়গুলি জানাইতে চেষ্টা করিব।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি হিন্দুদিগের জাতি-বিচার সম্বন্ধে ও কোন কোন সম্প্রদায়ের ব্যবহারের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া যে বক্তৃতাগুলি মাদ্রাজে দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, স্বামীজীর ভাষাটা একটু বেশী কড়া হইয়াছে। তাঁহার নিকট সে কথা প্রকাশও করিয়াছিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন: যাহা কিছু বলিয়াছি, সমস্ত সত্য। আর যাহাদের সম্বন্ধে ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছি, তাঁহাদের কার্যের তুলনায় উহা বিন্দুমাত্রও অধিক কড়া নহে। সত্য কথার সঙ্কোচ বা গোপন করার তো কোন কারণ দেখি না; তবে ঐরূপ কার্যের ঐরূপ সমালোচনা করিয়াছি বলিয়া মনে করিও না যে, তাঁহাদের উপর আমার রাগ ছিল বা আছে, অথবা কেহ কেহ যেমন ভাবিয়া থাকেন, কর্তব্যবোধে যাহা করিয়াছি, তাহার

জন্য এখন আমি দুঃখিত। ও-কথার একটাও সত্য নহে। আমি রাগিয়াও ঐ কাজ করি নাই এবং করিয়াছি বলিয়াও দুঃখিত নহি। এখনও যদি ঐরূপ কোন অপ্রিয় কার্য করা কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এখনও ঐরূপ নিঃসঙ্কোচে উহা নিশ্চয় করিব।

ভণ্ড সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আর একদিন কথা উঠায় বলিলেন: অবশ্য অনেক বদমায়েস লোক ওয়ারেণ্টের ভয়ে কিংবা উৎকট দুষ্কর্ম করিয়া লুকাইবার জন্য সন্ন্যাসীর বেশে বেড়ায় সত্য; কিন্তু তোমাদেরও একটু দোষ আছে। তোমরা মনে কর, কেহ সন্ন্যাসী হইলেই তাহার ঈশ্বরের মতো ত্রিগুণাতীত হওয়া চাই। সে পেট ভরিয়া ভাল খাইলে দোষ, বিছানায় শুইলে দোষ, এমন কি, জুতা বা ছাতি পর্যন্ত তাহার ব্যবহার করার জো নাই। কেন, তাহারাও তো মানুষ, তোমাদের মতে পূর্ণ পরমহংস না হইলে তাহার আর গেরুয়া বস্ত্র পরিবার অধিকার নাই—ইহা ভুল। এক সময়ে আমার একটি সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ হয়। তাঁহার ভাল পোশাকের উপর ভারি ঝোঁক। তোমরা তাঁহাকে দেখিলে নিশ্চয়ই ঘোর বিলাসী মনে করিবে। কিন্তু বাস্তবিক তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী।

স্বামীজী বলিতেন: দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে মানসিক ভাব ও অনুভবের অনেক তারতম্য হয়। ধর্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। প্রত্যেক মানুষেরই আবার একটা-না-একটা বিষয়ে বেশী ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের সকলেই আপনাকে বেশী বুদ্ধিমান্ মনে করে। তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমিই কেবল বুঝি, অন্যে বুঝে না, ইহাতেই যত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। সকলেই চায়, প্রত্যেক বিষয়টা অপর সকলে তাহারই মতো দেখুক ও বুঝুক। সে যেটা সত্য বুঝিয়াছে বা যাহা জানিয়াছে, তাহা ছাড়া আর কোন সত্য থাকিতে পারে না। সাংসারিক বিষয়েই হউক বা ধর্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়েই হউক, ও-রূপ ভাব কোনমতে মনে আসিতে দেওয়া উচিত নয়।

জগতের কোন বিষয়েই সকলের উপর এক আইন খাটে না। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নীতি এবং সৌন্দর্যবোধও বিভিন্ন দেখা যায়। তিব্বত-দেশে এক স্ত্রীলোকের বহু পতি থাকার প্রথা প্রচলিত আছে। হিমালয়-ভ্রমণকালে আমার ঐরূপ একটি তিব্বতীয় পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ পরিবারে ছয়জন পুরুষ এবং ঐ ছয়জনের একটি স্ত্রী ছিল। ক্রমে পরিচয়ের গাঢ়তা

জন্মিলে আমি একদিন তাহাদের ঐ কুপ্রথা সম্বন্ধে বলায় তাহারা বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, 'তুমি সাধু সন্ন্যাসী হইয়া লোককে স্বার্থপরতা শিখাইতে চাহিতেছ? এটি আমারই উপভোগ্য, অন্যের নয়—এরূপ ভাবা কি অন্যায় নহে?' আমি তো শুনিয়া অবাক!

নাসিকা এবং পায়ের খর্বতা লইয়াই চীনের সৌন্দর্য-বিচার, এ-কথা সকলেরই জানা আছে। আহারাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ। ইংরেজ আমাদের মতো সুবাসিত চাউলের অন্ন ভালবাসে না। এক সময়ে কোন স্থানের জজ-সাহেবের অন্যত্র বদলি হওয়ায় তথাকার কতকগুলি উকিল মোক্তার তাঁহার সম্মানার্থ উত্তম সিধা পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েক সের সুবাসিত চাউল ছিল। জজ-সাহেব সুবাসিত চাউলের ভাত খাইয়া উহা পচা চাউল মনে করেন এবং উকিলদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলেন, 'You ought not to have given me rotten rice.'—তোমাদের পচা চালগুলি আমাকে দেওয়া ভাল হয় নাই।

কোন এক সময়ে ট্রেনে যাইতেছিলাম, সেই কামরায় চার-পাঁচটি সাহেব ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তামাকের বিষয়ে আমি বলিলাম, 'সুবাসিত গুড়ুক তামাক জলপূর্ণ হুঁকায় ব্যবহার করাই তামাকু-সেবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ।' আমার নিকট খুব ভাল তামাক ছিল, তাঁহাদিগকে উহা দেখিতেও দিলাম। তাঁহারা আঘ্রাণ লইয়াই বলিলেন, 'এ তো অতি দুর্গন্ধ! ইহাকে তুমি সুগন্ধ বলো?' এইরূপে গন্ধ, আস্বাদ, সৌন্দর্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সমাজ-দেশ-কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত।

স্বামীজীর পূর্বোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার বিলম্ব হয় নাই। আমার মনে হইল, পূর্বে শিকার করা আমার কত প্রিয় ছিল। কোন পশু পক্ষী দেখিলে কতক্ষণে উহাকে মারিব, এই জন্য প্রাণ ছটফট করিত। মারিতে না পারিলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। এখন ও-রূপ প্রাণিবধ একেবারেই ভাল লাগে না। সুতরাং কোন জিনিসটা ভাল লাগা বা মন্দ লাগা কেবল অভ্যাসের কাজ।

আপনার মত বজায় রাখিতে প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ জিদ দেখা যায়। ধর্মমত সম্বন্ধে আবার উহার বিশেষ প্রকাশ। স্বামীজী ঐ সম্বন্ধে

একটি গল্প বলিলেন : এক সময়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিবার জন্য অন্য এক রাজা সদলবলে উপস্থিত হইলেন। কাজেই শত্রুর হাত হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায় স্থির করিবার জন্য সেই রাজ্যে এক মহা সভা আহূত হইল। সভায় ইঞ্জিনিয়র, সূত্রধর, চর্মকার, কর্মকার, উকিল, পুরোহিত প্রভৃতি সভাসদ্‌গণ উপস্থিত হইলেন। ইঞ্জিনিয়র বলিলেন, 'শহরের চারিদিকে বেড় দিয়া এক বৃহৎ খাল খনন কর।' সূত্রধর বলিল, 'কাঠের দেওয়াল দেওয়া যাক।' চামার বলিল, 'চামড়ার মতো মজবুত কিছুই নাই; চামড়ার বেড়া দাও।' কামার বলিল, 'ও-সব কাজের কথা নয়; লোহার দেওয়ালই ভাল, ভেদ করিয়া গুলিগোলা আসিতে পারিবে না।' উকিল বলিলেন, 'কিছুই করিবার দরকার নাই; আমাদের রাজ্য লইবার শত্রুদের কোন অধিকার নাই—এই কথাটি তাহাদের তর্কযুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাউক।' পুরোহিত বলিলেন, 'তোমরা সকলেই বাতুলের মতো প্রলাপ বকিতেছ। হোম যাগ কর, স্বস্ত্যয়ন কর, তুলসী দাও, শত্রুরা কিছুই করিতে পারিবে না।' এইরূপে রাজ্য বাঁচাইবার কোন উপায় স্থির না করিয়া তাহারা নিজ নিজ মত লইয়া মহা হুলস্থূল তর্ক আরম্ভ করিল। এই রকম করাই মানুষের স্বভাব!

গল্পটি শুনিয়া আমারও মানুষের মনের একঘেয়ে ঝোঁক সম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়িল, স্বামীজীকে বলিলাম, 'স্বামীজী, আমি ছেলেবেলায় পাগলের সহিত আলাপ করিতে বড় ভালবাসিতাম। একদিন একটি পাগল দেখিলাম বেশ বুদ্ধিমান্, ইংরেজীও একটু-আধটু জানে; তার চাই কেবল জল খাওয়া! সঙ্গে একটি ভাঙা ঘটি। যেখানে জল পায়, খাল হউক, ডোবা হউক, নূতন একটা জলের জায়গা দেখিলেই সেখানকার জল পান করিত। আমি তাহাকে এত জল খাবার কারণ জিজ্ঞাসায় সে বলিল, 'Nothing like water, sir!'—জলের মতো কোন জিনিসই নেই, মোশাই! তাহাকে আমি একটি ভাল ঘটি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, সে উহা কোনমতে লইল না। কারণ জিজ্ঞাসায় বলিল, 'এটি ভাঙা ঘটি বলিয়াই এত-দিন আছে। ভাল হইলে অন্যে চুরি করিয়া লইত।'

স্বামীজী গল্প শুনিয়া বলিলেন, 'সে তো বেশ মজার পাগল! ওদের monomaniac বলে। আমাদের সকলেরই ঐ রকম এক-একটা ঝোঁক আছে। আমাদের উহা চাপিয়া রাখিবার ক্ষমতা আছে, পাগলের তাহা

নাই। পাগলের সহিত আমাদের এইটুকু মাত্র প্রভেদ। রোগ-শোক-অহঙ্কারে, কাম-ক্রোধ-হিংসায় বা অন্য কোন অত্যাচার বা অনাচারে মানুষ দুর্বল হইয়া ঐ সংযমটুকু হারাইলেই মুশকিল! মনের আবেগ আর চাপিতে পারে না। আমরা তখন বলি, ও লোকটা খেপেছে। এই আর কি!'

স্বামীজীর স্বদেশানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল; এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। একদিন ঐ সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলা হয় যে, সংসারী লোকের আপনাপন দেশের প্রতি অনুরাগ নিত্যকর্তব্য হইলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে নিজের দেশের মায়া ত্যাগ করা এবং সকল দেশের উপর সমদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সকল দেশের কল্যাণচিন্তা হৃদয়ে রাখা ভাল। ঐ কথার উত্তরে স্বামীজী যে জ্বলন্ত কথাগুলি বলেন, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। তিনি বলিলেন, 'যে আপনার মাকে ভাত দেয় না, সে অন্যের মাকে আবার কি পুষবে?'

আমাদের প্রচলিত ধর্মে, আচার-ব্যবহারে, সামাজিক প্রথায় যে অনেক দোষ আছে, স্বামীজী এ কথা স্বীকার করিতেন, বলিতেন, 'সে-সকল সংশোধন করিবার চেষ্টা করা আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য; কিন্তু তাই বলিয়া সংবাদপত্রে ইংরেজের কাছে সে-সকল ঘোষণা করিবার আবশ্যক কি? ঘরের গলদ বাহিরে যে দেখায়, তাহার মতো গর্দভ আর কে আছে? Dirty linen must not be exposed in the street.'—ময়লা কাপড়-চোপড় রাস্তার ধারে, লোকের চোখের সামনে রাখাটা উচিত নয়।

খ্রীষ্টান মিশনরীগণের সম্বন্ধে একদিন কথাবার্তা হয়। তাঁহারা আমাদের দেশে কত উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, প্রসঙ্গক্রমে আমি এই কথা বলি। শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'কিন্তু অপকারও বড় কম করেন নাই। দেশের লোকের মনের শ্রদ্ধাটি একেবারে গোল্লায় দিবার বিলক্ষণ যোগাড় করিয়াছেন। শ্রদ্ধানাশের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও নাশ হয়। এ কথা কেহ কি বোঝে? আমাদের দেবদেবীর নিন্দা, আমাদের ধর্মের কুৎসা না করিয়া কি তাঁহাদের নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো যায় না? আর এক কথা, যিনি যে ধর্মমত প্রচার করিতে চান, তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ও তদনুযায়ী কাজ করা চাই। অধিকাংশ মিশনরী মুখে এক, কাজে আর। আমি কপটতার উপর ভারি চটা।'

একদিন ধর্ম ও যোগ সম্বন্ধে অনেক কথা অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছিলেন। তাহার মর্ম যতদূর মনে আছে, এইখানে লিখিলাম:

সকল প্রাণীই সতত সুখী হইবার চেষ্টায় বিব্রত; কিন্তু খুব কম লোকই সুখী। কাজকর্মও সকলে অনবরত করিতেছে; কিন্তু তাহার অভিলষিত ফল পাইতে প্রায় দেখা যায় না। এরূপ বিপরীত ফল উপস্থিত হইবার কারণ কি, তাহাও সকলে বুঝিবার চেষ্টা করে না। সেই জন্যই মানুষ দুঃখ পায়। ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস হউক না কেন, কেহ যদি ঐ বিশ্বাস-বলে আপনাকে যথার্থ সুখী বলিয়া অনুভব করে, তাহা হইলে তাহার ঐ মত পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করা কাহারও উচিত নহে, এবং করিলেও তাহাতে সুফল ফলে না। তবে মুখে যে যাহাই বলুক না কেন, যখন দেখিবে কাহারও ধর্ম সম্বন্ধে কথা-বার্তা শুনিবারই কেবলমাত্র আগ্রহ আছে, উহার কোন কিছু অনুষ্ঠানের চেষ্টা নাই, তখনই জানিবে যে তাহার কোন একটা বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হয় নাই।

ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সুখী করা। কিন্তু পরজন্মে সুখী হইব বলিয়া ইহজন্মে দুঃখভোগ করাও বুদ্ধিমানের কাজ নহে। এই জন্মে, এই মুহূর্ত হইতেই সুখী হইতে হইবে। যে ধর্ম দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইবে, তাহাই মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম। ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ ক্ষণস্থায়ী ও তাহার সহিত অবশ্যম্ভাবী দুঃখও অনিবার্য। শিশু, অজ্ঞান ও পশুপ্রকৃতির লোকেরাই ঐ ক্ষণস্থায়ী দুঃখমিশ্রিত সুখকে বাস্তবিক সুখ মনে করিয়া থাকে। যদি ঐ সুখকেও কেহ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া চিরকাল সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ও সুখী থাকিতে পারে, তাহাও মন্দ নহে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এরূপ লোক দেখা যায় নাই। সচরাচর ইহাই দেখা যায় যে, যাহারা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাকেই সুখ মনে করে, তাহারা আপনাদের অপেক্ষা ধনবান বিলাসী লোকদের অধিক সুখী মনে করিয়া দ্বেষ করে এবং উচ্চশ্রেণীর বহুব্যয়সাধ্য ইন্দ্রিয়ভোগ দেখিয়া উহা পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া অসুখী হয়। সম্রাট আলেকজেন্দার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, পৃথিবীতে আর জয় করিবার দেশ নাই ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য বুদ্ধিমান্ মনীষীরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া বিচার করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন একটা ধর্মে যদি পূর্ণ বিশ্বাস হয়, তবেই মানুষ নিশ্চিন্ত ও যথার্থ সুখী হইতে পারে।

বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। সেই জন্য তাহাদের উপযোগী ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া আবশ্যক; নতুবা কিছুতেই উহা তাহাদের সন্তোষপ্রদ হইবে না, কিছুতেই তাহারা উহার

অনুষ্ঠান করিয়া যথার্থ সুখী হইতে পারিবে না। নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী সেই সেই ধর্মমত নিজেকেই ভাবিয়া চিন্তিয়া, দেখিয়া ঠেকিয়া বাছিয়া লইতে হইবে। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ধর্মগ্রন্থপাঠ, গুরূপদেশ, সাধুদর্শন, সৎপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি ঐ বিষয়ে সাহায্য করে মাত্র।

কর্ম সম্বন্ধেও জানা আবশ্যক যে, কোন-না-কোন প্রকার কর্ম না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না; কেবল ভাল বা কেবল মন্দ, জগতে এরূপ কোন কর্মই নাই। ভালটা করিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু মন্দ করিতেই হইবে। আর সেজন্য কর্ম দ্বারা যেমন সুখ আসিবে, কিছু-না-কিছু দুঃখ এবং অভাববোধও সেই সঙ্গে আসিবেই আসিবে, উহা অবশ্যম্ভাবী। সে দুঃখটুকু যদি না লইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বিষয়-ভোগ-জনিত আপাত-সুখলাভের আশাটাও ছাড়িতে হইবে। অর্থাৎ স্বার্থ-সুখ অন্বেষণ না করিয়া কর্তব্যবুদ্ধিতে সকল কার্য করিয়া যাইতে হইবে। উহার নাম নিষ্কাম কর্ম, গীতাতে ভগবান্ অর্জুনকে তাহারই উপদেশ করিয়া বলিতেছেন, 'কাজ করো, কিন্তু ফলটা আমাকে দাও; অর্থাৎ আমার জন্যই কাজ করো।'

গীতা, বাইবেল, কোরান, পুরাণ প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ-নিবদ্ধ ঘটনাবলীর যথাযথ ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আমার আদৌ বিশ্বাস হইত না। স্বামীজীকে একদিন জিজ্ঞাসা করি, 'কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অনতিপূর্বে অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম-উপদেশ, যাহা ভগবদ্গীতায় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা কি-না?' উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বড় সুন্দর। তিনি বলিলেন: গীতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন কালে ইতিহাস লেখার বা পুস্তকাদি ছাপার এখনকার মতো এত ধুমধাম ছিল না; সেজন্য তোমাদের মতো লোকের কাছে ভগবদ্গীতার ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু গীতোক্ত ঘটনা যথাযথ ঘটিয়াছিল কি-না, সেজন্য তোমাদের মাথা ঘামাইবার কারণও দেখিতেছি না। কেন না যদি কেহ— শ্রীভগবান্ সারথি হইয়া অর্জুনকে গীতা বলিয়াছিলেন, ইহা অকাট্য প্রমাণ-প্রয়োগে তোমাদের বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলেই কি তোমরা গীতাতে যাহা কিছু লেখা আছে, তাহা বিশ্বাস করিবে? সাক্ষাৎ ভগবান্ যখন তোমাদের নিকট মূর্তিমান্ হইয়া আসিলেও তোমরা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে

ছোটো ও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে বলো, তখন গীতা ঐতিহাসিক কি-না, এ বৃথা সমস্যা লইয়া কেন ঘুরিয়া বেড়াও? পারো যদি তো গীতার উপদেশগুলি যতটা সম্ভব জীবনে পরিণত করিয়া কৃতার্থ হও। পরমহংসদেব বলিতেন, 'আম খা, গাছের পাতা গুনে কি হবে?' আমার বোধ হয় ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ঘটনার উপর বিশ্বাস-অবিশ্বাস করা is a matter of personal equation (ব্যক্তিগত ব্যাপার)—অর্থাৎ মানুষ কোন এক অবস্থা-বিশেষে পড়িয়া তাহা হইতে উদ্ধার-কামনায় পথ খুঁজিতে থাকে এবং ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কোন ঘটনার সহিত তাহার নিজের অবস্থা ঠিক ঠিক মিলিতেছে দেখিতে পাইলে ঐ ঘটনা ঐতিহাসিক বলিয়া নিশ্চয় বিশ্বাস করে। আর ধর্মশাস্ত্রোক্ত ঐ অবস্থার উপযোগী উপায়ও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে।

স্বামীজী একদিন শারীরিক এবং মানসিক শক্তি অভীষ্ট কার্যের নিমিত্ত সংরক্ষণ করা যে প্রত্যেকের কতদূর কর্তব্য, তাহা অতি সুন্দর ভাবে আমাদের বুঝাইয়াছিলেন, 'অনধিকার চর্চায় বা বৃথা কাজে যে শক্তিক্ষয় করে, অভীষ্ট কার্যসিদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সে আর কোথায় পাইবে? The sum-total of the energy which can be exhibited by an ego is a constant quantity—অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরে নানাভাবে প্রকাশ করিবার যে শক্তি বর্তমান রহিয়াছে, উহা সীমাবদ্ধ; সুতরাং সেই শক্তির অধিকাংশ একভাবে প্রকাশিত হইলে ততটা আর অন্যভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। ধর্মের গভীর সত্যসকল জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে অনেক শক্তির প্রয়োজন; সেই জন্যই ধর্মপথের পথিকদিগের প্রতি—বিষয়ভোগ ইত্যাদিতে শক্তিক্ষয় না করিয়া ব্রহ্মচর্যাদির দ্বারা শক্তিসংরক্ষার উপদেশ সকল জাতির ধর্মগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়।'

স্বামীজী বাঙলাদেশের পল্লীগ্রাম ও তথাকার লোকদের কতকগুলি আচরণের উপর বড় একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। পল্লীগ্রামের একই পুষ্করিণীতে স্নান, জলশৌচ প্রভৃতি এবং সেই পুকুরের জলই পান করার প্রথার উপর তিনি ভারি বিরক্ত ছিলেন।

স্বামীজীর এক এক দিনের এইরূপ কথাবার্তা ধরিয়া রাখিতে পারিলে এক একখানি পুস্তক হইত। একই প্রশ্নের বারবার একই ভাবে উত্তর দেওয়া এবং একই দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝানো তাঁহার রীতি ছিল না। যতবারই সেই

প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ততবারই উহা নূতন ভাবে নূতন দৃষ্টান্ত-সহায়ে এমন্সি বলিবার ক্ষমতা ছিল যে, উহা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া লোকের বোধ হইত এবং তাঁহার কথা শুনিতে ক্লান্তিবোধ দূরে থাকুক, আগ্রহ ও অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত। বক্তৃতা সম্বন্ধেও তাঁহার ঐ প্রথা ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিবার বিষয়গুলি (points) লিখিয়া তিনি কোনকালে বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। বক্তৃতার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত হাসি-তামাসা, সাধারণভাবে কথাবার্তা এবং বক্তৃতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধহীন বিষয়সকল লইয়াও চর্চা করিতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়ে হিন্দুধর্ম বুঝাইতে এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য দেখাইতে স্বামীজীর মতো আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। সে-বিষয়ে দু-চারটি কথা আজ উপহার দিবার ইচ্ছা।

স্বামীজী বলিতেন: চেতন অচেতন, স্থূল সূক্ষ্ম—সবই একত্বের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান। প্রথমে মানুষ যত রকম জিনিস দেখিতে লাগিল, তাহাদের প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন জিনিস মনে করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম দিল। পরে বিচার করিয়া ঐ সমস্ত জিনিসগুলি ৯৩টা মূলদ্রব্য (elements) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্থির করিল।

ঐ মূলদ্রব্যগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি মিশ্রদ্রব্য (compound) বলিয়া এখন অনেকের সন্দেহ হইতেছে। আর যখন রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) শেষ মীমাংসায় পৌছিবে, তখন সকল জিনিসই এক জিনিসেরই অবস্থাভেদমাত্র—বোঝা যাইবে। প্রথমে তাপ, আলো ও তড়িৎ (heat, light and electricity) বিভিন্ন জিনিস বলিয়া সকলে জানিত। এখন প্রমাণ হইয়াছে, ঐগুলি সব এক, এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র। লোকে প্রথমে সমস্ত পদার্থগুলি চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিল। তারপর দেখিল যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে, অন্য সকল চেতন প্রাণীর ন্যায় গমনশক্তি নাই মাত্র। তখন খালি দুইটি শ্রেণী রহিল—চেতন ও অচেতন। আবার কিছুদিন পরে দেখা যাইবে, আমরা যাহাকে অচেতন বলি, তাহাদেরও অল্পবিস্তর চৈতন্য আছে।[১]

---

১ স্বামীজী যখন পূর্বোক্ত কথাগুলি বলেন, তখন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু-প্রচারিত তাড়িত-প্রবাহযোগে জড়বস্তুর চেতনবৎ আচরণ (Response of Inorganic Matter to Electric Currents) এই অপূর্ব তত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই।

পৃথিবীতে যে উচ্চ-নিম্ন জমি দেখা যায়, তাহাও সতত সমতল হইয়া একভাবে পরিণত হইবার চেষ্টা করিতেছে। বর্ষার জলে পর্বতাদি উচ্চ জমি ধুইয়া গিয়া গহ্বরসকল পলিতে পূর্ণ হইতেছে। একটা উষ্ণ জিনিস কোন জায়গায় রাখিলে উহা ক্রমে চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্রব্যের ন্যায় সমান উষ্ণভাব ধারণ করিতে চেষ্টা করে। উষ্ণতাশক্তি এইরূপে সঞ্চালন, সংবাহন, বিকিরণাদি (conduction, convection and radiation) উপায়-অবলম্বনে সর্বদা সমভাব বা একত্বের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

গাছের ফল ফুল পাতা শিকড় আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখিলেও বাস্তবিক উহারা যে এক, বিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করিয়াছে। ত্রিকোণ কাঁচের মধ্য দিয়া দেখিলে এক সাদা রং, রামধনুর সাতটা রঙের মতো পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত দেখায়। সাদা চক্ষে দেখিলে একই রং, আবার লাল বা নীল চশমার ভিতর দিয়া দেখিলে সমস্তই লাল বা নীল দেখায়।

এইরূপ যাহা সত্য, তাহা এক। মায়া দ্বারা আমরা পৃথক্ পৃথক্ দেখি মাত্র। অতএব দেশকালাতীত অবিভক্ত অদ্বৈত সত্যাবলম্বনে মানুষের যত কিছু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থজ্ঞান উপস্থিত হইলেও মানুষ সেই সত্যকে ধরিতে পারে না, দেখিতে পায় না।

এইসব কথা শুনিয়া বলিলাম, 'স্বামীজী, আমাদের চোখের দেখাটাই কি সব সময় ঠিক সত্য? দুখানা রেল লাইন সমান্তরালে, দেখায় যেন উহারা ক্রমে এক জায়গায় মিলিয়া গিয়াছে। মরীচিকা, রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রভৃতি optical illusion (দৃষ্টিবিভ্রম) সর্বদাই হইতেছে। Fluorspar নামক পাথরের নীচে একটা রেখাকে double refraction-এ দুটো দেখায়। একটা উডপেন্সিল আধ-গ্লাস জলে ডুবাইয়া রাখিলে পেন্সিলের জলমগ্ন ভাগটা উপরের ভাগ অপেক্ষা মোটা দেখায়। আবার সকল প্রাণীর চোখগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতাবিশিষ্ট এক একটা লেন্স (lens) মাত্র। আমরা কোন জিনিস যত বড় দেখি, ঘোড়া প্রভৃতি অনেক প্রাণী তাহাই তদপেক্ষা বড় দেখিয়া থাকে, কেন না তাহাদের চোখের লেন্স বিভিন্নশক্তিবিশিষ্ট। অতএব আমরা যাহা স্বচক্ষে দেখি, তাহাই যে সত্য, তাহারও তো প্রমাণ নাই। জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, মানুষ 'সত্য সত্য' করিয়া পাগল, কিন্তু প্রকৃত সত্য (Absolute Truth) বুঝিবার ক্ষমতা মানুষের নাই, কারণ ঘটনাক্রমে প্রকৃত সত্য মানুষের

হস্তগত হইলে তাহাই যে বাস্তবিক সত্য, ইহা সে বুঝিবে কি করিয়া? আমাদের সমস্ত জ্ঞান relative (আপেক্ষিক), Absolute বুঝিবার ক্ষমতা নাই। অতএব Absolute ভগবান্ বা জগৎকারণকে মানুষ কখনই বুঝিতে পারিবে না।'

স্বামীজী। তোমার বা সচরাচর লোকের Absolute জ্ঞান না থাকিতে পারে, তাই বলিয়া কাহারও নাই, এমন কথা কি করিয়া বলো? অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া দুইরকম ভাব বা অবস্থা আছে। এখন তোমরা যাহাকে জ্ঞান বলো, বাস্তবিক উহা মিথ্যাজ্ঞান। সত্যজ্ঞানের উদয় হইলে উহা অন্তর্হিত হয়, তখন সব এক দেখায়। দ্বৈতজ্ঞান অজ্ঞানপ্রসূত।

আমি। স্বামীজী, এ তো বড় ভয়ানক কথা! যদি জ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান দুইটি জিনিস থাকে, তাহা হইলে আপনি যাহাকে সত্যজ্ঞান ভাবিতেছেন, তাহাও তো মিথ্যাজ্ঞান হইতে পারে, আর আমাদের যে দ্বৈতজ্ঞানকে আপনি মিথ্যাজ্ঞান বলিতেছেন, তাহাও তো সত্য হইতে পারে?

স্বামীজী। ঠিক বলেছ, সেইজন্যই বেদে বিশ্বাস করা চাই। পূর্বকালে আমাদের মুনিঋষিগণ সমস্ত দ্বৈতজ্ঞানের পারে গিয়া ঐ অদ্বৈত সত্য অনুভব করিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাকেই বেদ বলে। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থার মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য, আমাদের বিচার করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। যতক্ষণ না ঐ দুই অবস্থার পারে গিয়া দাঁড়াইয়া—ঐ দুই অবস্থাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিব, ততক্ষণ কেমন করিয়া বলিব—কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য? শুধু দুইটি বিভিন্ন অবস্থার অনুভব হইতেছে, এরূপ বলা যাইতে পারে। এক অবস্থায় যখন থাকো, তখন অন্যটাকে ভুল বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নে হয়তো কলকাতায় কেনাবেচা করিলে, উঠিয়া দেখ—বিছানায় শুইয়া আছ। যখন সত্যজ্ঞানের উদয় হইবে, তখন এক ভিন্ন দুই দেখিবে না এবং পূর্বের দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিবে। কিন্তু এ-সব অনেক দূরের কথা, হাতেখড়ি হইতে না হইতেই রামায়ণ মহাভারত পড়িবার ইচ্ছা করিলে চলিবে কেন? ধর্ম অনুভবের জিনিস, বুদ্ধি দিয়া বুঝিবার নহে। হাতেনাতে করিতে হইবে, তবে ইহার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবে। এ-কথা তোমাদের পাশ্চাত্য Chemistry (রসায়ন), Physics (পদার্থবিদ্যা), Geology (ভূতত্ত্ববিদ্যা) প্রভৃতির অনুমোদিত। দু-বোতল hydrogen (উদজান) আর এক বোতল

oxygen (অম্লজান) লইয়া 'জল কই?' বলিলে কি জল হইবে না, তাহাদের একটা শক্ত জায়গায় রাখিয়া electric current (তাড়িত-প্রবাহ) তাহার ভেতর চালাইয়া তাহাদের combination (সংযোগ, মিশ্রণ নহে) করিলে তবে জল দেখিতে পাইবে এবং বুঝিবে যে, জল hydrogen ও oxygen নামক গ্যাস হইতে উৎপন্ন। অদ্বৈত জ্ঞান উপলব্ধি করিতে গেলেও সেইরূপ ধর্মে বিশ্বাস চাই, আগ্রহ চাই, অধ্যবসায় চাই, প্রাণপণ যত্ন চাই, তবে যদি হয়। এক মাসের অভ্যাস ত্যাগ করাই কত কঠিন, দশ বৎসরের অভ্যাসের তো কথাই নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির শত শত জন্মের কর্মফল পিঠে বাঁধা রহিয়াছে। একমুহূর্ত শ্মশানবৈরাগ্য হইল, আর বলিলে কি-না, 'কই, আমি তো সব এক দেখিতেছি না!'

আমি। স্বামীজী, আপনার ঐ কথা সত্য হইলে যে Fatalism (অদৃষ্টবাদ) আসিয়া পড়ে। যদি বহু জন্মের কর্মফল একজন্মে যাইবার নয়, তবে আর চেষ্টা আগ্রহ কেন? যখন সকলের মুক্তি হইবে, তখন আমারও হইবে।

স্বামীজী। তাহা নহে। কর্মফল তো অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু অনেক কারণে ঐ-সকল কর্মফল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইতে পারে। ম্যাজিক-লণ্ঠনের পঞ্চাশখানা ছবি দশ মিনিটেও দেখানো যায়, আবার দেখাইতে দেখাইতে সমস্ত রাতও কাটানো যায়। উহা নিজের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।

সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধেও স্বামীজীর ব্যাখ্যা অতি সুন্দর: সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই চেতন ও অচেতন (সুবিধার জন্য) দুইভাগে বিভক্ত। মানুষ সৃষ্ট বস্তুর চেতনভাগের শ্রেষ্ঠ প্রাণিবিশেষ। কোন কোন ধর্মের মতে ঈশ্বর আপনার মতো রূপবিশিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি নির্মাণ করিয়াছেন; কেহ বলেন, মানুষ লেজবিহীন বানরবিশেষ; কেহ বলেন, মানুষেরই কেবল বিবেচনাশক্তি আছে, তাহার কারণ মানুষের মস্তিষ্কে জলের ভাগ বেশী। যাহাই হউক, মানুষ প্রাণিবিশেষ ও প্রাণিসমূহ সৃষ্ট পদার্থের অংশমাত্র, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। এখন সৃষ্ট পদার্থ কি, বুঝিবার জন্য একদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া এটা কি, ওটা কি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; আর অন্যদিকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ ভারতবর্ষের উষ্ণ আবহাওয়ায় ও উর্বর

ভূমিতে শরীর-রক্ষার জন্ত যৎসামান্ত সময়মাত্র ব্যয় করিয়া কৌপীন পরিয়া প্রদীপের মিটমিটে আলোতে বসিয়া আদা-জল খাইয়া বিচার করিতে লাগিলেন, —এমন জিনিস কি আছে, যাহা জানিলে সব জানা যায়? তাঁহাদের মধ্যে অনেক রকমের লোক ছিলেন। কাজেই চার্বাকের দৃশুসত্য মত হইতে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মত পর্যন্ত সমস্তই আমাদের ধর্মে পাওয়া যায়। দুই দলই ক্রমে এক জায়গায় উপনীত হইতেছেন এবং এখন এক কথাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দুই দলই বলিতেছেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই এক অনির্বচনীয় অনাদি অনন্ত বস্তুর প্রকাশমাত্র। কাল এবং আকাশও (time and space) তাই। কাল অর্থাৎ যুগ, কল্প, বৎসর, মাস, দিন ও মুহূর্ত প্রভৃতি সময়জ্ঞাপক পদার্থ, যাহার অনুভবে সূর্যের গতিই আমাদের প্রধান সহায়, ভাবিয়া দেখিলে সেই কালটাকে কি মনে হয়? সূর্য অনাদি নহে; এমন সময় অবশ্য ছিল, যখন সূর্যের সৃষ্টি হয় নাই। আবার এমন সময় আসিবে, যখন আবার সূর্য থাকিবে না, ইহা নিশ্চিত। তাহা হইলে অখণ্ড সময় একটি অনির্বচনীয় ভাব বা বস্তুবিশেষ ভিন্ন আর কি? আকাশ বা অবকাশ বলিলে আমরা পৃথিবী বা সৌরজগৎ-সম্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ জায়গাবিশেষ বুঝি। কিন্তু উহা সমগ্র সৃষ্টির অংশমাত্র বই আর কিছুই নয়। এমন অবকাশও থাকা সম্ভব, যেখানে কোন সৃষ্ট বস্তুই নাই। অতএব অনন্ত আকাশও সময়ের মতো অনির্বচনীয় একটি ভাব বা বস্তুবিশেষ। এখন সৌরজগৎ ও সৃষ্ট বস্তু কোথা হইতে কিরূপে আসিল? সাধারণতঃ আমরা কর্তা ভিন্ন ক্রিয়া দেখিতে পাই না। অতএব মনে করি, এই সৃষ্টির অবশ্য কোন কর্তা আছেন, কিন্তু তাহা হইলে সৃষ্টিকর্তারও তো সৃষ্টিকর্তা আবশ্যক; তাহা থাকিতে পারে না। অতএব আদিকারণ, সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরও অনাদি অনির্বচনীয় অনন্ত ভাব বা বস্তুবিশেষ। অনন্তের তো বহুত্ব সম্ভবে না, তাই ঐ-সকল অনন্ত পদার্থই এক, এবং একই ঐ-সকলরূপে প্রকাশিত।

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'স্বামীজী, মন্ত্রাদিতে বিশ্বাস—যাহা সাধারণে প্রচলিত আছে, তাহা কি সত্য?'

তিনি উত্তর করিলেন, 'সত্য না হইবার তো কোন কারণ দেখি না। তোমাকে কেহ করুণস্বরে মিষ্টভাষায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তুমি সন্তুষ্ট

হও, আর কঠোর তীব্রভাষায় কোন কথা বলিলে তোমার রাগ হয়। তখন প্রত্যেক ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও যে সুললিত উত্তম শ্লোক (যাকে মন্ত্র বলে) দ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন না, তাহার মানে কি ?'

এই-সকল কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, 'স্বামীজী, আমার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় তো আপনি সবই বুঝিতে পারিতেছেন, এখন আমার কি করা কর্তব্য, আপনি বলিয়া দিন।'

স্বামীজী বলিলেন, 'প্রথমে মনটাকে বশে আনিতে চেষ্টা কর, তা যে উপায়েই হোক্, পরে সব আপনিই হইবে। আর জ্ঞান—অদ্বৈত জ্ঞান ভারি কঠিন; জানিয়া রাখো যে, উহা মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (highest ideal), কিন্তু লক্ষ্যে পৌছিবার পূর্বে অনেক চেষ্টা ও আয়োজনের আবশ্যক। সাধুসঙ্গ ও যথার্থ বৈরাগ্য ভিন্ন উহা অনুভব করিবার অন্য উপায় নাই।'

স্বামীজীর স্মৃতি

[প্রিয়নাথ সিংহ স্বামীজীর বাল্যবন্ধু ও পাড়ার ছেলে; নরেন্দ্রনাথকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধাও করিতেন। তিনি কোথায় আছেন, কি করিতেছেন—সব সংবাদ রাখিতেন। আমেরিকায় তাঁহার প্রচার-সাফল্যে আনন্দিত হইয়াছেন, মাদ্রাজে তাঁহার সংবর্ধনায় উৎসাহিত হইয়াছেন, কলিকাতায় নিজেরাই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। এখন নির্জনে বাল্যবন্ধুকে কাছে পাইবার আশায় কাশীপুরে গোপাল লাল শীলের বাগানে আসিয়াছেন—]

অবসর পেয়েই তাঁকে ধ'রে নিয়ে বাগানে গঙ্গার ধারে বেড়াতে এলুম। তিনিও শৈশবের খেলুড়েকে পেয়ে আগেকার মতোই কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। দু-চারটা কথা বলতে না বলতেই ডাকের উপর ডাক এল যে, অনেক নূতন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বাবা, একটু রেহাই দাও; এই ছেলেবেলাকার খেলুড়ের সঙ্গে দুটো কথা কই, একটু ফাঁকা হাওয়ায় থাকি। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের যত্ন ক'রে বসাওগে, তামাক-টামাক খাওয়াওগে।'

যে ডাকতে এসেছিল, সে চলে গেলে জিজ্ঞাসা করলুম, 'স্বামীজী, তুমি সাধু। তোমার অভ্যর্থনার জন্যে যে টাকা আমরা চাঁদা ক'রে তুললুম, আমি ভেবেছিলুম, তুমি দেশের দুর্ভিক্ষের কথা শুনে কলকাতায় পৌছবার আগেই আমাদের 'তার' করবে—আমার অভ্যর্থনায় এক পয়সা খরচ না ক'রে দুর্ভিক্ষনিবারণী ফণ্ডে ঐ সমস্ত টাকা চাঁদা দাও; কিন্তু দেখলুম, তুমি তা করলে না; এর কারণ কি?'

স্বামীজী বললেন, 'হাঁ, আমি ইচ্ছেই করেছিলুম যে, আমায় নিয়ে একটা খুব হইচই হয়। কি জানিস? একটা হইচই না হ'লে তাঁর (ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের) নামে লোক চেতবে কি ক'রে? এত ovation (সংবর্ধনা) কি আমার জন্যে করা হ'ল, না তাঁর নামেরই জয়জয়কার হ'ল? তাঁর বিষয় জানবার জন্যে লোকের মনে কতটা ইচ্ছে হ'ল। এইবার ক্রমে তাঁকে জানবে, তবে না দেশের মঙ্গল হবে। যিনি দেশের মঙ্গলের জন্যে এসেছেন, তাঁকে না জানলে লোকের মঙ্গল কি ক'রে হবে? তাঁকে ঠিক ঠিক জানলে তবে মানুষ তৈরী হবে, আর মানুষ তৈরী হ'লে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তাড়ানো কতক্ষণের কথা!

আমাকে দিয়ে এই রকম বিরাট সভা ক'রে হইচই ক'রে তাঁকে প্রথমে মানুক—আমার এই ইচ্ছেই হয়েছিল; নতুবা আমার নিজের জন্যে এত হাঙ্গামের কি দরকার ছিল? তোদের বাড়ি গিয়ে যে একসঙ্গে খেলতুম, তার চেয়ে আর আমি কি বড়লোক হয়েছি? আমি তখনও যা ছিলুম, এখনও তাই আছি। তুই-ই বল্‌না, আমার কোন পরিবর্তন দেখছিস?'

আমি মুখে বললুম, 'না, সে রকম তো কিছুই দেখছিনি।' তবে মনে হ'ল—সাক্ষাৎ দেবতা হয়েছ।

স্বামীজী বলতে লাগলেন, 'দুর্ভিক্ষ তো আছেই, এখন যেন ওটা দেশের ভূষণ হয়ে পড়েছে। অন্য কোন দেশে দুর্ভিক্ষের এত উৎপাত আছে কি? নেই; কারণ সে-সব দেশে মানুষ আছে। আমাদের দেশের মানুষগুলো একেবারে জড় হয়ে গেছে। তাঁকে দেখে, তাঁকে জেনে লোকে স্বার্থত্যাগ করতে শিখুক, তখন দুর্ভিক্ষ-নিবারণের ঠিক ঠিক চেষ্টা আসবে। ক্রমে সে চেষ্টাও ক'রব, দেখ্ না।'

আমি। আচ্ছা, তুমি এখানে খুব লেকচার-টেকচার দেবে তো? তা না হ'লে তাঁর নাম কেমন ক'রে প্রচার হবে?

স্বামীজী। তুই খেপেছিস, তাঁর নাম-প্রচারের কি কিছু বাকি আছে? লেকচার ক'রে এদেশে কিছু হবে না। বাবুভায়ারা শুনবে, 'বেশ বেশ' করবে, হাততালি দেবে; তারপর বাড়ি গিয়ে ভাতের সঙ্গে সব হজম ক'রে ফেলবে। পচা পুরানো লোহার উপর হাতুড়ির ঘা মারলে কি হবে? ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে; তাকে পুড়িয়ে লাল করতে হবে; তবে হাতুড়ির ঘা মেরে একটা গড়ন করতে পারা যাবে। এদেশে জলন্ত জীবন্ত উদাহরণ না দেখালে কিছুই হবে না। কতকগুলো ছেলে চাই, যারা সব ছেড়েছুড়ে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে। তাদের life আগে তয়ের ক'রে দিতে হবে, তবে কাজ হবে।

আমি। আচ্ছা, স্বামীজী, তোমার নিজের দেশের লোক নিজেদের ধর্ম বুঝতে না পেরে কেউ কৃশ্চান, কেউ মুসলমান, কেউ বা অন্য কিছু হচ্ছে। তাদের জন্যে তুমি কিছু না ক'রে, গেলে কি-না আমেরিকা ইংলণ্ডে ধর্ম বিলুতে?

স্বামীজী। কি জানিস, তোদের দেশের লোকের যথার্থ ধর্ম গ্রহণ করবার

শক্তি কি আছে? আছে কেবল একটা অহংকার যে, আমরা ভারি সত্ত্বগুণী। তোরা এককালে সাত্ত্বিক ছিলি বটে, কিন্তু এখন তোদের ভারি পতন হয়েছে। সত্ত্ব থেকে পতন হ'লে একেবারে তমস্ আসে। তোরা তাই এসেছিস। মনে করেছিস বুঝি, যে নড়ে না চড়ে না, ঘরের ভেতর বসে হরিনাম করে, সামনে অপরের উপর হাজার অত্যাচার দেখেও চুপ ক'রে থাকে, সেই-ই সত্ত্বগুণী—তা নয়, তাকে মহা তমস্ ঘিরেছে। যে-দেশের লোক পেটটা ভরে খেতে পায় না, তার ধর্ম হবে কি ক'রে? যে-দেশের লোকের মনে ভোগের কোন আশাই মেটেনি, তাদের নিবৃত্তি কেমন ক'রে হবে? তাই আগে যাতে মানুষ পেটটা ভরে খেতে পায় এবং কিছু ভোগবিলাস করতে পারে, তারই উপায় কর্, তবে ক্রমে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য এলে ধর্মলাভ হ'তে পারে। বিলেত-আমেরিকার লোকেরা কেমন জানিস? পূর্ণ রজোগুণী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রকম ভোগ ক'রে এলে গেছে। তাতে আবার কৃশ্চানী ধর্ম—মেয়েলি ভক্তির ধর্ম, পুরাণের ধর্ম! শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে তাতে আর তাদের শান্তি হচ্ছে না। তারা যে অবস্থায় আছে, তাতে তাদের একটা ধাক্কা দিয়ে দিলেই সত্ত্বগুণে পৌছয়। তারপর আজ একটা লালমুখ এসে যে কথা বলবে, তা তোরা যত মানবি, একটা ছেঁড়ান্তাকড়া-পরা সন্ন্যাসীর কথা তত মানবি কি?

আমি। এন. ঘোষও ঠিক ঐ ভাবের কথা বলেছিলেন।

স্বামীজী। হাঁ, আমার সেখানকার চেলারা সব যখন তৈরী হয়ে এখানে এসে তোদের বলবে, 'তোমরা কি ক'রছ, তোমাদের ধর্ম-কর্ম রীতি-নীতি কিসে ছোট? দেখ, তোমাদের ধর্মটাই আমরা বড় মনে করি'—তখন দেখিস হুদো হুদো লোক সে কথা শুনবে। তাদের দ্বারা এদেশের বিশেষ উপকার হবে। মনে করিসনি, তারা ধর্মের গুরুগিরি করতে এদেশে আসবে। বিজ্ঞান প্রভৃতি ব্যাবহারিক শাস্ত্রে তারা তোদের গুরু হবে, আর ধর্মবিষয়ে এদেশের লোক তাদের গুরু হবে। ভারতের সঙ্গে সমস্ত জগতের ধর্মবিষয়ে এই সম্বন্ধ চিরকাল থাকবে।

আমি। তা কেমন ক'রে হবে? ওরা আমাদের যে-রকম ঘৃণা করে, তাতে ওরা যে কখন নিঃস্বার্থভাবে আমাদের উপকার করবে, তা বোধ হয় না।

স্বামীজী। ওরা তোদের ঘৃণা করবার অনেকগুলি কারণ পায়, তাই ঘৃণা করে। একে তো তোরা বিজিত, তার ওপর তোদের মতো 'হাঘরের দল'

জগতে আর কোথাও নেই। নীচ জাতগুলো তোদের চিরকালের অত্যাচারে উঠতে-বসতে জুতো-লাথি খেয়ে, একেবারে মনুষ্যত্ব হারিয়ে এখন professional (পেশাদার) ভিখিরি হয়েছে; তাদের উপরশ্রেণীর লোকেরা দু-এক পাতা ইংরেজী পড়ে আর্জি হাতে ক'রে সকল আফিসের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা বিশ টাকার চাকরি খালি হ'লে পাঁচ-শ বি. এ., এম. এ. দরখাস্ত করে। পোড়া দরখাস্তও বা কেমন!—'ঘরে ভাত নেই, মাগ-ছেলে খেতে পাচ্ছে না; সাহেব, দুটি খেতে দাও, নইলে গেলুম!' চাকরিতে ঢুকেও দাসত্বের চূড়ান্ত করতে হয়। তোদের উচ্চশিক্ষিত বড় বড় (?) লোকেরা দল বেঁধে 'হায় ভারত গেল! হে ইংরেজ, তোমরা আমাদের লোকদের চাকরি দাও, দুর্ভিক্ষ মোচন করো' ইত্যাদি দিনরাত কেবল 'দাও দাও' ক'রে মহা হল্লা করছে। সকল কথার ধুয়ো হচ্ছে—'ইংরেজ, আমাদের দাও!' বাপু, আর কত দেবে? রেল দিয়েছে, তারের খবর দিয়েছে, রাজ্যে শৃঙ্খলা দিয়েছে, ডাকাতের দল প্রায় তাড়িয়েছে, বিজ্ঞানশিক্ষা দিয়েছে। আবার কি দেবে? নিঃস্বার্থ ভাবে কে কি দেয়? বলি বাপু, ওরা তো এত দিয়েছে, তোরা কি দিয়েছিস?

আমি। আমাদের দেবার কি আছে? রাজ্যের কর দিই।

স্বামীজী। আ মরি! সে কি তোরা দিস, জুতো মেরে আদায় করে—রাজ্যরক্ষা করে ব'লে। তোদের যে এত দিয়েছে, তার জন্যে কি দিস—তাই বল্। তোদের দেবার এমন জিনিস আছে, যা ওদেরও নেই। তোরা বিলেত যাবি, তাও ভিখিরি হয়ে, কি-না বিদ্যে দাও। কেউ গিয়ে বড়জোর তাদের ধর্মের দুটো তারিফ ক'রে এলি, বড় বাহাদুরি হ'ল। কেন, তোদের দেবার কি কিছু নেই? অমূল্য রত্ন রয়েছে, দিতে পারিস—ধর্ম দে, মনোবিজ্ঞান দে। সমস্ত জগতের ইতিহাস পড়ে দেখ্, যত উচ্চ ভাব পূর্বে ভারতেই উঠেছে। চিরকাল ভারত জনসমাজে ভাবের খনি হয়ে এসেছে; ভাব প্রসব ক'রে সমস্ত জগৎকে ভাব বিতরণ করেছে। আজ ইংরেজ ভারতে এসেছে সেই উচ্চ উচ্চ ভাব, সেই বেদান্তজ্ঞান, সেই সনাতন ধর্মের গভীর রহস্য নিতে। তোরা ওদের নিকট যা পাস, তার বিনিময়ে তোদের ঐ-সব অমূল্য রত্ন দান কর্। তোদের এই ভিখিরি-নাম ঘুচাবার জন্যে ঠাকুর আমাকে ওদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেবল ভিক্ষে করবার জন্যে বিলেত যাওয়া ঠিক নয়। কেন তোদের চিরকাল

ভিক্ষে দেবে? কেউ কখন দিয়ে থাকে? কেবল কাঙালের মতো হাত পেতে নেওয়া জগতের নিয়ম নয়। জগতের নিয়মই হচ্ছে আদান-প্রদান। এই নিয়ম যে-লোক বা যে-জাত বা যে-দেশ না রাখবে, তার কল্যাণ হবে না। সেই নিয়ম আমাদেরও প্রতিপালন করা চাই। তাই আমেরিকায় গিয়েছিলুম। তাদের ভেতর এখন এতদূর ধর্মপিপাসা যে, আমার মতো হাজার হাজার লোক গেলেও তাদের স্থান হয়। তারা অনেকদিন থেকে তাদের ধন-রত্ন দিয়েছে, তোরা এখন অমূল্য রত্ন দে। দেখবি, ঘৃণাস্থলে শ্রদ্ধাভক্তি পাবি, আর তোদের দেশের জন্যে তারা অযাচিত উপকার করবে। তারা বীরের জাত, উপকার ভোলে না।

আমি। ওদেশে লেকচারে আমাদের কত গুণপনা ব্যাখ্যা ক'রে এসেছ, আমাদের ধর্মপ্রাণতার কত উদাহরণ দিয়েছ! আবার এখন ব'লছ, আমরা মহা তমোগুণী হয়ে গেছি। অথচ ঋষিদের সনাতন ধর্ম বিলোবার অধিকারী আমাদেরই ক'রছ—এ কেমন কথা?

স্বামীজী। তুই কি বলিস, তোদের দোষগুলো দেশে দেশে গাবিয়ে বেড়াবো, না তোদের যা গুণ আছে, সেই গুণগুলোর কথাই ব'লে বেড়াবো? যার দোষ তাকেই বুঝিয়ে বলা ভাল, আর তার গুণ দিয়ে ঢাক বাজানোই উচিত। ঠাকুর বলতেন যে, মন্দ লোককে 'ভাল ভাল' বললে সে ভাল হয়ে যায়; আর ভাল লোককে 'মন্দ মন্দ' বললে সে মন্দ হয়ে যায়। তাদের দোষের কথা তাদের কাছে খুব ব'লে এসেছি। এদেশ থেকে যত লোক এ পর্যন্ত ওদেশে গেছে, সকলে তাদের গুণের কথাই গেয়ে এসেছে; আর আমাদের দোষের কথাই গাবিয়ে বেড়িয়েছে। কাজেই তারা আমাদের ঘৃণা করতে শিখেছে। তাই আমি তোদের গুণ ও তাদের দোষ তাদের দেখিয়েছি। তোরা যত তমোগুণী হোস না কেন, পুরাতন ঋষিদের ভাব তোদের ভেতর একটু-না-একটু আছে—অন্ততঃ তার কাঠামোটা আছে। তবে হুট ক'রে বিলেত গিয়েই যে ধর্ম-উপদেষ্টা হ'তে পারা যায়, তা নয়। আগে নিরালায় বসে ধর্ম-জীবনটা বেশ ক'রে গড়ে নিতে হবে; পূর্ণভাবে ত্যাগী হ'তে হবে; আর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য করতে হবে; তোদের ভেতর তমোগুণ এসেছে—তা কি হয়েছে? তমোনাশ কি হ'তে পারে না? এক কথায় হ'তে পারে। ঐ তমোনাশ করবার জন্যেই তো ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন।

আমি। কিন্তু স্বামীজী, তোমার মতো কে হবে?

স্বামীজী। তোরা ভাবিস, আমি ম'লে বুঝি আর 'বিবেকানন্দ' হবে না। ঐ যে নেশাখোরগুলো এসে কনসার্ট বাজিয়ে গেল, যাদের তোরা এত ঘৃণা করিস, মহা অপদার্থ মনে করিস, ঠাকুরের ইচ্ছে হ'লে ওরা প্রত্যেকে এক এক 'বিবেকানন্দ' হ'তে পারে, দরকার হ'লে 'বিবেকানন্দে'র অভাব হবে না। কোথা থেকে কত কোটি কোটি এসে হাজির হবে তা কে জানে? এ বিবেকানন্দের কাজ নয় রে; তাঁর কাজ—খোদ রাজার কাজ। একটা গভর্নর জেনারেল গেলে তাঁর জায়গায় আর একটা আসবেই। তোরা যতই তমোগুণী হোস না কেন, মন মুখ এক ক'রে তাঁর শরণ নিলে সব তমঃ কেটে যাবে। এখন যে ও-রোগের রোজা এসেছে। তাঁর নাম ক'রে কাজে লেগে গেলে তিনি আপনিই সব ক'রে নেবেন। ঐ তমোগুণটাই সত্ত্বগুণ হয়ে দাঁড়াবে।

আমি। যাই বলো ও-কথা বিশ্বাস হয় না। তোমার মতো Philosophyতে oratory (দর্শনে বক্তৃতা) করবার ক্ষমতা কার হবে?

স্বামীজী। তুই জানিসনি। ও-ক্ষমতা সকলের হ'তে পারে। যে ভগবানের জন্য বারো বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করবে, তারই ও-ক্ষমতা হবে। আমি ঐরূপ করেছি, তাই আমার মাথার ভেতর একটা পর্দা খুলে গিয়েছে। তাই আর আমাকে দর্শনের মতো জটিল বিষয়ের বক্তৃতা ভেবে বার করতে হয় না। মনে কর্ কাল বক্তৃতা দিতে হবে, যা বক্তৃতা দেবো তার সমস্ত ছবি আজ রাত্রে, পর পর চোখের সামনে দিয়ে যেতে থাকে। পরদিন বক্তৃতার সময় সেই-সব বলি। অতএব বুঝলি তো, এটা আমার নিজস্ব শক্তি নয়। যে অভ্যাস করবে, তারই হবে। তুই কর্, তোরও হবে। অমুকের হবে, আর অমুকের হবে না—আমাদের শাস্ত্রে এ-কথা বলে না।

আমি। তোমার মনে আছে, তখন তুমি সন্ন্যাস লও নাই, একদিন আমরা একজনের বাড়িতে বসেছিলুম; তুমি সমাধি ব্যাপারটা আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলে। কলিকালে ও-সব হয় না ব'লে আমি তোমার কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করায় তুমি জোর ক'রে বলেছিলে, 'তুই সমাধি দেখতে চাস্, না সমাধিস্থ হ'তে চাস? আমার সমাধি হয়। আমি তোর সমাধি ক'রে দিতে পারি।' তোমার এই কথা বলবার পরেই

একজন নূতন লোক এসে প'ড়ল আর আমাদের ঐ-বিষয়ের কোন কথাই চ'লল না।

স্বামীজী। হাঁ, মনে পড়ে।

আমায় সমাধিস্থ ক'রে দেবার জন্তে তাঁকে বিশেষরূপে ধরায় স্বামীজী বললেন, 'দেখ্, গত কয়েক বৎসর ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে আর কাজ ক'রে আমার ভেতর রজোগুণ বড় বেড়ে উঠেছে; তাই সে শক্তি এখন চাপা পড়েছে। কিছুদিন সব কাজ ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে বসলে তবে আবার সে শক্তির উদয় হবে।'

এর দু-এক দিন পরে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা ক'রব ব'লে আমি বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি, এমন সময় দুটি বন্ধু এসে জানালেন যে, তাঁরাও স্বামীজীর সঙ্গে দেখা ক'রে প্রাণায়ামের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে কাশীপুরের বাগানে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলুম, স্বামীজী হাত মুখ ধুয়ে বাইরে আসছেন। শুধু হাতে দেবতা বা সাধু দর্শন করতে যেতে নেই শুনেছিলুম, তাই আমরা কিছু ফল ও মিষ্টান্ন সঙ্গে এনেছিলুম। তিনি আসবামাত্র তাঁকে সেইগুলি দিলুম; স্বামীজী সেগুলি নিয়ে নিজের মাথায় ঠেকালেন এবং আমরা প্রণাম করবার আগেই আমাদের প্রণাম করলেন। আমার সঙ্গের দুটি বন্ধুর মধ্যে একটি তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তাঁকে চিনতে পেরে বিশেষ আনন্দের সহিত তাঁর সমস্ত কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, পরে তাঁর নিকটে আমাদের বসালেন। আমরা যেখানে বসলুম, সেখানে আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজীর মধুর কথা শুনতে এসেছেন। অন্তান্ত লোকের দু-একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী নিজেই প্রাণায়ামের কথা কইতে লাগলেন। মনোবিজ্ঞান হতেই জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিজ্ঞান-সহায়ে প্রথমে তা বুঝিয়ে পরে প্রাণায়াম বস্তুটা কি, বোঝাতে লাগলেন। এর আগে আমরা কয়জনেই তাঁর 'রাজযোগ' পুস্তকখানি ভালো ক'রে পড়েছিলুম। কিন্তু আজ তাঁর কাছে প্রাণায়াম সম্বন্ধে যে-সকল কথা শুনলুম, তাতে মনে হ'ল যে তাঁর ভেতরে যা আছে, তার অতি অল্পমাত্রই সেই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সেদিন আমরা স্বামীজীর কাছে সাড়ে তিনটার সময় উপস্থিত হই। তাঁর

প্রাণায়াম-বিষয়ক কথা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত চলেছিল। বাইরে এসে সজ্জিরয় আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁদের প্রাণের ভেতরের প্রশ্ন স্বামীজী কেমন ক'রে জানতে পারলেন? আমি কি পূর্বেই তাঁকে এ প্রশ্নগুলি জানিয়েছিলুম?

ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন বাগবাজারে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গিরিশবাবু, অতুলবাবু, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ এবং আরও দু-একটি বন্ধুর সম্মুখে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'স্বামীজী, সেদিন আমার সঙ্গে যে দু-জন লোক তোমায় দেখতে গিয়েছিল, তুমি এ-দেশে আসবার আগেই তারা তোমার 'রাজযোগ' পড়েছিল আর ব'লে রেখেছিল যে, যদি তোমার সঙ্গে কখন দেখা হয় তো তোমাকে প্রাণায়াম-বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু সেদিন তারা কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে না করতেই তুমি তাদের ভেতরের সন্দেহগুলি আপনি তুলে ঐরূপে মীমাংসা করায় তারা আমায় জিজ্ঞাসা করছিল, আমি তোমাকে তাদের প্রশ্নগুলি আগে জানিয়েছিলুম কি-না।'

স্বামীজী বললেন: ওদেশেও অনেক সময়ে ঐরূপ ঘটনা ঘটায় অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা ক'রত, 'আপনি আমার অন্তরের প্রশ্ন কেমন ক'রে জানতে পারলেন?' ওটা আমার তত হয় না। ঠাকুরের অহরহ হ'ত।

এই প্রসঙ্গে অতুলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি রাজযোগে বলেছ যে, পূর্বজন্মের কথা সমস্ত জানতে পারা যায়। তুমি নিজে জানতে পারো?'

স্বামীজী। হাঁ, পারি।

অতুলবাবু। কি জানতে পারো, বলবার বাধা আছে?

স্বামীজী। জানতে পারি—জানি-ও, কিন্তু details (খুঁটিনাটি) ব'লব না।

আষাঢ় মাস, সন্ধ্যার কিছু আগে চতুর্দিক অন্ধকার ও ভয়ানক তর্জন-গর্জন ক'রে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। আমরা সেদিন মঠে। শ্রীযুক্ত ধর্মপাল এসেছেন, নূতন মঠ হচ্ছে দেখবেন এবং সেখানে মিসেস বুল আছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। মঠের বাড়িটি সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। পুরানো যে দু-তিনটি কুটীর আছে, তাহাতে মিসেস বুল আছেন। সাধুরা ঠাকুর নিয়ে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে ভাড়া দিয়ে বাস করছেন। ধর্মপাল বৃষ্টির আগেই সেইখানে স্বামীজীর কাছে এসে উঠেছেন। প্রায় এক

ঘণ্টা অতীত হ'ল, বৃষ্টি আর থামে না। কাজেই ভিজে ভিজে নূতন মঠে যেতে হবে। স্বামীজী সকলকে জুতো খুলে ছাতা নিয়ে যেতে বললেন; সকলে জুতো খুললেন। ছেলেবেলার মতো শুধু পায় ভিজে ভিজে কাদায় যেতে হবে, স্বামীজীর কতই আনন্দ! একটা খুব হাসি পড়ে গেল। ধর্মপাল কিন্তু জুতো খুললেন না দেখে স্বামীজী তাঁহাকে বুঝিয়ে বললেন, 'বড় কাদা, জুতোর দফা রফা হবে।' ধর্মপাল বললেন,' Never mind, I will wade with my shoes on,' এক এক ছাতা নিয়ে সকলের যাত্রা করা হ'ল। মধ্যে মধ্যে কাহারও পা পিছলয়, তার উপর খুব জোর ঝাপটায় সমস্ত ভিজে যায়, তার মধ্যে স্বামীজীর হাসির রোল; মনে হ'ল যেন আবার সেই ছেলেবেলার খেলাই বুঝি করছি। যা হোক অনেক খানা-খন্দল পার হয়ে নূতন মঠের সীমানায় আসা গেল।

সকলের পা হাত ধোয়া হলে মিসেস বুলের কাছে সকলে গিয়ে বসলেন এবং অনেকক্ষণ অনেক বিষয়ে কথাবার্তার পর ধর্মপালের নৌকা এলে সকলে উঠে পড়লাম। নৌকা আমাদের মঠে নামিয়ে দিয়ে ধর্মপালকে নিয়ে কলকাতা গেল, তখনও বেশ টিপির টিপির বৃষ্টি পড়ছে।

মঠে এসে স্বামীজী তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের সঙ্গে ঠাকুরঘরে ধ্যান করতে গেলেন এবং ঠাকুরঘরে ও তার পূর্বদিকের দালানে বসে সকলে ধ্যানে মগ্ন হলেন। আমার আর সেদিন ধ্যান হ'ল না। পূর্বের কথাগুলিই কেবল মনে পড়তে লাগল। ছেলেবেলায় মুগ্ধ হয়ে দেখতাম, এই অদ্ভুত বালক নরেন আমাদের সঙ্গে কখন হাসছে, খেলছে, গল্প করছে, আবার কখন বা সকলের মনোমুগ্ধকর কিন্নরস্বরে গান করছে। ক্লাসে তো বরাবর first (প্রথম) হ'ত। খেলাতেও তাই, ব্যায়ামেও তাই, বালকগণের নেতৃত্বেও তাই, গানেতে তো কথাই নাই—গন্ধর্বরাজ!

স্বামীজীরা ধ্যান থেকে উঠলেন। বড় ঠাণ্ডা, একটা ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে বসে স্বামীজী তানপুরা ছেড়ে গান ধরলেন। তারপর সঙ্গীতের উপর অনেক কথা চ'লল। স্বামী শিবানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিলাতী সঙ্গীত কেমন?'

স্বামীজী। খুব ভাল, harmony-র চূড়ান্ত, যা আমাদের মোটেই নেই। তবে আমাদের অনভ্যস্ত কানে বড় ভাল লাগে না। আমারও ধারণা ছিল যে, ওরা কেবল শেয়ালের ডাক ডাকে। যখন বেশ মন দিয়ে শুনতে আর

বুঝতে লাগলুম, তখন অবাক হলুম। শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যেতাম। সকল art-এরই তাই। একবার চোখ বুলিয়ে গেলে একটা খুব উৎকৃষ্ট ছবির কিছু বুঝতে পারা যায় না। তার উপর একটু শিক্ষিত চোখ নইলে তো তার অন্ধি-সন্ধি কিছুই বুঝবে না। আমাদের দেশের যথার্থ সঙ্গীত কেবল কীর্তনে আর ধ্রুপদে আছে। আর সব ইসলামী ছাঁচে ঢালা হয়ে বিগড়ে গেছে। তোমরা ভাবো, ঐ যে বিদ্যুতের মতো গিটকিরি দিয়ে নাকী সুরে টপ্পা গায়, তাই বুঝি দুনিয়ার সেরা জিনিস। তা নয়। প্রত্যেক পর্দায় সুরের পূর্ণবিকাশ না করলে music-এ (গানে) science (বিজ্ঞান) থাকে না। Painting-এ (চিত্রশিল্পে) nature (প্রকৃতিকে) বজায় রেখে যত artistic (সুন্দর) করো না কেন ভালই হবে, দোষ হবে না। তেমনি music-এর science বজায় রেখে যত কায়দানি করো, ভাল লাগবে। মুসলমানেরা রাগরাগিণী-গুলোকে নিলে এদেশে এসে। কিন্তু টপ্পাবাজিতে তাদের এমন একটা নিজেদের ছাপ ফেললে যে, তাতে science আর রইল না।

প্রশ্ন। কেন science মারা গেল ? টপ্পা জিনিসটা কার না ভাল লাগে ?

স্বামীজী। ঝিঁঝি পোকার রবও খুব ভাল লাগে। সাঁওতালরাও তাদের music অত্যুৎকৃষ্ট ব'লে জানে। তোরা এটা বুঝতে পারিস না যে, একটা সুরের ওপর আর একটা সুর এত শীঘ্র এসে পড়ে যে, তাতে আর সঙ্গীতমাধুর্য (music) কিছুই থাকে না, উলটে discordance (বে-সুর) জন্মায়। সাতটা পর্দার permutation, combination (পরিবর্তন ও সংযোগ) নিয়ে এক-একটা রাগরাগিণী হয় তো ? এখন টপ্পায় এক তুড়িতে সমস্ত রাগটার আভাস দিয়ে একটা তান সৃষ্টি করলে আবার তার ওপর গলায় জোয়ারী বলালে কি ক'রে আর তার রাগত্ব থাকবে ? আর টোকরা তানের এত ছড়াছড়ি করলে সঙ্গীতের কবিত্ব-ভাবটা তো একেবারে যায়। টপ্পার যখন সৃষ্টি হয়, তখন গানের ভাব বজায় রেখে গান গাওয়াটা দেশ থেকে একেবারে উঠে গিয়েছিল। আজকাল থিয়েটারের উন্নতির সঙ্গে সেটা যেমন একটু ফিরে আসছে, তেমনি কিন্তু রাগরাগিণীর শ্রাদ্ধটা আরও বিশেষ ক'রে হচ্ছে।

এইজন্য যে ধ্রুপদী, সে টপ্পা শুনতে গেলে তার কষ্ট হয়। তবে আমাদের সঙ্গীতে cadence (মিড় মূর্ছনা) বড় উৎকৃষ্ট জিনিস। ফরাসীরা প্রথমে ওটা

ধরে, আর নিজেদের music-এ ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তারপর এখন ওটা ইওরোপে সকলেই খুব আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে।

প্রশ্ন। ওদের musicটা কেবল martial (রণবাদ্য) ব'লে বোধ হয়, আর আমাদের সঙ্গীতের ভিতর ঐ ভাবটা আদতেই নেই যেন।

স্বামীজী। আছে, আছে। তাতে harmonyর (ঐকতানের) বড় দরকার। আমাদের harmonyর বড় অভাব, এই জন্যই ওটা অত দেখা যায় না, আমাদের music-এর খুবই উন্নতি হচ্ছিল, এমন সময়ে মুসলমানেরা এসে সেটাকে এমন ক'রে হাতালে যে, সঙ্গীতের গাছটি আর বাড়তে পেলে না। ওদের (পাশ্চাত্যের) music খুব উন্নত, করুণরস বীররস দুই আছে, যেমন থাকা দরকার। আমাদের সেই কদুকলের আর উন্নতি হ'ল না।

প্রশ্ন। কোন্ রাগরাগিণীগুলি martial?

স্বামীজী। সকল রাগই martial হয়, যদি harmony-তে বসিয়ে নিয়ে যন্ত্রে বাজানো যায়। রাগিণীর মধ্যেও কতকগুলি হয়।

ইতোমধ্যে ঠাকুরের ভোগ হ'লে পর সকলে ভোজন করতে গেলেন। আহারের পর কলকাতার যে-সকল লোক সেই রাত্রে মঠে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের শয়নের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে তারপর স্বামীজী নিজে শয়ন করতে গেলেন।

* * *

প্রায় দুই বৎসর নূতন মঠ হয়েছে, সাধুরা সেইখানেই আছেন। একদিন প্রাতে আমি গুরুদর্শনে গেছি। স্বামীজী আমায় দেখে হাসতে হাসতে তন্ন তন্ন ক'রে সমস্ত কুশল এবং কলকাতার সমস্ত খবর জিজ্ঞাসা ক'রে বললেন, 'আজ থাকবি তো?'

আমি 'নিশ্চয়' ব'লে অন্যান্য অনেক কথার পর স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ছোটছেলেদের শিক্ষা দেবার বিষয়ে তোমার মত কি?'

স্বামীজী। গুরুগৃহে বাস।

প্রশ্ন। কি রকম?

স্বামীজী। সেই পুরাকালের বন্দোবস্ত। তবে তার সঙ্গে আজকালের পাশ্চাত্য দেশের জড়বিজ্ঞানও চাই। দুটোই চাই।

প্রশ্ন। কেন, আজকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীতে কি দোষ?

স্বামীজী। প্রায় সবই দোষ, কেবল চূড়ান্ত কেরানি-গড়া কল বই তো নয়। কেবল তাই হলেও বাঁচতুম। মানুষগুলো একেবারে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-বর্জিত হচ্ছে। গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলবে; বেদকে চাষার গান বলবে। ভারতের বাইরে যা কিছু আছে, তার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে, নিজের কিন্তু সাত পুরুষ চুলোয় যাক—তিন পুরুষের নামও জানে না।

প্রশ্ন। তাতে কি এসে গেল? নাই বা বাপ-দাদার নাম জানলে?

স্বামীজী। না রে; যাদের দেশের ইতিহাস নেই, তাদের কিছুই নেই। তুই মনে কর্ না, যার 'আমি এত বড় বংশের ছেলে' ব'লে একটা বিশ্বাস ও গর্ব থাকে, সে কি কখন মন্দ হ'তে পারে? কেমন ক'রে হবে বল্ না? তার সেই বিশ্বাসটা তাকে এমন রাশ টেনে রাখবে যে, সে মরে গেলেও একটা মন্দ কাজ করতে পারবে না। তেমনি একটা জাতির ইতিহাস সেই জাতটাকে টেনে রাখে, নীচু হ'তে দেয় না। আমি বুঝেছি, তুই বলবি আমাদের history (ইতিহাস) তো নেই। তোদের মতে নেই। তোদের University-র (বিশ্ববিদ্যালয়ের) পণ্ডিতদের মতে নেই, আর এক দৌড়ে বিলেতে বেড়িয়ে এসে সাহেব সেজে যারা ব'লে, 'আমাদের কিছুই নেই, আমরা বর্বর', তাদের মতে নেই। আমি বলি, অন্যান্য দেশের মতো নেই। আমরা ভাত খাই, বিলেতের লোকে ভাত খায় না; তাই ব'লে কি তারা উপোস ক'রে মরে ভূত হয়ে আছে? তাদের দেশে যা আছে, তারা তাই খায়। তেমনি তোদের দেশের ইতিহাস যেমন থাকা দরকার হয়েছিল, তেমনি আছে। তোরা চোখ বুজে 'নেই নেই' ব'লে চেঁচালে কি ইতিহাস লুপ্ত হয়ে যাবে? যাদের চোখ আছে, তারা সেই জ্বলন্ত ইতিহাসের বলে এখনও সজীব আছে। তবে সেই ইতিহাসকে নূতন ছাঁচে ঢালাই ক'রে নিতে হবে। এখনও পাশ্চাত্য শিক্ষার চোটে লোকের যে বুদ্ধিটি দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই বুদ্ধির মতো উপযুক্ত ক'রে ইতিহাসটাকে নিতে হবে।

প্রশ্ন। সে কেমন ক'রে হবে?

স্বামীজী। সে অনেক কথা। আর সেই জন্যই 'গুরুগৃহবাস' ইত্যাদি চাই। চাই Western Science-এর (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের) সঙ্গে বেদান্ত, আর মূলমন্ত্র ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়। আর কি জানিস, ছোটছেলেদের গাধা পিটে ঘোড়া করা গোছ শিক্ষা দেওয়াটা তুলে দিতে হবে একেবারে।

প্রশ্ন। তার মানে ?

স্বামীজী। ওরে, কেউ কাকেও শেখাতে পারে না। শেখাচ্ছি মনে করেই শিক্ষক সব মাটি করে। কি জানিস, বেদান্ত বলে—এই মানুষের ভেতরেই সব আছে। একটা ছেলের ভেতরেও সব আছে। কেবল সেইগুলি জাগিয়ে দিতে হবে, এইমাত্র শিক্ষকের কাজ। ছেলেগুলো যাতে নিজ নিজ হাত-পা নাক-কান মুখ-চোখ ব্যবহার ক'রে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শেখে, এইটুকু ক'রে দিতে হবে। তা হলেই আখেরে সবই সহজ হয়ে পড়বে। কিন্তু গোড়ার কথা ধর্ম। ধর্মটা যেন ভাত, আর সবগুলো তরকারি। কেবল শুধু তরকারি খেয়ে হয় বদহজম, শুধু ভাতেও তাই। মেলা কতকগুলো কেতাব-পত্র মুখস্থ করিয়ে মনিষ্যিগুলোর মুণ্ডু বিগড়ে দিচ্ছিল। এক দিক দিয়ে দেখলে তোদের বড়লাটের উপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। High education (উচ্চ-শিক্ষা) তুলে দিচ্ছে ব'লে দেশটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। বাপ্! কি পাসের ধুম, আর দুদিন পরেই সব ঠাণ্ডা! শিখলেন কি ? —না, নিজেদের সব মন্দ, সাহেবদের সব ভাল। শেষে অন্ন জোটে না। এমন high education (উচ্চশিক্ষা) থাকলেই কি, আর গেলেই বা কি ? তার চেয়ে একটু technical education (কারিগরি শিক্ষা) পেলে লোকগুলো কিছু ক'রে খেতে পারবে ; চাকরি চাকরি ক'রে আর চেঁচাবে না।

প্রশ্ন। মারোয়াড়ীরা বেশ,—চাকরি করে না, প্রায় সকলেই ব্যবসা করে।

স্বামীজী। দূর, ওরা দেশটা উচ্ছন্ন দিতে বসেছে। ওদের বড় হীন বুদ্ধি। তোরা ওদের চেয়ে অনেক ভালো—manufacture-এর (শিল্পজাত দ্রব্য-নির্মাণের) দিকে নজর বেশী। ওরা যে টাকাটা খাটিয়ে সামান্য লাভ করে আর গৌরাঙ্গের পেট ভরায়, সেই টাকায় যদি গোটাকতক factory (শিল্প-শালা), workshop (কারখানা) করে, তা হ'লে দেশেরও কল্যাণ হয় আর ওদের এর চেয়ে অনেক বেশী লাভ হয়। চাকরি বোঝে না কাবলীরা—স্বাধীনতার ভাব হাড়ে হাড়ে। ওদের একজনকে চাকরির কথা ব'লে দেখিস না!

প্রশ্ন। High education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে সব মানুষগুলো যেমন গরু ছিল, তেমনি আবার গরু হয়ে দাঁড়াবে যে!

স্বামীজী। রাম কহ! তাও কি হয় রে ? সিঙ্গি কি কখনো শেয়াল হয় ? তুই বলিস কি ? যে-দেশ চিরকাল জগৎকে বিদ্যা দিয়ে এসেছে,

লর্ড কার্জন high education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে ব'লে কি দেশসুদ্ধ লোক গরু হয়ে দাঁড়াবে!

প্রশ্ন। যখন ইংরেজ এদেশে আসেনি, তখন দেশের লোক কি ছিল? আজও কি আছে?

স্বামীজী। কলকবজা তয়ের করতে শিখলেই high education হ'ল না। Life-এর problem solve (জীবনের সমস্যার সমাধান) করা চাই—যে-কথা নিয়ে আজকাল সভ্য জগৎ গভীর গবেষণায় মগ্ন, আর যেটার সিদ্ধান্ত আমাদের দেশে হাজার বৎসর আগে হয়ে গেছে।

প্রশ্ন। তবে তোমার সেই বেদান্তও তো যেতে বসেছিল?

স্বামীজী। হাঁ। সময়ে সময়ে সেই বেদান্তের আলো একটু নেবো নেবো হয়, আর সেইজন্যই ভগবানের আসবার দরকার হয়। আর তিনি এসে সেটাতে এমন একটা শক্তি সঞ্চার ক'রে দিয়ে যান যে, আবার কিছুকালের জন্য তার আর মার থাকে না। এখন সেই শক্তি এসে গেছে। তোদের বড়লাট high education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে ভালই হবে।

প্রশ্ন। ভারত যে সমগ্র জগৎকে বিদ্যা দিয়ে এসেছে, তার প্রমাণ কি?

স্বামীজী। ইতিহাসই তার প্রমাণ। এই ব্রহ্মাণ্ডে যত soul-elevating ideas (মানবমনের উন্নয়নকারী ভাবসমূহ) বেরিয়েছে আর যত কিছু বিদ্যা আছে, অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায়, তার মূল সব ভারতে রয়েছে।

এই কথা বলতে বলতে তিনি যেন মেতে উঠলেন। একে তো শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, তার ওপর দারুণ গ্রীষ্ম, মুহুর্মুহুঃ পিপাসা পেতে লাগলো। অনেকবার জল পান করলেন। এবার বললেন, 'সিংহ, একটু বরফজল খাওয়া। তোকে সব বুঝিয়ে বলছি।'

জল পান ক'রে আবার বললেন—'আমাদের চাই কি জানিস?—স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর science (বিজ্ঞান) পড়ানো; চাই technical education (কারিগরি শিক্ষা), চাই যাতে industry (শিল্প) বাড়ে; লোকে চাকরি না ক'রে দু-পয়সা ক'রে খেতে পারে।'

প্রশ্ন। সেদিন টোলের কথা কি বলছিলে?

স্বামীজী। উপনিষদের গল্পটল্প পড়েছিস? সত্যকাম গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য

করতে গেলেন। গুরু তাঁকে কতকগুলি গরু দিয়ে বনে চরাতে পাঠালেন। অনেকদিন পরে যখন গরুর সংখ্যা দ্বিগুণ হ'ল, তখন তিনি গুরুগৃহে ফেরবার উপক্রম করলেন। এই সময় একটি গরু, অগ্নি এবং অন্যান্য কতকগুলি জন্তু তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। যখন শিষ্য গুরুর বাড়ি ফিরে এলেন, তখন গুরু তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলেন, শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। এই গল্পের মানে এই—প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস করলে তা থেকেই যথার্থ শিক্ষা পাওয়া যায়।

সেই-রকম ক'রে বিদ্যা উপার্জন করতে হবে; শিরোমণি মহাশয়ের টোলে পড়লে রূপী বাঁদরটি থাকবে। একটা জলন্ত character-এর (চরিত্রের) কাছে ছেলেবেলা থেকেই থাকা চাই, জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা চাই। কেবল 'মিথ্যা কথা কহা বড় পাপ' পড়লে কচুও হবে না। Absolute (অখণ্ড) ব্রহ্মচর্য করাতে হবে প্রত্যেক ছেলেটাকে, তবে না শ্রদ্ধা বিশ্বাস আসবে। নইলে যার শ্রদ্ধা বিশ্বাস নেই, সে মিছে কথা কেন কইবে না? আমাদের দেশে চিরকাল ত্যাগী লোকের দ্বারাই বিদ্যার প্রচার হয়েছে। পণ্ডিত মশাইরা হাত বাড়িয়ে বিদ্যাটা টেনে নিয়ে টোল খুলেই দেশের সর্বনাশটা ক'রে বসেছেন। যতদিন ত্যাগীরা বিদ্যাদান করেছেন, ততদিন ভারতের কল্যাণ ছিল।

প্রশ্ন। এর মানে কি? আর সব দেশে তো ত্যাগী সন্ন্যাসী নেই, তাদের বিদ্যার বলে যে ভারত জুতোর তলে রয়েছেন।

স্বামীজী। ওরে বাপ চেল্লাসনি, যা বলি শোন্। ভারত চিরকাল মাথায় জুতো বইবে, যদি ত্যাগী সন্ন্যাসীদের হাতে আবার ভারতকে বিদ্যা শেখাবার ভার না পড়ে। জানিস, একটা নিরক্ষর ত্যাগী ছেলে তেরকেলে বুড়ো পণ্ডিতদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পা পূজারী ভেঙে ফেলে। পণ্ডিতরা এসে সভা ক'রে পাঁজিপুঁথি খুলে বললে, 'এ ঠাকুরের সেবা চলবে না, নূতন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।' মহা হুলস্থূল ব্যাপার। শেষে পরমহংস মশাইকে ডাকা হ'ল। তিনি বললেন, 'স্বামীর যদি পা খোঁড়া হয়ে যায়, তা হ'লে কি স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে?' পণ্ডিত বাবাজীদের আর টীকে-টিপপুনি চললো না। ওরে আহম্মক, তা যদি হবে তো পরমহংস মহাশয় আসবেন কেন? আর বিদ্যাটাকে এত উপেক্ষা করবেন কেন? বিদ্যাশিক্ষায় তাঁর সেই নূতন শক্তিসঞ্চার চাই; তবে ঠিক ঠিক কাজ হবে।

প্রশ্ন। সে তো সহজ কথা নয়। কেমন ক'রে হবে?

স্বামীজী। সহজ হ'লে তাঁর আসবার দরকার হ'ত না। এখন তোদের করতে হবে কি জানিস? প্রতি গ্রামে প্রতি শহরে মঠ খুলতে হবে। পারিস কিছু করতে? কিছু কর্। কলকাতায় একটা বড় ক'রে মঠ কর্। একটা ক'রে সুশিক্ষিত সাধু থাকবে সেখানে, তার তাঁবে practical science (ব্যাবহারিক বিজ্ঞান) ও সব রকম art (কলাকৌশল) শেখাবার জন্য প্রত্যেক branch-এ (বিভাগে) specialist (বিশেষজ্ঞ) সন্ন্যাসী থাকবে।

প্রশ্ন। সে-রকম সাধু কোথায় পাবে?

স্বামীজী। তয়ের ক'রে নিতে হবে। তাই তো বলি কতকগুলি স্বদেশানুরাগী ত্যাগী ছেলে চাই। ত্যাগীরা যত শীঘ্র এক-একটা বিষয় চূড়ান্ত রকমে শিখে নিতে পারবে, তেমন তো আর কেউ পারবে না।

তারপর স্বামীজী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে তামাক খেতে লাগলেন। পরে ব'লে উঠলেন, 'দেখ্ সিঙ্গি, একটা কিছু কর্। দেশের জন্য করবার এত কাজ আছে যে, তোর আমার মতো হাজার হাজার লোকের দরকার। শুধু গপ্পিতে কি হবে? দেশের মহা দুর্গতি হয়েছে, কিছু কর্ রে। ছোট-ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেতাব নেই।'

প্রশ্ন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তো অনেকগুলি বই আছে।

এই কথা বলবামাত্র স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললেন: 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ', 'গোপাল অতি সুবোধ বালক'—ওতে কোন কাজ হবে না। ওতে মন্দ বই ভাল হবে না। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ থেকে ছোট ছোট গল্প নিয়ে অতি সোজা ভাষায় কতকগুলি বাঙলাতে আর কতকগুলি ইংরেজীতে কেতাব করা চাই। সেইগুলি ছোটছেলেদের পড়াতে হবে।

বেলা প্রায় ১১টা; ইতিপূর্বে পশ্চিমদিকে একখানা মেঘ দেখা দিয়াছিল। এখন সেই মেঘ স্বন্ স্বন্ শব্দে চলে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ শীতল বাতাস উঠল। স্বামীজীর আর আনন্দের শেষ নাই; বৃষ্টি হবে। তিনি উঠে 'সিঙ্গি, আয় গঙ্গার ধারে যাই' ব'লে আমাকে নিয়ে ভাগীরথীতীরে বেড়াতে লাগলেন।

কালিদাসের মেঘদূত থেকে কত শ্লোক আওড়ালেন, কিন্তু মনে মনে সেই একই চিন্তা করছিলেন—ভারতের মঙ্গল। বললেন, 'সিদ্ধি, একটা কাজ করতে পারিস? ছেলেগুলোর অল্প বয়সে যে বন্ধ করতে পারিস?'

আমি উত্তর করলাম, 'বে বন্ধ করা চুলোয় যাক, বাবুরা যাতে বে সস্তা হয় তার ফিকির করছেন।'

স্বামীজী। খেপেছিস, কার সাধ্যি সময়ের ঢেউ ফেরায়! ঐ হইচই-ই সার। বে যত মাগগি হয় ততই মঙ্গল। যেমন পাসের ধুম, তেমনি কি বিয়ের ধুম! মনে হয় বুঝি আইবুড়ো আর রইল না! পরের বছর আবার তেমনি।

স্বামীজী আবার খানিক চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বললেন, 'কতকগুলি অবিবাহিত graduate (গ্রাজুয়েট) পাই তো জাপানে পাঠাই, যাতে তারা সেখানে কারিগরি শিক্ষা (technical education) পেয়ে আসে। যদি এরূপ চেষ্টা করা যায়, তা হ'লে বেশ হয়।'

প্রশ্ন। কেন? বিলেত যাওয়ার চেয়ে কি জাপান যাওয়া ভাল?

স্বামীজী। সহস্রগুণে! আমি বলি এদেশের সমস্ত বড় লোক আর শিক্ষিত লোকে যদি একবার ক'রে জাপান বেড়িয়ে আসে তো লোকগুলোর চোখ ফোটে।

প্রশ্ন। কেন?

স্বামীজী। সেখানে এখানকার মতো বিদ্যার বদহজম নেই। তারা সাহেবদের সব নিয়েছে, কিন্তু তারা জাপানীই আছে, সাহেব হয়নি। তোদের দেশে সাহেব হওয়া যে একটা বিষম রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি। আমি কতকগুলি জাপানী ছবি দেখেছি। তাদের শিল্প দেখে অবাক হ'তে হয়। আর তার ভাবটি যেন তাদের নিজস্ব বস্তু, কারও নকল করবার জো নেই।

স্বামীজী। ঠিক। ঐ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা যে Asiatic (এশিয়াবাসী)। আমাদের দেখছিস না সব গেছে, তবু যা আছে তা অদ্ভুত। এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ। যে-মেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর! ঠাকুর নিজে একজন কত বড় artist (শিল্পী) ছিলেন।

প্রশ্ন। সাহেবদেরও তো art (শিল্প) বেশ।

স্বামীজী। দূর মূর্খ। আর তোরেই বা গাল দিই কেন? দেশের দশাই এমনি হয়েছে। দেশসুদ্ধ লোক নিজের সোনা রাঙ, আর পরের রাঙটা সোনা দেখছে। এটা হচ্ছে আজকালকার শিক্ষার ভেলকি। ওরে, ওরা যতদিন এশিয়ায় এসেছে, ততদিন ওরা চেষ্টা করছে জীবনে art (শিল্প) ঢোকাতে।

আমি। এ-রকম কথা শুনলে লোকে বলবে, তোমার সব pessimistic view (নৈরাশ্যবাদী মত)।

স্বামীজী। কাজেই তাই বই-কি! আমার ইচ্ছে করে, আমার চোখ দিয়ে তোদের সব দেখাই। ওদের বাড়িগুলো দেখ্ সব সাদামাটা। তার কোন মানে পাস্? দেখ্ না এই যে এত বড় বড় সব বাড়ি government-এর (সরকারের) রয়েছে, বাইরে থেকে দেখলে তার কোন মানে বুঝিস, বলতে পারিস? তারপর তোদের খাড়া প্যাণ্ট, চোস্ত কোট, আমাদের হিসেবে এক প্রকার ন্যাংটো। না? আর তার কি যে বাহার! আমাদের জন্মভূমিটা ঘুরে দেখ। কোন্ buildingটার (অট্টালিকার) মানে না বুঝতে পারিস, আর তাতে কিবা শিল্প! ওদের জলখাবার গেলাস, আমাদের ঘটি— কোন্‌টায় আর্ট আছে? ওরে, একটুকরা Indian silk (ভারতীয় রেশম) চায়না (China)-র নকল করতে হার মেনে গেল। এখন সেটা Japan (জাপান) কিনে নিলে ২০,০০০৲ টাকায়, যদি তারা পারে চেষ্টা ক'রে। পাড়াগাঁয়ে চাষাদের বাড়ি দেখেছিস?

উত্তর। হাঁ।

স্বামীজী। কি দেখেছিস?

আমি। বেশ নিকন চিকন পরিষ্কার।

স্বামীজী। তাদের ধানের মরাই দেখেছিস? তাতে কত আর্ট! মেটে ঘরগুলোয় কত চিত্তির-বিচিত্তির! আর সাহেবদের দেশে ছোটলোকেরা কেমন থাকে তাও দেখে আয়। কি জানিস, সাহেবদের utility (কার্য-কারিতা) আর আমাদের art (শিল্প)—ওদের সমস্ত দ্রব্যই utility, আমাদের সর্বত্র আর্ট। ঐ সাহেবী শিক্ষায় আমাদের অমন সুন্দর চুমকি ঘটি ফেলে এনামেলের গেলাস এসেছেন ঘরে। ওই রকমে utility এমনভাবে আমাদের ভেতর ঢুকেছে যে, সে বদহজম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন চাই art এবং

utility-র combination (সংযোগ)। জাপান সেটা বড় চট ক'রে নিয়ে ফেলেছে, তাই এত শীঘ্র বড় হয়ে পড়েছে। এখন আবার ওরা তোমার সাহেবদের শেখাবে।

প্রশ্ন। কোন্ দেশের কাপড় পরা ভাল?

স্বামীজী। আর্যদের ভাল। সাহেবরাও এ-কথা স্বীকার করে। কেমন পাটে পাটে সাজানো পোশাক। যত দেশের রাজ-পরিচ্ছদ এক রকম আর্য-জাতিদের নকল, পাটে-পাটে রাখবার চেষ্টা, আর তা জাতীয় পোশাকের ধারেও যায় না। দেখ্ সিঙ্গি, ঐ হতভাগা শার্টগুলো পরা ছাড়।

প্রশ্ন। কেন?

স্বামীজী। আরে ওগুলো সাহেবদের underwear (অধোবাস)। সাহেবরা ঐগুলো পরা বড় ঘৃণা করে। কি হতভাগা দশা বাঙালীর! যা হোক একটা পরলেই হ'ল? কাপড় পরার যেন মা-বাপ নেই। কারুর ছোঁয়া খেলে জাত যায়, বেচালের কাপড়চোপড় পরলেও যদি জাত যেত তো বেশ হ'ত। কেন, আমাদের নিজের মতো কিছু ক'রে নিতে পারিস না? কোট, শার্ট গায় দিতেই হবে, এর মানে কি?

বৃষ্টি এল; আমাদেরও প্রসাদ পাবার ঘণ্টা প'ড়ল। 'চল্, ঘণ্টা দিয়েছে' ব'লে স্বামীজী আমায় সঙ্গে নিয়ে প্রসাদ পেতে গেলেন। আহার করতে করতে স্বামীজী বললেন, 'দেখ্ সিঙ্গি, concentrated food (সারভূত খাদ্য) খাওয়া চাই। কতকগুলো ভাত ঠেসে খাওয়া কেবল কুড়েমির গোড়া।' আবার কিছু পরেই বললেন, 'দেখ্, জাপানীরা দিনে দু-বার তিনবার ভাত আর দালের ঝোল খায়। খুব জোয়ান লোকেরাও অতি অল্প খায়, বারে বেশী। আর যারা সঙ্গতিপন্ন, তারা মাংস প্রত্যহই খায়। আমাদের যে দু-বার আহার কুঁচকি-কণ্ঠা ঠেসে। একগাদা ভাত হজম করতে সব energy (শক্তি) চলে যায়।'

প্রশ্ন। আমাদের মাংস খাওয়াটা সকলের পক্ষে সুবিধা কি?

স্বামীজী। কেন, কম ক'রে খাবে। প্রত্যহ এক পোয়া খেলেই খুব হয়। ব্যাপারটা কি জানিস? দরিদ্রতার প্রধান কারণ আলস্য। একজনের সাহেব রাগ ক'রে মাইনে কমিয়ে দিলে; তা সে ছেলেদের দুধ কমিয়ে দিলে, একবেলা হয়তো মুড়ি খেয়ে কাটালে।

প্রশ্ন। তা নয়তো কি করবে ?

স্বামীজী। কেন, আরও অধিক পরিশ্রম ক'রে যাতে খাওয়া-দাওয়াটা বজায় থাকে, এটুকু করতে পারে না ? পাড়ায় যে দু-ঘণ্টা আড্ডা দেওয়া চাই-ই চাই। সময়ের কত অপব্যয় করে লোকে, তা আর কি ব'লব !

আহারান্তে স্বামীজী একটু বিশ্রাম করতে গেলেন।

*　　　　*　　　　*

একদিন স্বামীজী বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে আছেন, আমি তাঁকে দর্শন করতে গেছি। তাঁর সঙ্গে আমেরিকার ও জাপানের অনেক কথা হবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম—

প্রশ্ন। স্বামীজী, আমেরিকায় কতগুলি শিষ্য করেছ ?

স্বামীজী। অনেক।

প্রশ্ন। ২।৪ হাজার ?

স্বামীজী। ঢের বেশী।

প্রশ্ন। কি, সব মন্ত্রশিষ্য ?

স্বামীজী। হাঁ।

প্রশ্ন। কি মন্ত্র দিলে, স্বামীজী ? সব প্রণবযুক্ত মন্ত্র দিয়েছ ?

স্বামীজী। সকলকে প্রণবযুক্ত দিয়েছি।

প্রশ্ন। লোকে বলে শূদ্রের প্রণবে অধিকার নেই, তায় তারা ম্লেচ্ছ ; তাদের প্রণব কেমন ক'রে দিলে ? প্রণব তো ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কারও উচ্চারণে অধিকার নেই ?

স্বামীজী। যাদের মন্ত্র দিয়েছি তারা যে ব্রাহ্মণ নয়, তা তুই কেমন ক'রে জানলি ?

প্রশ্ন। ভারত ছাড়া সব তো যবন ও ম্লেচ্ছের দেশ ; তাদের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ কোথায় ?

স্বামীজী। আমি যাকে যাকে মন্ত্র দিয়েছি, তারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ও-কথা ঠিক, ব্রাহ্মণ নইলে প্রণবের অধিকারী হয় না। ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয় তার মানে নেই, হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে। বাগবাজারে—চক্রবর্তীর ভাইপো যে মেথর হয়েছে, মাথায় ক'রে গুয়ের হাঁড়ি নে যায় ! সেও তো বামুনের ছেলে।

প্রশ্ন। ভাই, তুমি আমেরিকা-ইংলণ্ডে ব্রাহ্মণ কোথায় পেলে?

স্বামীজী। ব্রাহ্মণজাতি আর ব্রাহ্মণের গুণ—দুটো আলাদা জিনিস। এখানে সব—জাতিতে ব্রাহ্মণ, সেখানে গুণে। যেমন সত্ত্ব রজঃ তমঃ—তিনটে গুণ আছে জানিস, তেমনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ব'লে গণ্য হবার গুণও আছে। এই তোদের দেশে ক্ষত্রিয়-গুণটা যেমন প্রায় লোপ পেয়ে গেছে, তেমনি ব্রাহ্মণত্ব-গুণটাও প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। ওদেশে এখন সব ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে ব্রাহ্মণত্ব পাচ্ছে।

প্রশ্ন। তার মানে সেখানকার সাত্ত্বিকভাবের লোকদের তুমি ব্রাহ্মণ ব'লছ?

স্বামীজী। তাই বটে; সত্ত্ব রজঃ তমঃ যেমন সকলের মধ্যেই আছে—কোনটা কাহার মধ্যে কম, কোনটা কাহারও মধ্যে বেশী; তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হবার কয়টা গুণও সকলের মধ্যে আছে। তবে এই কয়টা গুণ সময়ে সময়ে কম বেশী হয়। আর সময়ে সময়ে এক একটা প্রকাশ হয়। একটা লোক যখন চাকরি করে, তখন সে শূদ্রত্ব পায়। যখন দু-পয়সা রোজগারের ফিকিরে থাকে, তখন বৈশ্য; আর যখন মারামারি ইত্যাদি করে, তখন তার ভিতর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ পায়। আর যখন সে ভগবানের চিন্তায় বা ভগবৎ-প্রসঙ্গে থাকে, তখন সে ব্রাহ্মণ। এক জাতি থেকে আর এক জাতি হয়ে যাওয়াও স্বাভাবিক। বিশ্বামিত্র আর পরশুরাম—একজন ব্রাহ্মণ ও অপর ক্ষত্রিয় কেমন ক'রে হ'ল?

প্রশ্ন। এ কথা তো খুব ঠিক ব'লে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশে অধ্যাপক আর কুলগুরু মহাশয়েরা সে-রকম ভাবে দীক্ষাশিক্ষা কেন দেন না?

স্বামীজী। ঐটি তোদের দেশের একটি বিষম রোগ। যাক্। সে-দেশে যারা ধর্ম করতে শুরু করে, তারা কেমন নিষ্ঠা ক'রে জপ-তপ, সাধন-ভজন করে।

প্রশ্ন। তাদের আধ্যাত্মিক শক্তিও অতি শীঘ্র প্রকাশ পায় শুনতে পাই। শরৎ মহারাজের একজন (পাশ্চাত্য) শিষ্য মোট চার মাস সাধন ভজন ক'রে তার যে-সকল ক্ষমতা হয়েছে, তা লিখে পাঠিয়েছে, সেদিন শরৎ মহারাজ দেখালেন।

স্বামীজী। হাঁ, তবে বোঝ্ তারা ব্রাহ্মণ কিনা—তোদের দেশে যে মহা

অত্যাচারে সমস্ত যাবার উপক্রম হয়েছে। গুরুঠাকুর মন্ত্র দেন, সেটা তার একটা ব্যবসা। আর গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধটাও কেমন! ঠাকুর-মহাশয়ের ঘরে চাল নেই। গিন্নী বললেন, 'ওগো, একবার শিষ্যবাড়ি-টাড়ি যাও; পাশা খেললে কি আর পেট চলে?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'হাঁগো, কাল মনে ক'রে দিও, অমুকের বেশ সময় হয়েছে শুনছি, আর তার কাছে অনেক দিন যাওয়াও হয়নি।' এই তো তোদের বাঙলার গুরু! পাশ্চাত্যে আজও এ-রকমটা হয়নি। সেখানে অনেকটা ভাল আছে।

* * *

প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবের দিন এক অপরূপ দৃশ্য দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে এটি যে একটি সুবৃহৎ মেলা, তার আর সন্দেহ নাই। এখানে দশ-বিশ হাজার লোক একত্র হইলেও সে-প্রকার ঠেলাঠেলি হয় না, কারণ অধিকাংশই শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। কিন্তু এখানেও এক সময়ে এই ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয়। ষ্টীমার আসিয়া মঠের কিনারায় লাগিল, আর রক্ষা নাই— সকলকেই আগে নামিতে হইবে। মঠ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে ষ্টীমারে উঠিবার সময়ও ঠিক তদ্রূপ—কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নাই।

স্বামীজীর সঙ্গে একদিন মঠে তাঁহার এক বন্ধুর আমাদের জাতির এই অসংযত ভাবের বিষয়ে কথাবার্তা হয়। তিনি দুঃখ প্রকাশপূর্বক বলিয়াছিলেন, 'দেখ, আমাদের একটা সেকেলে কথা আছে—যদি না পড়ে পো, সভায় নিয়ে থো। কথাটি খুব পুরাতন। আর সভা মানে সামাজিক এক-আধটা সভা—যা কালেভদ্রে কারও বাড়িতে হয়, তা নয়; সভা হচ্ছে রাজদরবার। আগে আমাদের যে-সকল স্বাধীন বাঙালী রাজা ছিল, তাদের প্রত্যহই সকালে বৈকালে সভা ব'সত। সকালে সমস্ত রাজকার্য। আর খবরের কাগজ তো ছিল না, সমস্ত মাতব্বর ভদ্রলোকের কাছে রাজ্যের প্রায় সব খবর লওয়া হ'ত, আর তাতে সেই রাজধানীর সব ভদ্রলোক আসত। যদি কেউ না আসত তার খবর হ'ত। এইসকল দরবার-সভাই আমাদের দেশের, কি সব সভ্য দেশের সভ্যতার centre (কেন্দ্র) ছিল। পশ্চিমে রাজপুতানায় আমাদের এখানকার চেয়ে ঢের ভাল। সেখানে আজও সেই রকমটা কতক হয়।'

প্রশ্ন। এখন দেশী রাজা আমাদের দেশে নেই ব'লে কি দেশের লোকগুলো এতই অসভ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে?

স্বামীজী। এগুলো একটা অবনতি—যার মূলে স্বার্থপরতা, এ তারই লক্ষণ। জাহাজে ওঠবার সময় 'চাচা আপন বাঁচা,' আর গানের সময় 'হামবড়া'—এই হচ্ছে সব ভিতরের ভাব, একটু self-sacrifice (আত্মত্যাগ) শিক্ষা করলেই ঐটুকু যায়। এটা বাপ-মার দোষ—ঠিক ঠিক সৌজন্যও শেখায় না। সভ্যতা self-sacrifice-এর গোড়া।

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন: বাপ-মার অন্যায় দাবের জন্য ছেলেগুলো যে একটা স্ফূর্তি পায় না। গান গাওয়াটা বড় দোষ—ছেলের কিন্তু একটা ভাল গান শুনলে প্রাণ ছটফট করে, সে নিজের গলায় কেমন ক'রে সেটি বার করবে। কাজেই সে একটা আড্ডা খোঁজে। তামাক খাওয়াটা মহাপাপ—এখন কাজেই সে চাকর-বাকরের সঙ্গে আড্ডা দেবে না তো কি করবে? সকলেরই ভেতর সেই infinite (অনন্ত) ভাব আছে—সে-সব ভাবের কোন-রকম স্ফূর্তি চাই। তোদের দেশে তা হবার জো নাই। তা হ'তে গেলে বাপ-মাদেরও নূতন ক'রে শিক্ষা দিতে হবে। এই তো অবস্থা! সুসভ্য নয়, তার ওপর আবার তোদের শিক্ষিত বড় বড় বাবুরা চান কি না—এখনি রাজ্যিটা ইংরেজ তাঁদের হাতে ফেলে দেয়, আর তাঁরা রাজ্যিটা চালান। দুঃখও হয়, হাসিও পায়। আরে সে martial (সামরিক) ভাব কই? তার গোড়ায় যে দাসভাব সাধন করা চাই, নির্ভর চাই—হামবড়াটা martial ভাব নয়। হুকুমে এগিয়ে মাথা দিতে হবে—তবে না মাথা নিতে পারবে। সে যে আপনাকে আগে বলি দিতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন ভক্ত-লেখক—তাঁহার কোন পুস্তকে যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন, স্বামীজী তাঁহাকে ডাকাইয়া উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন:

তোর এমন ক'রে সকলকে গাল দিয়ে লেখবার কি দরকার ছিল? তোর ঠাকুরকে তারা বিশ্বাস করে না, তা কি হয়েছে? আমরা কি একটা দল করেছি না কি? আমরা কি রামকৃষ্ণ-ভজা যে, তাঁকে যে না ভজবে সে আমাদের শত্রু? তুই তো তাঁকে নীচু ক'রে ফেললি, তাঁকে ছোট ক'রে ফেললি। তোর ঠাকুর যদি ভগবান হন তো যে যেমন ক'রে ডাকুক, তাঁকেই তো ডাকছে। তবে সবাইকে গাল দেবার তুই কে? না, গাল দিলেই তোর কথা

তারা শুনবে? আহাম্মক! মাথা দিতে পারিস তবে মাথা নিতে পারবি; নইলে তোর কথা লোকে নেবে কেন?

একটু স্থির হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন:

বীর না হ'লে কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে, না নির্ভর করতে পারে? বীর না হ'লে হিংসা দ্বেষ যায় না; তা সভ্য হবে কি? সেই manly (পুরুষোচিত) শক্তি, সেই বীরভাব তোদের দেশে কই? নেই নেই। সে-ভাব ঢের খুঁজে দেখছি, একটা বই দুটো দেখতে পাই নি।

প্রশ্ন। কার দেখেছ, স্বামীজী?

স্বামীজী। এক G. C.-র (গিরিশচন্দ্রের) দেখেছি যথার্থ নির্ভর, ঠিক দাসভাব; মাথা দিতে প্রস্তুত, তাই না ঠাকুর তার আমমোক্তারনামা নিয়েছিলেন। কি নির্ভর! এমন আর দেখলুম না; নির্ভর তার কাছে শিখেছি।

এই বলিয়া স্বামীজী হাত তুলিয়া গিরিশবাবুর উদ্দেশে নমস্কার করিলেন।

* * * *

দ্বিতীয়বার মার্কিনে যাইবার সমস্ত উদ্যোগ হইতেছে, স্বামীজী অনেকটা ভাল আছেন। একদিন প্রাতে তিনি কলিকাতায় কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া বাগবাজারে বলরামবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন নৌকা ডাকিতে গিয়াছে—স্বামীজী এখনি মঠে যাইবেন। ইতোমধ্যে তাঁহার বন্ধুকে ডাকাইয়া বলিলেন: চল্, মঠে যাবি আমার সঙ্গে—অনেক কথা আছে।

বন্ধুটি উপবেশন করিলে পর আবার বলিলেন, 'আজ বড় মজা হয়েছে। একজনের বাড়ি গেছলুম—সে একটা ছবি আঁকিয়েছে—কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ। কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রথের উপর, ঘোড়ার লাগাম হাতে আর অর্জুনকে গীতা বলছেন। ছবিটা দেখিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়েছে। আমি বললুম, মন্দ কি! সে জিদ ক'রে বললে, সব দোষগুণ বিচার ক'রে বলো—কেমন হয়েছে। কাজেই বলতে হ'ল—কিছুই হয়নি। প্রথমতঃ 'রথটা' আজকালের প্যাগোডা রথ নয়, তারপর কৃষ্ণের ভাব কিছুই হয়নি।

প্রশ্ন। কেন প্যাগোডা রথ নয়?

স্বামীজী। ওরে দেশে যে বুদ্ধদেবের পর থেকে সব খিচুড়ি হয়ে গেছে। প্যাগোডা রথে চড়ে রাজারা যুদ্ধ ক'রত না! রাজপুতানায় আজও

রথ আছে, অনেকটা সেই সেকেলে রথের মতো। Grecian mythology (গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী)র ছবিতে যে-সব রথ আঁকা আছে, দেখেছিস ? দু-চাকার, পিছন দিয়ে ওঠা-নাবা যায়—সেই রথ আমাদের ছিল। একটা ছবি আঁকলেই কি হ'ল ? সেই সময়ের সমস্ত যেমন ছিল, তার অনুসন্ধানটা নিয়ে সেই সময়ের জিনিসগুলো দিলে তবে ছবি দাঁড়ায় Truth represent (প্রতীকে সত্যকে প্রকাশ) করা চাই, নইলে কিছুই হয় না, যত মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলে—যাদের স্কুলে লেখাপড়া হ'ল না, আমাদের দেশে তারাই যায় painting (চিত্রবিদ্যা) শিখতে। তাদের দ্বারা কি আর কোন ছবি হয় ? একখানা ছবি এঁকে দাঁড় করানো আর একখানা perfect drama (সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক) লেখা, একই কথা।

প্রশ্ন। কৃষ্ণকে কি ভাবে আঁকা উচিত ওখানে ?

স্বামীজী। শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস ?—সমস্ত গীতাটা personified (মূর্তিমান্)! যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাকে গীতা বলছেন, তখন তাঁর central idea (মুখ্যভাব)টি তার শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।

এই বলিয়া স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে আঁকা কর্তব্য, সেইমত নিজে অবস্থিত হইয়া দেখাইলেন আর বলিলেন :

এমনি ক'রে সজোরে ঘোড়া দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পিছনের পা-দুটো প্রায় হাঁটুগাড়া গোছ আর সামনের পাগুলো শূন্যে উঠে পড়েছে—ঘোড়াগুলো হাঁ ক'রে ফেলেছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় action (ক্রিয়া) খেলছে। তাঁর সখা ত্রিভুবনবিখ্যাত বীর ; দু-পক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধনুক-বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মতো রথের ওপর বসে পড়েছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সেই-রকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক হাতে সমস্ত শরীরটিকে বেঁকিয়ে তাঁর সেই অমানুষী প্রেমকরুণামাখা বালকের মতো মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর প্রাণের সখাকে গীতা বলছেন। এখন গীতার preacher (প্রচারক)-এর এ ছবি দেখে কি বুঝলি ?

উত্তর। ক্রিয়াও চাই আর গাম্ভীর্য-ধৈর্যও চাই।

স্বামীজী। আাই !—সমস্ত শরীরে intense action (তীব্র ক্রিয়াশীলতা)

আর মুখ যেন নীল আকাশের মতো ধীর গম্ভীর প্রশান্ত! এই হ'ল গীতার central idea (মুখ্যভাব), দেহ জীবন আর প্রাণ মন তাঁর শ্রীপদে রেখে সকল অবস্থাতেই স্থির গম্ভীর।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥[১]

—যিনি কর্ম করেও তার মধ্যে চিত্তকে প্রশান্ত রাখতে পারেন, আর বাহ্য কোন কর্ম না করলেও অন্তরে যার আত্মচিন্তারূপ কর্মের প্রবাহ চলতে থাকে, তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তাঁরই সব কর্ম করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে যিনি নৌকা ডাকিতে গিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সংবাদ দিলেন যে নৌকা আসিয়াছে। স্বামীজী যে বন্ধুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন, 'চল্, মঠে যাই। বাড়িতে ব'লে এসেছিস তো?'

বন্ধু। আজ্ঞা হাঁ।

সকলে কথা কহিতে কহিতে মঠে যাইবার জন্য নৌকায় উঠিলেন।

স্বামীজী। এই ভাব সমস্ত লোকের ভেতর ছড়ানো চাই—কর্ম কর্ম অনন্ত কর্ম—তার ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে আর প্রাণ-মন সেই রাঙা পায়।

বন্ধু। এ তো কর্মযোগ!

স্বামীজী। হ্যাঁ, এই কর্মযোগ। কিন্তু সাধনভজন না করলে কর্মযোগও হবে না। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য চাই। নইলে প্রাণ-মন কেমন ক'রে তাঁতে দিয়ে রাখবি?

বন্ধু। গীতার কর্ম মানে তো লোকে বলে—বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান, সাধন-ভজন; আর তা ছাড়া সব কর্ম অকর্ম।

স্বামীজী। খুব ভাল কথা, ঠিক কথা; কিন্তু সেটাকে আরও বাড়িয়ে নে না। তোর প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, প্রতি চিন্তার জন্য, তোর প্রতি কাজের জন্য দায়ী কে? তুই তো?

বন্ধু। তা বটে, নাও বটে। ঠিক বুঝতে পারছিনি। আসল কথা তো দেখছি গীতার ভাব—'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন' ইত্যাদি। তা আমি

---

১ গীতা, ৪।১৮

তাঁর শক্তিতে চালিত, তবে আর আমার কাজের জন্য আমি তো একেবারেই দায়ী নই।

স্বামীজী। ওটা বড় উচ্চ অবস্থার কথা। কর্ম ক'রে চিত্ত শুদ্ধ হ'লে পর যখন দেখতে পাবি তিনিই সব করাচ্ছেন, তখন ওটা বলা ঠিক ; নইলে সব মুখস্থ, মিছে।

বন্ধু। মিছে কেন, যদি একজন ঠিক বিচার ক'রে বোঝে যে, তিনিই সব করাচ্ছেন।

স্বামীজী। বিচার ক'রে দেখলে পরে তখন। তা সে যখনকার তখনি। তারপর তো নয়। কি জানিস, বেশ বুঝে দেখ্—অহরহঃ তুই যা-ই করিস, তুই কর্‌ছিস মনে ক'রে করিস কিনা? তিনিই করাচ্ছেন, কতক্ষণ মনে থাকে? তবে ঐ-রকম বিচার করতে করতে এমন একটা অবস্থা আসবে যে, 'আমি'টা চলে যাবে আর তার জায়গায় 'হৃষীকেশ' এসে বসবেন। তখন 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন' বলা ঠিক হবে। আর বাবা, 'আমি'টা বুক জুড়ে বসে থাকলে তাঁর আসবার জায়গা কোথায় যে তিনি আসবেন? তখন হৃষীকেশের অস্তিত্বই নেই!

বন্ধু। কুকর্মের প্রবৃত্তিটা তিনিই দিচ্ছেন তো?

স্বামীজী। না রে না ; ও-রকম ভাবলে ভগবানকে অপরাধী করা হয়। তিনি কুকর্মের প্রবৃত্তি দিচ্ছেন না। ওটা তোর আত্মতৃপ্তির বাসনা থেকেই ওঠে। জোর ক'রে তিনি সব করাচ্ছেন ব'লে অসৎ কাজ করলে সর্বনাশ হয়। ঐ থেকেই ভাবের ঘরে চুরি আরম্ভ হয়। ভাল কাজ করলে কেমন একটা elation (উল্লাস) হয়। বুক ফুলে ওঠে। বেশ করেছি ব'লে আপনাকে বাহবা দিবি। এটা তো আর এড়াবার জো নেই, দিতেই হবে। ভাল কাজটার বেলা আমি, আর মন্দ কাজটার সময় তিনি—ওটা গীতা-বেদান্তের বদহজম, বড় সর্বনেশে কথা, অমন কথা বলিসনি। বরং তিনি ভালটা করাচ্ছেন আর আমি মন্দটা করছি—বল্। তাতে ভক্তি আসবে, বিশ্বাস আসবে। তাঁর কৃপা হাতে হাতে দেখতে পাবি। আসল কথা, কেউ তোকে সৃষ্টি করেনি, তুই আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেছিস কিনা। বিচার এই, বেদান্ত এই। তবে সেটা উপলব্ধি নইলে বোঝা যায় না। সেইজন্য প্রথমটা সাধককে দ্বৈতভাবটা ধরে নিয়ে চলতে হয় ; তিনি ভালটা করান, আমি মন্দটা করি—

এটিই হ'ল চিত্তশুদ্ধির সহজ উপায়। তাই বৈষ্ণবদের ভেতর দ্বৈতভাব এত প্রবল। অদ্বৈতভাব গোড়ায় আনা বড় শক্ত। কিন্তু ঐ দ্বৈতভাব থেকে পরে অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি হয়।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন :

দেখ্, বিটলেমোটা বড় খারাপ। ভাবের ঘরে চুরি যদি না থাকে, অর্থাৎ যদি প্রবৃত্তিটা বড়ই নীচ হয় অথচ যদি সত্যই তার মনে বিশ্বাস হয় যে এও ভগবান করাচ্ছেন, তা হ'লে কি আর বেশীদিন তাকে সেই নীচ কাজ করতে হয়? সব ময়লা চট্ ক'রে সাফ হয়ে যায়। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা খুব বুঝত; আর আমার মনে হয় বৌদ্ধধর্মের যখন পতন আরম্ভ হ'ল, আর বৌদ্ধদের পীড়নে লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রত—বাবা, ছ-মাস ধরে আর যাগ করবার জো-টি নেই, একরাত্রেই কাঁচা মাটির মূর্তি গড়ে পূজা শেষ ক'রে তাকে বিসর্জন দিতে হবে, যেন এতটুকু চিহ্ন না থাকে—সেই সময়টা থেকে তন্ত্রের উৎপত্তি হ'ল। মানুষ একটা concrete (স্থূল) চায়, নইলে প্রাণটা বুঝবে কেন? ঘরে ঘরে ঐ এক রাত্রে যজ্ঞ হ'তে আরম্ভ হ'ল। কিন্তু প্রবৃত্তি সব sensual (ইন্দ্রিয়গত) হয়ে পড়েছে। ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, 'কেউ কেউ নর্দমা দিয়ে পথ করে'; তেমনি সদ্গুরুরা দেখলেন যে, যাদের প্রবৃত্তি নীচ ব'লে কোন সৎ কাজের অনুষ্ঠান করতে পারছে না, তাদেরও ধর্মপথে ক্রমশঃ নিয়ে যাওয়া দরকার। তাদের জন্যই ঐ-সব বিটকেল তান্ত্রিক সাধনার সৃষ্টি হয়ে প'ড়ল।

প্রশ্ন। মন্দ কাজের অনুষ্ঠান তো সে ভাল ব'লে করতে লাগলো, এতে তার প্রবৃত্তির নীচতা কেমন ক'রে যাবে?

স্বামীজী। ঐ যে প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দিলে—ভগবান পাবে ব'লে কাজ করছে।

প্রশ্ন। সত্যসত্যই কি তা হয়?

স্বামীজী। সেই একই কথা; উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেই হবে, না হবে কেন?

প্রশ্ন। পঞ্চ 'মকার'-সাধনে কিন্তু অনেকের মন যে মদমাংসে পড়ে যায়?

স্বামীজী। তাই পরমহংস-মশাই এসেছিলেন। ও-ভাবে তন্ত্রসাধনার দিন গেছে। তিনিও তন্ত্রসাধন করেছিলেন, কিন্তু ও-রকম ভাবে নয়। মদ খাবার বিধি যেখানে, সেখানে তিনি একটা কারণের ফোঁটা কাটতেন। তন্ত্রটা

বড় slippery ground (পিছল পথ)। এই জন্ত বলি, এদেশে তন্ত্রের চর্চা চূড়ান্ত হয়েছে। এখন আরও উপরে যাওয়া চাই। বেদের [বেদান্তের] চর্চা চাই। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য ক'রে সাধন করা চাই, অথণ্ড ব্রহ্মচর্য চাই।

প্রশ্ন। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য কি রকম?

স্বামীজী। জ্ঞান—বিচার বৈরাগ্য, ভক্তি, কর্ম আর সঙ্গে সঙ্গে সাধনা, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি পূজাভাব চাই।

প্রশ্ন। স্ত্রীলোকের প্রতি এই ভাব কি ক'রে আসে?

স্বামীজী। ওরাই হ'ল আদ্যাশক্তি। যেদিন আদ্যাশক্তির পুজো আরম্ভ হবে, যেদিন মায়ের কাছে প্রত্যেক লোক আপনাকে আপনি 'নরবলি' দেবে, সেই দিনই ভারতের যথার্থ মঙ্গল শুরু হবে।

এই কথা বলিয়া স্বামীজী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

একদিন তাঁহার কতকগুলি বাল্যবন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন: স্বামীজী, তুমি যে ছেলেবেলায় বে করতে বললে বলতে, 'বে ক'রব না, আমি কি হবো দেখবি'; তা যা বলেছিলে, তাই করলে।

স্বামীজী। হাঁ ভাই, করেছি বটে। তোরা তো দেখেছিস—খেতে পাইনি, তার উপর খাটুনি। বাপ্, কতই না খেটেছি! আজ আমেরিকানরা ভালবেসে এই দেখ্ কেমন খাট বিছানা গদি দিয়েছে! দুটো খেতেও পাচ্ছি। কিন্তু ভাই, ভোগ আমার অদৃষ্টে নেই। গদিতে শুলেই রোগ বাড়ে, হাঁপিয়ে মরি। আবার মেজেয় এসে পড়ি, তবে বাঁচি।

রক্ত-মাংসের শরীর, কতই বা সহ্য হবে? এই দারুণ পরিশ্রমের ফলে··· স্বামীজীর অকালে দেহত্যাগ হয়।

তিনদিনের স্মৃতিলিপি[১]

২২শে জানুআরি, ১৮৯৮ খৃঃ। ১০ই মাঘ শনিবার। সকালে উঠিয়াই হাতমুখ ধুইয়া বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বসুর স্ট্রীটস্থ বলরাম বাবুর বাটীতে স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হইয়াছি। একঘর লোক। স্বামীজী বলিতেছেন: চাই শ্রদ্ধা, নিজেদের ওপর বিশ্বাস চাই। Strength is life, weakness is death (সবলতাই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু)। আমরা আত্মা, অমর, মুক্ত—pure, pure by nature (পবিত্র, স্বভাবতঃ পবিত্র)। আমরা কি কখনও পাপ করতে পারি? অসম্ভব। এই রকম বিশ্বাস চাই। এই বিশ্বাসই আমাদের মানুষ করে, দেবতা ক'রে তোলে। এই শ্রদ্ধার ভাবটা হারিয়েই তো দেশটা উৎসন্ন গিয়েছে।

প্রশ্ন। এই শ্রদ্ধাটা আমাদের কেমন ক'রে নষ্ট হ'ল?

স্বামীজী। ছেলেবেলা থেকে আমরা negative education (নেতি-মূলক শিক্ষা) পেয়ে আসছি। আমরা কিছু নই—এ শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। আমাদের দেশে যে বড়লোক কখন জন্মেছে, তা আমরা জানতেই পাই না। Positive (ইতিমূলক) কিছু শেখানো হয়নি। হাত-পায়ের ব্যবহার তো জানিইনি। ইংরেজদের সাতগুষ্টির খবর জানি, নিজের বাপ-দাদার খবর রাখি না। শিখেছি কেবল দুর্বলতা। জেনেছি যে আমরা বিজিত দুর্বল, আমাদের কোন বিষয়ে স্বাধীনতা নেই। এতে আর শ্রদ্ধা নষ্ট হবে না কেন? দেশে এই শ্রদ্ধার ভাবটা আবার আনতে হবে। নিজেদের উপর বিশ্বাসটা আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। তা হলেই দেশের যত কিছু problems (সমস্যাগুলি) ক্রমশঃ আপনা-আপনিই solved (মীমাংসিত) হয়ে যাবে।

প্রশ্ন। সব দোষ শুধরে যাবে, তাও কি কখন হয়? সমাজে কত অসংখ্য দোষ রয়েছে! দেশে কত অভাব রয়েছে, যা পূরণ করবার জন্য কংগ্রেস প্রভৃতি অন্যান্য দেশহিতৈষী দল কত আন্দোলন করছে, ইংরেজ বাহাদুরের কাছে কত প্রার্থনা করছে! এ-সব অভাব কিসে পূরণ হবে?

১ সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিত।

স্বামীজী। অভাবটা কার? রাজা পূরণ করবে, না তোমরা পূরণ করবে?

প্রশ্ন। রাজাই অভাব পূরণ করবেন। রাজা না দিলে আমরা কোথা থেকে কি পাব, কেমন ক'রে পাব?

স্বামীজী। ভিখিরির অভাব কখনও পূর্ণ হয় না। রাজা অভাব পূরণ করলে সব রাখতে পারবে, সে লোক কই? আগে মানুষ তৈরি কর। মানুষ চাই। আর শ্রদ্ধা না আসলে মানুষ কি ক'রে হবে?

প্রশ্ন। মহাশয়, majority-র (অধিকাংশের) কিন্তু এ মত নয়।

স্বামীজী। Majority (অধিকাংশ) তো fools (নির্বোধ), men of common intellect (সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন); মাথাওয়ালা লোক অল্প। এই মাথাওয়ালা লোকেরাই সব কাজের সব department-এরই (বিভাগেরই) নেতা। এদেরই ইঙ্গিতে majority (অধিকাংশ) চলে। এদেরই আদর্শ ক'রে চললে কাজও সব ঠিক হয়। আহাম্মকেরাই শুধু হামবড়া হয়ে চলে, আর মরে। সমাজ-সংস্কার আর কি করবে? তোমাদের সমাজ-সংস্কার মানে তো বিধবার বিয়ে আর স্ত্রী-স্বাধীনতা বা ঐ রকম আর কিছু। তোমাদের দুই-এক বর্ণের সংস্কারের কথা ব'লছ তো? দুই-চার জনের সংস্কার হ'ল, তাতে সমস্ত জাতটার কি এসে যায়? এটা সংস্কার না স্বার্থপরতা? নিজেদের ঘরটা পরিষ্কার হ'ল, আর যারা মরে মরুক।

প্রশ্ন। তা হ'লে কি কোন সমাজ-সংস্কারের দরকার নেই বলেন?

স্বামীজী। দরকার আছে বইকি। আমি তা বলছি না। তোমাদের মুখে যা সংস্কারের কথা শুনতে পাই, তার মধ্যে অনেকগুলোই অধিকাংশ গরীব সাধারণদের স্পর্শ-ই করবে না। তোমরা যা চাও, তা তাদের আছে । এজন্য তারা ওগুলোকে সংস্কার বলেই মনে করবে না। আমার কথা এই যে, শ্রদ্ধার অভাবই আমাদের মধ্যে সমস্ত evils (অনর্থ) এনেছে ও আরও আনছে। আমার চিকিৎসা হচ্ছে রোগের কারণকে নির্মূল করা—রোগ চাপা দিয়ে রাখা নয়। সংস্কার আর দরকার নেই? যেমন ভারতবর্ষে inter-marriage (অন্ত-র্বিবাহ)-টা হওয়া দরকার, তা না হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্বলতা এসেছে।

* * *

২৩শে জানুআরি, ১৮৯৮। ১১ই মাঘ, রবিবার। বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাটীতে সন্ধ্যার পর আজ সভা হইয়াছে। স্বামীজী উপস্থিত আছেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছেন। স্বামীজী পূর্বদিকের বারান্দায় বসিয়া আছেন। বারান্দাটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দক্ষিণ ও উত্তর দিকের বারান্দাও সেইরূপ লোকে পরিপূর্ণ। স্বামীজী কলিকাতায় থাকিলে নিত্যই এইরূপ হইত। স্বামীজী সুন্দর গান গাহিতে পারেন, অনেকে শুনিয়াছেন। অধিকাংশ লোকের গান শুনিবার ইচ্ছা দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় ফিস্ ফিস্ করিয়া দুই-এক জনকে স্বামীজীর গান শুনিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন। স্বামীজী নিকটেই ছিলেন, মাষ্টার মহাশয়ের কাণ্ড দেখিতে পাইলেন।

স্বামীজী। কি ব'লছ মাষ্টার, বলো না? ফিস্ ফিস্ ক'রছ কেন?

মাষ্টার মহাশয়ের অনুরোধক্রমে অতঃপর স্বামীজী 'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে' গানটি ধরিলেন। যেন বীণায় ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল। যাঁহারা তখনও আসিতেছিলেন, তাঁহারা সিঁড়ি হইতে মনে করিলেন—যেন গানটি বেহালার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গীত হইতেছে। গান শেষ হইলে স্বামীজী মাষ্টার মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'হয়েছে তো? আর গায় না। নেশা ধরে যাবে। আর গলাটা লেকচার দিয়ে দিয়ে মোটা হয়ে গেছে। Voice (গলার স্বর)-টা roll করে (কাঁপে)।' * *

অতঃপর স্বামীজী এক ব্রহ্মচারী শিষ্যকে 'মুক্তির স্বরূপ' সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। ব্রহ্মচারীটি সভাস্থলে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতান্তে শচীনবাবু ও আর দু-এক জন বক্তৃতার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিলেন। স্বামীজী তাঁহার একজন গৃহীভক্তকে বলিলেন, 'এর পক্ষে বা বিপক্ষে যদি কিছু বলবার থাকে তো বল্।' স্বামীজী উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে দুই-এক জনকে মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। দ্বৈত ও অদ্বৈতের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক তর্ক হইল। তর্ক ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া স্বামীজী ও তুরীয়ানন্দ স্বামী উভয়ে তর্ক-বিতর্ক থামাইয়া দিলেন।

স্বামীজী। রেগে উঠলি কেন? তোরা বড় গোল করিস। তিনি (পরমহংসদেব) বলতেন, 'শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক।' ভক্তিমতে ভগবানকে প্রেমময় বলা হয়। তাঁকে ভালবাসি—এ কথাও বলা যায় না, তিনি যে ভালবাসাময়। যে ভালবাসাটা হৃদয়ে আছে, তাই যে তিনি।

এইরূপ যার যে-টান, সে-সমস্তই তিনি। চোর চুরি করে, বেশ্যা বেশ্যাগিরি করে, মা ছেলেকে ভালবাসে—সব জায়গাতেই তিনি। একটা জগৎ আর একটাকে টানছে, সেখানেও তিনি। সর্বত্রই তিনি। জ্ঞানপক্ষেও সর্বস্থানে তাঁকে অনুভব হয়। এইখানেই জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য। যখন ভাবে ডুবে যায়, অথবা সমাধি হয়, তখনই দ্বিভাব থাকতে পারে না, ভক্তের সহিত ভগবানের পৃথক্‌ত্ব থাকে না। ভক্তিশাস্ত্রে ভগবানলাভের জন্য পাঁচ ভাবে সাধনের কথা আছে, আর এক ভাবের সাধন তাতে যোগ করা যেতে পারে—ভগবানকে অভেদভাবে সাধন করা। ভক্তেরা অদ্বৈতবাদীদের 'অভেদবাদী ভক্ত' বলতে পারেন। মায়ার ভেতর যতক্ষণ, ততক্ষণ দ্বৈত থাকবেই। দেশ-কাল-নিমিত্ত বা নাম-রূপই মায়া। যখন এই মায়ার পারে যাওয়া যায়, তখনই একত্ববোধ হয়; তখন মানুষ দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী থাকে না, তার কাছে তখন সব এক, এই বোধ হয়। জ্ঞানী ও ভক্তের তফাত কোথায় জানিস? একজন ভগবানকে বাইরে দেখে, আর একজন ভগবানকে ভেতরে দেখে। তবে ঠাকুর বলতেন, ভক্তির আর এক অবস্থাভেদ আছে, যাকে পরাভক্তি বলা যায়; মুক্তিলাভ ক'রে অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থিত হয়ে তাঁকে ভক্তি করা। যদি বলা যায়—মুক্তিই যদি হয়ে গেল, তবে আবার ভক্তি করবে কেন? এর উত্তর এই—মুক্ত যে, তার পক্ষে কোন নিয়ম বা প্রশ্ন হ'তে পারে না। মুক্ত হয়েও কেউ কেউ ইচ্ছে ক'রে ভক্তি রেখে দেয়।

প্রশ্ন। মশায়, এ তো বড় মুশকিলের কথা। চোরে চুরি করবে, বেশ্যা বেশ্যাগিরি করবে, সেখানেও ভগবান; তা হ'লে ভগবানই তো সব পাপের জন্য দায়ী হলেন।

স্বামীজী। ঐ-রকম জ্ঞান একটা অবস্থার কথা। ভালবাসা-মাত্রকেই যখন ভগবান ব'লে বোধ হবে, তখনই কেবল ঐ রকম মনে হ'তে পারে। সেই রকম হওয়া চাই। ভাবটার realisation (উপলব্ধি) হওয়া দরকার।

প্রশ্ন। তা হ'লে তো বলতে হবে, পাপেতেও তিনি।

স্বামীজী। পাপ আর পুণ্য ব'লে আলাদা জিনিস তো কিছু নেই। ওগুলো ব্যাবহারিক কথামাত্র। আমরা কোন জিনিসের এক-রকম ব্যবহারের নাম পাপ ও আর এক-রকম ব্যবহারের নাম পুণ্য দিয়ে থাকি। যেমন এই আলোটা জলার দরুন আমরা দেখতে পাচ্ছি ও কত কাজ করছি, আলোর এই

এক-রকম ব্যবহার। আবার এই আলোতে হাত দাও, হাত পুড়ে যাবে। এটা ঐ আলোর আর এক-রকম ব্যবহার। অতএব ব্যবহারেই জিনিসটা ভাল মন্দ হয়ে থাকে। পাপ-পুণ্যটাও ঐ-রকম। আমাদের শরীর ও মনের কোন শক্তিটার সুব্যবহারের নামই পুণ্য এবং কুব্যবহার বা অপচয়ের নাম পাপ।

প্রশ্নের উপর প্রশ্ন হইতে লাগিল। একজন বলিলেন, 'একটা জগৎ আর একটাকে টানে, সেখানেও ভগবান্—এ-কথা সত্য হোক আর না হোক, এর মধ্যে বেশ poetry (কবিত্ব) আছে।'

স্বামীজী। না হে বাপু, ওটা poetry (কবিত্ব) নয়। ওটা জ্ঞান হ'লে দেখতে পাওয়া যায়।

আবার Mill (মিল্), Hamilton (হ্যামিল্টন), Herbert Spencer (স্পেনসার) প্রভৃতির দর্শন লইয়া প্রশ্ন হইতে লাগিল। স্বামীজী সকলেরই যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন। উত্তরে সকলেই মহা সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহার উত্তরদানে তৎপরতা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শেষে আবার প্রশ্ন হইল।

প্রশ্ন। ব্যাবহারিক প্রভেদই বা হয় কেন? কোন শক্তি মন্দরূপে ব্যবহার করতে লোকের প্রবৃত্তিই বা হয় কেন?

স্বামীজী। নিজের নিজের কর্ম অনুসারে প্রবৃত্তি হয়, সবই নিজের কর্মকৃত; সেইজন্যই প্রবৃত্তি দমন বা তাকে সুচারুরূপে চালনা করাও সম্পূর্ণ নিজের হাতে।

প্রশ্ন। সবই কর্মের ফল হলেও গোড়া তো একটা আছে! সেই গোড়াতেই বা আমাদের প্রবৃত্তির ভালমন্দ হয় কেন?

স্বামীজী। কে বললে গোড়া আছে? সৃষ্টি যে অনাদি। বেদের এই মত। ভগবান যতদিন আছেন, তাঁর সৃষ্টিও ততদিন আছে।

প্রশ্ন। আচ্ছা মায়াটা কেন এল? আর কোথা থেকে এল?

স্বামীজী। ভগবান সম্বন্ধে 'কেন' বলাটা ভুল। 'কেন' বলা যায় কার সম্বন্ধে?—যার অভাব আছে, তারই সম্বন্ধে। যার কোন অভাব নেই, যে পূর্ণ, তার পক্ষে আবার 'কেন' কি? 'মায়া কোথা থেকে এল?'—এরূপ প্রশ্নও হ'তে পারে না। দেশ-কাল-নিমিত্তের নামই মায়া। তুমি আমি সকলেই

এই মায়ার ভেতর। তুমি প্রশ্ন ক'রছ ঐ মায়ার পারের জিনিস সম্বন্ধে। মায়ার ভেতর থেকে মায়ার পারের জিনিসের কি কোন প্রশ্ন হ'তে পারে?

অতঃপর অন্য দুই-চারিটা কথার পর সভা ভঙ্গ হইল। আমরাও সকলে আপন আপন বাসায় ফিরিলাম।

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার, বলরাম বসুর বাটী

২৪শে জানুআরি, ১৮৯৮। ১২ই মাঘ, সোমবার। গত শনিবার যে-লোকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তিনি আবার আসিয়াছেন। তিনি intermarriage (অন্তর্বিবাহ) সম্বন্ধে আবার কথা পাড়িলেন। বলিলেন, 'ভিন্ন জাতির সহিত আমাদের কিরূপে আদান-প্রদান হ'তে পারে?'

স্বামীজী। বিধর্মী জাতিদের ভেতর আদান-প্রদান হবার কথা আমি বলি না। অন্ততঃ আপাততঃ তা সমাজ-বন্ধনকে শিথিল ক'রে নানা উপদ্রবের কারণ হবে, এ কথা নিশ্চিত। জানো তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নং' ইত্যাদি[1]; সমধর্মীদের মধ্যেই বিবাহ-প্রচলনের কথা আমি ব'লে থাকি।

প্রশ্ন। তা হলেও তো অনেক গোল। মনে করুন আমার এক মেয়ে আছে, সে এদেশে জন্মেছে ও পালিত হয়েছে। তার বিয়ে দিলুম এক পশ্চিমে লোকের সঙ্গে বা মান্দ্রাজীর সঙ্গে। বিয়ের পর মেয়ে জামাইয়ের কথা বোঝে না, জামাইও মেয়ের কথা বোঝে না। আবার পরস্পরের দৈনিক ব্যবহারাদিরও অনেক তফাত। বর-কনে সম্বন্ধে তো এই গণ্ডগোল; আবার সমাজেও মহা বিশৃঙ্খলা এসে পড়বে।

স্বামীজী। ও-রকম বিয়ে হ'তে আমাদের দেশে এখনও ঢের দেরী। একেবারে ও-রকম করাও ঠিক নয়। কাজের একটা secret (রহস্য) হচ্ছে—to go by the way of least possible resistance (যতদূর সম্ভব কম বাধার পথে চলা)। সেইজন্য প্রথমে এক বর্ণের মধ্যে বিয়ে চলুক। এই

১ গীতা, ১।৩৯

বাঙলা দেশের কায়স্থদের কথা ধর। এখানে কায়স্থদের মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে—উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ইত্যাদি। এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নেই। প্রথমে উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ীতে বিবাহ হোক। যদি তা সম্ভব না হয়, বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীতে বিবাহ হোক। এইরূপে—যেটা আছে, সেটাকেই গড়তে হবে, ভাঙার নাম সংস্কার নয়।

প্রশ্ন। আচ্ছা না হয় বিয়েই হ'ল, তাতে ফল কি? উপকার কি?

স্বামীজী। দেখতে পাচ্ছ না, আমাদের সমাজে এক এক শ্রেণীর মধ্যে একশ' বছর ধরে বিয়ে হয়ে হয়ে এখন ধরতে গেলে সব ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হ'তে আরম্ভ হয়েছে। তাতেই শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে যত রোগও এসে জুটছে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভেতরে চলাফেরা করেই রক্তটা দূষিত হয়ে পড়েছে। তাদের শরীরগত রোগাদি নবজাত সকল শিশুই নিয়ে জন্মাচ্ছে। সেইজন্য তাদের শরীরের রক্ত জন্মাবধি খারাপ। কাজেই কোন রোগের বীজকে resist করবার (বাধা দেবার) ক্ষমতা ও-সব শরীরে বড় কম হয়ে পড়েছে। শরীরের মধ্যে একবার নূতন অন্যরকম রক্ত বিবাহের দ্বারা এসে পড়লে এখনকার রোগাদির হাত থেকে ছেলেগুলো পরিত্রাণ পাবে এবং এখনকার চাইতে ঢের active (কর্মঠ) হবে।

প্রশ্ন। আচ্ছা মশায়, early marriage (বাল্যবিবাহ) সম্বন্ধে আপনার মত কি?

স্বামীজী। বাঙলাদেশে শিক্ষিতদের মধ্যে ছেলেদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার নিয়মটা উঠে গিয়েছে। মেয়েদের মধ্যেও পূর্বের চেয়ে দু-এক বছর বড় ক'রে বিয়ে দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সেটা হয়েছে টাকার দায়ে। তা যেজন্যই হোক, মেয়েগুলোর আরও বড় ক'রে বিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু বাপ-বেচারীরা কি করবে? মেয়ে বড় হলেই বাড়ির গিন্নি থেকে আরম্ভ ক'রে যত আত্মীয়ারা ও পাড়ার মেয়েরা বে দেবার জন্য নাকে কান্না ধরবে। আর তোমাদের ধর্মধ্বজীদের কথা ব'লে আর কি হবে! তাদের কথা তো আর কেউ মানে না, তবুও তারা নিজেরাই মোড়ল সাজে। রাজা বললে যে, বার বছরের মেয়ের সহবাস করতে পারবে না, অমনি দেশের সব ধর্মধ্বজীরা 'ধর্ম গেল, ধর্ম গেল' ব'লে চীৎকার আরম্ভ ক'রল। বার-তের বছরের বালিকার গর্ভ না হ'লে তাদের ধর্ম হবে না! রাজাও মনে করেন,

বা রে এদের ধর্ম! এরাই আবার political agitation (রাজনৈতিক আন্দোলন) করে, political right (রাষ্ট্রীয় অধিকার) চায়।

প্রশ্ন। তা হ'লে আপনার মত—মেয়ে-পুরুষ সকলেরই বেশী বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত।

স্বামীজী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই। তা না হ'লে অনাচার ব্যভিচার আরম্ভ হবে। তবে যে-রকম শিক্ষা চলেছে, সে-রকম নয়। Positive (ইতিমূলক) কিছু শেখা চাই। খালি বইপড়া শিক্ষা হ'লে হবে না। যাতে character form (চরিত্র তৈরী) হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই-রকম শিক্ষা চাই।

প্রশ্ন। মেয়েদের মধ্যে অনেক সংস্কার দরকার।

স্বামীজী। ঐ-রকম শিক্ষা পেলে মেয়েদের problems (সমস্যাগুলো) মেয়েরা নিজেরাই solve (মীমাংসা) করবে। আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা ক'রে আসছে। একটা কিছু হ'লেই কেবল কাঁদতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এ সময়ে তাদের মধ্যে self-defence (আত্মরক্ষা) শেখা দরকার হয়ে পড়েছে। দেখ দেখি, ঝাঁসির রানী কেমন ছিল!

প্রশ্ন। আপনি যা বলছেন, তা বড়ই নূতন ধরনের; আমাদের মেয়েদের মধ্যে সে-শিক্ষা দিতে এখনও সময় লাগবে।

স্বামীজী। চেষ্টা করতে হবে। তাদের শেখাতে হবে। নিজেদেরও শিখতে হবে। খালি বাপ হলেই তো হয় না, অনেক দায়িত্ব ঘাড়ে করতে হয়। আমাদের মেয়েদের একটা শিক্ষা তো সহজেই দেওয়া যেতে পারে। হিন্দুর মেয়ে—সতীত্ব কি জিনিস, তা সহজেই বুঝতে পারবে; এটা তাদের heritage (উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জিনিস) কিনা। প্রথমে সেই ভাবটাই বেশ ক'রে তাদের মধ্যে উস্কে দিয়ে তাদের character form (চরিত্র তৈরি) করতে হবে—যাতে তাদের বিবাহ হোক বা তারা কুমারী থাকুক, সকল অবস্থাতেই সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে কাতর না হয়। কোন-একটা ভাবের জন্য প্রাণ দিতে পারাটা কি কম বীরত্ব? এখন যে-রকম সময় পড়েছে, তাতে তাদের ঐ যে ভাবটা বহুকাল থেকে আছে, তার বলেই তাদের মধ্যে কতকগুলিকে চিরকুমারী ক'রে রেখে ত্যাগধর্ম শিক্ষা দিতে হবে। সঙ্গে

সঙ্গে বিজ্ঞানাদি অন্য সব শিক্ষা, যাতে তাদের নিজের ও অপরের কল্যাণ হ'তে পারে, তাও শেখাতে হবে ; তা হ'লে তারা অতি সহজেই ঐ-সব শিখতে পারবে এবং ঐরূপ শিখতে আনন্দও পাবে। আমাদের দেশে যথার্থ কল্যাণের জন্য এই-রকম কতকগুলি পবিত্রজীবন ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী দরকার হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন। ঐরূপ ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী হলেও দেশের কল্যাণ কেমন ক'রে হবে ?

স্বামীজী। তাদের দেখে ও তাদের চেষ্টায় দেশটার আদর্শ উলটে যাবে। এখন ধরে বিয়ে দিতে পারলেই হ'ল!—তা ন-বছরেই হোক, দশ-বছরেই হোক! এখন এ-রকম হয়ে পড়েছে যে, তের বছরের মেয়ের সন্তান হ'লে গুষ্টিশুদ্ধ আহ্লাদ কত, তার ধুমধামই বা দেখে কে! এ ভাবটা উলটে গেলে ক্রমশঃ দেশে শ্রদ্ধাও আসতে পারবে। যারা ঐ-রকম ব্রহ্মচর্য করবে, তাদের তো কথাই নেই—কতটা শ্রদ্ধা, নিজেদের উপর কতটা বিশ্বাস তাদের হবে, তা বলা যায় না!

শ্রোতা মহাশয় এতক্ষণ পরে স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উঠিতে উদ্যত হইলেন। স্বামীজী বলিলেন, 'মাঝে মাঝে এস।' তিনি বলিলেন, 'ঢের উপকার পেলুম ; অনেক নূতন কথা শুনলুম, এমন আর কখনও কোথাও শুনিনি।' সকাল হইতে কথাবার্তা চলিতেছিল, এখন বেলা হইয়াছে দেখিয়া আমিও স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

স্নান আহার ও একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বাগবাজারে চলিলাম। আসিয়া দেখি, স্বামীজীর কাছে অনেক লোক।' শ্রীচৈতন্যদেবের কথা হইতেছে। হাসি-তামাসাও চলিতেছে। একজন বলিয়া উঠিলেন, 'মহাপ্রভুর কথা নিয়ে এত মজরসের কারণ কি ? আপনারা কি মনে করেন, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন না, তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করেন নাই ?'

স্বামীজী। কে বাবা তুমি ? কাকে নিয়ে ফষ্টিনাষ্টি করতে হবে ? তোমাকে নিয়ে নাকি ? মহাপ্রভুকে নিয়ে রঙ্গ-তামাসা করাটাই দেখছ বুঝি। তাঁর কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের জলন্ত আদর্শ নিয়ে এতদিন যে জীবনটা গড়বার ও লোকের ভেতর সেই ভাবটা ঢোকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটা দেখতে পাচ্ছ

না? শ্রীচৈতন্যদেব মহা ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। স্ত্রীলোকের সংস্পর্শেও থাকতেন না। কিন্তু পরে চেলারা তাঁর নাম ক'রে নেড়া-নেড়ীর দল করলে। আর তিনি যে-প্রেমের ভাব নিজের জীবনে দেখালেন, তা স্বার্থশূন্য কামগন্ধহীন প্রেম। তা কখন সাধারণের সম্পত্তি হ'তে পারে না। অথচ তাঁর পরবর্তী বৈষ্ণব গুরুরা আগে তাঁর ত্যাগটা শেখানোর দিকে ঝোঁক না দিয়ে তাঁর প্রেমটাকে সাধারণের ভেতর ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। কাজেই সাধারণ লোকে সে উচ্চ প্রেমভাবটা নিতে পারলে না এবং সেটাকে নায়ক-নায়িকার দূষিত প্রেম ক'রে তুললে।

প্রশ্ন। মশায়, তিনি তো আচণ্ডালে হরিনাম প্রচার করলেন, তা সেটা সাধারণের সম্পত্তি হবে না কেন?

স্বামীজী। প্রচারের কথা হচ্ছে না গো, তাঁর ভাবের কথা হচ্ছে—প্রেম, প্রেম—রাধাপ্রেম। যা নিয়ে তিনি দিন রাত মেতে থাকতেন, তার কথা হচ্ছে।

প্রশ্ন। সেটা সাধারণের সম্পত্তি হবে না কেন?

স্বামীজী। সাধারণের সম্পত্তি কি ক'রে হয়, তা এই জাতটা দেখে বোঝ না? ওই প্রেম প্রচার করেই তো সমস্ত জাতটা 'মেয়ে' হয়ে গিয়েছে। সমস্ত উড়িয়াটা কাপুরুষ ও ভীরুর আবাস হয়ে গিয়েছে। আর এই বাঙলা দেশটায় চারশ' বছর ধরে রাধাপ্রেম ক'রে কি দাঁড়িয়েছে দেখ! এখানেও পুরুষত্বের ভাব প্রায় লোপ পেয়েছে। লোকগুলো কেবল কাঁদতেই মজবুত হয়েছে। ভাষাতেই ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—তা চারশ' বছর ধরে বাঙলা ভাষায় যা কিছু লেখা হয়েছে, সে-সব এক কান্নার সুর। প্যানপ্যানানি ছাড়া আর কিছুই নেই। একটা বীরত্বসূচক কবিতারও জন্ম দিতে পারেনি!

প্রশ্ন। ওই প্রেমের অধিকারী তবে কারা হ'তে পারে?

স্বামীজী। কাম থাকতে প্রেম হয় না—এক বিন্দু থাকতেও হয় না। মহাত্যাগী, মহাবীর পুরুষ ভিন্ন ও-প্রেমের অধিকারী কেউ নয়। ওই প্রেম সাধারণের সম্পত্তি করতে গেলে নিজেদের এখনকার ভেতরকার ভাবটাই ঠেলে উঠবে। ভগবানের উপর প্রেমের কথা মনে না পড়ে ঘরের গিন্নিদের সঙ্গে যে প্রেম, তার কথাই মনে উঠবে। আর প্রেমের যে অবস্থা হবে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ!

প্রশ্ন। তবে কি ঐ প্রেমের পথ দিয়ে ভজন ক'রে—ভগবানকে স্বামী

ও নিজেকে স্ত্রী ভেবে ভজন ক'রে—তাঁকে (ভগবানকে) লাভ করা গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব ?

স্বামীজী। দু-এক জনের পক্ষে সম্ভব হলেও সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে যে অসম্ভব, এ-কথা নিশ্চিত। আর এ-কথা জিজ্ঞাসারই বা এত আবশ্যক কি ? মধুরভাব ছাড়া ভগবানকে ভজন করবার আর কি কোন পথ নেই ? আরও চারটে ভাব আছে তো, সেগুলো ধরে ভজন কর না ? প্রাণভরে তাঁর নাম কর না ? হৃদয় খুলে যাবে। তারপর যা হবার আপনি হবে। তবে এ-কথা নিশ্চিত জেনো যে, কাম থাকতে প্রেম হয় না। কামশূন্য হবার চেষ্টাটাই আগে কর না। বলবে, তা কি ক'রে হবে ?—আমি গৃহস্থ। গৃহস্থ হলেই কি কামের একটা জালা হ'তে হবে ? স্ত্রীর সঙ্গে কামজ সম্বন্ধ রাখতেই হবে ? আর মধুরভাবের ওপরই বা এত ঝোঁক কেন ? পুরুষ হয়ে মেয়ের ভাব নেবার দরকার কি ?

প্রশ্ন। হাঁ, নামকীর্তনটাও বেশ। সেটা লাগেও বেশ, শাস্ত্রেও কীর্তনের কথা আছে। চৈতন্যদেবও তাই প্রচার করলেন। যখন খোলটা বেজে ওঠে, তখন প্রাণটা যেন মেতে ওঠে আর নাচতে ইচ্ছে করে।

স্বামীজী। বেশ কথা, কিন্তু কীর্তন মানে কেবল নাচাই মনে ক'রো না। কীর্তন মানে ভগবানের গুণগান, তা যেমন ক'রেই হোক্। বৈষ্ণবদের মাতামাতি ও নাচ ভাল বটে, কিন্তু তাতে একটা দোষও আছে। সেটা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে যেও। কি দোষ জানো ? প্রথমে একেবারে ভাবটা খুব জমে, চোখ দিয়ে জল বেরোয়, মাথাটাও রি-রি করে, তারপর যেই সংকীর্তন থামে তখন সে ভাবটা হু হু ক'রে নাবতে থাকে। ঢেউ যত উঁচু উঠে, নাববার সময় সেটা তত নীচুতে নাবে। বিচারবুদ্ধি সঙ্গে না থাকলেই সর্বনাশ, সে-সময়ে রক্ষা পাওয়া ভার। কামাদি নীচ ভাবের অধীন হয়ে পড়তে হয়। আমেরিকাতেও ওইরূপ দেখেছি কতকগুলো লোক গির্জায় গিয়ে বেশ প্রার্থনা করলে, ভাবের সঙ্গে গাইলে, লেকচার শুনে কেঁদে ফেললে—তারপর গির্জা থেকে বেরিয়েই বেশ্যালয়ে ঢুকল।

প্রশ্ন। তা হ'লে মহাশয়, চৈতন্যদেবের দ্বারা প্রবর্তিত ভাবগুলির ভেতর কোন্‌গুলি নিলে আমাদের কোনরূপ ভ্রমে পড়তে হবে না এবং মঙ্গলও হবে ?

স্বামীজী। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সঙ্গে ভগবানকে ডাকবে। ভক্তির সঙ্গে বিচারবুদ্ধি রাখবে। এ ছাড়া চৈতন্যদেবের কাছ থেকে আরও নেবে তাঁর

heart (হৃদয়বত্তা), সর্বজীবে ভালবাসা, ভগবানের জন্ত টান, আর তাঁর ত্যাগটা জীবনের আদর্শ করবে।

প্রশ্নকর্তা। ঠিক বলেছেন, মহাশয়। আমি আপনার ভাব প্রথমে বুঝতে পারিনি। (করজোড়ে) মাপ করবেন। তাই আপনাকে বৈষ্ণবদের মধুরভাব নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতে দেখে কেমন বোধ হয়েছিল।

স্বামীজী। (হাসিতে হাসিতে) দেখ, গালাগাল যদি দিতেই হয় তো ভগবানকে দেওয়াই ভাল। তুমি যদি আমাকে গাল দাও, আমি ক্ষেপে যাব। আমি তোমাকে গাল দিলে তুমিও তার শোধ তোলবার চেষ্টা করবে। ভগবান তো সে-সব পারবেন না।

এইবার প্রশ্নকর্তা তাঁহার পদধূলি লইয়া চলিয়া গেলেন। স্বামীজী দর্শনার্থীদের ফিরাইয়া দিতে চাহিতেন না। তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে কাহারও কথা তিনি রাখিতেন না। বলিতেন, 'তারা এত কষ্ট ক'রে দূর থেকে হেঁটে আসতে পারে, আর আমি এখানে বসে বসে একটু নিজের শরীর খারাপ হবে ব'লে তাদের সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারি না?'

ঐদিন বেলা তিন-চারিটা হইবে। স্বামীজীর সহিত উপস্থিত কয়েক-জনের অন্ত কথাবার্তা হইতে লাগিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকার কথাও হইতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী বলিলেন: ইংলণ্ড থেকে আসবার সময় পথে বড় এক মজার স্বপ্ন দেখেছিলুম। ভূমধ্যসাগরে আসতে আসতে জাহাজে ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্নে দেখি—বুড়ো থুড়থুড়ো ঋষিভাবাপন্ন একজন লোক আমাকে বলছে, 'তোমারা এস, আমাদের পুনরুদ্ধার কর, আমরা হচ্ছি সেই পুরাতন থেরাপুত্ত সম্প্রদায়—ভারতের ঋষিদের ভাব নিয়েই যা গঠিত হয়েছে। খ্রীষ্টানেরা আমাদের প্রচারিত ভাব ও সত্যসমূহই যীশুর দ্বারা প্রচারিত ব'লে প্রকাশ করেছে। নতুবা যীশু নামে বাস্তবিক কোন ব্যক্তি ছিল না। ঐ-বিষয়ক নানা প্রমাণাদি এই স্থান খনন করলে পাওয়া যাবে।' আমি বললাম, 'কোথায় খনন করলে ঐ-সকল প্রমাণ-চিহ্নাদি পাওয়া যেতে পারে?' বৃদ্ধ বলিল, 'এই দেখ না এখানে।' একথা ব'লে টার্কির নিকটবর্তী একটি স্থান দেখিয়ে দিল। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙবামাত্র তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন জাহাজ কোন্ জায়গায় উপস্থিত হয়েছে?' ক্যাপ্টেন ব'লল, 'ওই সামনে টার্কি এবং ক্রীটদ্বীপ দেখা যাচ্ছে।'

কথোপকথন

লণ্ডনে ভারতীয় যোগী

[ওয়েস্টমিনস্টার গেজেট—২৩শে অক্টোবর, ১৮৯৫]

জনৈক সংবাদদাতা আমাদিগকে লিখিতেছেন: পাশ্চাত্য জাতির নিকটে একপ্রকার সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া প্রতীত বেদান্তধর্মের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। ইনি সত্যসত্যই একজন ভারতীয় যোগী—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সন্ন্যাসী ও যোগিগণ শিষ্যপরম্পরাক্রমে যে-শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন, তাহাই ব্যাখ্যা করিবার জন্ম তিনি অকুতোভয়ে পাশ্চাত্য দেশে আসিয়াছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে গত সন্ধ্যায় 'প্রিন্সেস হলে' এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মাথায় কালো কাপড়ের পাগড়ি, মুখের ভাব শান্ত ও প্রসন্ন—তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় তাঁহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: স্বামীজী, আপনার নামের কোন অর্থ আছে কি?—যদি থাকে, তাহা কি আমি জানিতে পারি?

স্বামীজী: আমি এখন যে (স্বামী বিবেকানন্দ) নামে পরিচিত, তাহার প্রথম শব্দটির অর্থ সন্ন্যাসী অর্থাৎ যিনি বিধিপূর্বক সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, আর দ্বিতীয়টি একটি উপাধি—সংসারত্যাগের পর ইহা আমি গ্রহণ করিয়াছি। সকল সন্ন্যাসীই এইরূপ করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ—বিবেক অর্থাৎ সদসদ্বিচারের আনন্দ।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা স্বামীজী, সংসারের সকল লোকে যে-পথে চলিয়া থাকে, আপনি তাহা ত্যাগ করিলেন কেন?

তিনি উত্তর দিলেন: বাল্যকাল হইতেই ধর্ম ও দর্শন-চর্চায় আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ—মানবের পক্ষে ত্যাগ শ্রেষ্ঠ আদর্শ। পরে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামক একজন উন্নত ধর্মাচার্যের সহিত মিলন হইলে দেখিলাম, আমার যাহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহা তিনি জীবনে পরিণত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর, তিনি যে-পথের পথিক, আমারও সেই পথ অবলম্বন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইল, সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প স্থির করিলাম।

'তবে কি তিনি একটি সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—আপনি এখন তাহারই প্রতিনিধিস্বরূপ?'

স্বামীজী অমনি উত্তর দিলেন: না, না, সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতে সর্বত্র যে এক গভীর ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্যই তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি কোন সম্প্রদায় স্থাপন করেন নাই, বরং উহার সম্পূর্ণ বিপরীতই করিয়া গিয়াছেন। সাধারণে যাহাতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনচিন্তাপরায়ণ হয়, এই মতই তিনি পোষণ করিতেন এবং উহার জন্যই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন খুব বড় যোগী ছিলেন।

'তাহা হইলে এই দেশের কোন সমাজ বা সম্প্রদায়ের সহিতই আপনার কোন সম্বন্ধ নাই, যথা—থিওজফিক্যাল সোসাইটি, ক্রিশ্চান সায়েন্টিস্ট[১] বা অপর কোন সম্প্রদায়ের সহিত?'

স্বামীজী স্পষ্ট হৃদয়স্পর্শী স্বরে বলিলেন: না, কিছুমাত্র না। (স্বামীজী যখন কথা কহেন, তখন তাঁহার মুখ বালকের মুখের মতো উজ্জ্বল হইয়া উঠে—মুখখানি এতই সরল, অকপট ও সদ্‌ভাবপূর্ণ!) আমি যাহা শিক্ষা দিই, তাহা আমার গুরুর শিক্ষানুযায়ী, তাঁহার উপদেশের অনুগামী হইয়া আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ আমি নিজে যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। অলৌকিক উপায়ে লব্ধ কোনপ্রকার বিষয় শিক্ষা দিবার দাবি আমি করি না। আমার উপদেশের মধ্যে যতটুকু তীক্ষ্ণবিচার-বুদ্ধিসম্মত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের গ্রাহ্য, ততটুকু লোকে গ্রহণ করিলেই আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হইব।

তিনি বলিতে লাগিলেন: সকল ধর্মেরই লক্ষ্য—কোন বিশেষ মানব-জীবনকে আদর্শস্বরূপ ধরিয়া স্থূলভাবে ভক্তি, জ্ঞান বা যোগ শিক্ষা দেওয়া। উক্ত আদর্শগুলিকে অবলম্বন করিয়া ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ-বিষয়ক যে সাধারণ ভাব ও সাধনপ্রণালী রহিয়াছে, বেদান্ত তাহারই বিজ্ঞানস্বরূপ। আমি ঐ বিজ্ঞানই প্রচার করিয়া থাকি, এবং ঐ বিজ্ঞানসহায়ে নিজ নিজ সাধনার উপায়-রূপে অবলম্বিত বিশেষ বিশেষ স্থূল আদর্শগুলি প্রত্যেকে নিজেই বুঝিয়া লউক—এই কথাই বলি। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজ নিজ অভিজ্ঞতাকেই

১ Christian Scientists—মার্কিনদেশীয় একটি ধর্মসম্প্রদায়ের নাম।

প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিতে বলিয়া থাকি, আর যেখানে কোন গ্রন্থের কথা প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করি, সেখানে বুঝিতে হইবে, চেষ্টা করিলে সেগুলি সংগ্রহ করা যাইতে পারে, আর সকলেই ইচ্ছা করিলে নিজে নিজে উহা পড়িয়া লইতে পারে। সর্বোপরি প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি দ্বারা আদেশ প্রচারকারী—সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত মহাপুরুষদের উপদেশ বলিয়া কোন কিছু প্রমাণস্বরূপে উপস্থাপিত করি না, অথবা গোপনীয় গ্রন্থ বা হস্তলিপি হইতে কিছু শিখিয়াছি বলিয়া দাবি করি না। আমি কোন গুপ্ত সমিতির মুখপাত্র নই, অথবা ঐরূপ সমিতিসমূহের দ্বারা কোনরূপ কল্যাণ হইতে পারে বলিয়াও আমার বিশ্বাস নাই। সত্য আপনিই আপনার প্রমাণ, উহার অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, সত্য অনায়াসে দিবালোক সহ্য করিতে পারে।

'তবে স্বামীজী, আপনার কোন সমাজ বা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প নাই ?'

স্বামীজী : না, আমার কোন প্রকার সমিতি বা সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা নাই। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে গূঢ়ভাবে অবস্থিত ও সর্বসাধারণের সম্পত্তিস্বরূপ আত্মার তত্ত্ব উপদেশ দিয়া থাকি। জনকয়েক দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি আত্মজ্ঞানলাভ করিলে ও ঐ জ্ঞান-অবলম্বনে দৈনন্দিন জীবনের কাজ করিয়া গেলে পূর্ব পূর্ব যুগের ন্যায় এ যুগেও জগৎটাকে সম্পূর্ণ ওলটপালট করিয়া দিতে পারেন। পূর্বকালেও এক এক জন দৃঢ়চিত্ত মহাপুরুষ ঐভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ সময়ে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন।

'স্বামীজী, আপনি এই সবে ভারত হইতে আসিতেছেন ?'

স্বামীজী : না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোয় যে ধর্ম-মহাসভা হইয়াছিল, আমি তাহাতে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি ছিলাম। সেই অবধি আমি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা দিতেছি। মার্কিন জাতি পরম আগ্রহ সহকারে আমার বক্তৃতা শুনিতেছে এবং আমার সহিত পরমবন্ধুবৎ আচরণ করিতেছে। সেদেশে আমার কাজ এমন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, আমাকে শীঘ্র সেখানে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

'স্বামীজী, পাশ্চাত্য ধর্মসমূহের প্রতি আপনার কিরূপ ভাব ?'

'আমি এমন একটি দর্শন প্রচার করিয়া থাকি, যাহা জগতে যত প্রকার ধর্ম থাকা সম্ভব, সে-সমুদয়েরই ভিত্তিস্বরূপ হইতে পারে, আর আমার সব

ধর্মের উপরই সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, আমার উপদেশ কোন ধর্মেরই বিরোধী নয়। আমি ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিসাধনেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখি, ব্যক্তিকেই তেজস্বী করিবার চেষ্টা করি। প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বরাংশ বা ব্রহ্ম—এ কথাই শিক্ষা দিই, আর সর্বসাধারণকে তাহাদের অন্তর্নিহিত এই ব্রহ্মভাব সম্বন্ধে সচেতন হইতেই আহ্বান করিয়া থাকি। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহাই প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মের আদর্শ।'

'এদেশে আপনার কাজ কি ধরনের হইবে?'

'আমার আশা এই যে, আমি কয়েকজনকে পূর্বোক্ত ভাবে শিক্ষা দিব, আর তাহাদের নিজ নিজ ভাবে অপরের নিকট উহা ব্যক্ত করিতে উৎসাহিত করিব। আমার উপদেশ তাহারা যত ইচ্ছা রূপান্তরিত করুক, ক্ষতি নাই। আমি অবশ্য-বিশ্বাস্য মতবাদরূপে কিছু শিক্ষা দিব না, কারণ পরিণামে সত্যের জয় নিশ্চয়ই হইয়া থাকে।

'আমি প্রকাশ্যে যে-সব কাজ করি, তাহার ভার আমার দু-একটি বন্ধুর হাতে আছে। তাঁহারা ২২শে অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে আটটার সময় পিকাডেলি প্রিন্সেস হলে ইংরেজ শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে আমার এক বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। চারিদিকে বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। বিষয় আমার প্রচারিত দর্শনের মূলতত্ত্ব—'আত্মজ্ঞান'। তাহার পর আমার উদ্দেশ্য সফল করিবার যে-পথ দেখিতে পাইব, সেই পথ অনুসরণ করিতে আমি প্রস্তুত; লোকের বৈঠকখানায় বা অন্য স্থলে সভায় যোগ দেওয়া, পত্রের উত্তর দেওয়া বা সাক্ষাৎভাবে বিচার করা—সব কিছুই করিতে আমি প্রস্তুত। এই অর্থ-লালসা-প্রধান যুগে আমি এই কথাটি কিন্তু সকলকে বলিতে চাই, আমার কোন কার্যই অর্থলাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয় না।'

আমি এঁইবার তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম—আমার সহিত যত ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইনি সর্বাপেক্ষা অধিক মৌলিক-ভাবপূর্ণ, সে-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভারতের জীবনব্রত

[সান্‌ডে টাইম্‌স—লণ্ডন, ১৮৯৬]

ইংলণ্ডবাসীরা যে ভারতের 'প্রবাল উপকূলে'[১] ধর্ম-প্রচারক প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহা ইংলণ্ডের জনসাধারণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। তবে ভারতও যে ইংলণ্ডে ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়া থাকেন, তাহা ইংলণ্ডের জনসাধারণ বড় একটা জানেন না।

সেণ্ট জর্জেস রোড, সাউথ ওয়েস্ট, ৬৩নং ভবনে স্বামী বিবেকানন্দ অল্পকালের জন্য বাস করিতেছেন। দৈবযোগে (যদি 'দৈব' এই শব্দটি প্রয়োগ করিতে কেহ আপত্তি না করেন) সেখানে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কি করেন, এবং তাঁহার ইংলণ্ডে আসিবার উদ্দেশ্যই বা কি, এই-সকল বিষয়ে আলোচনা করিতে তাঁহার কোন আপত্তি না থাকায় ঐ স্থানে আসিয়া আমি তাঁহার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিলাম। তিনি যে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমার সহিত ঐ ভাবে কথোপকথনে সম্মত হইয়াছেন, তাহাতে আমি প্রথমেই বিস্ময় প্রকাশ করিলাম।

তিনি বলিলেন: আমেরিকায় বাস করিবার কাল হইতেই এইরূপে সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করা আমার সম্পূর্ণ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। আমার দেশে ঐরূপ প্রথা নাই বলিয়াই যে আমি সর্বসাধারণকে যাহা জানাইতে ইচ্ছা করি, তাহা জানাইবার জন্য বিদেশে গিয়া সেখানকার প্রচারের প্রচলিত প্রথাগুলি অবলম্বন করিব না, ইহা কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো শহরে যে বিশ্বধর্মমহাসভা বসিয়াছিল, তাহাতে আমি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি ছিলাম। মহীশূরের রাজা এবং অপর কয়েকটি বন্ধু আমাকে সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, আমি আমেরিকায় কিছুটা কৃতকার্য হইয়াছি বলিয়া দাবি করিতে পারি। চিকাগো ছাড়াও আমেরিকার অন্যান্য বড় বড় শহরে আমি বহুবার নিমন্ত্রিত হইয়াছি। আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া আমেরিকায় বাস করিতেছি। গত বৎসর গ্রীষ্মকালে একবার

---

১ Coral-strands—ভারতের সমুদ্রতীরে যথেষ্ট প্রবাল পাওয়া যায়, প্রাচীনকালে পাশ্চাত্যের লোকেরা ভারতের এই পরিচয়ই জানিত।

ইংলণ্ডে আসিয়াছিলাম, এ বৎসরও আসিয়াছি দেখিতেছেন; প্রায় তিন বৎসর আমেরিকায় রহিয়াছি। আমার বিবেচনায় আমেরিকার সভ্যতা খুব উচ্চ স্তরের। দেখিলাম, মার্কিনজাতির চিত্ত সহজেই নূতন নূতন ভাব ধারণা করিতে পারে। কোন জিনিস নূতন বলিয়াই তাহারা পরিত্যাগ করে না, উহার বাস্তবিক কোন গুণাগুণ আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখে—তারপর উহা গ্রাহ্য কি ত্যাজ্য, বিচার করে।

'ইংলণ্ডের লোকেরা অন্যপ্রকার—ইহাই বুঝি আপনার বলিবার উদ্দেশ্য?'

'হাঁ, ইংলণ্ডের সভ্যতা আমেরিকা হইতে পুরাতন। শতাব্দীর পর শতাব্দী যেমন চলিয়াছে, তেমনই উহাতে নানা নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়া উহার বিকাশ হইয়াছে। ঐরূপে অনেকগুলি কুসংস্কারও আসিয়া জুটিয়াছে। সেগুলিকে ভাঙিতে হইবে। এখন যে-কোন ব্যক্তি আপনাদের ভিতর কোন নূতন ভাব প্রচার করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাকেই ঐগুলির দিকে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে।'

'লোকে এইরূপ বলে বটে। আমি যতদূর জানি, তাহাতে আপনি আমেরিকায় কোন নূতন সম্প্রদায় বা ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়া আসেন নাই।'

'এ কথা সত্য। সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমার ভাবের বিরোধী; কারণ সম্প্রদায় তো যথেষ্টই রহিয়াছে। আর সম্প্রদায় করিতে গেলে উহার তত্ত্বাবধানের জন্য লোক প্রয়োজন। এখন ভাবিয়া দেখুন, যাহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে, অর্থাৎ সাংসারিক পদমর্যাদা, বিষয়সম্পত্তি, নাম প্রভৃতি সব ছাড়িয়াছে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণই যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহারা এরূপ কাজের ভার লইতে পারে না। বিশেষতঃ ঐরূপ কাজ যখন অপরে চালাইতেছে, তখন আবার ঐ ভাবে কাজে অগ্রসর হওয়া নিষ্প্রয়োজন।'

'আপনার শিক্ষা কি ধর্মসমূহের তুলনামূলক আলোচনা?'

'সকল প্রকার ধর্মের সারভাগ শিক্ষা দেওয়া বলিলে বরং আমার প্রদত্ত শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে একটা স্পষ্টতর ধারণা হইতে পারে। ধর্মসমূহের গৌণ অঙ্গগুলি বাদ দিয়া উহাদের মধ্যে যেটি মুখ্য, যেটি উহাদের মূলভিত্তি, সেইটির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার কাজ। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন শিষ্য, তিনি একজন সিদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার জীবন ও উপদেশ আমার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ

কোন ধর্মকে কখনও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিতেন না; কোন ধর্মের এই এই ভাব ঠিক নয়—এ-কথা তিনি বলিতেন না। তিনি সকল ধর্মের ভাল দিকটাই দেখাইয়া দিতেন। দেখাইতেন, কিরূপে ঐগুলি অনুষ্ঠান করিয়া উপদিষ্ট ভাবগুলিকে আমরা আমাদের জীবনে পরিণত করিতে পারি। কোন ধর্মের বিরোধিতা করা বা তাহার বিপরীত পক্ষ আশ্রয় করা—তাঁহার শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; কারণ তাঁহার উপদেশের মূল সত্যই এই যে, সমগ্র জগৎ প্রেমবলে পরিচালিত। আপনারা জানেন, হিন্দুধর্ম কখনও অপর ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করে নাই। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ই প্রেম ও শান্তিতে বাস করিতে পারে। মুসলমানদের সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতে ধর্মসম্বন্ধীয় মতামত লইয়া হত্যা অত্যাচার প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা আসিবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন—জৈনগণ, যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করে, তাহাদেরও ইচ্ছামত ধর্মানুষ্ঠানে কেহ কোন দিন বাধা দেয় নাই; আজ পর্যন্ত তাহারা ভারতে রহিয়াছে। ভারতই ঐ বিষয়ে শান্তি ও মৃদুতারূপ যথার্থ বীর্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। যুদ্ধ, অসমসাহসিকতা, প্রচণ্ড আঘাতের শক্তি—এগুলি ধর্মজগতে দুর্বলতার চিহ্ন।'

'আপনার কথাগুলি টলস্টয়ের[১] মতের মতো লাগিতেছে। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এই মত অনুসরণীয় হইতে পারে; সে সম্বন্ধেও আমার নিজের সন্দেহ আছে, কিন্তু সমগ্র জাতির ঐ নিয়মে বা আদর্শে কিভাবে চলা সম্ভব?'

'জাতির পক্ষেও ঐ মত অতি উত্তমরূপে কার্যকর হইবে দেখা যায়, ভারতের কর্মফল—ভারতের অদৃষ্ট অপরজাতিগুলি কর্তৃক বিজিত হওয়া, কিন্তু আবার সময়ে ঐ-সকল বিজেতাকে ধর্মবলে জয় করা। ভারত তাহার মুসলমান বিজেতাগণকে ইতিমধ্যেই জয় করিয়াছে। শিক্ষিত মুসলমানগণ সকলেই সুফি[২]—তাঁহাদিগকে হিন্দু হইতে পৃথক করিবার উপায় নাই। হিন্দু ভাব তাঁহাদের সভ্যতার মর্মে প্রবেশ করিয়াছে—তাঁহারা ভারতের নিকট শিক্ষার্থীর ভাব ধারণ করিয়াছেন। মোগল সম্রাট মহাত্মা আকবর কার্যতঃ

১ Count Leo Tolstoi—রুশিয়ার প্রসিদ্ধ পরহিতব্রত চিন্তাশীল লেখক ও সংস্কারক।

২ আবু সৈয়দ আবুলচের প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। এই সম্প্রদায়ের মতের সহিত বেদান্তের অদ্বৈতবাদের অনেক মিল আছে।

একজন হিন্দু ছিলেন। আবার ইংলণ্ডের পালা আসিলে ভারত তাহাকেও জয় করিবে। আজ ইংলণ্ডের হস্তে তরবারি রহিয়াছে, কিন্তু ভাব-জগতে উহার উপযোগিতা তো নাই-ই, বরং উহাতে অপকারই হইয়া থাকে। আপনি জানেন, শোপেনহাওয়ার[১] ভারতীয় ভাব ও চিন্তা সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, 'অন্ধকার যুগের'[২] পর গ্রীক ও ল্যাটিন বিদ্যার অভ্যুদয়ে যেমন ইওরোপে গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছিল, ভারতীয় ভাব ইওরোপে সুপরিচিত হইলে সেইরূপ গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইবে।'

'আমায় ক্ষমা করিবেন—কিন্তু সম্প্রতি তো ইহার বিশেষ কিছু চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।'

স্বামীজী গম্ভীরভাবে বলিলেন: না দেখা যাইতে পারে, কিন্তু এ-কথাও বেশ বলা যায় যে, ইওরোপের সেই 'জাগরণের'[৩] সময়ও অনেকে কোন চিহ্ন পূর্বে দেখে নাই, এবং উহা আসিবার পরও উহা যে আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। যাঁহারা সময়ের লক্ষণ বিশেষভাবে অবগত, তাঁহারা কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, একটি মহান্ আন্দোলন আজকাল ভিতরে ভিতরে চলিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বর্ষ ধরিয়া প্রাচ্যতত্ত্বানুসন্ধান অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। বর্তমানে ইহা পণ্ডিতদের হস্তেই রহিয়াছে এবং তাঁহারা যতদূর কার্য করিয়াছেন, তাহা লোকের নিকট শুষ্ক নীরস বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু ক্রমে লোকে উহা বুঝিবে, ক্রমে জ্ঞানালোকের প্রকাশ হইবে।

'আপনার মতে তবে ভারতই ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ বিজেতার আসন পাইবে! তথাপি ভারত তাহার ভাবরাজি প্রচারের জন্য অন্যান্য দেশে অধিক ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করে না কেন? বোধ করি, যত দিন না সমগ্র জগৎ আসিয়া তাহার পদতলে পড়িতেছে, ততদিন সে অপেক্ষা করিবে!'

১ Schopenhaur—বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক। ইঁহার দর্শনে বেদান্তের প্রভাব বিশেষরূপে প্রবেশ করিয়াছে।

২ Dark Ages—৫ম-১৫শ শতাব্দী, যে সময় ইওরোপ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।

৩ Renaissance—পঞ্চদশ শতাব্দীর পর হইতে যখন ইওরোপে সাহিত্য-শিল্পাদি-চর্চার পুনরভ্যুদয় হয়, তৎকালই ইতিহাসে এই নামে প্রসিদ্ধ।

'ভারত প্রাচীন যুগে ধর্মপ্রচারকার্যে একটি প্রবল শক্তি হইয়া উঠিয়াছিল। ইংলণ্ড খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার শত শত বৎসর পূর্বে বুদ্ধ সমগ্র এশিয়াকে তাঁহার মতাবলম্বী করিবার জন্য ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। বর্তমানকালে চিন্তাজগৎ ধীরে ধীরে ভারতের ভাব গ্রহণ করিতেছে। এখন ইহার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। বিশেষ কোনপ্রকার ধর্ম-অবলম্বনে অনিচ্ছুক ব্যক্তিগণের সংখ্যা খুব বাড়িতেছে, আর শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ভিতরেই এই ভাব বাড়িয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকাতে যে লোক-গণনা হইয়াছিল, তাহাতে অনেক লোক আপনাদিগকে কোনরূপ বিশেষ ধর্মাবলম্বী বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল। আমি বলি, সকল ধর্মসম্প্রদায়ই এক মূল সত্যের বিভিন্ন বিকাশমাত্র। হয় সবগুলিরই উন্নতি হইবে, নয় সবগুলিই বিনষ্ট হইবে। উহারা ঐ এক সত্যরূপ কেন্দ্র হইতে বহু ব্যাসার্ধের মতো বাহির হইয়াছে, এবং বিভিন্নপ্রকৃতিবিশিষ্ট-মানব-মনের উপযোগী সত্যের প্রকাশস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।'

'এখন আমরা অনেকটা মূলপ্রসঙ্গের কাছে আসিতেছি—সেই কেন্দ্রীভূত সত্যটি কি?'

'মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তি। প্রত্যেক ব্যক্তিই—সে যতই মন্দপ্রকৃতি হউক না কেন, ভগবানের প্রকাশস্বরূপ। এই ব্রহ্মশক্তি আবৃত থাকে, মানুষের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত থাকে। ঐ কথায় আমার ভারতীয় সিপাহীবিদ্রোহের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। ঐ সময়ে বহুবর্ষ-মৌনব্রতধারী এক সন্ন্যাসীকে জনৈক মুসলমান দারুণ আঘাত করে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে লোকে ঐ আঘাতকারীকে ধরিয়া তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া বলিল, 'স্বামিন্, আপনি একবার বলুন, তাহা হইলে এ ব্যক্তি নিহত হইবে।' সন্ন্যাসী অনেক দিনের মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া তাঁহার শেষ নিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন, 'বৎসগণ, তোমরা বড়ই ভুল করিতেছ—ঐ ব্যক্তি যে সাক্ষাৎ ভগবান্!' সকলের পশ্চাতে ঐ একত্ব রহিয়াছে—উহাই আমাদের জীবনের শিক্ষা করিবার প্রধান বিষয়। তাঁহাকে গড্, আল্লা, জিহোবা, প্রেম বা আত্মা যাহাই বলুন না কেন, সেই এক বস্তুই অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে মহত্তম মানব পর্যন্ত সমুদয় প্রাণীতেই প্রাণস্বরূপে বিরাজমান। এই চিত্রটি মনে মনে ভাবুন দেখি, যেন বরফে ঢাকা সমুদ্রের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন আকারের গর্ত করা রহিয়াছে—

ঐ প্রত্যেকটি গর্তই এক একটি আত্মা—এক একটি মানুষসদৃশ, নিজ নিজ বুদ্ধিশক্তির তারতম্য অনুসারে বন্ধন কাটাইয়া—ঐ বরফ ভাঙিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে!'

'আমার বোধ হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতির আদর্শের মধ্যে একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। আপনারা সন্ন্যাস, একাগ্রতা প্রভৃতি উপায়ে খুব উন্নত ব্যক্তি গঠনের চেষ্টা করিতেছেন, আর পাশ্চাত্য জাতির আদর্শ—সামাজিক অবস্থার সম্পূর্ণতা সাধন করা। সেইজন্য আমরা সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্যাসমূহের মীমাংসাতেই বিশেষ ভাবে নিযুক্ত; কারণ সর্বসাধারণের কল্যাণের উপর আমাদের সভ্যতার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে—আমরা এইরূপ বিবেচনা করি।'

স্বামীজী খুব দৃঢ়তা ও আগ্রহের সহিত বলিলেন, 'কিন্তু সামাজিক বা রাজনীতিক সর্ববিধ বিষয়ের সফলতার মূলভিত্তি—মানুষের সাধুতা। পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ কোন আইন দ্বারা কখন কোন জাতি উন্নত বা ভাল হয় না, কিন্তু সেই জাতির অন্তর্গত লোকগুলি উন্নত ও ভাল হইলেই জাতিও ভাল হইয়া থাকে। আমি চীনদেশে গিয়াছিলাম—এক সময়ে ঐ জাতিই সর্বাপেক্ষা চমৎকার শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ সেই চীন ছত্রভঙ্গ কতকগুলা সামান্য লোকের সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ—প্রাচীনকালে উদ্ভাবিত ঐ-সকল শাসনপ্রণালী পরিচালনা করিবার উপযুক্ত লোক বর্তমানে ঐ জাতিতে আর জন্মাইতেছে না। ধর্ম সকল-বিষয়ের মূল পর্যন্ত গিয়া থাকে। মূলটি যদি ঠিক থাকে, তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই ঠিক থাকে।'

'ভগবান্ সকলেরই ভিতর রহিয়াছেন, কিন্তু তিনি আবৃত রহিয়াছেন—এ কথাটা যেন কি রকম অস্পষ্ট ও ব্যাবহারিক জগৎ হইতে অনেক দূরে বলিয়া বোধ হয়। লোকে তো আর সদা সর্বদা ঐ ব্রহ্মের সন্ধান করিতে পারে না?'

'লোকে অনেক সময় পরস্পর একই উদ্দেশ্যে কার্য করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা বুঝিতে পারে না। এটি স্বীকার করিতেই হইবে যে, আইন গভর্নমেণ্ট রাজনীতি—এগুলি মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য নহে। ঐ-সকল ছাড়াইয়া উহাদের চরম লক্ষ্যস্থল এমন একটি আছে—যেখানে আইন আর প্রয়োজন হয় না। এখানে বলিয়া রাখি, সন্ন্যাসী শব্দটির অর্থ—বিধিনিয়মত্যাগী ব্রহ্মতত্ত্বা-

মৈত্রী—কিংবা সন্ন্যাসী বলিতে নেতিবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীও বলিতে পারা যায়। তবে এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিলে সঙ্গে সঙ্গে একটা ভুল ধারণা আসিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ একই শিক্ষা দিয়া থাকেন। যীশুখ্রীষ্ট বুঝিয়াছিলেন, নিয়ম-প্রতিপালনই উন্নতির মূল নহে, যথার্থ পবিত্রতা ও চরিত্রই শক্তি। আপনি যে বলিতেছিলেন, প্রাচ্যদেশে আত্মার উচ্চতর বিকাশের দিকে লক্ষ্য—অবশ্য আপনি এ-কথা বিস্মৃত হন নাই বোধ হয় যে, আত্মা দুই প্রকার: কূটস্থ চৈতন্য, যিনি আত্মার যথার্থ স্বরূপ; আর আভাস চৈতন্য, আপাততঃ যাহাকে আমাদের আত্মা বলিয়া বোধ হইতেছে।'

'বোধ হয়, আপনার ভাব এই যে, আমরা আভাসের উদ্দেশ্যে কার্য করিতেছি, আর আপনারা প্রকৃত চৈতন্যের উদ্দেশ্যে কার্য করিতেছেন?'

'মন নিজ পূর্ণতর বিকাশের জন্য নানা সোপানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। প্রথমে উহা স্থূলকে অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মের দিকে যাইতে থাকে। আরও দেখুন, সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের ধারণা মানুষে কিরূপে লাভ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ উহা সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃভাবের আকারে আবির্ভূত হয়—তখন উহাতে সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ—'অপরকে বাদ দেওয়া' ভাব থাকে। পরে ক্রমে ক্রমে আমরা উদারতার ভাবে—সূক্ষ্মতর ভাবে পৌঁছিয়া থাকি।'

'তাহা হইলে আপনি কি মনে করেন, এই সব সম্প্রদায়, যাহা আমরা—ইংরেজরা—এত ভালবাসি, সব লোপ পাইবে? আপনি জানেন বোধ হয়, জনৈক ফরাসী বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে সম্প্রদায় সহস্র সহস্র, কিন্তু সার জিনিস খুব অল্প।'

'ঐ-সব সম্প্রদায় যে লোপ পাইবে, সে-সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নাই। উহাদের অস্তিত্ব অসার বা গৌণ কতকগুলি বিষয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য উহাদের মুখ্য বা সার ভাবটি থাকিয়া যাইবে এবং উহার সাহায্যে অপর নূতন গৃহ নির্মিত হইবে। অবশ্য সেই প্রাচীন উক্তি আপনার জানা আছে যে, একটা চার্চ বা সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে জন্মানো ভাল, কিন্তু আমরণ উহার গণ্ডির ভিতরে বদ্ধ থাকা ভাল নয়।'

'ইংলণ্ডে আপনার কার্যের কিরূপ বিস্তার হইতেছে, অনুগ্রহপূর্বক বলিবেন কি?'

'ধীরে ধীরে হইতেছে, ইহার কারণ আমি পূর্বেই বলিয়াছি। যেখানে মূল ধরিয়া কার্য, সেখানে প্রকৃত উন্নতি বা বিস্তার অবশ্যই ধীরে ধীরে হইয়া থাকে। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, যে-কোন উপায়েই হউক, এই-সব ভাব বিস্তৃত হইবেই হইবে, এবং আমাদের অনেকের বোধ হইতেছে, ঐ-সকল ভাব-প্রচারের যথার্থ সময় উপস্থিত হইয়াছে।'

ভারত ও ইংলণ্ড

['ইণ্ডিয়া', লণ্ডন, ১৮৯৬]

লণ্ডনের ইহা মরসুমের সময়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মত ও দর্শনে আকৃষ্ট অনেক ব্যক্তির সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন ও তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সাময়িক বাসস্থান দক্ষিণ বেলগ্রেভিয়াতে গেলাম। ভারতের আবার ইংলণ্ডকে বলিবার আর কি আছে, জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইল।

স্বামীজী শান্তভাবে বলিলেন: ভারতের পক্ষে এখানে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ কিছু নূতন ব্যাপার নহে। যখন বৌদ্ধধর্ম নবীন তেজে উঠিতেছিল—যখন ভারতের চতুষ্পার্শ্বস্থ জাতিগুলিকে তাহার কিছু শিখাইবার ছিল, তখন সম্রাট অশোক চারিদিকে ধর্মপ্রচারক পাঠাইলেন।

'আচ্ছা, এ কথা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কেন ভারত ঐরূপে ধর্মপ্রচারক-প্রেরণ বন্ধ করিয়াছিল, আবার কেনই বা এখন আরম্ভ করিল?'

'বন্ধ করিবার কারণ—ক্রমশঃ স্বার্থপর হইয়া ভারত এই তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছিল যে, আদানপ্রদান-প্রণালীক্রমেই ব্যক্তি এবং জাতি উভয়েই জীবিত থাকে ও উন্নতি লাভ করে। ভারত চিরদিন জগতে একই বার্তা বহন করিয়াছে; ভারতের বার্তা আধ্যাত্মিক। অনন্ত যুগ ধরিয়া অন্তরের ভাব-রাজ্যেই তাহার একচেটিয়া অধিকার—সূক্ষ্ম বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র—ইহাতেই ভারতের বিশেষ অধিকার। প্রকৃতপক্ষে আমার ইংলণ্ডে প্রচারকার্যে আগমন—ইংলণ্ডের ভারত-গমনেরই ফলস্বরূপ। ইংলণ্ড ভারতকে জয় করিয়া শাসন

করিতেছে, তাহার পদার্থবিদ্যা নিজের এবং আমাদের কাজে লাগাইতেছে। ভারত জগৎকে কি দিয়াছে ও দিতে পারে, মোটামুটি বলিতে গিয়া আমার একটি সংস্কৃত ও একটি ইংরেজী বাক্য মনে পড়িতেছে।

'কোন মানুষ মরিয়া গেলে আপনারা বলেন, সে আত্মা পরিত্যাগ করিল (He gave up the ghost), আর আমরা বলি, সে দেহত্যাগ করিল। আপনারা বলিয়া থাকেন, মানুষের আত্মা আছে, তাহাতে আপনারা যেন অনেকটা ইহাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন যে, শরীরটাই মানুষের প্রধান জিনিস। কিন্তু আমরা বলি, মানুষ আত্মাস্বরূপ—তাহার একটা দেহ আছে। এগুলি অবশ্য জাতীয় চিন্তাতরঙ্গের উপরিভাগের ক্ষুদ্র বুদ্বুদমাত্র, কিন্তু ইহাই আপনাদের জাতীয় চিন্তাতরঙ্গের গতি প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

'আমার ইচ্ছা হইতেছে, আপনাকে শোপেনহাওয়ারের ভবিষ্যদ্বাণীটি স্মরণ করাইয়া দিই যে, অন্ধকার যুগের (Dark Ages) অবসানে গ্রীক ও ল্যাটিন বিদ্যার অভ্যুদয়ে ইওরোপে যেরূপ গুরুতর পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল, ভারতীয় দর্শন ইওরোপে সুপরিচিত হইলে সেইরূপ গুরুতর পরিবর্তন আসিবে। প্রাচ্যতত্ত্ব-গবেষণা খুব প্রবল বেগে অগ্রসর হইতেছে। সত্যান্বেষিগণের সমক্ষে নূতন ভাবস্রোতের দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে।'

'তবে কি আপনি বলিতে চান, ভারতই অবশেষে তাহার বিজেতাকে জয় করিবে?'

'হাঁ, ভাবরাজ্যে। এখন ইংলণ্ডের হাতে তরবারি—সে এখন জড়জগতের প্রভু, যেমন ইংরেজের আগে আমাদের মুসলমান বিজেতারা ছিলেন। সম্রাট আকবর কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন হিন্দুই হইয়া গিয়াছিলেন। শিক্ষিত মুসলমানদের সঙ্গে—সুফিদের সঙ্গে—হিন্দুদের সহজে প্রভেদ করা যায় না। তাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে না এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে আমাদের আচার-ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া থাকে। তাহাদের চিন্তাপ্রণালী আমাদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরঞ্জিত হইয়াছে।'

'তাহা হইলে আপনার মতে—দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজের অদৃষ্টেও ঐরূপ হইবে? বর্তমান মুহূর্তে ঐ ভবিষ্যৎ কিন্তু অনেক দূরে বলিয়াই বোধ হয়।'

'না, আপনি যতদূর ভাবিতেছেন, ততদূর নয়। ধর্মবিষয়ে হিন্দু ও ইংরেজের ভাব অনেক বিষয়ে সদৃশ। আর অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে হিন্দুর ঐক্য

আছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যদি কোন ইংরেজ শাসনকর্তার (Civil Servant) ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও জ্ঞান থাকে, তবে দেখা যায়, উহাই তাঁহার হিন্দুর প্রতি সহানুভূতির কারণ। ঐ সহানুভূতির ভাব দিন দিন বাড়িতেছে। কতকগুলি লোক যে এখনও ভারতীয় ভাবকে অতি সঙ্কীর্ণ—এমন কি, কখন কখন অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, কেবল অজ্ঞানই যে তাহার কারণ, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অন্যায় বলা হইবে না।'

'হাঁ, ইহা অজ্ঞতার পরিচায়ক বটে। আপনি ইংলণ্ডে না আসিয়া যে আমেরিকায় ধর্মপ্রচারকার্যে গেলেন, ইহার কারণ কি বলিবেন?'

'সেটি কেবল দৈবঘটনা মাত্র—বিশ্বধর্মমহাসভা লণ্ডনে না বসিয়া চিকাগোয় বসিয়াছিল বলিয়াই আমাকে সেখানে যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক লণ্ডনেই উহার অধিবেশন হওয়া উচিত ছিল। মহীশূরের রাজা এবং আর কয়েকজন বন্ধু আমাকে সেখানে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়াছিলেন। আমি সেখানে তিন বৎসর ছিলাম—কেবল গতবৎসর গ্রীষ্মকালে আমি লণ্ডনে বক্তৃতা দিবার জন্য আসিয়াছিলাম এবং এই গ্রীষ্মেও আসিয়াছি। মার্কিনেরা খুব বড় জাত—উহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমি তাহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন—তাহাদের মধ্যে আমি অনেক সহৃদয় বন্ধু পাইয়াছি। ইংরেজদের অপেক্ষা তাহাদের কুসংস্কার অল্প—তাহারা সকল নূতন ভাবকেই ওজন করিয়া দেখিতে বা পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত—নূতনত্ব সত্ত্বেও উহার আদর করিতে প্রস্তুত। তাহারা খুব অতিথিপরায়ণ। লোকের বিশ্বাসপাত্র হইতে সেখানে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় লাগে। আমার মতো আপনিও আমেরিকার শহরে শহরে ঘুরিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন—সর্বত্রই বন্ধু জুটিবে। আমি বস্টন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, ডেসমোনিস, মেমফিস এবং অন্যান্য অনেক স্থানে গিয়াছিলাম।'

'আর প্রত্যেক জায়গায় শিষ্য করিয়া আসিয়াছেন?'

'হাঁ, শিষ্য করিয়া আসিয়াছি—কিন্তু কোন সমাজ গঠন করি নাই। উহা আমার কাজের অন্তর্গত নহে। সমাজ বা সমিতি তো যথেষ্টই আছে। তা ছাড়া সম্প্রদায় করিলে উহা পরিচালনার জন্য আবার লোক দরকার—সম্প্রদায় গঠিত হইলেই টাকার প্রয়োজন, ক্ষমতার প্রয়োজন, মুরুব্বির

প্রয়োজন। অনেক সময় সম্প্রদায়সমূহ প্রভুত্বের জন্ম চেষ্টা করিয়া থাকে, কখন কখন অপরের সহিত লড়াই পর্যন্ত করিয়া থাকে।'

'তবে কি আপনার ধর্মপ্রচারকার্যের ভাব সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, আপনি বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া তাহারই প্রচার করিতে চাহেন?'

'আমি প্রচার করিতে চাই—ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলির যাহা সার তাহাই আমি প্রচার করিতে চাই। সকল ধর্মেরই একটা মুখ্য ও একটা গৌণ ভাগ আছে। ঐ গৌণভাগগুলি ছাড়িয়া দিলে যাহা থাকে, তাহাই সকল ধর্মের প্রকৃত ভিত্তিস্বরূপ, উহাই সকল ধর্মের সাধারণ সম্পত্তি। সকল ধর্মের অন্তরালে ঐ একত্ব রহিয়াছে—আমরা উহাকে গড্, আল্লা, জিহোভা, আত্মা, প্রেম—যে-কোন নাম দিতে পারি। সেই এক সত্তাই সকল প্রাণীর প্রাণরূপে বিরাজিত—প্রাণিজগতের অতি নিকৃষ্ট বিকাশ হইতে সর্বোচ্চ বিকাশ মানব পর্যন্ত সর্বত্র। আমরা ঐ একত্বের দিকেই সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে চাই, কিন্তু পাশ্চাত্যে—শুধু পাশ্চাত্যে কেন, সর্বত্রই লোকে গৌণবিষয়গুলির দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। লোকে ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি লইয়া অপরকে ঠিক নিজের মতো কাজ করাইবার জন্মই পরস্পরের সহিত বিবাদ এবং পরস্পরকে হত্যা পর্যন্ত করে। ভগবদ্ভক্তি ও মানব-প্রীতিই যখন জীবনের সার বস্তু, তখন এইসকল বাদ-বিসংবাদকে কঠিনতর ভাষায় নির্দেশ না করিলেও আশ্চর্য ব্যাপার বলিতে হয়।'

'আমার বোধ হয়, হিন্দু কখনও অন্য ধর্মাবলম্বীর উপর উৎপীড়ন করিতে পারে না।'

'এ পর্যন্ত কখনও করে নাই। জগতে যত জাতি আছে তাহার মধ্যে হিন্দুই সর্বাপেক্ষা পরধর্মসহিষ্ণু। হিন্দু গভীর ধর্মভাবাপন্ন বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে যে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ব্যক্তির উপর সে অত্যাচার করিবে। কিন্তু দেখুন, জৈনেরা ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন হিন্দুই জৈনদের উপর অত্যাচার করে নাই। ভারতে মুসলমানেরাই প্রথমে পরধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল।'

'ইংলণ্ডে এই অদ্বৈত মতবাদ কিরূপ প্রসার লাভ করিতেছে? এখানে তো সহস্র সহস্র সম্প্রদায়।'

'স্বাধীন চিন্তা ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে ধীরে ধীরে ঐগুলি লোপ পাইবে ; উহারা গৌণবিষয় অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত—সেজন্য স্বভাবতই চিরকাল থাকিতে পারে না। ঐ সম্প্রদায়গুলি তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে। ঐ উদ্দেশ্য—সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের ধারণানুযায়ী সঙ্কীর্ণ ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা। এখন ঐ-সকল বিভিন্ন ব্যক্তির সমষ্টির মধ্যে যে ভেদরূপ প্রাচীর—ব্যবধান আছে, সেগুলি ভাঙিয়া দিয়া ক্রমে আমরা সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবে পৌছিতে পারি। ইংলণ্ডে এই কাজ খুব ধীরে ধীরে চলিতেছে—তাহার কারণ সম্ভবতঃ এখনও উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই ভাব প্রসারিত হইতেছে। ইংলণ্ডও ভারতে ঐ কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে, আমি আপনার দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। আধুনিক জাতিভেদ ভারতের উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক। উহা সঙ্কীর্ণতা ও ভেদ আনয়ন করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর একটা গণ্ডি কাটিয়া দেয়। চিন্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।'

'কিন্তু কতক ইংরেজ—আর তাঁহারা ভারতের প্রতি কম সহানুভূতি-সম্পন্ন নন, কিংবা উহার ইতিহাস সম্বন্ধে খুব অজ্ঞ নন—জাতিভেদকে মুখ্যতঃ কল্যাণকর বলিয়াই মনে করেন। লোকে সহজেই বেশী রকম ইওরোপীয়-ভাবাপন্ন হইয়া যাইতে পারে। আপনিই আমাদের অনেকগুলি আদর্শকে জড়বাদাত্মক বলিয়া নিন্দা করেন।'

'সত্য। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ভারতকে ইংলণ্ডে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন না। দেহের অন্তরালে যে চিন্তা রহিয়াছে, তাহা দ্বারাই এই শরীর গঠিত হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র জাতিটি জাতীয় চিন্তার বিকাশমাত্র, আর ভারতে উহা সহস্র সহস্র বৎসরের চিন্তার বিকাশ-স্বরূপ। সুতরাং ভারতকে ইওরোপীয়-ভাবাপন্ন করা এক অসম্ভব ব্যাপার এবং উহার জন্য চেষ্টা করাও নির্বোধের কাজ। ভারতে চিরদিনই সামাজিক উন্নতির উপাদান বিদ্যমান ছিল ; যখনই শান্তিপূর্ণ শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইয়াছে, তখনই উহার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উপনিষদের যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমাদের সকল বড় বড় আচার্যই জাতিভেদের বেড়া ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য মূল জাতিবিভাগকে নহে, উহার বিকৃত ও অবনত ভাবটাকেই তাঁহারা ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীন জাতিবিভাগে অতি সুন্দর সামাজিক

ব্যবস্থা ছিল—বর্তমান জাতিভেদের মধ্যে যেটুকু ভাল দেখিতে পাইতেছেন, তাহা সেই প্রাচীন জাতিবিভাগ হইতেই আসিয়াছে। বুদ্ধ জাতিবিভাগকে উহার প্রাচীন মৌলিক আকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারত যখনই জাগিয়াছে, তখনই জাতিভেদ ভাঙিবার প্রবল চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগকেই চিরকাল এ কাজ করিতে হইবে—আমাদিগকেই প্রাচীন ভারতের পরিণতি ও ক্রমবিকাশ-কল্পে নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে; যে-কোন বৈদেশিক ভাব ঐ কাজে সাহায্য করে, তাহা যেখানেই পাওয়া যাক না কেন, তাহা নিজের করিয়া লইতে হইবে। অপরে কখন আমাদের হইয়া ঐ কাজ করিতে পারিবে না। সকল উন্নতিই ব্যক্তি- বা জাতি-বিশেষের ভিতর হইতে হওয়া প্রয়োজন। ইংলণ্ড কেবল ভারতকে তাহার নিজ উদ্ধার-সাধনে সাহায্য করিতে পারে—এই পর্যন্ত! আমার মতে যে-জাতি ভারতের গলা টিপিয়া রহিয়াছে, তাহার নির্দেশে যে-উন্নতি হইবে, তাহার কোন মূল্য নাই। ক্রীত-দাসের ভাবে কার্য করিলে অতি উচ্চতম কার্যেরও ফলে অবনতিই ঘটিয়া থাকে।'

'আপনি কি ভারতের জাতীয় মহাসমিতি আন্দোলনের (Indian National Congress Movement) দিকে কখনও মনোযোগ দিয়াছেন?'

'আমি যে ও-বিষয়ে বিশেষ মন দিয়াছি, বলিতে পারি না। আমার কার্য-ক্ষেত্র অন্য বিভাগে। কিন্তু আমি ঐ আন্দোলন দ্বারা ভবিষ্যতে বিশেষ শুভফল লাভের সম্ভাবনা আছে মনে করি এবং অন্তরের সহিত উহার সিদ্ধি কামনা করি। ভারতের বিভিন্ন জাতি লইয়া এক বৃহৎ জাতি বা নেশন গঠিত হইতেছে। আমার কখনও কখনও মনে হয়, ভারতের বিভিন্ন জাতি ইওরোপের বিভিন্ন জাতি অপেক্ষা কম বিচিত্র নয়। অতীতে ইওরোপের বিভিন্ন জাতি ভারতীয় বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছে, আর এই ভারতীয় বাণিজ্য জগতের সভ্যতা-বিস্তারে একটি প্রবল শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে। এই ভারতীয় বাণিজ্যাধিকারলাভ মনুষ্যজাতির ইতিহাসে একরূপ ভাগ্যচক্র-পরিবর্তনকারী ঘটনা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, ওলন্দাজ, পোর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজ ক্রমান্বয়ে উহার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। ভিনিসবাসীরা প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য-বিস্তারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সুদূর পাশ্চাত্যে ঐ ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করাতেই যে আমেরিকার আবিষ্কার হইল, ইহাও বলা যাইতে পারে।'

'ইহার পরিণতি কোথায়?'

'অবশ্য ইহার পরিণতি হইবে ভারতের মধ্যে সাম্যভাব-স্থাপনে, সকল ভারতবাসীর ব্যক্তিগত সমান অধিকারলাভে। জ্ঞান কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির একচেটিয়া সম্পত্তি থাকিবে না—উহা উচ্চ শ্রেণী হইতে ক্রমে নিম্ন শ্রেণীতে বিস্তৃত হইবে। সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা চলিতেছে, পরে বাধ্য করিয়া সকলকে শিক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত হইবে। ভারতীয় সর্বসাধারণের মধ্যে নিহিত অগাধ কার্যকরী শক্তিকে ব্যবহারে আনিতে হইবে। ভারতের অভ্যন্তরে মহতী শক্তি নিহিত আছে—উহাকে জাগাইতে হইবে।'

'প্রবল যুদ্ধকুশল জাতি না হইয়া কি কেহ কখনও বড় হইয়াছে?'

স্বামীজী মুহূর্তমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন 'হাঁ, চীন হইয়াছে। অন্যান্য দেশের মধ্যে আমি চীন ও জাপানে ভ্রমণ করিয়াছি। আজ চীন একটা ছত্রভঙ্গ দলের মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু উন্নতির দিনে উহার যেমন সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা ছিল, আর কোন জাতির এ পর্যন্ত সেরূপ হয় নাই। অনেক বিষয়—যেগুলিকে আমরা আজকাল 'আধুনিক' ব'লে থাকি, চীনে শত শত, এমন কি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সেগুলি প্রচলিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রতিযোগিতা-পরীক্ষার কথা ধরুন।'

'চীন এমন ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল কেন?'

'কারণ, চীন তাহার সামাজিক প্রথা অনুযায়ী মানুষ তৈয়ার করিতে পারিল না। আপনাদের একটা চলিত কথা আছে যে, পার্লামেন্টের আইনবলে মানুষকে ধার্মিক করিতে পারা যায় না। চীনারা আপনাদের পূর্বেই ঐ কথা ঠেকিয়া শিখিয়াছিল। ঐ কারণেই রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মের আবশ্যকতা গভীরতর। কারণ ধর্ম ব্যাবহারিক জীবনের মূলতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করে।'

'আপনি যে ভারতের জাগরণের কথা বলিতেছেন, ভারত কি সে-বিষয়ে সচেতন?'

'সম্পূর্ণ সচেতন। সকলে সম্ভবতঃ কংগ্রেস আন্দোলনে এবং সমাজসংস্কার-ক্ষেত্রে এই জাগরণ বেশীর ভাগ দেখিয়া থাকে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ধীরভাবে কাজ চলিলেও ধর্মবিষয়ে ঐ জাগরণ বাস্তবিকই হইয়াছে।'

'পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশের আদর্শ এতদূর বিভিন্ন। আমাদের আদর্শ সামাজিক অবস্থার পূর্ণতা-সাধন বলিয়াই বোধ হয়। আমরা এখন এই-সকল

বিষয়ের আলোচনাতেই ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছি, আর প্রাচ্যবাসিগণ সেই সময়ে সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের ধ্যানে নিযুক্ত। সুদানযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের ব্যয়ভার কোথা হইতে নির্বাহ হইবে, এই বিষয়ের বিচারেই এখানে পার্লামেণ্ট ব্যস্ত। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে ভদ্র সংবাদপত্র মাত্রেই সরকারের অন্যায় মীমাংসার বিরুদ্ধে খুব চীৎকার করিতেছে, কিন্তু আপনি হয়তো ভাবিতেছেন, ও-বিষয়টা একেবারে মনোযোগেরই যোগ্য নয়।'

স্বামীজী সম্মুখের সংবাদপত্রটি লইয়া এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কাগজ হইতে উদ্ধৃতাংশসমূহে একবার চোখ বুলাইয়া বলিলেন, 'কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার সহানুভূতি স্বভাবতই আমার দেশের সহিত হইবে। তথাপি ইহাতে আমার একটি সংস্কৃত প্রবাদ মনে পড়িতেছে—হাতী বেচিয়া এখন আর অঙ্কুশের জন্য বিবাদ কেন? ভারতই চিরকাল দিয়া আসিতেছে। রাজনীতিকদের বিবাদ বড় অদ্ভুত। রাজনীতির ভিতর ধর্ম ঢুকাইতে এখনও অনেক যুগ লাগিবে।'

'তাহা হইলেও উহার জন্য অতি শীঘ্র চেষ্টা করা তো আবশ্যক?'

'হাঁ, জগতের মধ্যে বৃহত্তম শাসনযন্ত্র সুমহান্ লণ্ডনের হৃদয়ে কোন ভাব-বীজ রোপণ করা বিশেষ প্রয়োজন বটে। আমি অনেক সময় ইহার কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকি—কিরূপ তেজের সহিত ও কেমন সম্পূর্ণভাবে অতি সূক্ষ্মতম শিরায় পর্যন্ত উহার ভাবপ্রবাহ ছুটিয়াছে! উহার ভাববিস্তার—চারিদিকে শক্তিসঞ্চালনপ্রণালী কি অদ্ভুত! ইহা দেখিলে সমগ্র সাম্রাজ্যটি কত বৃহৎ ও উহার কার্য কত গুরুতর, তাহা বুঝিবার পক্ষে সাহায্য হয়। অন্যান্য বিষয়-বিস্তারের সহিত উহা ভাবও ছড়াইয়া থাকে। এই মহান্ যন্ত্রের কেন্দ্রে কতকগুলি ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন, যাহাতে অতি দূরবর্তী দেশে পর্যন্ত ঐগুলি সঞ্চারিত হইতে পারে।'

ইংলণ্ডে ভারতীয় ধর্মপ্রচারক

[লণ্ডন হইতে প্রকাশিত 'একো' নামক সংবাদপত্র, ১৮৯৬]

...বোধ হয় নিজের দেশে হইলে স্বামীজী গাছতলায়, বড় জোর কোন মন্দিরের সন্নিকটে থাকিতেন, নিজের দেশের কাপড় পরিতেন ও তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত থাকিত। কিন্তু লণ্ডনে তিনি ও-সব কিছুই করেন না। সুতরাং আমি যখন স্বামীজীর সহিত দেখা করিলাম, দেখিলাম, তিনি অপরাপর লোকের মতোই বাস করিতেছেন। পোশাকও অন্যান্য লোকেরই মতো—তফাত কেবল এই যে, তিনি গেরুয়া রঙের একটি লম্বা জামা পরেন।

আমি প্রথমেই ঐ ভারতীয় যোগীকে তাঁহার নাম খুব ধীরে ধীরে বানান করিতে বলিলাম।

* * *

'আপনি কি মনে করেন, আজকাল লোকের অসার ও গৌণ বিষয়েই দৃষ্টি বেশী?'

'আমার তো তাই মনে হয়—অনুন্নত জাতিদের মধ্যে এবং পাশ্চাত্য দেশের সভ্য জাতিদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত, তাদের মধ্যেও এই ভাব। আপনার প্রশ্নের ভাবে বোধ হয়, ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্য ভাব। বাস্তবিক তাই বটে। ধনী লোকেরা হয় ঐশ্বর্যভোগে মগ্ন অথবা আরও অধিক ধন-সঞ্চয়ের চেষ্টায় ব্যস্ত। তারা এবং সংসারকর্মে ব্যস্ত অনেক লোকে ধর্মটাকে একটা অনর্থক বাজে জিনিস মনে করে, আর সরল ভাবেই এ-কথা মনে ক'রে থাকে। প্রচলিত ধর্ম হচ্ছে—দেশহিতৈষিতা আর লোকাচার। লোকে বিবাহের সময় বা কাকেও কবর দেবার সময়েই কেবল চার্চে যায়।'

'আপনি যা প্রচার করছেন, তার ফলে কি লোকের চার্চে গতিবিধি বাড়বে?'

'আমার তো তা বোধ হয় না। কারণ বাহ্য অনুষ্ঠান বা মতবাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মই যে মানবজীবনের সর্বস্ব এবং সব কিছুর ভেতরেই যে ধর্ম আছে, তাই দেখানো আমার জীবনব্রত।...আর এখানে

ইংলণ্ডে কি ভাব চলছে? ভাবগতিক দেখে বোধ হয় যে, সোশ্যালিজম্ বা অন্য কোনরূপ গণতন্ত্র, তার নাম যাই দিন না কেন, শীঘ্র প্রচলিত হবে। লোকে অবশ্য তাদের সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির আকাঙ্ক্ষা মেটাতে চাইবে। তারা চাইবে—যাতে তাদের কাজ পূর্বাপেক্ষা কমে যায়, যাতে তারা ভাল খেতে পায় এবং অত্যাচার ও যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে বন্ধ হয়। কিন্তু যদি এদেশের সভ্যতা বা অন্য কোন সভ্যতা ধর্মের উপর, মানবের সাধুতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তা যে টিকবে তার নিশ্চয়তা কি? এটি নিশ্চয় জানবেন যে, ধর্ম সকল-বিষয়ের মূলদেশ পর্যন্ত গিয়ে থাকে। যদি ঐটি ঠিক থাকে, তবে সব ঠিক।'

'কিন্তু ধর্মের সার দার্শনিক ভাব লোকের মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া তো বড় সহজ ব্যাপার নয়। লোকে সচরাচর যে-সকল চিন্তা করে এবং যেভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তার সঙ্গে তো এর অনেক ব্যবধান।'

'সকল ধর্ম বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়, প্রথমাবস্থায় লোকে ক্ষুদ্রতর সত্যকে আশ্রয় ক'রে থাকে, পরে তা থেকেই বৃহত্তর সত্যে উপনীত হয়; সুতরাং অসত্য ছেড়ে সত্যলাভ হ'ল, এটি বলা ঠিক নয়। সৃষ্টির অন্তরালে এক বস্তু বিরাজমান, কিন্তু লোকের মন নিতান্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সত্য বস্তু একটিই, জ্ঞানিগণ তাকে নানারূপে বর্ণনা ক'রে থাকেন। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, লোকে সঙ্কীর্ণতর সত্য থেকে ব্যাপকতর সত্যে অগ্রসর হয়ে থাকে; সুতরাং অপরিণত বা নিম্নতর ধর্মসমূহও মিথ্যা নয়, সত্য; তবে তাদের মধ্যে সত্যের ধারণা বা অনুভূতি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট বা অপকৃষ্ট—এই মাত্র। লোকের জ্ঞানবিকাশ ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। এমন কি, ভূতোপাসনা পর্যন্ত সেই নিত্য সত্য সনাতন ব্রহ্মেরই বিকৃত উপাসনা মাত্র। ধর্মের অন্যান্য যে-সব রূপ আছে, তাহাদের মধ্যেও অল্পবিস্তর সত্য বর্তমান; সত্য কোন ধর্মেই পূর্ণরূপে নেই।'

'আপনি ইংলণ্ডে এই যে ধর্মপ্রচার করতে এসেছেন, তা আপনারই উদ্ভাবিত কি না, এ কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

'এ ধর্ম আমার উদ্ভাবিত কখনই নয়। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস নামক জনৈক ভারতীয় মহাপুরুষের শিষ্য। আমাদের দেশের অনেক মহাত্মার মতো তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন না বটে, কিন্তু অতিশয় পবিত্রাত্মা ছিলেন এবং

তাঁহার জীবন ও উপদেশ বেদান্তদর্শনের ভাবে বিশেষরূপে অনুরঞ্জিত ছিল। বেদান্ত দর্শন বললাম—কিন্তু এটিকে ধর্মও বলতে পারা যায়, কারণ প্রকৃতপক্ষে উহা 'ধর্ম' ও 'দর্শন' উভয়ই। সম্প্রতি 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি' পত্রের একটি সংখ্যায় অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার আমার আচার্যদেবের যে বিবরণ লিখেছেন, তা অনুগ্রহপূর্বক পড়ে দেখবেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়, আর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহত্যাগ হয়। কেশবচন্দ্র সেন এবং অন্যান্য ব্যক্তির জীবনের উপর তিনি প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শরীর ও মনের সংযম অভ্যাস ক'রে তিনি আধ্যাত্মিক জগতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। তাঁর মুখভাব সাধারণ মানুষের মতো ছিল না—তাঁর মুখে বালকের মতো কমনীয়তা, গভীর নম্রতা এবং অদ্ভুত প্রশান্ত ও মধুর ভাব দেখা যেত। তাঁর মুখ দেখে বিচলিত না হয়ে কেউ থাকতে পারত না।'

'তবে আপনার উপদেশ বেদ হইতে গৃহীত।'

'হাঁ, বেদান্তের অর্থ বেদের শেষভাগ, উহা বেদের তৃতীয় অংশ। উহার নাম উপনিষদ্। প্রাচীনভাগে যে-সকল ভাব বীজাকারে অবস্থিত দেখতে পাওয়া যায়, সেই বীজগুলিই এখানে সুপরিণত হয়েছে। বেদের অতি প্রাচীন ভাগের নাম সংহিতা। এগুলি অতি প্রাচীন ধরনের সংস্কৃতে রচিত। যাস্কের 'নিরুক্ত' নামক অতি প্রাচীন অভিধানের সাহায্যেই কেবল এগুলি বোঝা যেতে পারে।'

* * *

'আমাদের—ইংরেজদের—বরং ধারণা, ভারতকে আমাদের কাছ থেকে অনেক শিক্ষা করতে হবে। ভারত থেকে ইংরেজরা যে কিছু শিখতে পারে, এ-সম্বন্ধে সাধারণ লোক একরূপ অজ্ঞ বললেও হয়।'

'তা সত্য বটে। কিন্তু পণ্ডিতেরা ভালভাবেই জানেন, ভারত থেকে কতদূর শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে, আর ঐ শিক্ষা কতদূরই বা প্রয়োজনীয়। আপনি দেখবেন—ম্যাক্সমূলার, মোনিয়ার, উইলিয়াম্‌স্‌, স্যার উইলিয়ম হাণ্টার বা জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ভারতীয় সূক্ষ্মবিজ্ঞান (abstract science)-কে অবজ্ঞা করেন না।'

স্বামীজীর সহিত মাদুরায় একঘণ্টা

('হিন্দু', মান্দ্রাজ ; ফেব্রুআরি, ১৮৯৭)

প্রশ্ন। আমার যতদূর জানা আছে, 'জগৎ মিথ্যা'—এই মতবাদ এই কয়েক প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে :

(১) অনন্তের তুলনায় নশ্বর নামরূপের স্থায়িত্ব এত অল্প যে, তাহা বলিবার নয়। (২) দুইটি প্রলয়ের অন্তর্গত কাল অনন্তের তুলনায় ঐরূপ। (৩) যেমন শুক্তিতে রজতজ্ঞান বা রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ভ্রমাবস্থায় সত্য, আর ঐ জ্ঞান মনের অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ বর্তমানে এই জগতেরও একটা আপাতপ্রতীয়মান সত্যতা আছে, উহারও সত্যতা-জ্ঞান মনের অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে, কিন্তু পরমার্থতঃ (চরমে বা পরিণামে) মিথ্যা। (৪) বন্ধ্যাপুত্র বা শশশৃঙ্গ যেমন মিথ্যা, জগৎও তেমনি একটা মিথ্যা ছায়ামাত্র।

এই কয়েকটি ভাবের মধ্যে অদ্বৈত বেদান্তদর্শনে 'জগৎ মিথ্যা' এই মতটি কোন্ ভাবে গৃহীত হইয়াছে ?

উত্তর। অদ্বৈতবাদীদের ভিতর অনেক শ্রেণী আছে—প্রত্যেকটিই কিন্তু ঐগুলির মধ্যে কোন-না-কোন একটি ভাবে অদ্বৈতবাদ বুঝিয়াছেন। শঙ্কর তৃতীয় ভাবানুযায়ী শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ—এই জগৎ আমাদের নিকট যেভাবে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা সবই বর্তমান জ্ঞানের পক্ষে ব্যাবহারিক ভাবে সত্য ; কিন্তু যখনই মানবের জ্ঞান উচ্চ আকার ধারণ করে, তখনই উহা একেবারে অন্তর্হিত হয় ; সম্মুখে একটা স্থাণু দেখিয়া আপনার ভূত বলিয়া ভ্রম হইতেছে। সেই সময়ের জন্য সেই ভূতের জ্ঞানটি সত্য ; কারণ, যথার্থ ভূত হইলে উহা আপনার মনে যেরূপ কাজ করিত, যে-ফল উৎপন্ন করিত, ইহাতেও ঠিক সেই ফল হইতেছে। যখনই আপনি বুঝিবেন উহা স্থাণুমাত্র, তখনই আপনার ভূতজ্ঞান চলিয়া যাইবে। স্থাণু ও ভূত—উভয় জ্ঞান একত্র থাকিতে পারে না। একটি যখন বর্তমান, অপরটি তখন থাকে না।

প্র। শঙ্করের কতকগুলি গ্রন্থে চতুর্থ ভাবটিও কি গৃহীত হয় নাই ?

উ। না। কোন কোন ব্যক্তি শঙ্করের 'জগৎ মিথ্যা' এই উপদেশটির মর্ম ঠিক ঠিক ধরিতে না পারিয়া উহাকে লইয়া বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাদের গ্রন্থে চতুর্থ ভাবটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাব দুটি কয়েক শ্রেণীর অদ্বৈতবাদী গ্রন্থের বিশেষত্ব বটে, কিন্তু শঙ্কর ঐগুলি কখনও অনুমোদন করেন নাই।

প্র। এই আপাতপ্রতীয়মান সত্যতার কারণ কি?

উ। স্থাণুতে ভূত-ভ্রান্তির কারণ কি? জগৎ প্রকৃতপক্ষে সর্বদাই একরূপ রহিয়াছে, আপনার মনই ইহাতে নানা অবস্থা-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতেছে।

প্র। 'বেদ অনাদি অনন্ত'—এ-কথার বাস্তবিক তাৎপর্য কি? উহা কি বৈদিক মন্ত্ররাজির সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে? যদি বেদমন্ত্রে নিহিত সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই বেদ অনাদি অনন্ত বলা হইয়া থাকে, তবে ন্যায় জ্যামিতি রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রও অনাদি অনন্ত; কারণ তাহাদের মধ্যেও তো সনাতন সত্য রহিয়াছে?

উ। এমন এক সময় ছিল, যখন বেদের অন্তর্গত আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ অপরিণামী ও সনাতন, মানবের নিকট কেবল অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র—এইভাবে বেদসমূহ অনাদি অনন্ত বিবেচিত হইত। পরবর্তী কালে বোধ হয় যেন অর্থজ্ঞানের সহিত বৈদিক মন্ত্রগুলিই প্রাধান্য লাভ করিল এবং ঐ মন্ত্রগুলিকেই ঈশ্বরপ্রসূত বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। আরও পরবর্তী কালে মন্ত্রগুলির অর্থেই প্রকাশ পাইল যে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি কখনও ঈশ্বরপ্রসূত হইতে পারে না; কারণ ঐগুলি মানবজাতিকে—প্রাণিগণকে—যন্ত্রণাদান প্রভৃতি নানাবিধ পাপজনক কার্যের বিধান দিয়াছে, উহাদের মধ্যে অনেক 'আষাঢ়ে গল্প'ও দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ 'অনাদি অনন্ত'—এ-কথার যথার্থ তাৎপর্য এই যে, উহা দ্বারা মানবজাতির নিকট যে বিধি বা সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিত্য ও অপরিণামী। ন্যায় জ্যামিতি রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রও মানবজাতির নিকট নিত্য অপরিণামী নিয়ম বা সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে, আর সেই অর্থে উহারাও অনাদি অনন্ত। কিন্তু এমন সত্য বা বিধিই নাই, যাহা বেদে নাই; আর আমি আপনাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছি—উহাতে ব্যাখ্যাত হয় নাই, এমন কি সত্য আছে, দেখাইয়া দিন।

প্র। অদ্বৈতবাদীদের মুক্তির ধারণা কিরূপ? আমার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই—তাঁহাদের মতে কি ঐ অবস্থায় জ্ঞান থাকে? অদ্বৈতবাদীদের মুক্তি ও বৌদ্ধনির্বাণে কোন প্রভেদ আছে কি?

উ। মুক্তিতে একপ্রকার জ্ঞান থাকে, উহাকে আমরা 'তুরীয় জ্ঞান' বা অতিচেতন অবস্থা বলিয়া থাকি। উহার সহিত আপনাদের বর্তমান জ্ঞানের প্রভেদ আছে। মুক্তি-অবস্থায় কোনরূপ জ্ঞান থাকে না, বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। আলোকের মতো জ্ঞানেরও তিন অবস্থা—মৃদু জ্ঞান, মধ্যবিধ জ্ঞান ও চরম জ্ঞান। যখন আলোকের স্পন্দন অতি প্রবল হয়, তখন উহার ঔজ্জ্বল্য এত অধিক হয় যে, উহা চক্ষুকে ধাঁধিয়া দেয়, তার অতি ক্ষীণতম আলোকে যেমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, উহাতেও সেইরূপ কিছুই দেখা যায় না। জ্ঞান সম্বন্ধেও তাহাই। বৌদ্ধেরা যাহাই বলুন না কেন, নির্বাণেও ঐ-প্রকার জ্ঞান বিদ্যমান। আমাদের মুক্তির সংজ্ঞা অস্তিভাবাত্মক, বৌদ্ধ নির্বাণের সংজ্ঞা নাস্তিভাবদ্যোতক।

প্র। তুরীয় ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টির জন্য অবস্থাবিশেষ আশ্রয় করেন কেন?

উ। এই প্রশ্নটিই অযৌক্তিক, সম্পূর্ণ ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ব্রহ্ম 'অবাঙ্-মনসোগোচরম্,' অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা বা মনের দ্বারা তাঁহাকে ধরিতে পারা যায় না। যাহা দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত প্রদেশে অবস্থিত, তাহাকে মানব-মনের দ্বারা ধারণা করিতে পারা যায় না; আর দেশ-কাল-নিমিত্তের অন্তর্গত রাজ্যেই যুক্তি ও অনুসন্ধানের অধিকার। তাই যদি হয়, তবে যে-বিষয় মানব-বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করিবার কোন সম্ভাবনা নাই, সে-সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা বৃথা চেষ্টা মাত্র।

প্র। দেখা যায়—অনেকে বলেন, পুরাণগ্রন্থগুলির আপাত-প্রতীয়মান অর্থের পশ্চাতে গুহ্য অর্থ আছে। তাঁহারা বলেন, ঐ গুহ্য ভাবগুলি পুরাণে রূপকচ্ছলে উপদিষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ আবার বলেন যে, পুরাণের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কিছুমাত্র নাই—উচ্চতম আদর্শসমূহ বুঝাইবার জন্য পুরাণকার কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণ বা মহাভারতের কথা ধরুন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বাস্তবিক কি ঐগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা কিছু আছে, অথবা উহারা কেবল দার্শনিক সত্যসমূহের রূপকভাবে বর্ণনা, অথবা মানবজাতির চরিত্র নিয়মিত করিবার

অন্ত উচ্চতম আদর্শসমূহেরই দৃষ্টান্ত, কিংবা উহারা মিল্টন হোমর প্রভৃতির কাব্যের ন্যায় উচ্চভাবাত্মক কাব্যমাত্র?

উ। কিছু-না-কিছু ঐতিহাসিক সত্য সকল পুরাণেরই মূল ভিত্তি। পুরাণের উদ্দেশ্য—নানাভাবে পরম সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। আর যদিও সেগুলিতে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য না থাকে, তথাপি উহারা যে উচ্চতম সত্যের উপদেশ দিয়া থাকে, সেই হিসাবে আমাদের নিকট খুব উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামায়ণের কথা ধরুন—অলঙ্ঘনীয় প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে উহাকে মানিতে হইলেই যে রামের ন্যায় কেহ কখন যথার্থ ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। রামায়ণ বা মহাভারতের মধ্যে যে ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে, তাহা রাম বা কৃষ্ণের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না; সুতরাং ইহাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হইয়াও রামায়ণ-মহাভারতকে মানবজাতির নিকট উপদিষ্ট মহান্ ভাবসমূহ সম্বন্ধে উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়। আমাদের দর্শন উহার সত্যতার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না। দেখুন, কৃষ্ণ জগতের সমক্ষে নূতন বা মৌলিক কিছুই শিক্ষা দেন নাই, আর রামায়ণকারও এমন কথা বলেন না যে, বেদাদি শাস্ত্রে যাহা আদৌ উপদিষ্ট হয় নাই, এমন কিছু তত্ত্ব তিনি শিখাইতে চান। এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন, খ্রীষ্টধর্ম খ্রীষ্ট ব্যতীত, মুসলমানধর্ম মহম্মদ এবং বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধ ব্যতীত টিকিতে পারে না, কিন্তু হিন্দুধর্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর একেবারে নির্ভর করে না। কোন পুরাণে বর্ণিত দার্শনিক সত্য কতদূর প্রামাণ্য, তাহার বিচার করিতে হইলে ঐ পুরাণে বর্ণিত ব্যক্তিগণ বাস্তবিকই ছিলেন, অথবা তাঁহারা কাল্পনিক চরিত্রমাত্র,—এ বিচারের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। পুরাণের উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতির শিক্ষা—আর যে-সকল ঋষি ঐ পুরাণসমূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কতকগুলি ঐতিহাসিক চরিত্র লইয়া ইচ্ছামত যত কিছু ভাল বা মন্দ গুণ উহাদের উপর আরোপ করিতেন—এইরূপে তাঁহারা মানবজাতির পরিচালনার জন্য ধর্মের বিধান দিয়াছেন। রামায়ণে বর্ণিত দশমুখ রাবণের অস্তিত্ব—একটা দশমাথাযুক্ত রাক্ষস অবশ্যই ছিল—মানিতেই হইবে, এমন কি কথা আছে? দশানন নামে কোন ব্যক্তি বাস্তবিকই থাকুন বা উহা কবিকল্পনাই হউক, ঐ চরিত্রসহায়ে এমন কিছু শিক্ষা দেওয়া

হইয়াছে, যাহা আমাদের বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। আপনি এখন কৃষ্ণকে আরও মনোহরভাবে বর্ণনা করিতে পারেন, আপনার বর্ণনা আদর্শের উচ্চতার উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু পুরাণে নিবদ্ধ মহোচ্চ দার্শনিক সত্যসমূহ চিরকালই একরূপ।

প্র। যদি কোন ব্যক্তি সিদ্ধ (adept) হন, তবে কি তাঁহার পক্ষে তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মের ঘটনাসমূহ স্মরণ করা সম্ভব? পূর্বজন্মের স্থূল মস্তিষ্ক—যাহার মধ্যে তাঁহার পূর্বানুভূতির সংস্কারসমূহ সঞ্চিত ছিল—এখন তাহা আর নাই, এ-জন্মে তিনি একটি নূতন মস্তিষ্ক পাইয়াছেন। তাহাই যদি হইল, তবে বর্তমান মস্তিষ্কের পক্ষে অধুনা অবর্তমান অপর যন্ত্রের দ্বারা গৃহীত সংস্কারসমূহকে গ্রহণ করা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে?

স্বামীজী। আপনি সিদ্ধ (adept) বলিতে কি লক্ষ্য করিতেছেন?

সংবাদদাতা। যিনি নিজের 'গুহ্য' শক্তিসমূহের 'বিকাশ' করিয়াছেন।

স্বামীজী। 'গুহ্য' শক্তি কিভাবে 'বিকাশ'প্রাপ্ত হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার ভাব আমি বুঝিতেছি, কিন্তু আমার বিশেষ ইচ্ছা যে, যে-সকল শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, সেগুলির অর্থে যেন কোনরূপ অনির্দিষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবের ছায়ামাত্র না থাকে। যেখানে যে-শব্দটি যথার্থ উপযোগী, সেখানে যেন ঠিক সেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আপনি বলিতে পারেন, 'গুহ্য' বা 'অব্যক্ত' শক্তি 'ব্যক্ত' বা 'নিরাবরণ' হয়। যাঁহাদের অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্বজন্মের ঘটনাসমূহ স্মরণ করিতে পারেন। কারণ মৃত্যুর পর যে সূক্ষ্ম শরীর থাকে, তাহাই তাঁহাদের বর্তমান মস্তিষ্কের বীজস্বরূপ।

প্র। অহিন্দুকে হিন্দুধর্মাবলম্বী করা কি হিন্দুধর্মের মূলভাবের অবিরোধী, আর চণ্ডাল যদি দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে, ব্রাহ্মণ কি তাহা শুনিতে পারেন?

উ। অহিন্দুকে হিন্দু করা হিন্দুধর্ম আপত্তিকর জ্ঞান করেন না। যে-কোন ব্যক্তি—তিনি শূদ্রই হউন আর চণ্ডালই হউন—ব্রাহ্মণের নিকট পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অতি নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও—তিনি যে-কোন জাতি হউন বা যে-কোন ধর্মাবলম্বী হউন—সত্য শিক্ষা করা যাইতে পারে।

স্বামীজী তাঁহার এই মতের স্বপক্ষে খুব প্রামাণ্য সংস্কৃত শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিলেন। এই স্থানেই কথাবার্তা বন্ধ হইল, কারণ তাঁহার মন্দিরদর্শনে যাইবার সময় হইয়াছিল। সুতরাং তিনি উপস্থিত ভদ্রলোকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মন্দিরদর্শনে যাত্রা করিলেন।

ভারত ও অন্যান্য দেশের নানা সমস্যা আলোচনা

['হিন্দু', মাদ্রাজ ; ফেব্রুআরি, ১৮৯৭]

আমাদের অনেক প্রতিনিধি চিঙলপুট স্টেশনে স্বামীজীর সহিত ট্রেনে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সহিত মাদ্রাজ পর্যন্ত আসেন। গাড়িতে উভয়ের নিম্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিল :

'স্বামীজী, আপনি আমেরিকায় কেন গেছলেন ?'

'বড় শক্ত কথা। সংক্ষেপে এর উত্তর দেওয়া কঠিন। এখন আমি এর আংশিক উত্তর মাত্র দিতে পারি। ভারতের সব জায়গায় আমি ঘুরছিলুম—দেখলুম, ভারতে যথেষ্ট ঘোরা হয়েছে ; তখন অন্য অন্য দেশে যাবার ইচ্ছা হ'ল। আমি জাপানের দিক দিয়ে আমেরিকায় গেছলুম।'

'আপনি জাপানে কি দেখলেন ? জাপান উন্নতির যে পথে চলেছে, ভারতের কি তা অনুসরণ করবার কোন সম্ভাবনা আছে—মনে করেন ?'

'কোন সম্ভাবনা নেই, যতদিন না ভারতের ত্রিশ কোটি লোক মিলে একটা জাতি হয়ে দাঁড়ায়। জাপানীর মতো এমন স্বদেশহিতৈষী ও শিল্পপটু জাত আর দেখা যায় না ; আর তাদের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইওরোপ ও অন্য স্থানে একদিকে যেমন শিল্পের বাহার, অপরদিকে আবার তেমনি অপরিষ্কার, কিন্তু জাপানীদের যেমন শিল্পের সৌন্দর্য, তেমনি আবার তারা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার ইচ্ছে—আমাদের যুবকেরা জীবনে অন্ততঃ একবার জাপানে বেড়িয়ে আসে। যাওয়াও কিছু শক্ত নয়। জাপানীরা হিন্দুদের সবই খুব ভাল ব'লে মনে করে, আর ভারতকে তীর্থস্বরূপ ব'লে বিশ্বাস করে। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম আর জাপানের বৌদ্ধধর্ম ঢের তফাত।

জাপানের বৌদ্ধধর্ম বেদান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম নাস্তিক্যবাদে দূষিত, জাপানের বৌদ্ধধর্ম আস্তিক।'

'জাপান হঠাৎ এ-রকম বড় হ'ল কি ক'রে? এর রহস্যটা কি?'

'জাপানীদের আত্মপ্রত্যয় আর তাদের স্বদেশের উপর ভালবাসা। যখন ভারতে এমন লোক জন্মাবে, যারা দেশের জন্য সব ছাড়তে প্রস্তুত, আর যাদের মন মুখ এক, তখন ভারতও সব বিষয়ে বড় হবে। মানুষ নিয়েই তো দেশের গৌরব। শুধু দেশে আছে কি? জাপানীরা সামাজিক ও রাজনীতিক বিষয়ে যেমন সাঁচ্চা, তোমাদেরও যখন তাই হবে, তোমরাও তখন জাপানীদের মতো বড় হবে। জাপানীরা তাদের দেশের জন্যে সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাইতেই তারা বড় হয়েছে। তোমরা যে কাম-কাঞ্চনের জন্য সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত!'

'আপনার কি ইচ্ছে যে ভারত জাপানের মতো হোক?'

'তা কখনই নয়। ভারত ভারতই থাকবে। ভারত কেমন ক'রে জাপান বা অন্য জাতের মতো হবে? যেমন সঙ্গীতে একটা ক'রে প্রধান সুর থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতেরই এক একটা মুখ্য ভাব থাকে, অন্য অন্য ভাবগুলি তার অনুগত। ভারতের মুখ্য ভাব হচ্ছে ধর্ম। সমাজ-সংস্কার এবং অন্য সবই গৌণ। লোকে বলে হৃদয় উন্মুক্ত হ'লে চিন্তার প্রবাহ আসে। ভারতের হৃদয়ও এক সময়ে উন্মুক্ত হবে, তখন ধর্মতরঙ্গ খেলতে থাকবে! ভারত ভারতই। আমরা জাপানীদের মতো নই, আমরা হিন্দু। ভারতের হাওয়াতেই কেমন শান্তি এনে দেয়! আমি এখানে সর্বদা কাজ করছি, কিন্তু এরই মধ্যে আমি বিশ্রাম লাভ করছি। ভারতে ধর্মকার্য করলে শান্তি পাওয়া যায়, এখানে সাংসারিক কার্য করতে গেলে শেষে মৃত্যু হয়— বহুমূত্র হয়ে।'

'যাক জাপানের কথা। আচ্ছা, স্বামীজী, আপনি আমেরিকায় গিয়ে প্রথমে কি দেখলেন?'

'গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আমি ভালই দেখেছিলুম। কেবল মিশনরী আর 'চার্চের মেয়েরা' (church-women) ছাড়া আমেরিকানরা সকলেই বড় অতিথিবৎসল সৎস্বভাব ও সহৃদয় ব্যক্তি।'

'চার্চের মেয়েরা কি, স্বামীজী?'

'মার্কিন মেয়ে যখন যে করবার জন্ম উঠে পড়ে লাগে, তখন সব রকম সমুদ্রতীরবর্তী স্নানের জায়গায় ঘুরতে থাকে, আর একটা পুরুষ পাকড়াবার জন্ম যত রকম কৌশল করবার চেষ্টা করে। সব চেষ্টা ক'রে যখন বিফল হয়, তখন সে চার্চে যোগ দেয়, তখন তাকে ওখানে 'ওল্ড মেড' বলে। তাদের মধ্যে অনেকে চার্চের বেজায় গোঁড়া হয়ে দাঁড়ায়।...এদের বাদ দিলে, আমেরিকানরা বড় ভাল লোক। তারা আমায় ভালবাসত, আমিও তাদের খুব ভালবাসি। আমি যেন তাদেরই একজন, এই-রকম বোধ করতাম।'

'চিকাগো ধর্মমহাসভা হয়ে কি ফল দাঁড়ালো, আপনার ধারণা?'

আমার ধারণা, চিকাগো ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য ছিল—জগতের সামনে অ-খ্রীষ্টান ধর্মগুলিকে হীন প্রতিপন্ন করা। কিন্তু দাঁড়ালো অ-খ্রীষ্টান ধর্মের প্রাধান্য। সুতরাং খ্রীষ্টানদের দৃষ্টিতে ঐ মহাসভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। দেখ না কেন, এখন প্যারিসে আর একটা মহাসভা হবার কথা হচ্ছে, কিন্তু রোমান ক্যাথলিকরা, যাঁরা চিকাগো মহাসভার উদ্যোক্তা ছিলেন, তাঁরাই এখন যাতে প্যারিসে ধর্মমহাসভা না হয়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন। কিন্তু চিকাগো সভা দ্বারা ভারতীয় চিন্তার বিশেষরূপ বিস্তারের সুবিধা হয়েছে! ওতে বেদান্তের চিন্তাধারা বিস্তার হবার সুবিধে হয়েছে—এখন সমগ্র জগৎ বেদান্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। অবশ্য আমেরিকানরা চিকাগো সভার এই পরিণামে বিশেষ সুখী—কেবল গোঁড়া পুরোহিত আর 'চার্চের মেয়েরা' ছাড়া।'

'ইংলণ্ডে আপনার প্রচারকার্যের কিরূপ আশা দেখছেন, স্বামীজী?'

'খুব আশা আছে। দশ বৎসরও যেতে হবে না—অধিকাংশ ইংরেজই বেদান্তী হবে। আমেরিকার চেয়ে ইংলণ্ডে বেশী আশা। আমেরিকানরা তো দেখছ—সব বিষয়েই একটা হুজুক ক'রে তোলে। ইংরেজরা হুজুগে নয়। বেদান্ত না বুঝলে খ্রীষ্টানেরা তাদের নিউটেস্টামেন্টও বুঝতে পারে না। বেদান্ত সব ধর্মেরই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাস্বরূপ। বেদান্তকে ছাড়লে সব ধর্মই কুসংস্কার। বেদান্তকে ধরলে সবই ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়।'

'আপনি ইংরেজ-চরিত্রে বিশেষ কি গুণ দেখলেন?'

'ইংরেজরা কোন বিষয় বিশ্বাস করলেই তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে যায়। ওদের কাজের শক্তি অসাধারণ। ইংরেজ পুরুষ ও মহিলার চেয়ে উন্নততর

নরনারী সারা পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া যায় না। এই জন্যেই তাদের উপর আমার বেশী বিশ্বাস। অবশ্য প্রথম তাদের মাথায় কিছু ঢোকানো বড় কঠিন; অনেক চেষ্টাচরিত্র ক'রে উঠে পড়ে লেগে থাকলে তবে তাদের মাথায় একটা ভাব ঢোকে, কিন্তু একবার দিতে পারলে আর সহজে সেটি বেরোয় না। ইংলণ্ডে কোন মিশনরী বা অন্য কোন লোক আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেনি—একজনও আমার কোন রকম নিন্দে করবার চেষ্টা করেনি। আমি দেখে আশ্চর্য হলুম, অধিকাংশ বন্ধুই 'চার্চ অব্ ইংলণ্ডে'র অন্তর্ভুক্ত। আমি জেনেছি যে-সব মিশনরী এ দেশে আসে, তারা ইংলণ্ডের খুব নিম্নশ্রেণীভুক্ত। কোন ভদ্র ইংরেজ তাদের সঙ্গে মেশে না। এখানকার মতো ইংলণ্ডেও জাতের খুব কড়াকড়ি। আর 'চার্চে'র সদস্য ইংরেজরা ভদ্রশ্রেণীভুক্ত। আপনার সঙ্গে তাঁদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তাতে আপনার সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব হবার কিছু ব্যাঘাত হবে না। এই জন্যে আমি আমার স্বদেশবাসীকে এই একটি পরামর্শ দিতে চাই যে, মিশনরীরা কি, তা তো এখন জেনেছি; এখন এই কর্তব্য যে, এই গালাগালবাজ মিশনরীদের মোটেই আমল না দেওয়া। আমরাই তো ওদের আস্কারা দিয়েছি। এখন ওদের মোটে গ্রাহ্যের মধ্যে না আনাই কর্তব্য।'

'স্বামীজী, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সমাজসংস্কার আন্দোলন কি রকম, অনুগ্রহ ক'রে এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?'

'সব সমাজ-সংস্কারকরা, অন্ততঃ তাঁদের নেতারা, এখন তাঁদের সাম্যবাদ প্রভৃতির একটা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভিত্তি বার করবার চেষ্টা করছে—আর সেই ভিত্তি কেবল বেদান্তেই পাওয়া যায়। অনেক নেতা, যাঁরা আমার বক্তৃতা শুনতে আসতেন, আমায় বলেছেন, নূতন ভাবে সমাজ গঠন করতে হ'লে বেদান্তকে ভিত্তিস্বরূপ নেওয়া দরকার।'

'ভারতের জনসাধারণ সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?'

'আমরা ভয়ানক গরীব। আমাদের জনসাধারণ লৌকিক বিদ্যায় বড়ই অজ্ঞ, কিন্তু তারা বড় ভাল। কারণ এখানে দারিদ্র্য একটা দণ্ডনীয় অপরাধ ব'লে বিবেচিত হয় না। এরা দুর্দান্তও নয়। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে অনেক সময় আমার পোশাকের দরুন জনসাধারণ খেপে অনেকবার আমাকে মারবার যোগাড়ই করেছিল। কিন্তু ভারতে কারও অসাধারণ পোশাকের

দরুন জনসাধারণ খেপে গিয়ে মারতে উঠেছে, এ-রকম কথা তো কখন শুনিনি। অন্যান্য সব বিষয়েও আমাদের জনসাধারণ, ইওরোপের জনসাধারণের চেয়ে ঢের সভ্য।'

'ভারতীয় জনসাধারণের উন্নতির জন্য কি করা ভাল বলেন?'

'তাঁদের লৌকিক বিদ্যা শেখাতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে-প্রণালী দেখিয়ে গেছেন, তারই অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ বড় বড় আদর্শগুলি ধীরে ধীরে সাধারণের ভেতর সঞ্চারিত করতে হবে। ধীরে ধীরে তাদের তুলে নাও, ধীরে ধীরে তাদের সমান ক'রে নাও। লৌকিক বিদ্যাও ধর্মের ভিতর দিয়ে শেখাতে হবে।'

'কিন্তু স্বামীজী, আপনি কি মনে করেন, এ কাজ সহজে হ'তে পারে?'

'অবশ্য এটা ধীরে ধীরে কাজে পরিণত করতে হবে। কিন্তু যদি আমি অনেকগুলি স্বার্থত্যাগী যুবক পাই, যারা আমার সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত, তা হ'লে কালই এটা হ'তে পারে। কেবল এই কাজে যে পরিমাণে উৎসাহ ও স্বার্থত্যাগ করা হবে, তারই উপর নির্ভর করছে এ কাজ তাড়াতাড়ি হবে বা দেরীতে হবে।'

'কিন্তু যদি বর্তমান হীনাবস্থা তাদের অতীত কর্মের ফল হইয়া থাকে, তবে আপনার বিবেচনায় কিভাবে সহজে এটি ঘুচবে আর আপনি কেমন করেই বা তাদের সাহায্য করবার ইচ্ছা করেন?'

স্বামীজী মুহূর্তমাত্র চিন্তার অবসর না লইয়াই উত্তর দিলেন, 'কর্মবাদই অনন্তকাল মানবের স্বাধীনতা ঘোষণা করছে। কর্মের দ্বারা নিজেদের হীন অবস্থায় এনেছি—এ কথা যদি সত্য হয়, তবে কর্মের দ্বারা আমাদের অবস্থার উন্নতিসাধনও নিশ্চয়ই করতে পারি। আরও কথা এই, জনসাধারণ কেবল যে নিজেদের কর্মের দ্বারাই এই হীনাবস্থা এনেছে, তা নয়। সুতরাং তাদের উন্নতি করবার আরও সুবিধা দিতে হবে। আমি সব জাতকে একাকার করতে বলি না। জাতিবিভাগ খুব ভাল। এই জাতিবিভাগ-প্রণালীই আমরা অনুসরণ করতে চাই। জাতিবিভাগ যথার্থ কি, তা লাখে একজন বোঝে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই, যেখানে জাত নেই। ভারতে আমরা জাতিবিভাগের মধ্য দিয়ে জাতির অতীত অবস্থায় গিয়ে থাকি। জাতিবিভাগ ঐ মূলসূত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভারতে এই জাতিবিভাগ-

প্রণালীর উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে ব্রাহ্মণ করা—ব্রাহ্মণই আদর্শ মানুষ। যদি ভারতের ইতিহাস পড়ো, তবে দেখবে—এখানে বরাবরই নিম্নজাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা হয়েছে। অনেক জাতিকে উন্নত করা হয়েছেও। আরও অনেক হবে। শেষে সকলেই ব্রাহ্মণ হবে। এই আমাদের কার্য-প্রণালী। কাকেও নামাতে হবে না—সকলকে ওঠাতে হবে। আর এইটি প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদের করতে হবে, কারণ প্রত্যেক অভিজাত সম্প্রদায়েরই কর্তব্য নিজেদের মূলোচ্ছেদ করা। আর যত শীগগির তাঁরা এটি করেন, ততই সকলের পক্ষে মঙ্গল। এ বিষয়ে দেরী করা উচিত নয়, বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করা উচিত নয়। ইওরোপ-আমেরিকার জাতিবিভাগের চেয়ে ভারতের জাতিবিভাগ অনেক ভাল। অবশ্য আমি এ-কথা বলি না যে, এর সবটাই ভাল। যদি জাতিবিভাগ না থাকত, তবে তোমরা থাকতে কোথায়? জাতিবিভাগ না থাকলে তোমাদের বিদ্যা ও আর আর জিনিস কোথায় থাকত? জাতিবিভাগ না থাকলে ইওরোপীয়দের পড়বার জন্যে এ-সব শাস্ত্রাদি কোথায় থাকত? মুসলমানরা তো সবই নষ্ট ক'রে ফেলত। ভারতীয় সমাজ স্থিতিশীল কবে দেখেছ? এ সমাজ সর্বদাই গতিশীল। কখন কখন, যেমন বিজাতীয় আক্রমণের সময়, এই গতি খুব মৃদু হয়েছিল, অন্য সময়ে আবার দ্রুত। আমি আমার স্বদেশীদের এই কথা বলি। আমি তাদের গাল দিই না। আমি অতীতের দিকে দেখি। আর দেখতে পাই, দেশ-কাল-অবস্থা বিবেচনা করলে কোন জাতই এর চেয়ে মহৎ কর্ম করতে পারত না। আমি বলি, তোমরা বেশ করেছ, এখন আরও ভাল করবার চেষ্টা কর।'

'জাতিবিভাগের সঙ্গে কর্মকাণ্ডের সম্বন্ধ বিষয়ে আপনার কি মত, স্বামীজী?'

'জাতিবিভাগ-প্রণালীও ক্রমাগত বদলাচ্ছে, ক্রিয়াকাণ্ডও ক্রমাগত বদলাচ্ছে। কেবল মূল তত্ত্ব বদলাচ্ছে না। আমাদের ধর্ম কি, জানতে গেলে বেদ পড়তে হবে। বেদ ছাড়া আর সব শাস্ত্রই যুগভেদে বদলে যাবে। বেদের শাসন নিত্য। অন্যান্য শাস্ত্রের শাসন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ। যেমন কোন স্মৃতি এক যুগের জন্য, আর একটি স্মৃতি আর এক যুগের জন্য। বড় বড় মহাপুরুষ অবতারেরা সর্বদাই আসছেন, আর কিভাবে কাজ করতে হবে, দেখিয়ে যাচ্ছেন। কয়েকজন মহাপুরুষ নিম্নজাতির উন্নতির চেষ্টা ক'রে গেছেন। কেউ কেউ, যেমন মধ্বাচার্য, নারীদের বেদ পড়বার অধিকার

দিয়েছেন। জাতিবিভাগ কখনও যেতে পারে না, তবে মাঝে মাঝে একে নূতন ছাঁচে ঢালতে হবে। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার ভেতর এমন প্রাণশক্তি আছে, যাতে দু-লক্ষ নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গঠিত হ'তে পারে। জাতি-বিভাগ উঠিয়ে দেবার ইচ্ছা করাও পাগলামি মাত্র। পুরাতনেরই নব বিবর্তন বা বিকাশ—এই হ'ল নূতন কার্যপ্রণালী।'

'হিন্দুদের কি সমাজসংস্কারের দরকার নেই?'

'খুব আছে। প্রাচীনকালে মহাপুরুষেরা উন্নতির নূতন নূতন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতেন, আর রাজারা আইন ক'রে সেগুলি চালিয়ে দিতেন। প্রাচীনকালে ভারতে এই-রকম করেই সমাজের উন্নতি হ'ত। বর্তমান কালে এইভাবে সামাজিক উন্নতি করতে গেলে এমন একটি শক্তি চাই, যার কথা লোকে নেবে। এখন হিন্দু রাজা নেই, এখন লোকদের নিজেদেরই সমাজের সংস্কার, উন্নতি প্রভৃতির চেষ্টা করতে হবে। সুতরাং যতদিন না লোকে শিক্ষিত হয়ে নিজেদের অভাব বোঝে, আর নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে প্রস্তুত ও সমর্থ হয়, ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কোন সংস্কারের সময় সংস্কারের পক্ষে লোক খুব অল্পই পাওয়া যায়, এর চেয়ে আর দুঃখের বিষয় কিছু হ'তে পারে না। এই জন্য কেবল কতকগুলি কাল্পনিক সংস্কারে—যা কখন কার্যে পরিণত হবে না, তাতে বৃথা শক্তিক্ষয় না ক'রে আমাদের উচিত একেবারে মূল থেকে প্রতিকারের চেষ্টা করা—এমন একদল লোক তৈরি করা, যারা নিজেদের আইন নিজেরাই করবে। অর্থাৎ এর জন্যে লোকদের শিক্ষা দিতে হবে—তাতে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান ক'রে নেবে। তা না হ'লে এ-সব সংস্কার আকাশকুসুমই থেকে যায়। নূতন প্রণালী হ'ল নিজেদের দ্বারা নিজেদের উন্নতি সাধন। এটি কাজে পরিণত করতে সময় লাগবে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে; কারণ, প্রাচীনকালে এখানে বরাবরই রাজার অব্যাহত শাসন ছিল।'

'আপনি কি মনে করেন, হিন্দুসমাজ ইওরোপীয় সমাজের রীতিনীতি গ্রহণ ক'রে কৃতকার্য হ'তে পারে?'

'না, সম্পূর্ণরূপে নয়। আমি বলি যে, গ্রীক মন—যা ইওরোপীয় জাতির বহির্মুখ শক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে—তার সঙ্গে হিন্দু মন মিলিত হ'লে ভারতের পক্ষে আদর্শ সমাজ হবে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, মিছামিছি শক্তিক্ষয়,

আর দিনরাত কতকগুলো বাজে কাল্পনিক বিষয়ে বাক্যব্যয় না ক'রে ইংরেজদের কাছ থেকে আজ্ঞামাত্র নেতার আদেশ-পালন, ঈর্ষাহীনতা, অদম্য অধ্যবসায় ও নিজেতে অনন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে শেখা আমাদের পক্ষে বিশেষ দরকার। একজন ইংরেজ কাকেও নেতা বলে স্বীকার করলে তাকে সব অবস্থায় মেনে চলবে, সব অবস্থায় তার আজ্ঞাধীন হবে। ভারতে সবাই নেতা হ'তে চায়, হুকুম তামিল করবার কেউ নেই। সকলেরই উচিত, হুকুম করবার আগে হুকুম তামিল করতে শেখা। আমাদের ঈর্ষার অন্ত নেই; হিন্দুর পদমর্যাদা যত বাড়ে ঈর্ষাও তত বাড়ে। যতদিন না এই ঈর্ষা দ্বেষ দূর হয় এবং নেতার আজ্ঞাবহতা হিন্দুরা শেখে ততদিন একটা সমাজ-সংহতি হতেই পারে না, ততদিন আমরা এই-রকম ছত্রভঙ্গ হয়ে থাকব, কিছুই করতে পারব না। ইওরোপের কাছ থেকে ভারতকে শিখতে হবে—বহিঃপ্রকৃতি জয়, আর ভারতের কাছ থেকে ইওরোপকে শিখতে হবে—অন্তঃপ্রকৃতি জয়। তা হ'লে আর হিন্দু, ইওরোপীয় ব'লে কিছু থাকবে না; উভয়-প্রকৃতিজয়ী এক আদর্শ মনুষ্যসমাজ গঠিত হবে। আমরা মনুষ্যত্বের একদিক, ওরা আর একদিক বিকাশ করেছে। এই দুইটির মিলনই দরকার। মুক্তি, যা আমাদের ধর্মের মূলমন্ত্র, তার প্রকৃত অর্থ দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সব রকম স্বাধীনতা।'

'স্বামীজী, ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ?'

'ক্রিয়াকাণ্ড হচ্ছে ধর্মের 'কিণ্ডারগার্টেন' বিদ্যালয়। জগতের এখন যে অবস্থা, তাতে ওটি এখনও পুরোপুরি আবশ্যক। তবে লোককে নূতন নূতন অনুষ্ঠান দিতে হবে। কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তির উচিত, এই কাজের ভার লওয়া। পুরাতন ক্রিয়াকাণ্ডগুলি উঠিয়ে দিতে হবে, নূতন নূতন আচার অনুষ্ঠান প্রবর্তন করতে হবে।'

'তবে আপনি ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে উঠিয়ে দিতে বলেন না, দেখছি।'

'না, আমার মূলমন্ত্র গঠন, বিনাশ নয়। বর্তমান ক্রিয়াকাণ্ড থেকে নূতন নূতন ক্রিয়াকাণ্ড করতে হবে। সব বিষয়েরই অনন্ত উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে—এই আমার বিশ্বাস। একটা পরমাণুর পেছনে সমগ্র জগতের শক্তি রয়েছে। হিন্দুজাতির ইতিহাসে বরাবর—কখনই বিনাশের চেষ্টা হয়নি, গঠনেরই চেষ্টা হয়েছে। এক সম্প্রদায় বিনাশের চেষ্টা করেন, তার ফলে ভারত থেকে

বহির্ভূত হলেন—তাঁদের নাম বৌদ্ধ। আমাদের শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি অনেক সংস্কারক হয়েছেন। তাঁরা সকলেই খুব বড় দরের সংস্কারক ছিলেন—তাঁরা সর্বদা গঠনই করেছিলেন, তাঁরা যে দেশ-কাল অনুসারে সমাজ গঠন করেছিলেন, সে হ'ল আমাদের কার্যপ্রণালীর বিশেষত্ব। আমাদের আধুনিক সংস্কারকেরা ইওরোপীয় ধ্বংসমূলক সংস্কার চালাতে চেষ্টা করেন—এতে কারও কোন উপকার হয়নি, হবেও না। কেবল একজন মাত্র আধুনিক সংস্কারক গঠনকারী ছিলেন—রাজা রামমোহন রায়। হিন্দু জাতি বরাবরই বেদান্তের আদর্শ কার্যে পরিণত করার চেষ্টা ক'রে চলেছে। সৌভাগ্যই হউক, আর দুর্ভাগ্যই হউক, সব অবস্থায় বেদান্তের এই আদর্শকে কার্যে পরিণত করবার প্রাণপণ চেষ্টাই—ভারতীয়দের জীবনের সমগ্র ইতিহাস। যখনই এমন কোন সংস্কারক সম্প্রদায় বা ধর্ম উঠেছে, যারা বেদান্তের আদর্শ ছেড়ে দিয়েছে, তারা তৎক্ষণাৎ একেবারে মুছে গেছে।'

'আপনার এখানকার কার্যপ্রণালী কিরূপ?'

'আমি আমার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করবার জন্য দুটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চাই—একটি মান্দ্রাজে, আর একটি কলকাতায়। আর আমার সঙ্কল্প সংক্ষেপে বলতে গেলে এই বলতে হয় যে, বেদান্তের আদর্শ প্রত্যেকের জীবনে পরিণত করবার চেষ্টা—তা তিনি সাধুই হোন, অসাধুই হোন, জ্ঞানীই হোন, অজ্ঞানই হোন, ব্রাহ্মণই হোন আর চণ্ডালই হোন।'

এইবার আমাদের প্রতিনিধি ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তার কোন উত্তর পাবার আগেই ট্রেন মান্দ্রাজের এগমোর স্টেশনের প্লাটফর্মে লাগলো। এইটুকু মাত্র স্বামীজীর মুখ থেকে শোনা গেল, ভারত ও ইংলণ্ডের সমস্যাগুলিকে রাজনীতির সঙ্গে জড়ানোর তিনি ঘোর বিরোধী।

পাশ্চাত্যে প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রচার

['মাদ্রাজ টাইমস্', ফেব্রুআরি, ১৮৯৭]

গত শনিবার আমাদের পত্রের জনৈক ভারতীয় প্রতিনিধি পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার ধর্মপ্রচারের সফলতার বিবরণ জানিবার জন্য স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য সাঙ্কেতিক লেখনবিৎ মিঃ গুডউইন মহাপুরুষের সহিত আমাদের প্রতিনিধির পরিচয় করাইয়া দিলেন। তিনি তখন একখানি সোফায় বসিয়া সাধারণ লোকের মতো জলযোগ করিতেছিলেন। স্বামীজী আমাদের প্রতিনিধিকে অতি ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করিয়া পার্শ্ববর্তী একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলেন। স্বামীজী গৈরিক-বসন-পরিহিত, তাঁহার আকৃতি ধীর স্থির শান্ত মহিমাব্যঞ্জক। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন যে-কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে প্রস্তুত। আমাদের প্রতিনিধি সাঙ্কেতিক-লিপি দ্বারা স্বামীজীর কথাগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন, আমরা এস্থলে তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামীজী, আপনার বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি কি?'

স্বামীজী বলিলেন (তাঁহার উচ্চারণে একটু বাঙালী ধাঁজ পাওয়া যায়): কলিকাতায় বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকাল হইতেই আমার প্রকৃতি ধর্মপ্রবণ ছিল। তখনই সকল জিনিস পরীক্ষা করিয়া লওয়া আমার স্বভাব ছিল—শুধু কথায় আমার তৃপ্তি হইত না। কিছুকাল পরেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়া তাঁহার নিকটেই আমি ধর্ম শিক্ষা করি। তাঁহার দেহত্যাগের পর আমি ভারতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলাম এবং কলিকাতায় একটি ক্ষুদ্র মঠ স্থাপন করিলাম। ভ্রমণ করিতে করিতে আমি মাদ্রাজে আসি, এবং মহীশূরের স্বর্গীয় রাজা এবং রামনাদের রাজার নিকট সাহায্য লাভ করি।

'আপনি পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে গেলেন কেন?'

'আমার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইয়াছিল। আমার মতে আমাদের জাতীয় অবনতির মূল কারণ—অপরাপর জাতির সহিত না মেশা। উহাই

অবনতির একমাত্র কারণ। পাশ্চাত্যের সহিত আমরা কখনও পরস্পরের ভাবের তুলনামূলক আলোচনা করিবার সুযোগ পাই নাই। আমরা কূপমণ্ডুক হইয়া গিয়াছিলাম।'

'আপনি পাশ্চাত্য দেশে বোধ হয় অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন?'

'আমি ইওরোপের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি—জার্মানি এবং ফ্রান্সেও গিয়াছি, তবে ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেই ছিল আমার প্রধান কার্যক্ষেত্র। প্রথমটা আমি একটু মুশকিলে পড়িয়াছিলাম। তাহার কারণ, ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা সে-সব দেশে গিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ভারতের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন। আমার কিন্তু চিরকাল ধারণা, ভারতবাসীই সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা নীতিপরায়ণ ও ধার্মিক জাতি। সেজন্য হিন্দুর সহিত অন্য কোন জাতিরই ঐ বিষয়ে তুলনা করাটা সম্পূর্ণ ভুল। সাধারণের নিকট হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্য প্রথম প্রথম অনেকে আমার ভয়ানক নিন্দাবাদ আরম্ভ করিয়াছিল এবং আমার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যাকথারও সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা বলিত, আমি জুয়াচোর, আমার এক-আধটি নয়—অনেকগুলি স্ত্রী ও একপাল ছেলে আছে। কিন্তু ঐ-সকল ধর্মপ্রচারক সম্বন্ধে যতই আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, ততই তাহারা ধর্মের নামে যে কতদূর অধর্ম করিতে পারে, সে-বিষয়ে আমার চোখ খুলিয়া গেল। ইংলণ্ডে ঐরূপ মিশনরীর উৎপাত কিছুমাত্র ছিল না। উহাদের কেহই সেখানে আমার সঙ্গে লড়াই করিতে আসে নাই। আমেরিকায় কেহ কেহ আমার নামে গোপনে নিন্দা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু লোকে তাহাদের কথা শুনিতে চাহে নাই; কারণ আমি তখন লোকের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছি। যখন পুনরায় ইংলণ্ডে আসিলাম, তখন ভাবিয়াছিলাম, জনৈক মিশনরী সেখানেও আমার বিরুদ্ধে লাগিবে, কিন্তু 'ট্রুথ' পত্রিকা তাহাকে চুপ করাইয়া দিল। ইংলণ্ডের সমাজবন্ধন ভারতের জাতিবিভাগ অপেক্ষাও কঠোরতর। ইংলিশ চার্চের সদস্যেরা সকলেই ভদ্রবংশ জাত—মিশনরীদের অধিকাংশই কিন্তু তাহা নহে। চার্চের সদস্যেরা আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, প্রায় ত্রিশ জন ইংলিশ চার্চের প্রচারক ধর্মবিষয়ক নানা বিষয়ে আমার সহিত সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু দেখিয়াছি, ইংলণ্ডের প্রচারক বা পুরোহিতেরা ঐ-সকল বিষয়ে আমার সহিত মতভেদ

থাকা সত্ত্বেও কখন গোপনে আমার নিন্দাবাদ করেন নাই। ইহাতে আমার আনন্দ ও বিস্ময় উভয়ই হইয়াছিল। ইহাই জাতিবিভাগ ও বংশপরম্পরাগত শিক্ষার গুণ।'

'আপনি পাশ্চাত্য দেশে ধর্মপ্রচারে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন?'

'আমেরিকার অনেক লোকে—ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী লোকে—আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে। নিম্নজাতীয় মিশনরীগণের নিন্দা সেখানে আমার কাজের সহায়তাই করিয়াছিল। আমেরিকা পৌঁছিবার কালে আমার কাছে টাকাকড়ি বিশেষ ছিল না। ভারতের লোকে আমার কেবল যাইবার ভাড়াটা মাত্র দিয়াছিল। অতি অল্প দিনে তাহা খরচ হইয়া যায়, সেজন্য এখানে যেমন সেখানেও তেমনি সাধারণের উপর নির্ভর করিয়াই আমাকে বাস করিতে হইয়াছিল। মার্কিনেরা বড়ই অতিথিবৎসল। আমেরিকার এক-তৃতীয়াংশ লোক খ্রীষ্টান। অবশিষ্টের কোন ধর্ম নাই, অর্থাৎ তাহারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নয়; কিন্তু তাহাদের মধ্যেই বিশিষ্ট ধার্মিক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বোধ হয়, ইংলণ্ডে আমার যেটুকু কাজ হইয়াছে, তাহা পাকা হইয়াছে। আমি যদি কাল মরিয়া যাই এবং কাজ চালাইবার জন্য সেখানে কোন সন্ন্যাসী পাঠাইতে না পারি, তাহা হইলেও ইংলণ্ডের কাজ চলিবে। ইংরেজ খুব ভাল লোক। বাল্যকাল হইতেই তাহাকে সমুদয় ভাব চাপিয়া রাখিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরেজের মস্তিষ্ক একটু মোটা, ফরাসী বা মার্কিনের মতো চট করিয়া সে কোন জিনিস ধরিতে পারে না, কিন্তু ভারী দৃঢ়কর্মী। মার্কিন জাতির বয়স এখনও এমন হয় নাই যে, তাহারা ত্যাগের মাহাত্ম্য বুঝিবে। ইংলণ্ড শত শত যুগ ধরিয়া বিলাসিতা ও ঐশ্বর্য ভোগ করিয়াছে—সেজন্য সেখানে অনেকেই এখন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। প্রথমবার ইংলণ্ডে গিয়া যখন আমি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করি, তখন আমার ক্লাসে বিশ-ত্রিশ জন মাত্র ছাত্র আসিত। সেখান হইতে আমার আমেরিকা চলিয়া যাওয়ার পরেও ক্লাস চলিতে থাকে। পরে পুনরায় যখন আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলাম, তখন আমি ইচ্ছা করিলেই এক সহস্র শ্রোতা পাইতাম। আমেরিকায় উহা অপেক্ষাও অনেক অধিক শ্রোতা পাইতাম, কারণ আমি আমেরিকায় তিন বৎসর ও ইংলণ্ডে মাত্র এক বৎসর কাটাইয়াছিলাম। ইংলণ্ডে একজন ও আমেরিকায় একজন

সন্ন্যাসী রাখিয়া আসিয়াছি। অন্যান্য দেশেও প্রচারকার্যের জন্য আমার সন্ন্যাসী পাঠাইবার ইচ্ছা আছে।'

'ইংরেজ জাতি বড় কঠোর কর্মী। তাহাদিগকে যদি একটা ভাব দিতে পারা যায়, অর্থাৎ ঐ ভাবটি যদি তাহারা যথার্থই ধরিয়া থাকে, তবে নিশ্চিত জানিবেন, উহা বৃথা যাইবে না। এদেশের লোকে এখন বেদে জলাঞ্জলি দিয়াছে; সমুদয় ধর্ম ও দর্শন এখন এদেশে রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে। 'ছুঁৎমার্গ'ই ভারতের বর্তমান ধর্ম—এ ধর্ম ইংরেজ কোন কালেই লইবে না। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তাসমূহ এবং তাঁহারা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক জগতে যে অপূর্ব তত্ত্বসমূহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক জাতিই গ্রহণ করিবে। ইংলিশ চার্চের বড় বড় মাতব্বররা বলিতেন, আমার চেষ্টায় বাইবেলের ভিতর বেদান্তের ভাব প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আধুনিক হিন্দুধর্ম আমাদের প্রাচীন ধর্মের অবনত ভাবমাত্র। পাশ্চাত্য দেশে আজকাল যে-সকল দার্শনিক গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে এমন একখানিও নাই, যাহাতে আমাদের বৈদান্তিক ধর্মের কিছু-না-কিছু প্রসঙ্গ নাই। হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থে পর্যন্ত ঐরূপ আছে। এখন দর্শনরাজ্যে অদ্বৈতবাদেরই সময় আসিয়াছে। সকলেই এখন উহার কথা বলে। তবে ইওরোপের লোকেরা নিজেদের মৌলিকত্ব দেখাইতে চায়। এদিকে হিন্দুদের প্রতি তাহারা অতিশয় ঘৃণা প্রকাশ করে, কিন্তু আবার হিন্দুদের প্রচারিত সত্যগুলি লইতেও ছাড়ে না। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার একজন পুরা বৈদান্তিক। তিনি বেদান্তের জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। তিনি পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাস করেন।'

'আপনি ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য কি করিতে ইচ্ছা করেন?'

'আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতিক আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না। ঐ-সকল জাতি আমাদের শিক্ষার জন্য—রাজকররূপে—পয়সা দিয়াছে। আমাদের ধর্মলাভের জন্য—শারীরিক পরিশ্রমে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই-সকলের বিনিময়ে তাহারা চিরকাল লাথিই খাইয়া

আসিয়াছে। তাহারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের ক্রীতদাস হইয়া আছে। ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদিগকে অবশ্যই কাজ করিতে হইবে। আমি যুবকগণকে ধর্মপ্রচারকরূপে শিক্ষিত করিবার জন্য প্রথমে দুইটি কেন্দ্রীয় শিক্ষালয় বা মঠ স্থাপন করিতে চাই—একটি মান্দ্রাজে ও অপরটি কলিকাতায়। কলিকাতারটি স্থাপন করিবার মতো টাকার জোগাড় আমার আছে। আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ইংরেজরাই—বিদেশীরাই টাকা দিবে।

'উদীয়মান যুবকসম্প্রদায়ের উপরেই আমার বিশ্বাস। তাহাদের ভিতর হইতেই আমি কর্মী পাইব। তাহারাই সিংহবিক্রমে দেশের যথার্থ উন্নতিকল্পে সমুদয় সমস্যা পূরণ করিবে। বর্তমানে অনুষ্ঠেয় আদর্শটিকে আমি একটি সুনির্দিষ্ট আকারে ব্যক্ত করিয়াছি এবং উহা কার্যতঃ সফল করিবার জন্য আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি। যদি আমি ঐ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ না করি, তাহা হইলে আমার পরে আমা অপেক্ষা কোন মহত্তর ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ করিয়া উহা কার্যে পরিণত করিবেন। আমি উহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। আমার মতে দেশের সর্বসাধারণকে তাহাদের অধিকার প্রদান করিলেই বর্তমান ভারতের সমস্যাগুলির সমাধান হইবে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতের ধর্মই শ্রেষ্ঠ, অথচ দেশের সর্বসাধারণকে কেবল কতকগুলা ভুয়া জিনিস দিয়াই আমরা চিরকাল ভুলাইয়া রাখিয়াছি। সম্মুখে অফুরন্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত থাকিতেও আমরা তাহাদিগকে নালার জলমাত্র পান করিতে দিয়াছি। দেখুন না, মান্দ্রাজের গ্রাজুয়েটগণ একজন নিম্নজাতীয় লোককে স্পর্শ পর্যন্ত করিবেন না, কিন্তু নিজেদের শিক্ষার সহায়তাকল্পে তাহাদের নিকট হইতে রাজকর বা অন্য কোন উপায়ে টাকা লইতে প্রস্তুত। আমি প্রথমেই ধর্মপ্রচারকগণের শিক্ষার জন্য পূর্বোক্ত দুইটি শিক্ষালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি, এখানে সর্বসাধারণকে অধ্যাত্ম ও লৌকিক বিদ্যা—দুই-ই শেখানো হইবে। শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রচারকগণ এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রে ছড়াইয়া পড়িবে—এইরূপে ক্রমে আমরা সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িব। আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজন—নিজের উপর বিশ্বাসী হওয়া; এমন কি, ভগবানে বিশ্বাস করিবারও পূর্বে সকলকে আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হইবে। দুঃখের বিষয়, ভারতবাসী আমরা দিন দিন এই আত্মবিশ্বাস হারাইতেছি। সংস্কারকগণের বিরুদ্ধে আমার ঐ জন্যই এত আপত্তি। গোঁড়াদের ভাব

অপরিণত হইলেও তাহাদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাস অনেক বেশী। সেজন্য তাহাদের মনে তেজও বেশী। কিন্তু এখানকার সংস্কারকেরা ইওরোপীয়-দিগের হাতের পুতুল-মাত্র হইয়া তাহাদের অহমিকার পোষকতাই করিয়া থাকে। অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় আমাদের দেশের জনসাধারণ দেবতাস্বরূপ। ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে দারিদ্র্য পাপ বলিয়া গণ্য নহে। নিম্নবর্ণের ভারতবাসীদেরও শরীর দেখিতে সুন্দর—তাহাদের মনেরও কমনীয়তা যথেষ্ট। কিন্তু অভিজাত আমরা তাহাদিগকে ক্রমাগত ঘৃণা করিয়া আসার দরুনই তাহারা আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছে। তাহারা মনে করে, তাহারা দাস হইয়াই জন্মিয়াছে। ন্যায্য অধিকার পাইলেই তাহারা নিজেদের উপর নির্ভর করিবে এবং উঠিয়া দাঁড়াইবে। জনসাধারণকে ঐরূপে অধিকার প্রদান করাই মার্কিন সভ্যতার মহত্ত্ব। হাঁটুভাঙা, অর্ধাশনক্লিষ্ট, হাতে একটা ছোট ছড়ি ও এক পুঁটলি কাপড়-চোপড় লইয়া সবে মাত্র জাহাজ হইতে আমেরিকায় নামিতেছে, এমন একজন আইরিশম্যানের আকৃতির সহিত কয়েক মাস আমেরিকায় বাসের পর তাহার আকৃতির তুলনা করুন। দেখিবেন, তাহার সেই সভয় ভাব গিয়াছে—সে সদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কারণ, সে এমন দেশ হইতে আসিয়াছিল, যেখানে নিজেকে দাস বলিয়া জানিত; এখন এমন স্থানে আসিয়াছে, যেখানে সকলেই পরস্পর ভাই ভাই ও সমানাধিকারপ্রাপ্ত।

'বিশ্বাস করিতে হইবে যে আত্মা অবিনাশী, অনন্ত ও সর্বশক্তিমান্। আমার বিশ্বাস, গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে গুরুগৃহবাসেই প্রকৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না আসিলে কোনরূপ শিক্ষাই হইতে পারে না। আমাদের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা ধরুন। পঞ্চাশ বৎসর হইল ঐগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ফল কি দাঁড়াইয়াছে? ঐগুলি একজনও মৌলিকভাবসম্পন্ন মানুষ তৈরি করিতে পারে নাই। এগুলি শুধু পরীক্ষাকেন্দ্ররূপে দণ্ডায়মান। সাধারণের কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের ভাব আমাদের ভিতর এখনও কিছুমাত্র বিকশিত হয় নাই।'

'মিসেস বেস্যাণ্ট ও থিওজফি সম্বন্ধে আপনার কি মত?'

'মিসেস বেস্যাণ্ট খুব ভাল লোক। আমি তাঁহার লণ্ডনের লজে[১] বক্তৃতা দিতে আহূত হইয়াছিলাম। সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি

১ Lodge—বক্তৃতাগৃহ

না। তবে আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান বড় অল্প। তিনি এদিক ওদিক হইতে একটু আধটু ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম আলোচনা করিবার অবসর তাঁহার হয় নাই। তবে তিনি যে একজন অকপট মহিলা, এ-কথা তাঁহার পরম শত্রুও স্বীকার করিবে। ইংলণ্ডে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা বলিয়া পরিগণিত। তিনি একজন 'সন্ন্যাসিনী'। কিন্তু 'মহাত্মা' 'কুথুমি' প্রভৃতিতে আমি বিশ্বাসী নহি। তিনি থিওজফিক্যাল সোসাইটির সংস্রব ছাড়িয়া দিন এবং নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া যাহা সত্য মনে করেন, তাহা প্রচার করুন।'

সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কথা পাড়িলে স্বামীজী বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে নিজের মত এইভাবে প্রকাশ করিলেন, 'আমি এখনও এমন কোন জাতি দেখি নাই, যাহার উন্নতি বা শুভাশুভ তাহার বিধবাগণের পতিসংখ্যার উপর নির্ভর করে।'

আমাদের প্রতিনিধি জানিতেন, কয়েক ব্যক্তি স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নীচের তলায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি যে সংবাদপত্রের তরফ হইতে এইরূপ উৎপীড়ন সহ্য করিতে অনুগ্রহপূর্বক সম্মত হইয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আমাদের প্রতিনিধি এইবার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

জাতীয় ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের পুনর্বোধন

['প্রবুদ্ধ ভারত', সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮]

সম্প্রতি 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র জনৈক প্রতিনিধি কতকগুলি বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তিনি সেই আচার্যশ্রেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করেন—

'স্বামীজী, আপনার মতে আপনার ধর্মপ্রচারের বিশেষত্ব কি?'

স্বামীজী প্রশ্ন শুনিবামাত্র উত্তর করিলেন, 'পরব্যূহভেদ (aggression); অবশ্য এই শব্দ কেবল আধ্যাত্মিক অর্থেই ব্যবহার করিতেছি। অন্যান্য সমাজ ও সম্প্রদায় ভারতের সর্বত্র প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধের পর আমরাই

প্রথম ভারতের সীমা লঙ্ঘন করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিতেছি।'

'ভারতের পক্ষে আপনার ধর্মান্দোলন কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিবে বলিয়া আপনি মনে করেন?'

'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি আবিষ্কার করা এবং জাতীয় চেতনা জাগ্রত করিয়া দেওয়া। বর্তমানকালে 'হিন্দু' বলিতে ভারতের তিনটি সম্প্রদায় বুঝায়—প্রথম গোঁড়া বা গতানুগতিক সম্প্রদায়; দ্বিতীয় মুসলমান আমলের সংস্কারক-সম্প্রদায়সমূহ এবং তৃতীয় আধুনিক সংস্কারক-সম্প্রদায়সমূহ। আজকাল দেখি, উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সকল হিন্দু কেবল একটি বিষয়ে একমত—গোমাংস-ভোজনে সকল হিন্দুরই আপত্তি।'

'বেদবিশ্বাসে কি সকলেই একমত নহে?

'মোটেই না। ঠিক এইটিই আমরা পুনরায় জাগাইতে চাই। ভারত এখনও বুদ্ধের ভাব আত্মসাৎ করিতে পারে নাই। বুদ্ধের বাণী শুনিয়া প্রাচীন ভারত মুগ্ধই হইয়াছিল, নব বলে সঞ্জীবিত হয় নাই।'

'বর্তমানকালে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আপনি কি কি বিষয়ে প্রতিভাত দেখিতেছেন?'

'বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তো সর্বত্রই জাজ্বল্যমান। আপনি দেখিবেন ভারত কখন কোন কিছু পাইয়া হারায় না, কেবল উহা আয়ত্ত করিতে—নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে সময়ের প্রয়োজন হয়। বুদ্ধ যজ্ঞে প্রাণিবধের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন, ভারত সেই ভাব আর ফেলিয়া দিতে পারে নাই। বুদ্ধ বলিলেন, 'গো-বধ করিও না'; এখন দেখুন আমাদের পক্ষে গো-বধ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'

'স্বামীজী, আপনি পূর্বে যে তিন সম্প্রদায়ের নাম করিলেন, তন্মধ্যে আপনি নিজেকে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন?'

স্বামীজী বলিলেন, 'আমি সকল সম্প্রদায়ের। আমরাই সনাতন হিন্দু।'

এই কথা বলিয়াই তিনি সহসা প্রবল আবেগভরে ও গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'কিন্তু ছুঁৎমার্গের সহিত আমাদের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। উহা হিন্দুধর্ম নহে, উহা আমাদের কোন শাস্ত্রে নাই। উহা প্রাচীন আচারের অননুমোদিত একটি কুসংস্কার—আর চিরদিনই উহা জাতীয় অভ্যুদয়ে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।'

'তাহা হইলে আপনি আসলে চান জাতীয় অভ্যুদয়?'

'নিশ্চয়। ভারত কেন সমগ্র আর্যজাতির পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে, তাহার কি কোন যুক্তি আপনি নির্দেশ করিতে পারেন? ভারত কি বুদ্ধিবৃত্তিহীন?—কলাকৌশলে হীন? উহার শিল্প, উহার গণিত, উহার দর্শনের দিকে দেখিলে আপনি কি উহাকে কোন বিষয়ে হীন বলিতে পারেন? কেবল প্রয়োজন এইটুকু যে, তাহাকে মোহনিদ্রা হইতে—শত শত শতাব্দী-ব্যাপী দীর্ঘ নিদ্রা হইতে—জাগিতে হইবে এবং পৃথিবীর সমগ্র জাতির মধ্যে তাহাকে তাহার প্রকৃত স্থান গ্রহণ করিতে হইবে।'

'কিন্তু ভারত চিরদিনই গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। উহাকে কার্য-কুশল করিবার চেষ্টা করিতে গেলে উহা নিজের একমাত্র সম্বল—ধর্মরূপ পরম ধন হারাইতে পারে, আপনার এরূপ আশঙ্কা হয় না কি?'

'কিছুমাত্র না। অতীতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এতদিন ধরিয়া ভারতে আধ্যাত্মিক বা অন্তর্জীবন এবং পাশ্চাত্যদেশে বাহ্য জীবন বা কর্মকুশলতা বিকাশ পাইয়া আসিয়াছে। এ পর্যন্ত উভয়ে বিপরীত পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল; এখন উভয়ের সম্মিলন-কাল উপস্থিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস গভীর-অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু বহির্জগতেও তাঁহার মতো কর্মতৎপরতা আর কাহার আছে? ইহাই রহস্য। জীবন—সমুদ্রের মতো গভীর হইবে বটে, আবার আকাশের মতো বিশাল হওয়াও চাই।'

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'আশ্চর্যের বিষয়, অনেক সময় দেখা যায়, বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি সঙ্কীর্ণতার পরিপোষক ও উন্নতির প্রতিকূল হইলেও আধ্যাত্মিক জীবন খুব গভীরভাবে বিকশিত হইয়াছে। কিন্তু এই দুই বিপরীত ভাবের পরস্পর একত্র অবস্থান আকস্মিক মাত্র, অপরিহার্য নহে। আর যদি আমরা ভারতে ইহার সমাধান করিতে পারি, তবে সমগ্র জগৎও ঠিক পথে চলিবে। কারণ, মূলে আমরা সকলেই কি এক নহি?'

'স্বামীজী, আপনার শেষ মন্তব্যগুলি শুনিয়া আর একটি প্রশ্ন মনে উদিত হইতেছে। এই প্রবুদ্ধ হিন্দুধর্মে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায়?'

স্বামীজী বলিলেন, 'এ বিষয়ের মীমাংসার ভার আমার নহে। আমি কখন কোন ব্যক্তিবিশেষকে প্রচার করি নাই। আমার নিজের জীবন এই

মহাত্মার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাভক্তিবশে পরিচালিত, কিন্তু অপরে আমরাই এই ভাব কতদূর গ্রহণ করিবে, তাহা তাহারা নিজেরাই স্থির করিবে। যতই বড় হউক, কেবল একটি নির্দিষ্ট জীবনখাত দিয়াই চিরকাল পৃথিবীতে ঐশীশক্তি-স্রোত প্রবাহিত হয় না। প্রত্যেক যুগকে নূতন করিয়া আবার ঐ শক্তি লাভ করিতে হইবে। আমরা কি সকলেই ব্রহ্মস্বরূপ নহি?'

'ধন্যবাদ। আপনাকে আর একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আছে। আপনি স্বজাতির জন্য আপনার প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এইভাবে আপনার কর্মপদ্ধতি এখন বর্ণনা করিবেন কি?'

স্বামীজী বলিলেন, 'আমাদের কার্যপ্রণালী অতি সহজেই বর্ণিত হইতে পারে। ঐ প্রণালী আর কিছুই নহে,—কেবল জাতীয় জীবনাদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল, ছয় শতাব্দী যাইতে না যাইতে সে তাহার সর্বোচ্চ গৌরবশিখরে আরোহণ করিল। ইহাই রহস্য। 'ত্যাগ ও সেবাই' ভারতের জাতীয় আদর্শ—ঐ দুইটি বিষয়ে উহাকে উন্নত করুন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যাহা কিছু আপনা হইতেই উন্নত হইবে। এদেশে ধর্মের পতাকা যতই উচ্চে তুলিয়া ধরা হউক, কিছুতেই পর্যাপ্ত হয় না। কেবল ইহার উপরেই ভারতের উদ্ধার নির্ভর করিতেছে।'

ভারতীয় নারী—তাহাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

['প্রবুদ্ধ ভারত', ডিসেম্বর, ১৮৯৮]

ভারতের নারীগণের অবস্থা ও অধিকার এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জন্য হিমালয়ের একটি সুন্দর উপত্যকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। স্বামীজীর নিকট যখন আমার আগমনের উদ্দেশ্য বিবৃত করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, 'চলুন, একটু বেড়াইয়া আসা যাক।' তখনই আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম।

কিছুক্ষণ পরে তিনি মৌনভঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'নারীর সম্বন্ধে আর্য ও সেমেটিক আদর্শ চিরদিনই সম্পূর্ণ বিপরীত! সেমাইটদের মধ্যে

স্ত্রীলোকের উপস্থিতি উপাসনার ঘোর বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত। তাহাদের মতে স্ত্রীলোকের কোনরূপ ধর্মকর্মে অধিকার নাই, এমন কি, আহারের জন্ত পক্ষী বলি দেওয়াও তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। আর্যদের মতে সহধর্মিণী ব্যতীত পুরুষ কোন ধর্মকার্য করিতে পারে না।'

আমি এইরূপ অপ্রত্যাশিত ও স্পষ্ট কথায় আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলাম, 'কিন্তু স্বামীজী, হিন্দুধর্ম কি আর্যধর্মেরই অঙ্গবিশেষ নহে ?'

স্বামীজী ধীরে ধীরে বলিলেন, 'আধুনিক হিন্দুধর্ম পৌরাণিক-ভাববহুল, অর্থাৎ উহার উৎপত্তিকাল বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী। দয়ানন্দ সরস্বতী দেখাইয়া দিয়াছেন : গার্হপত্য অগ্নিতে আহুতিদানরূপ বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যে সহধর্মিণী ব্যতীত হইতে পারে না, তাহারই আবার শালগ্রামশিলা অথবা গৃহদেবতাকে স্পর্শ করিবার অধিকার নাই ; ইহার কারণ এই যে, এই-সকল পূজা পরবর্তী পৌরাণিক যুগ হইতে প্রচলিত হইয়াছে।'

'তাহা হইলে আমাদের মধ্যে নরনারীর যে অধিকারবৈষম্য দেখা যায়, তাহা আপনি সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবসম্ভূত বলিয়া মনে করেন ?'

স্বামীজী বলিলেন, 'যদি কোথাও বাস্তবিকই অধিকারবৈষম্য থাকে, সে-ক্ষেত্রে আমি ঐরূপই মনে করি। পাশ্চাত্য সমালোচনার আকস্মিক স্রোতে এবং তুলনায় পাশ্চাত্য নারীদের অবস্থাবৈষম্য দেখিয়াই যেন আমরা আমাদের দেশে নারীদের হীন দশা অতি সহজেই মানিয়া না লই। বহু শতাব্দীর বহু ঘটনা-বিপর্যয়ের দ্বারা নারীদিগকে একটু আড়ালে রাখিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের সামাজিক রীতিনীতি পরীক্ষা করিতে হইবে, স্ত্রীজাতির হীন অবস্থা বিচার করিয়া নহে।'

'তাহা হইলে স্বামীজী, আমাদের সমাজে নারীগণের বর্তমান অবস্থায় কি আপনি সন্তুষ্ট ?'

স্বামীজী বলিলেন, 'না, কখনই নহে। কিন্তু নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার শুধু তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত ; নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতা-লাভে সমর্থ।'

'আপনি নারীজাতির অধিকারবৈষম্যের কারণ বলিয়া বৌদ্ধধর্মের উপরে দোষারোপ করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, বৌদ্ধধর্ম কিরূপে নারীজাতির অবনতির কারণ হইল?'

স্বামীজী বলিলেন, 'সেই কারণের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময় ঘটিয়াছিল। প্রত্যেক আন্দোলনেই কোন অসাধারণ বিশেষত্ব থাকে বলিয়াই তাহার জয় ও অভ্যুদয় হয়, কিন্তু আবার উহার অবনতির সময়, যাহা লইয়া তাহার গৌরব, তাহাই তাহার দুর্বলতার প্রধান উপাদান হয়। নরশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধের সম্প্রদায়গঠন ও পরিচালন-শক্তি অদ্ভুত ছিল, আর ঐ শক্তিতে তিনি জগৎ জয় করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ধর্ম কেবল সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের উপযোগী ধর্ম। তাহা হইতে এই অশুভ ফল হইল যে, সন্ন্যাসীর ভেক্ পর্যন্ত সম্মানিত হইতে লাগিল। আবার তিনিই সর্বপ্রথম মঠপ্রথা অর্থাৎ এক ধর্মসঙ্ঘে বাস করিবার প্রথা প্রবর্তিত করিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নারীজাতিকে পুরুষ অপেক্ষা নিম্নাধিকার দিতে হইল, যেহেতু বড় বড় মঠাধ্যক্ষাও নির্দিষ্ট মঠাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। ইহাতে উদ্দিষ্ট আশু ফললাভ, অর্থাৎ তাঁহার ধর্মসঙ্ঘের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল সুদূর ভবিষ্যতে ইহার যে ফল হইয়াছিল, তাহারই জন্য অনুশোচনা করিতে হয়।'

'কিন্তু বেদে তো সন্ন্যাসের বিধি আছে?'

'অবশ্যই আছে, কিন্তু সে-সময় ঐ বিষয়ে নরনারীর কোন প্রভেদ করা হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্যকে জনক-রাজার সভায় কিরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহা আপনার স্মরণ আছে তো?[১] তাঁহার প্রধান প্রশ্নকর্ত্রী ছিলেন বাক্‌পটু কুমারী বাচক্নবী। সেকালে এইরূপ মহিলাকে 'ব্রহ্মবাদিনী' বলা হইত। তিনি বলিয়াছিলেন, আমার এই প্রশ্নদ্বয় দক্ষ ধানুকের হস্তস্থিত দুইটি শাণিত তীরের ন্যায়; এই স্থলে তাঁহার নারীত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন তোলা হয় নাই। আমাদের প্রাচীন আরণ্য শিক্ষাকেন্দ্রে বালকবালিকার যে সমানাধিকার ছিল, তদপেক্ষা অধিকতর সাম্য আর কি হইতে পারে? আমাদের সংস্কৃত নাটকগুলি পড়ুন—শকুন্তলার উপাখ্যান পড়ুন, তারপর দেখুন—টেনিসনের 'প্রিন্সেস্' হইতে আমাদের নূতন কিছু শিখিবার আছে কি না।'

১ বৃহদারণ্যক উপ,—৩।৮

'আপনি বড় অদ্ভুতরূপে আমাদের অতীতের মহিমা-গৌরব সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারেন।'

স্বামীজী শান্তভাবে বলিলেন—'হাঁ, তাহার কারণ সম্ভবতঃ আমি জগতের দুইটি দিকই দেখিয়াছি। আর আমি জানি, যে-জাতি সীতা-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে—ঐ চরিত্র যদি কাল্পনিকও হয়, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, নারীজাতির উপর সেই জাতির যেরূপ শ্রদ্ধা, জগতে তাহার তুলনা নাই। পাশ্চাত্য মহিলাদের জন্য আইনের যে-সব বজ্রবাঁধন আছে, আমাদের দেশের লোক সে-সব জানেও না। আমাদের নিশ্চয়ই অনেক দোষ আছে, আমাদের সমাজে অনেক অন্যায়ও আছে, কিন্তু এই-সকল উহাদেরও আছে। আমাদের এটি কখন বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, সমগ্র জগতে প্রেম কোমলতা ও সাধুতা বাহিরের কার্যে ব্যক্ত করিবার একটা সাধারণ চেষ্টা চলিয়াছে, আর বিভিন্ন জাতীয় প্রথাগুলির দ্বারা যতটা সম্ভব ঐ-ভাব প্রকাশ করা হইয়া থাকে। গার্হস্থ্য ধর্ম সম্বন্ধে আমি এ-কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, অন্যান্য দেশের প্রথাসমূহ অপেক্ষা ভারতীয় প্রথাসমূহের নানাভাবে অধিকতর উপযোগিতা রহিয়াছে।'

'তবে স্বামীজী, আমাদের মেয়েদের কোনরূপ সমস্যা আদৌ আছে কি—যাহার মীমাংসা প্রয়োজন?'

'অবশ্যই আছে—অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নাই, 'শিক্ষা' এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে। প্রকৃত শিক্ষার ধারণা কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে উদিত হয় নাই।'

'তাহা হইলে আপনি প্রকৃত শিক্ষার কি সংজ্ঞা দিবেন?'

স্বামীজী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'আমি কখন কোন-কিছুর সংজ্ঞা নির্দেশ করি না। তথাপি এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে যে, শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শেখা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির—শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে; অথবা বলা যাইতে পারে—শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিকে এমন ভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং সফল হয়। এই ভাবে শিক্ষিতা হইলে ভারতের কল্যাণসাধনে সমর্থ নির্ভীক মহীয়সী নারীর অভ্যুদয় হইবে। তাঁহারা সঙ্ঘমিত্রা, লীলা, অহল্যাবাঈ ও মীরাবাঈ-এর পদাঙ্ক-অনুসরণে সমর্থ হইবেন, তাঁহারা পবিত্র স্বার্থশূন্য বীর হইবেন।

ভগবানের পাদপদ্মস্পর্শে যে বীর্য লাভ হয়, তাঁহারা সেই বীর্য লাভ করিবেন, সুতরাং তাঁহারা বীরপ্রসবিনী হইবার যোগ্যা হইবেন।'

'তাহা হইলে স্বামীজী, শিক্ষার ভিতর ধর্মশিক্ষাও কিছু থাকা উচিত, আপনি মনে করেন।'

স্বামীজী গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়া মনে করি। এটি কিন্তু মনে রাখিবেন যে, আমি আমার নিজের বা অপর কাহারও ধর্মসম্বন্ধে মতামতকে 'ধর্ম' বলিতেছি না। আমার বিবেচনায় অন্যান্য বিষয়ে যেমন, এ বিষয়েও তেমনি শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীর ভাব ও ধারণানুযায়ী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন এবং তাহাকে উন্নত করিবার এমন সহজ পথ দেখাইয়া দিবেন, যাহাতে তাহাকে খুব কম বাধা পাইতে হয়।'

'কিন্তু ধর্মের দৃষ্টিতে যাঁহারা ব্রহ্মচর্যকে বাড়াইয়া জননী ও সহধর্মিণীর সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, এবং ব্রহ্মচারিণীদিগকে উচ্চাসন দেন, তাঁহারা নারীর উন্নতিতে নিশ্চয় স্পষ্ট আঘাত করিয়াছেন।'

স্বামীজী বলিলেন—'আপনার স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ধর্ম যদি নারীর পক্ষে ব্রহ্মচর্যকে উচ্চাসন দিয়া থাকে, পুরুষজাতির পক্ষেও ঠিক তাহাই করিয়াছে। আরও আপনার প্রশ্ন শুনিয়া বোধ হইতেছে, এ বিষয়ে আপনার নিজের মনেও যেন একটু কি গোলমাল আছে। হিন্দুধর্ম মানবাত্মার পক্ষে একটি—কেবল একটি কর্তব্য নির্দেশ করিয়া থাকেন,—অনিত্যের মধ্যে নিত্যবস্তু সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা। কিন্তু ইহা কিরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহার একমাত্র পন্থা নির্দেশ করিতে কেহই সাহসী হন না। বিবাহ বা ব্রহ্মচর্য, ভাল বা মন্দ, বিদ্যা বা মূর্খতা—যে-কোন বিষয় ঐ চরম লক্ষ্যে লইয়া যাইবার সহায়তা করে, তাহারই সার্থকতা আছে। এই বিষয়ে হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভেদ বর্তমান। কারণ বৌদ্ধধর্মের প্রধান উপদেশ—বহির্জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি, আর মোটামুটি বলিতে গেলে ঐ উপলব্ধি একটিমাত্র উপায়েই সাধিত হইতে পারে। মহাভারতের সেই অল্পবয়স্ক যোগীর কথা আপনার কি মনে পড়ে? ইনি ক্রোধজাত তীব্র ইচ্ছাশক্তিবলে এক কাক ও বকের দেহ ভস্ম করিয়া নিজ যোগবিভূতিতে স্পর্ধান্বিত হইয়াছিলেন, তারপর নগরে গিয়া প্রথমে রুগ্ন পতির শুশ্রূষাকারিণী এক নারীর সহিত, পরে ধর্মব্যাধের সহিত

তাঁহার সাক্ষাৎ হইল—যাঁহারা উভয়েই কর্তব্যনিষ্ঠারূপ সাধারণ মার্গে থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ?'[১]

'তাহা হইলে আপনি এদেশের নারীগণকে কি বলিতে চান ?'

'কেন, আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, নারীগণকে ঠিক তাহাই বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধো, ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর, আর স্মরণ রাখিও, আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে বটে, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের অপরকে দিবার জিনিস সহস্রগুণ বেশী আছে।'

হিন্দুধর্মের সীমানা

['প্রবুদ্ধ ভারত', এপ্রিল, ১৮৯৯]

আমাদের প্রতিনিধি লিখিতেছেন, অন্যধর্মাবলম্বীকে হিন্দুধর্মে আনা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জন্য সম্পাদকের আদেশে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের পোস্তার নিকট নৌকা লাগাইয়াছি। স্বামীজী মঠ হইতে নৌকায় আসিয়া আমার সহিত কথাবার্তা কহিতে আসিলেন। গঙ্গাবক্ষে নৌকার ছাদে বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথনের সুযোগ মিলিল।

আমিই প্রথমে কথা বলিলাম, 'স্বামীজী, যাহারা হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে হিন্দুধর্মে পুনর্গ্রহণ-বিষয়ে আপনার মতামত কি জানিবার জন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আপনার কি মত, তাহাদিগকে আবার গ্রহণ করা যাইতে পারে ?'

স্বামীজী বলিলেন, 'নিশ্চয়। তাহাদের অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে, করা উচিতও।'

১ মহাভারত, বনপর্ব, ধর্মব্যাধ উপাখ্যান ; এই গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডে 'কর্মযোগে' গল্পটি বিবৃত।

তিনি মুহূর্তকাল গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'আর এক কথা তাহাদিগকে পুনর্গ্রহণ না করিলে আমাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে। যখন মুসলমানেরা প্রথমে এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন প্রাচীনতম মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে ভারতে ৬০ কোটি হিন্দু ছিল, এখন আমরা বিশ কোটিতে পরিণত হইয়াছি। আর, কোন লোক হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিলে সমাজে শুধু যে একটি লোক কম পড়ে তাহা নয়, একটি করিয়া শত্রু বৃদ্ধি হয়!

'তারপর আবার হিন্দুধর্মত্যাগী মুসলমান বা খ্রীষ্টানের মধ্যে অধিকাংশই তরবারিবলে ঐ সব ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, অথবা যাহারা ইতিপূর্বে ঐরূপ করিয়াছে, তাহাদেরই বংশধর। ইহাদিগের হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আসিবার পক্ষে নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করা বা প্রতিবন্ধকতা করা স্পষ্টতই অন্যায়। আর যাহারা কোনকালে হিন্দুসমাজভুক্ত ছিল না, তাহাদের সম্বন্ধেও কি আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? দেখুন না, অতীতকালে এইরূপ লক্ষ লক্ষ বিধর্মীকে হিন্দুধর্মে আনা হইয়াছে আর এখনও সেরূপ চলিতেছে।

'আমার নিজের মত এই যে, ভারতের আদিবাসিগণ, বহিরাগত জাতিসমূহ এবং মুসলমানাধিকারের পূর্ববর্তী আমাদের প্রায় সকল বিজেতৃবর্গের পক্ষেই ঐ কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, পুরাণসমূহে যে-সকল জাতির বিশেষ উৎপত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। আমার মতে তাহারা অন্যধর্মী ছিল, তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লওয়া হইয়াছে।

'যাঁহারা ইচ্ছাপূর্বক ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এখন হিন্দুসমাজে ফিরিয়া আসিতে চায়, তাহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত-ক্রিয়া আবশ্যক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাদিগকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছিল— যেমন কাশ্মীর ও নেপালে অনেককে দেখা যায়, অথবা যাহারা কখন হিন্দু ছিল না, এখন হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা করা উচিত নহে।'

সাহসপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, 'স্বামীজী, কিন্তু ইহারা কোন্ জাতি হইবে? তাহাদের কোন-না-কোনরূপ জাতি থাকা আবশ্যক, নতুবা তাহারা

কখন বিশাল হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইতে পারিবে না। হিন্দুসমাজে তাহাদের যথার্থ স্থান কোথায়?'

স্বামীজী ধীরভাবে বলিলেন, 'যাহারা পূর্বে হিন্দু ছিল, তাহারা অবশ্য তাহাদের জাতি ফিরিয়া পাইবে। আর যাহারা নূতন, তাহারা নিজের জাতি নিজেরাই করিয়া লইবে।'

তিনি আরও বলিতে লাগিলেন, 'স্মরণ রাখিবেন, বৈষ্ণবসমাজে ইতিপূর্বেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং অহিন্দু ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন জাতি হইতে যাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, সকলেই বৈষ্ণব সমাজের আশ্রয় লাভ করিয়া নিজেদেরই একটা জাতি গঠন করিয়া লইয়াছিল, আর সে জাতি বড় হীন জাতি নহে, বেশ ভদ্র জাতি। রামানুজ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলাদেশে শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত সকল বড় বড় বৈষ্ণব আচার্যই ইহা করিয়াছেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই নূতন যাহারা আসিবে, তাহাদের বিবাহ কোথায় হইবে?'

স্বামীজী স্থিরভাবে বলিলেন, 'এখন যেমন চলিতেছে, নিজেদের মধ্যেই।'

আমি বলিলাম, 'তারপর নামের কথা। আমার বোধ হয়, অহিন্দু এবং যে-সব স্বধর্মত্যাগী অহিন্দু নাম লইয়াছিল, তাহাদের নূতন নামকরণ করা উচিত। তাহাদিগকে কি জাতিসূচক নাম বা আর কোনপ্রকার নাম দেওয়া যাইবে?'

স্বামীজী চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, 'অবশ্য নামের অনেকটা শক্তি আছে বটে।'

কিন্তু তিনি এই বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিলেন না। কিন্তু তারপর আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে তাঁহার আগ্রহ যেন উদ্দীপ্ত হইল। প্রশ্ন করিলাম—'স্বামীজী, এই নবাগন্তুকগণ কি হিন্দুধর্মের বিভিন্নপ্রকার শাখা হইতে নিজেদের ধর্মপ্রণালী নিজেরাই নির্বাচন করিয়া লইবে অথবা আপনি তাহাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট ধর্মপ্রণালী নির্বাচন করিয়া দিবেন?'

স্বামীজী বলিলেন, 'এ-কথা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়? তাহারা আপনাপন পথ নিজেরা বাছিয়া লইবে। কারণ নিজে নির্বাচন করিয়া না লইলে হিন্দুধর্মের মূলভাবটিই নষ্ট করা হয়। আমাদের ধর্মের সার এইটুকু যে, প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্ট-নির্বাচনের অধিকার আছে।'

আমি এই কথাটি বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিলাম। কারণ আমার বোধ হয়, আমার সমুখস্থ এই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিকভাবে ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহের আলোচনায় অনেকদিন কাটাইয়াছেন আর ইষ্ট-নির্বাচনের স্বাধীনতারূপ তত্ত্বটি এত উদার যে, সমগ্র জগৎকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

১

[মঠের দৈনন্দিন লিপি হইতে সংগৃহীত]

প্র। গুরু কাকে বলতে পারা যায়?

উ। যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ ব'লে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু। দেখ না, আমার গুরু আমার ভূত-ভবিষ্যৎ ব'লে দিয়েছিলেন।

প্র। ভক্তিলাভ কিরূপে হবে?

উ। ভক্তি তোমার ভিতরেই রয়েছে, কেবল তার উপর কাম-কাঞ্চনের একটা আবরণ পড়ে আছে। ঐ আবরণটা সরিয়ে দিলে সেই ভিতরকার ভক্তি আপনিই প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

প্র। আপনি ব'লে থাকেন, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও; এখানে নিজের বলতে কি বুঝব?

উ। অবশ্য পরমাত্মার উপরই নির্ভর করতে বলা আমার উদ্দেশ্য। তবে এই 'কাঁচা আমি'র উপর নির্ভর করবার অভ্যাস করলেও ক্রমে তা আমাদের ঠিক জায়গায় নিয়ে যায়, কারণ জীবাত্মা সেই পরমাত্মারই মায়িক প্রকাশ বই আর কিছুই নয়।

প্র। যদি এক বস্তুই যথার্থ সত্য হয়, তবে এই দ্বৈতবোধ—যা সদাসর্বদা সকলের হচ্ছে, তা কোথা থেকে এল?

উ। বিষয় যখন প্রথম অনুভূত হয়, ঠিক সে-সময় কখন দ্বৈতবোধ হয় না। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়-সংযোগ হবার পর যখন আমরা সেই জ্ঞানকে

বুদ্ধিতে আরূঢ় করাই, তখনই দ্বৈতবোধ এসে থাকে। বিষয়ানুভূতির সময় যদি দ্বৈতবোধ থাকত, তবে জ্ঞেয় জ্ঞাতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে এবং জ্ঞাতাও জ্ঞেয় থেকে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করতে পারত।

প্র। সামঞ্জস্যপূর্ণ চরিত্রগঠনের প্রকৃষ্ট উপায় কি?

উ। যাঁদের চরিত্র সেইভাবে গঠিত হয়েছে, তাঁদের সঙ্গ করাই এর সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

প্র। বেদ সম্বন্ধে আমাদের কিরূপ ধারণা রাখা কর্তব্য?

উ। বেদই একমাত্র প্রমাণ—অবশ্য বেদের যে অংশগুলি যুক্তিবিরোধী সেগুলি বেদ-শব্দবাচ্য নহে। অন্যান্য শাস্ত্র যথা পুরাণাদি—ততটুকু গ্রাহ্য, যতটুকু বেদের অবিরোধী। বেদের পরে জগতের যে-কোন স্থানে যে-কোন ধর্মভাবের আবির্ভাব হয়েছে, তা বেদ থেকে নেওয়া বুঝতে হবে।

প্র। এই যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—চারিযুগের বিষয় শাস্ত্রে পড়া যায়, ইহা কি কোনরূপ জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনাসম্মত অথবা কাল্পনিক মাত্র?

উ। বেদে তো এইরূপ চতুর্যুগের কোন উল্লেখ নেই, এটা পৌরাণিক যুগের ইচ্ছামত কল্পনামাত্র।

প্র। শব্দ ও ভাবের মধ্যে বাস্তবিক কি কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে, না যে-কোন শব্দের দ্বারা যে-কোন ভাব বোঝাতে পারা যায়? মানুষ কি ইচ্ছামত যে-কোন শব্দে যে-কোন ভাব জুড়ে দিয়েছে?

উ। বিষয়টিতে অনেক তর্ক উঠতে পারে, স্থির সিদ্ধান্ত করা বড় কঠিন। বোধ হয় যেন, শব্দ ও ভাবের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সেই সম্বন্ধ যে নিত্য, তাই বা কেমন ক'রে বলা যায়? দেখ না, একটা ভাব বোঝাতে বিভিন্ন ভাষায় কত রকম বিভিন্ন শব্দ রয়েছে। কোনরূপ সূক্ষ্ম সম্বন্ধ থাকতে পারে, যা আমরা এখনও ধরতে পারছি না।

প্র। ভারতের কার্যপ্রণালী কি ধরনের হওয়া উচিত?

উ। প্রথমতঃ সকলে যাতে কাজের লোক হয় এবং তাদের শরীরটা যাতে সবল হয়, তেমন শিক্ষা দিতে হবে। এই রকম বারো জন পুরুষসিংহ জগৎ জয় করবে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভেড়ার পালের দ্বারা তা হবে না। দ্বিতীয়তঃ যত বড়ই হোক না কেন, কোন ব্যক্তির আদর্শ অনুকরণ করতে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়।

প্র। রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের পুনরুত্থানকার্যে কোন্ অংশ গ্রহণ করবে?

উ। এই মঠ থেকে সব চরিত্রবান্ লোক বেরিয়ে সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিকতার বন্যায় প্লাবিত করবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও উন্নতি হ'তে থাকবে। এইরূপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির অভ্যুদয় হবে, শূদ্রজাতি আর থাকবে না। তারা যে-সব কাজ এখন করছে, সে-সব যন্ত্রের দ্বারা হবে। ভারতের বর্তমান অভাব—ক্ষত্রিয়শক্তি।

প্র। মানুষের জন্মান্তরে কি পশ্বাদি নীচযোনি হওয়া সম্ভব?

উ। খুব সম্ভব। পুনর্জন্ম কর্মের উপর নির্ভর করে। যদি লোকে পশুর মতো কাজ করে, তবে সে পশুযোনিতে আকৃষ্ট হবে।

প্র। মানুষ আবার পশুযোনি প্রাপ্ত হবে কিরূপে, তা বুঝতে পারছি না। ক্রমবিকাশের নিয়মে সে যখন একবার মানবদেহ পেয়েছে, তখন সে আবার কিরূপে পশুযোনিতে জন্মাবে?

উ। কেন, পশু থেকে যদি মানুষ হ'তে পারে, মানুষ থেকে পশু হবে না কেন? একটা সত্তাই তো বাস্তবিক আছে—মূলে তো সবই এক।

প্র। কুণ্ডলিনী বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ আমাদের স্থূলদেহের মধ্যে আছে কি?

উ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, যোগীরা যাকে পদ্ম বলেন, বাস্তবিক তা মানবের দেহে নেই। যোগাভ্যাসের দ্বারা ঐগুলির উৎপত্তি হয়ে থাকে।

প্র। মূর্তিপূজার দ্বারা কি মুক্তি লাভ হ'তে পারে?

উ। মূর্তিপূজার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে মুক্তি হ'তে পারে না—তবে মূর্তি মুক্তিলাভের গৌণ কারণস্বরূপ, ঐ পথের সহায়ক। মূর্তিপূজার নিন্দা করা উচিত নয়, কারণ অনেকের পক্ষে মূর্তি অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধির জন্য মনকে প্রস্তুত ক'রে দেয়—ঐ অদ্বৈতজ্ঞান-লাভেই মানব মুক্ত হ'তে পারে।

প্র। আমাদের চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ কি হওয়া উচিত?

উ। ত্যাগ।

প্র। আপনি বলেন, বৌদ্ধধর্ম তার দায়স্বরূপ ভারতে ঘোর অবনতি আনয়ন করেছিল—এটি কি ক'রে হ'ল?

উ। বৌদ্ধেরা প্রত্যেক ভারতবাসীকে সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী করবার চেষ্টা করেছিল। সকলে তো আর তা হ'তে পারে না। এইভাবে যে-সে

ভিক্ষু হওয়াতে তাদের ভেতরে ক্রমশঃ ত্যাগের ভাব কমে আসতে লাগলো। আর এক কারণ—ধর্মের নামে তিব্বত ও অন্যান্য দেশের বর্বর আচার-ব্যবহারের অনুকরণ। ঐ-সব জায়গায় ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে তাদের ভেতর ওদের দূষিত সব আচারগুলি ঢুকল। তারা শেষে ভারতে সেগুলি চালিয়ে দিলে।

প্র। মায়া কি অনাদি অনন্ত ?

উ। সমষ্টিভাবে ধরলে অনাদি অনন্ত বটে, ব্যষ্টিভাবে কিন্তু সান্ত।

প্র। মায়া কি ?

উ। বস্তু প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র আছে—তাকে জড় বা চৈতন্য যে নামেই অভিহিত কর না কেন। কিন্তু ওদের মধ্যে একটি ছেড়ে আর একটিকে ভাবা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব। এটাই মায়া বা অজ্ঞান।

প্র। মুক্তি কি ?

উ। মুক্তি অর্থে পূর্ণ স্বাধীনতা—ভালমন্দ উভয়ের বন্ধন থেকেই মুক্ত হওয়া। লোহার শিকলও শিকল, সোনার শিকলও শিকল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—পায়ে একটা কাঁটা ফুটলে সেই কাঁটা তুলতে আর একটা কাঁটার প্রয়োজন হয়। কাঁটা উঠে গেলে দুটো কাঁটাই ফেলে দেওয়া হয়। এইরূপ সৎপ্রবৃত্তির দ্বারা অসৎপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করতে হবে, তারপর কিন্তু সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে পর্যন্ত জয় করতে হবে।

প্র। ভগবৎকৃপা ছাড়া কি মুক্তিলাভ হ'তে পারে ?

উ। মুক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নেই। মুক্তি আমাদের ভেতর আগে থেকেই রয়েছে।

প্র। আমাদের মধ্যে যাকে 'আমি' বলা যায়, তা যে দেহাদি থেকে উৎপন্ন নয়, তার প্রমাণ কি ?

উ। অনাত্মার মতো 'আমি'ও দেহমনাদি থেকেই উৎপন্ন। প্রকৃত 'আমি'র অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।

প্র। প্রকৃত জ্ঞানী এবং প্রকৃত ভক্তই বা কাকে বলা যায় ?

উ। প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই, যাঁর হৃদয়ে অগাধ প্রেম বিদ্যমান আর যিনি সর্বাবস্থাতে অদ্বৈততত্ত্ব সাক্ষাৎ করেন। আর তিনিই প্রকৃত ভক্ত, যিনি জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে অভেদ ভাবে উপলব্ধি ক'রে অন্তরে প্রকৃত জ্ঞান-সম্পন্ন হয়েছেন এবং সকলকেই ভালবাসেন, সকলের জন্য যাঁর প্রাণ

কাঁদে। জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যে একটির পক্ষপাতী এবং অপরটির বিরোধী, সে জ্ঞানীও নয়, ভক্তও নয়—চোর, ঠক।

প্র। ঈশ্বরের সেবা করবার কি দরকার?

উ। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব একবার স্বীকার কর, তবে তাঁকে সেবা করবার যথেষ্ট কারণ পাবে। সকল শাস্ত্রের মতে ভগবৎসেবা অর্থে স্মরণ। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও, তবে তোমার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে স্মরণ করবার হেতু উপস্থিত হবে।

প্র। মায়াবাদ কি অদ্বৈতবাদ থেকে কিছু আলাদা?

উ। না—একই। মায়াবাদ ব্যতীত অদ্বৈতবাদের কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়।

প্র। ঈশ্বর অনন্ত; তিনি মানুষরূপ ধরে এতটুকু হন কি ক'রে?

উ। সত্য বটে ঈশ্বর অনন্ত, কিন্তু তোমরা যেভাবে অনন্ত মনে ক'রছ অনন্ত মানে তা নয়। তোমরা অনন্ত বলতে একটা খুব প্রকাণ্ড জড়সত্তা মনে ক'রে গুলিয়ে ফেলছ। ভগবান্ মানুষরূপ ধরতে পারেন না বলতে তোমরা বুঝছ—একটা খুব প্রকাণ্ড জড়ধর্মী পদার্থকে এতটুকু করতে পারা যায় না। কিন্তু ঈশ্বর ও-হিসাবে অনন্ত নন—তাঁর অনন্তত্ব চৈতন্যের অনন্তত্ব। সুতরাং তিনি মানবাকারে আপনাকে অভিব্যক্ত করলেও তাঁর স্বরূপের কোন হানি হয় না।

প্র। কেহ কেহ বলেন, আগে সিদ্ধ হও, তারপর তোমার কার্যে অধিকার হবে; আবার কেহ কেহ বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম করা উচিত। এই দুটি বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য কিরূপে হ'তে পারে?

উ। তোমরা দুটি বিভিন্ন জিনিসে গোল ক'রে ফেলছ। কর্ম মানে মানবজাতির সেবা বা ধর্মপ্রচারকার্য। প্রকৃত প্রচারে অবশ্য সিদ্ধ পুরুষ ছাড়া আর কারও অধিকার নেই। কিন্তু সেবাতে সকলেরই অধিকার আছে; শুধু তা নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অপরের সেবা নিচ্ছি, ততক্ষণ আমরা অপরকে সেবা করতে বাধ্য।

২

[ব্রুকলিন নৈতিক সভা, ব্রুকলিন, আমেরিকা]

প্র। আপনি বলেন, সবই মঙ্গলের জন্য; কিন্তু দেখিতে পাই, জগতে অমঙ্গল দুঃখ কষ্ট চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। আপনার ঐ মতের সঙ্গে এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপারের আপনি কিভাবে সামঞ্জস্য করিবেন?

উ। যদি প্রথমে আপনি অমঙ্গলের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন, তবেই আমি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। কিন্তু বৈদান্তিক ধর্ম অমঙ্গলের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। সুখের সহিত অসংযুক্ত অনন্ত দুঃখ থাকিলে তাহাকে অবশ্য প্রকৃত অমঙ্গল বলিতে পারা যায়। কিন্তু যদি সাময়িক দুঃখকষ্ট হৃদয়ের কোমলতা ও মহত্ত্ব বিধান করিয়া মানুষকে অনন্ত সুখের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়, তবে তাহাকে আর অমঙ্গল বলা চলে না—বরং উহাকেই পরম মঙ্গল বলিতে পারা যায়। আমরা কোন জিনিসকে মন্দ বলিতে পারি না, যতক্ষণ না আমরা অনন্তের রাজ্যে উহার পরিণাম কি দাঁড়ায়, তাহার অনুসন্ধান করি।

ভূত বা পিশাচোপাসনা হিন্দুধর্মের অঙ্গ নহে। মানবজাতি ক্রমোন্নতির পথে চলিয়াছে, কিন্তু সকলেই একরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে নাই। সেইজন্য দেখা যায়, পার্থিব জীবনে কেহ কেহ অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা মহত্তর ও পবিত্রতর। প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহার বর্তমান উন্নতিক্ষেত্রের সীমার মধ্যে নিজেকে উন্নত করিবার সুযোগ বিদ্যমান। আমরা নিজেদের নষ্ট করিতে পারি না, আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবনীশক্তিকে নষ্ট বা দুর্বল করিতে পারি না, কিন্তু উহাকে বিভিন্ন দিকে পরিচালিত করিবার স্বাধীনতা আমাদের আছে।

প্র। জাগতিক জড় পদার্থের সত্যতা কি কেবল আমাদের নিজ মনেরই কল্পনা নহে?

উ। আমার মতে বাহ্য জগতের অবশ্যই একটা সত্তা আছে—আমাদের মনের চিন্তার বাহিরেও উহার একটা অস্তিত্ব আছে। সমগ্র প্রপঞ্চ চৈতন্যের ক্রমবিকাশরূপ মহান্ বিধানের বশবর্তী হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই চৈতন্যের ক্রমবিকাশ জড়ের ক্রমবিকাশ হইতে পৃথক্, জড়ের ক্রমবিকাশ চৈতন্যের বিকাশপ্রণালীর প্রতীকস্বরূপ, কিন্তু ঐ প্রণালীর ব্যাখ্যা করিতে পারে না। আমরা বর্তমান পার্থিব পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বদ্ধ থাকায় এখনও

অখণ্ড ব্যক্তিত্ব-পদবী লাভ করিতে পারি নাই। যে-অবস্থায় আমাদের অন্তরাত্মার পরমলক্ষণসমূহ প্রকাশার্থে আমরা উপযুক্ত যন্ত্ররূপে পরিণত হই, যতদিন না আমরা সেই উচ্চতর অবস্থা লাভ করি, ততদিন প্রকৃত ব্যক্তিত্ব-লাভ করিতে পারিব না।

প্র। যীশুখ্রীষ্টের নিকট একটি জন্মান্ধ শিশুকে আনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল: শিশুটি নিজের কোন পাপবশতঃ অথবা তাহার পিতামাতার পাপের জন্য অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছে?—আপনি এই সমস্যার কিরূপ মীমাংসা করেন?

উ। এ সমস্যার ভিতর পাপের কথা আনিবার কোন প্রয়োজন তো দেখা যাইতেছে না; তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—শিশুটির এই অন্ধতা তাহার পূর্বজন্মকৃত কোন কার্যের ফলস্বরূপ। আমার মতে এইরূপ সমস্যাগুলি কেবল পূর্বজন্ম স্বীকার করিলেই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

প্র। আমাদের আত্মা কি মৃত্যুর পর আনন্দের অবস্থা প্রাপ্ত হয়?

উ। মৃত্যু কেবল অবস্থার পরিবর্তন মাত্র। দেশ-কাল আপনার মধ্যেই বর্তমান, আপনি দেশকালের অন্তর্গত নহেন। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট যে, আমরা ইহলোকে বা পরলোকে যতই আমাদের জীবনকে পবিত্রতর ও মহত্তর করিব, ততই আমরা সেই ভগবানের সমীপবর্তী হইব, যিনি সমুদয় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও অনন্ত আনন্দের কেন্দ্রস্বরূপ।

৩

[টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি ক্লাব, বস্টন, আমেরিকা]

প্র। বেদান্ত কি মুসলমান ধর্মের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল?

উ। বেদান্তের আধ্যাত্মিক উদারতা মুসলমান ধর্মের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতের মুসলমান ধর্ম অন্যান্য দেশের মুসলমান ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। কেবল যখন মুসলমানেরা অপর দেশ হইতে আসিয়া তাহাদের ভারতীয় স্বধর্মীদের নিকট বলিতে থাকে যে, তাহারা কেমন

করিয়া বিধর্মীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে, তখনই অশিক্ষিত গোঁড়া মুসলমানের দল উত্তেজিত হইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা করিয়া থাকে।

প্র। বেদান্ত কি জাতিভেদ স্বীকার করেন?

উ। জাতিভেদ বৈদান্তিক ধর্মের বিরোধী। জাতিভেদ একটি সামাজিক প্রথা, আর আমাদের বড় বড় আচার্যেরা উহা ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সম্প্রদায়ই জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু যতই ঐরূপ প্রচার হইয়াছে, ততই জাতিভেদের নিগড় দৃঢ়তর হইয়াছে। জাতিভেদ রাজনীতিক ব্যবস্থাসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র। উহা বংশপরম্পরাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির সমবায় (Trade Guild)। কোনরূপ উপদেশ অপেক্ষা ইওরোপের সহিত বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় জাতিভেদ বেশী ভাঙিয়াছে।

প্র। বেদের বিশেষত্ব কি?

উ। বেদের একটি বিশেষত্ব এই যে, যত শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে একমাত্র বেদই বার বার বলিয়াছেন—বেদকেও অতিক্রম করিতে হইবে। বেদ বলেন, উহা কেবল অজ্ঞ শিশু-মনের জন্য লিখিত। পরিণত অবস্থায় বেদের গণ্ডি ছাড়াইয়া যাইতে হইবে।

প্র। আপনার মতে—প্রত্যেক জীবাত্মা কি নিত্য সত্য?

উ। জীবসত্তা কতকগুলি সংস্কার বা বৃত্তির সমষ্টিস্বরূপ, আর এই বৃত্তিসমূহের প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তন হইতেছে। সুতরাং উহা কখন অনন্ত-কালের জন্য সত্য হইতে পারে না। এই মায়িক জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যেই উহার সত্যতা। জীবাত্মা চিন্তা ও স্মৃতির সমষ্টি—উহা কিরূপে নিত্য সত্য হইতে পারে?

প্র। বৌদ্ধধর্ম ভারতে লোপ পাইল কেন?

উ। বৌদ্ধধর্ম ভারতে প্রকৃতপক্ষে লোপ পায় নাই। উহা কেবল একটি বিপুল সামাজিক আন্দোলন মাত্র ছিল। বুদ্ধের পূর্বে যজ্ঞার্থে এবং অন্যান্য কারণেও অনেক জীবহত্যা হইত, আর লোকে প্রচুর মদ্যপান ও মাংস ভোজন করিত। বুদ্ধের উপদেশের ফলে মদ্যপান ও জীবহত্যা ভারত হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছে।

৪

[আমেরিকার হার্টফোর্ডে 'আত্মা ঈশ্বর ও ধর্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতার শেষে শ্রোতৃবৃন্দ কয়েকটি প্রশ্ন করেন, সেই প্রশ্নগুলি ও তাহাদের উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বলিলেন—যদি খ্রীষ্টীয় ধর্মোপদেষ্টাগণ লোককে নরকাগ্নির ভয় না দেখান, তবে লোকে আর তাঁহাদের কথা মানিবে না।

উ। তাই যদি হয় তো না মানাই ভাল। যাহাকে ভয় দেখাইয়া ধর্মকর্ম করাইতে হয়, বাস্তবিক তাহার কোন ধর্মই হয় না। লোককে তাহার আসুরী প্রকৃতির কথা কিছু না বলিয়া তাহার ভিতরে যে দেবভাব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহার বিষয় উপদেশ দেওয়াই ভাল।

প্র। প্রভু (যীশুখ্রীষ্ট) 'স্বর্গরাজ্য এ জগতের নহে'—এ কথা কি অর্থে বলিয়াছিলেন?

উ। তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য ছিল যে, স্বর্গরাজ্য আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। য়াহুদীদের ধারণা ছিল যে, এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য বলিয়া একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। যীশুর সে ভাব ছিল না।

প্র। আপনি কি বিশ্বাস করেন, আমরা পূর্বে পশু ছিলাম, এখন মানব হইয়াছি?

উ। আমার বিশ্বাস, ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে উচ্চতর প্রাণিসমূহ নিম্নতর জীবসমূহ হইতে আসিয়াছে।

প্র। আপনি কি এমন কাহাকেও জানেন, যাঁহার পূর্বজন্মের কথা মনে আছে?

উ। আমার এমন কয়েক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, যাঁহারা আমাকে বলিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ আছে। তাঁহারা এমন এক অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের পূর্বজন্মের স্মৃতি উদিত হইয়াছে।

প্র। আপনি খ্রীষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া ব্যাপার কি বিশ্বাস করেন?

উ। খ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার ছিলেন—লোকে তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে নাই। যাহা তাহারা ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহা একটা ছায়ামাত্র, মরীচিকাস্বরূপ একটা ভ্রান্তিমাত্র।

প্র। যদি তিনি ঐরূপ একটা ছায়াশরীর নির্মাণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহাই কি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অলৌকিক ব্যাপার নহে?

উ। আমি অলৌকিক ঘটনাসমূহকে সত্যলাভের পথে সর্বাপেক্ষা অধিক বিঘ্ন বলিয়া মনে করি। বুদ্ধের শিষ্যগণ একবার তাঁহাকে তথাকথিত অলৌকিক ক্রিয়াকারী এক ব্যক্তির কথা বলিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি স্পর্শ না করিয়া খুব উচ্চস্থান হইতে একটি পাত্র লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধদেবকে সেই পাত্রটি দেখাইবামাত্র তিনি তাহা লইয়া পা দিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, আর তাহাদিগকে অলৌকিক ক্রিয়ার উপর ধর্মের ভিত্তি নির্মাণ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, সনাতন তত্ত্বসমূহের মধ্যে সত্যের অন্বেষণ করিতে হইবে। তিনি তাহাদিগকে যথার্থ আভ্যন্তরীণ জ্ঞানালোকের বিষয়, আত্মতত্ত্ব, আত্মজ্যোতির বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন—আর ঐ আত্মজ্যোতির আলোকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র নিরাপদ পন্থা। অলৌকিক ব্যাপারগুলি ধর্মপথের প্রতিবন্ধক মাত্র। সেগুলিকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে।

প্র। আপনি কি বিশ্বাস করেন, যীশু শৈলোপদেশ (Sermon on the Mount) দিয়াছিলেন?

উ। যীশু শৈলোপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এ বিষয়ে অপরাপর লোকে যেমন গ্রন্থের উপর নির্ভর করেন, আমাকেও তাহাই করিতে হয়; আর আমি ইহা জানি যে, কেবল গ্রন্থের প্রমাণের উপর সম্পূর্ণ আস্থা করা যাইতে পারে না। তবে ঐ শৈলোপদেশকে আমাদের জীবনের পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। আধ্যাত্মিক কল্যাণপ্রদ বলিয়া আমাদের প্রাণে যাহা লাগিবে, তাহাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। বুদ্ধ খ্রীষ্টের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাক্যাবলী প্রেম ও আশীর্বাদে পূর্ণ। কখনও তাঁহার মুখ হইতে কাহারও প্রতি একটি অভিশাপ-বাণী উচ্চারিত হয় নাই। তাঁহার জীবনে কাহারও অশুভ-অনুধ্যানের কথা শুনা যায় না। জরথুষ্ট্র বা কংফুছের মুখ হইতেও কখন অভিশাপ-বাণী নির্গত হয় নাই।

[ব্রুকলিন সভার পরিশিষ্ট হইতে সংগৃহীত]

প্র। আত্মার পুনর্দেহধারণ-সম্বন্ধীয় হিন্দু মতবাদটি কিরূপ ?

উ। বৈজ্ঞানিকদের শক্তি বা জড়-সাতত্য (Conservation of Energy or Matter) মত যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাও সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত। এই মতবাদ আমাদের দেশের জনৈক দার্শনিকই প্রথম প্রকাশ করেন। এই মতবাদের দার্শনিকেরা সৃষ্টি বিশ্বাস করিতেন না। 'সৃষ্টি' বলিলে বুঝায়—'কিছু না' হইতে 'কিছু' হওয়া। ইহা অসম্ভব। যেমন কালের আদি নাই, তেমনি সৃষ্টিরও আদি নাই। ঈশ্বর ও সৃষ্টি যেন দুইটি রেখার মতো—উহাদের আদি নাই, অন্ত নাই—উহারা নিত্য পৃথক্। সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের মত এই : উহা ছিল, আছে ও থাকিবে। পাশ্চাত্য-দেশীয়গণকে ভারত হইতে একটি বিষয় শিখিতে হইবে—পরধর্ম-সহিষ্ণুতা। কোন ধর্মই মন্দ নহে, কারণ সকল ধর্মেরই সারভাগ একই প্রকার।

প্র। ভারতের মেয়েরা তত উন্নত নহেন কেন ?

উ। বিভিন্ন যুগে যে সব অসভ্য জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, প্রধানতঃ তাহার জন্যই ভারতমহিলা অনুন্নত। কতকটা ভারতবাসীর নিজেরও দোষ।

এক সময় আমেরিকায় স্বামীজীকে বলা হইয়াছিল, হিন্দুধর্ম কখনও অন্যধর্মাবলম্বীকে নিজধর্মে আনয়ন করে না, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন : যেমন প্রাচ্যভূভাগে ঘোষণা করিবার জন্য বুদ্ধের বিশেষ এক বাণী ছিল, আমারও তেমনি পাশ্চাত্যদেশে ঘোষণা করিবার একটি বাণী আছে।

প্র। আপনি কি এদেশে (আমেরিকায়) হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানাদির প্রবর্তন করিতে ইচ্ছা করেন ?

উ। আমি কেবল দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করিতেছি।

প্র। আপনার কি মনে হয় না, যদি নরকের ভয় লোকের মন হইতে অপসারিত করা হয়, তবে তাহাদিগকে কোনরূপে শাসন করা যাইবে না ?

উ। না ; বরং আমার মনে হয়, ভয় অপেক্ষা হৃদয়ে প্রেম ও আশার সঞ্চার হইলে সে ঢের ভাল হইবে।

তথ্যপঞ্জী

তথ্যপঞ্জী

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ

গ্রন্থ-পরিচয় : ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তি-পরিচয় : ৭ম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৫ ১ 'প্রথমবার বিলাত হইতে'—স্বামীজী বিলাত হইতে ফিরিয়া ১৮৯৭ খৃঃ ১৫ই জানুআরি কলম্বোয়, ২৬শে জানুআরি ভারতের মাটিতে (রামনাদে) প্রথম পদার্পণ করেন এবং মাদ্রাজে কিছুদিন অবস্থানের পর ১৬ই ফেব্রুআরি কলিকাতা পৌছান।

৫ ১০ শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্র : শিষ্য-রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাত্মস্তবমালা' পুস্তিকার ১৮৯৫ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে রচিত প্রথম স্তোত্র।

৬ ৫ মিরর : 'Indian Mirror' ইংরেজী দৈনিক, ১৮৬১ খৃঃ কেশব সেন কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত। মনোমোহন ঘোষ ইহার প্রথম সম্পাদক। পরে নরেন্দ্রনাথ সেন ইহার সম্পাদক হন। 'মিরর' প্রথমে পাক্ষিক পত্র ছিল, পরে উহা সাপ্তাহিকে পরিণত হয় এবং ১৮৭১ খৃঃ হইতে উহা দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। স্বামীজী বিদেশে থাকাকালে তাঁহার সম্বন্ধে সংবাদ ঐ পত্রিকায় প্রায় প্রকাশিত হইত।

১০ ১০ কর্মবাদ : হিন্দুশাস্ত্রমতে পূর্বজন্মের কর্মফল ইহজীবনের এবং এই জীবনের কর্মফল ভবিষ্যৎ জীবনের সুখদুঃখ নিয়ন্ত্রিত করে।

১০ ২৭ চতুঃসাধন : ১। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক (কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি অসত্য—এই বিচার); ২। ইহামুত্রফলভোগবিরাগ (ইহলৌকিক ও স্বর্গাদির ফলভোগে অনাসক্তি); ৩। শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি (বহিরন্তর ইন্দ্রিয়-সংযম প্রভৃতি); ৪। মুমুক্ষুত্ব (মুক্তি পাইবার ইচ্ছা)।

১১ ১৬ হাইড্রলিক ব্রিজ—হুগলি নদী ও বাগবাজার খালের সংযোগস্থলে রেলওয়ে ব্রিজ। সেই সময়ে ঐ সেতুটি সম্ভবত জল-শক্তিতে চালিত হইত, এখন উহা মোটর-চালিত।

১৫ ১৪ 'করতলামলকবৎ'—হস্তস্থিত আমলকীর মতো স্পষ্ট, সম্পূর্ণ আয়ত্তে।

১৫ ২২ গীতগোবিন্দ-জয়দেব : প্রায় সাতশত বৎসর পূর্বে বর্তমান বীরভূম

পৃষ্ঠা পংক্তি

জেলার অন্তর্গত অজয় নদের তীরবর্তী কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলি-নিবাসী সংস্কৃত কবি জয়দেব। তিনি গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক। তাঁহার কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য 'গীতগোবিন্দম্' পরবর্তী কালের রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক বৈষ্ণবপদাবলীর প্রেরণা যোগাইয়াছে।

১৭ ৬ 'এই তো ইতিহাস বলছে'—ব্রহ্ম, ইন্দো-চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে হিন্দুগণ উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সুবর্ণদ্বীপে শৈলেন্দ্ররাজগণ খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতকে বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। মালয় উপদ্বীপ এবং সমগ্র ইন্দোনেশিয়া (যব, বলী, সুমাত্রা, বর্নিও প্রভৃতি) দ্বীপে ইহা বিস্তৃত ছিল। খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে আনাম (Annam) দেশে একটি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। তাহার রাজধানী ছিল চম্পা। খেমর দেশে (কাম্বোডিয়ার) কৌণ্ডিন্য নামে এক ব্রাহ্মণ রাজ্য স্থাপন করেন, উহা উত্তর কালে কম্বুজ নামে বিখ্যাত। এই-সকল দেশে সভ্যতার আলোক ভারতীয় ঔপনিবেশিক ও রাজগণই আনিয়াছিলেন। যবদ্বীপে বরবুদুর (Barabudur), কাম্বোডিয়ায় আংকোর ভাট (Angkar Vat), ব্রহ্মদেশে পাগান (Pagan) নামক স্থানে 'আনন্দ' মন্দির প্রভৃতি এখনও তাঁহাদের সভ্যতা ও শিল্পকলার উৎকর্ষের সাক্ষ্যরূপে বর্তমান।

২১ ১৭ 'তদাকারকারিত'—ইষ্টের স্বরূপতা-প্রাপ্তি, যাহার বিষয় চিন্তা করা যায়—তাহারই মতো হইয়া যাওয়া।

২৩ ২ 'কাল ১৮৯৭ (?)'—পুরাতন পঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে, ইহা ১৮৯৭ না হইয়া ১৮৯৮ হইবে। এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ১৮৯৮ খৃঃ ২২ জানুআরি মধ্যাহ্নের পর হইয়াছিল।

২৫ ১১ 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ'—কঠোপনিষদ্ ২।১।১ ; ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখী করিয়া স্রষ্টা যেন আমাদিগকে হিংসা করিয়াছেন ; ইন্দ্রিয়-গুলিকে অন্তর্মুখী করিলে তবে অন্তরাত্মার দর্শন হয়।

২৬ ২৯ 'যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি'—মুণ্ডক উপনিষদ্, ৩।১।১০

২৮ ৭ দুইটি ইংরেজ মহিলা—মিসেস সেভিয়ার ও মিস মুলার।

৩০ ৮ 'লোকসংগ্রহের জন্য'—লোকসকলকে তাহাদের নিজ নিজ ধর্মে প্রবর্তিত করা এবং তাহাদিগকে অধর্ম হইতে রক্ষা করার নাম 'লোকসংগ্রহ'।—দ্রষ্টব্য গীতা, ৩।২০, শাংকর ভাষ্য।

৩০ ২৮ 'শিয়া-সুন্নিতে লাঠালাঠি'—শিয়াগণ আলি ও আলির সন্তানগণকে হজরত মহম্মদের উত্তরাধিকারী এবং খলিফা বলিয়া মানেন। সুন্নীরা মনে করেন, যিনি নির্বাচিত হইবেন তিনিই খলিফা হইবেন; তাঁহারা আলি ও তাঁহার সন্তানদের খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন না। এই লইয়াই বিরোধ এবং কারবালার হত্যাকাণ্ডে ইহার মর্মান্তিক পরিণতি। মহরম পর্ব তাহারই বার্ষিক অনুষ্ঠান।

৩২ ১ জেন্দাবেস্তা: (Zend-Avesta) জরথুষ্ট্র-প্রবর্তিত পারসীকদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। ইহার প্রথম অংশ প্রাচীন আবেস্তান ভাষায় ও শেষ অংশ জেন্দ বা পহ্লবী ভাষায় লিখিত। শুভ ও অশুভ—এই দুই শক্তির নিয়ত সংগ্রামই এই ধর্মমতের প্রধান তত্ত্ব।

৩৪ ২২ 'কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ব্রাহ্ম সমাজ'—উত্তর কলিকাতার 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'। ছাত্রাবস্থায় 'নরেন্দ্রনাথ' এখানকার সদস্য ছিলেন।

৩৪ ২৫ 'মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী তপস্বিনী মাতা'—গঙ্গাবাঈ, মহারাষ্ট্রদেশীয়া বিদুষী মহিলা, রাজবংশীয়া কন্যা—ঝাঁসীরানীর পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ করেন, পরে নেপালে কিছুকাল তপস্যা করিয়া কলিকাতায় আসেন। দেশে ধর্মভাবহীন ও হিন্দুধর্মবিরোধী শিক্ষা দেখিয়া ১৮৯৩ খৃঃ বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টি এখন কৈলাস বসু (পুরাতন সুকিয়া) স্ট্রীটে অবস্থিত।

৩৬ ৪ গার্গী: বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত ব্রহ্মবাদিনী, বচক্নু ঋষির কন্যা; খনা—জ্যোতির্বিৎ নারী, বিক্রমাদিত্য সভার জ্যোতিষশাস্ত্র-বেত্তা মিহিরের পত্নী বলিয়া প্রসিদ্ধ; লীলাবতী—গণিতশাস্ত্রে অশেষ পারদর্শিনী, ভাস্করাচার্যের কন্যা বলিয়া কথিত।

৩৯ ৮ সায়ন বা সায়নাচার্য: বেদের ভাষ্যকার, দাক্ষিণাত্যের চোলবংশীয় বুক্কা রাজার মন্ত্রী বা সেনাপতি বলিয়া খ্যাত—ইহার অপর নাম বিদ্যারণ্য মুনি।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৩৯ ৩ 'ম্যাক্সমূলর-এর মুদ্রিত বহুসংখ্যায় সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ'—প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ও ভারতীয় ধর্মের অনুরাগী এই জার্মান পণ্ডিতের সম্পাদিত 'ঋগ্বেদ' (Sacred Books of the East Series) আজ পর্যন্ত নির্ভর-যোগ্য সংস্করণ।

৪০ ৭ 'East India Company…নগদ দিয়েছিল'—বহুশ্রমসাধ্য প্রাচীন বৈদিক পুঁথির পাঠোদ্ধার এবং তাহার প্রকাশনার জন্য ভারতের তৎকালীন শাসন-কর্তৃপক্ষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন।

৪৫ ২৬ 'মূকাস্বাদনবৎ'—নারদভক্তিসূত্র ৭।৫২। বোবা ব্যক্তি যেরূপ কোন রসযুক্ত বস্তু আস্বাদ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলেও মুখে কিছু ব্যক্ত করিতে পারে না, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের স্বাদ—অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলেও সিদ্ধ সাধক মুখে কিছু বলিতে পারেন না।

৪৬ ১৬ 'মুক্তিঃ করফলায়তে'—বিবেকচূড়ামণি, ১৮৫। মোক্ষ করতলস্থ ফলবৎ স্পষ্ট হয়, অর্থাৎ সিদ্ধ সাধক সর্বদা অনুভব করেন, তিনি সর্বপ্রকার বন্ধনবিহীন, নিত্য মুক্ত।

৫২ ৯ পরমপুরুষার্থ: পুরুষের প্রয়োজনীয় চতুর্বর্গ—ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষকে 'পুরুষার্থ' বলে। বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে পুরুষের (মানুষ বা সাধকের) চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক লক্ষ্য মোক্ষকে 'পরম পুরুষার্থ' বলা হইয়াছে।

৫৬ ১২ গোভিল গৃহ্যসূত্র: গোভিল-কৃত স্মৃতিগ্রন্থ—গৃহস্থের ধর্মকর্ম-বিবাহাদি-বিষয়ক।

৬২ ১৪ 'স্বামীজী যতদিন না পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছিলেন'—১৮৯৯ খৃঃ ২০ জুন স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য অভিমুখে যাত্রা করেন, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা সঙ্গে যান।

৬৪ ৮ 'নর ও নারায়ণ নামে'—শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত শ্রীভগবানের অবতার দুই ঋষি, ইঁহারা জগৎকল্যাণে বদরিকাশ্রমে তপস্যা করেন।

৬৫ ২৭ 'দুর্যোধনও বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, অর্জুনও'—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব লইয়া গেলে দুর্যোধন তাঁহাকে

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

বন্দী করিতে উদ্যত হন। ভগবান তখন তাঁহাকে বিশ্বরূপ দর্শন করান। দুর্যোধন মনে করেন, উহা ভেলকি। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জুন তদ্গতচিত্তে স্তব করিয়াছিলেন।—(গীতা, ১১শ অধ্যায়)।

৬৯ ১৭ 'দুঃখিনী ব্রাহ্মণী-কোলে'— গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি-সম্বন্ধীয় সঙ্গীত।

৭১ ৫ 'নীলাম্বরবাবুর বাগানে'—বেলুড়ে বর্তমান মঠবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে (১৮৯৮ খৃঃ ১৩ ফেব্রুআরি হইতে) বেলুড়ে নীলাম্বর-মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাড়ি ভাড়া লওয়া হয়। নীলাম্বর বাবু কাশ্মীরের দেওয়ান (?) ছিলেন। বাড়িটি বেলুড় মঠের দক্ষিণে অবস্থিত।

৭৩ ৭ 'কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাছ দুয়ারে'—কমলাকান্ত-বিরচিত মাতৃসঙ্গীত 'আপনাতে আপনি থেকো মন'—এই গানের শেষ চরণ। নাছ বা নাচদুয়ার—সদর দরজা।

৭৫ ২২ 'পঞ্চম পুরুষার্থ': ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটি পুরুষার্থ; ভক্তিশাস্ত্র-মতে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম বা পূর্ণ নির্ভরতা।

৭৫ ২৫ 'ঠাকুরের সেই গোহত্যা পাপের গল্প'—বাগানের ফুলগাছ নষ্ট করায় জনৈক ব্রাহ্মণ একটি গরু হত্যা করে। গোহত্যার পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে আসিলে ব্রাহ্মণ বলে, 'হস্তের অধিপতি দেবতা ইন্দ্রকে গিয়া ধর।' সব কথা শুনিয়া ইন্দ্র ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন, বাগানটির খুব সুখ্যাতি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাগান কে করিয়াছে?' ব্রাহ্মণ জানাইল, 'আমি করিয়াছি।' 'গরু কে মারিয়াছে?'—জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ ইন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার চেষ্টা করে। ইন্দ্র বলেন, যে বাগান করিয়াছে, সেই গরু মারিয়াছে। অর্থাৎ কর্তৃত্ববোধ থাকা পর্যন্ত শুভ ও অশুভ দুই কাজেরই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

৮২ ২৩ জীবন্মুক্ত অবস্থা: শরীর থাকাকালেই মুক্ত অবস্থা-লাভের নাম 'জীবন্মুক্তি'। শরীর ত্যাগের পর যে মুক্তি, তাহা 'বিদেহ মুক্তি'।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৮৩ ১৩ 'মজলো আমার মনভ্রমরা কালীপদ-নীলকমলে'—রচয়িতা সাধক কমলাকান্ত।

৮৪ ১ গুরুগোবিন্দ : গুরুগোবিন্দ শিখদিগের দশম গুরু। তাঁহার সময়ে শিখগণ মহাপরাক্রান্ত জাতিরূপে গঠিত হইয়াছিল। দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থাবলীর ৫ম খণ্ডে—পৃঃ ২৬৭

৮৭ ১৫ 'মাদ্রাজে যখন মন্মথবাবুর বাড়ীতে ছিলাম'—পরিব্রাজক অবস্থায় ১৮৯২ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজের ডেপুটি একাউণ্টেণ্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য স্বামীজীকে পণ্ডিচেরি হইতে মাদ্রাজে লইয়া আসেন। ১৮৯৩ খৃঃ ১০ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত স্বামীজী মাদ্রাজে অবস্থান করেন।

৮৮ ১৭ 'কাকতালীয়ের ন্যায়'—ন্যায়শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। গাছে কাকটি বসিবার সঙ্গে সঙ্গে তালটি পড়িল, লোকের ধারণা হইল, গাছে কাকটি বসাই বুঝি তাল পড়িবার কারণ; বাস্তবিক তাহা নহে।

৯৩ ১৬ 'হিন্দুধর্ম কি? ব'লে একটা বাঙলায় লিখতুম'—'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধ 'ভাববার কথা' পুস্তকে সন্নিবেশিত। দ্রঃ এই গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে পৃঃ ৩

৯৭ ৯ অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি : ব্যাকরণের পাণিনিসূত্র আট অধ্যায়ে বিভক্ত। মহর্ষি পতঞ্জলি-কৃত ইহার ভাষ্য 'মহাভাষ্য' নামে পরিচিত।

১০০ ৪ 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' : বেদান্তসূত্র, ৪।৪।২২ ; মুক্তপুরুষের পুনরাবৃত্তি (সংসারে পুনর্জন্ম) হয় না।

১০১ ১৪ পঞ্চদশীকার : 'পঞ্চদশী' শ্রীমদ্ ভারতীতীর্থ মুনীশ্বর বিরচিত। 'তত্ত্ব-বিবেক', 'ভূতবিবেক', 'পঞ্চকোষবিবেক', 'দ্বৈত বিবেক', 'মহাবাক্য-বিবেক' প্রভৃতি 'পঞ্চদশ' পরিচ্ছেদে বর্ণিত বেদান্তের বিশিষ্ট প্রকরণ গ্রন্থ। স্বামীজীর উদ্ধৃতিটি পঞ্চকোষবিবেক-এর ৪০-সংখ্যক শ্লোক।

১১৯ ২৬ 'গল্‌জাতের হাতে পড়ে'—রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের অন্যতম কারণ গল্-প্রভৃতি বর্বর জাতিদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ। গলেরা কেল্টজাতির সমগোত্রীয়; কালক্রমে তাহারা ফ্রান্সে বসবাস করিতে থাকে।

পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি

জুলিয়স সীজার তাহাদিগকে পরাজিত করেন ; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা আবার মাথা তুলিতে সমর্থ হয়।

১১৯ ১৩ ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ : চার্লস্ রবার্ট ডারুইনের 'Origin of Species' গ্রন্থে বর্ণিত ক্রমবিকাশবাদে (Theory of Evolution) নিম্নস্তরের প্রাণী হইতে উচ্চস্তরের প্রাণীতে ক্রম-পরিণতির কথা আলোচিত হইয়াছে।

১৩০ ২৭ 'সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো'—বিবেকচূড়ামণি, ১১৩। মায়া সৎ অসৎ বা উভয় ভাব-মিশ্রিত অন্য কোন পদার্থও নহে। ইহাকে 'অনির্বচনীয়বাদ' বলে।

১৩১ ৮ 'ঠাকুরের সেই মুচি-মুটের গল্প'—গল্পটি 'কথামৃতে' আছে। এক ব্রাহ্মণ তাঁহার মোট বহিবার জন্য একজনকে সঙ্গে লন। তিনি জানিতেন না, ঐ ব্যক্তি মুচি। কিছুদূর গিয়া তাহার কোন অনাচার লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন 'তুই মুচি নাকি রে!' তখন সেই মুটে বলিল, 'ঠাকুর মশাই, তবে আমি চললাম।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'কি হ'ল রে?' সেই মুটে-রূপী মুচি বলিল, 'আমায় যে চিনে ফেলেছেন!'

১৩৯ ১৪ 'ক গতং কেন বা নীতং'—বিবেকচূড়ামণি, ৪৯১

১৪১ ১ 'ন (মুক্তিঃ) সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি'—বিবেকচূড়ামণি, ৬

৪ 'ন ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকে'—কৈবল্যোপনিষদ্, ৩

১৫২ ২৩ 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতি, স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।—ছান্দোগ্য উপ., ৭।২৬।২ ; নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ।

১৫৬ ১৪ 'বৈদিক কল্প, গৃহ্য ও শ্রৌতসূত্র'—কল্পসূত্র : (১) গৃহ্যসূত্র—স্মৃতি-অবলম্বনে গৃহস্থদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম ; (২) শ্রৌতসূত্র—বেদের কর্মকাণ্ডবিষয়ে নির্ধারণ।

১৫৬ ১৫ রঘুনন্দনের শাসন—আধুনিক বঙ্গদেশে প্রচলিত যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থা। মিতাক্ষরার শাসন—বাঙলা ব্যতীত ভারতের অপর প্রদেশে প্রচলিত স্মৃতির শাসন।

মনুস্মৃতির শাসন—'মনুসংহিতা'ই আর্যসংস্কারের বিধিব্যবস্থার মূল গ্রন্থ।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

১৬০ ১৩ 'গিরি গণেশ আমার শুভকারী'—দাশরথি রায়-রচিত আগমনী গান।

১৬৬ ৬ নড়ালের রায় বাবু—যশোহর জেলার নড়াইলের জমিদার। এখন কাশীপুরে ইঁহাদের বসবাস।

১৭৩ ৫ 'পাক্ষিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাব'—'উদ্বোধন' পত্রিকা বাঙলা ১৩০৫, ১লা মাঘ প্রথমে পাক্ষিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়। ১০ম বর্ষ ১৩১৪, মাঘ হইতে ইহা মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হইতেছে।

১৭৩ ১০ 'পত্রের প্রস্তাবনা'—স্বামীজী লিখিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রস্তাবনা 'বর্তমান সমস্যা'; দ্রঃ—এই গ্রন্থাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ডে পৃঃ ২৯।

১৭৯ ১৩ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ : এখানে আচার্যশংকরের অদ্বৈতবাদই বুঝিতে হইবে।

১৮০ ৬ 'আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত'—ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্যন্ত, অর্থাৎ বিশ্বজগতের চরাচর সব কিছু।

১৮০ ২৬ 'এখনি খাল কেটে জল আনতে'—অনাবৃষ্টিকালে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চাষীর খাল কাটিয়া জমিতে জল আনার গল্পটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন।

১৮১ ২১ 'মনটাকে মারতে হবে'—মনের বহির্মুখী বৃত্তিকে প্রশমিত করিতে হইবে। উত্তরাখণ্ডের সাধুদের মধ্যে প্রচলিত সূক্তি : মনকো মারো, তনকো জারো।

১৮৩ ৫ 'স্তিমিত সলিলরাশি প্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্'—নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা, স্থির সাগরের তরঙ্গ-রহিত অবস্থার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বিবেকচূড়ামণি, ৪১৭

১৮৫ ২১ 'বিনিহন্ত্যসদ্‌গ্রহাৎ'—আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি অসত্যবস্তু গ্রহণ করিয়া বিনষ্ট হয়।—বিবেকচূড়ামণি, ৪

১৮৭ ৮ 'প্যারিস প্রদর্শনী'—দ্রঃ এই গ্রন্থাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ডে পৃঃ ৪৭।

১৯২ ৯ 'পরমধন সে পরশমণি'—কমলাকান্তের গান 'আপনাতে আপনি থেকো মন'-এর ৩য় পঙ্‌ক্তি।

১৯৪ ৭ ঢাকার মোহিনীবাবুর বাড়িতে—ঢাকার জমিদার মোহিনীমোহন দাসের বাড়িতে স্বামীজীর থাকিবার ব্যবস্থা হয়।

পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি

১৯৪ ২৪ 'হ-র স্ত্রী'—ঢাকার হরপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী।

১৯৫ ১৩ কটন সাহেব : ভারতহিতৈষী স্যর হেনরী কটন তৎকালে আসামের চীফ কমিশনার ছিলেন।

১৯৫ ২১ 'শঙ্করদেবের নাম'—আসামে ভক্তি-আন্দোলনের পুরোধা শ্রীশঙ্করদেব বা 'হঙ্করদেব', শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক।

১৯৯ ২৩ 'বৌদ্ধযুগেই স্ত্রীমঠ'—বৌদ্ধযুগেই প্রথম স্ত্রীমঠ স্থাপিত হয়; শিষ্য আনন্দের অনুরোধে ভগবান বুদ্ধ অনুমতি দেন। তাঁহার পালনকর্ত্রী মাতৃ-স্বসা মহাপ্রজাপতি গৌতমী স্ত্রীমঠের প্রথম অধ্যক্ষা হন।

২০২ ১২ 'যে বিদেশী মেয়েরা আমার চেলা হয়েছে'—মিসেস সেভিয়ার, মিসেস ওলি বুল, মিস নোবল প্রভৃতি স্বামীজীর কাজে সহায়তা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

২১১ ২৬ 'জি. সি. কেমন নূতন ছন্দে'—শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ (স্বামীজী তাঁহাকে তাঁহার ইংরেজী নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী G. C. বলিয়া ডাকিতেন) অমিত্রাক্ষর ছন্দ নূতন রূপে তাঁহার নাটকে ব্যবহার করেন। এই নূতন ছন্দ 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত।

২১৫ ১৮ শ্রীরামকৃষ্ণস্তবমালা : স্বামীজী-রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক স্তোত্র—"ওঁং হ্রীং ঋতং ত্বমচলো" ইত্যাদি। দ্রঃ—৬ষ্ঠ খণ্ডে পৃঃ ২৫৩

২১৬ ১১ 'ঠাকুরের কথা সাপচলা, আর সাপের স্থিরভাব'—একই সাপ, যেমন কখন চলে, আবার কখনও নিষ্ক্রিয় হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া থাকে, সেইরূপ একই ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণরূপে প্রতিভাত হন। যখন তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম বলা হয়। যখন তিনি এ-সবের ঊর্ধ্বে শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত, তখন তাঁহাকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলা হয়।

২২৩ ১ 'এক শ্রেণীর বেদান্তবাদীদের ঐরূপ মত আছে'—ব্যষ্টিগত মুক্তি যথার্থ মুক্তি নয়, সমষ্টিগত মুক্তিই মুক্তি—বৈদান্তিক অপ্পয়দীক্ষিতের মত।

২২৫ ১০ 'রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব'—প্রচলিত স্মৃতিগ্রন্থ; তিথিতত্ত্ব প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ড আলোচিত।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

২২৭ ১৮ 'সংস্কৃত ভাষায় একটি স্তব'—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী-রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাষ্ট-স্তবমালা (১ম সংস্করণ) পুস্তিকার অষ্টম স্তব— শ্রীরামকৃষ্ণজন্মলীলা-স্তোত্রম্'।

২৩১ ১০ 'আমি কিছুদিন গাজীপুরে পাওহারী বাবার সঙ্গ করি'—দ্রঃ পত্রাবলীতে ঐ প্রসঙ্গ, এবং ৯ম খণ্ডে 'পওহারী বাবা' প্রবন্ধ।

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে

২৬৩ ৬ 'নদীতীরে বেলুড়ের কুটীরে'—মঠের জমিতে পূর্ব হইতেই কয়েকটি বাড়ি ছিল, তাহার একটিতে মিসেস বুল বাস করিতেন। স্বামীজী ও অন্যান্য সন্ন্যাসীরা তখন অল্পদূরে দক্ষিণে গঙ্গাতীরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানে থাকিতেন।

২৬৫ ১০ 'স্বামীজীর অষ্টবর্ষব্যাপী ভ্রমণের'—শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর ১৮৮৬ খৃঃ অগস্ট হইতে ১৮৯৩ খৃঃ ৩১ মে আমেরিকা যাত্রা পর্যন্ত কয়েক বৎসর স্বামীজী সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন।

২৬৮ ১ 'আমাদের তিনজন'—মিস ম্যাকলাউড (জয়া), মিসেস বুল (ধীরামাতা) ও মার্গারেট (নিবেদিতা)।

২৬৮ ৩ 'একজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন'—মিস্ মার্গারেট নোবল ; ১৮৯৮ খৃঃ ২৫শে মার্চ তারিখে দীক্ষাগ্রহণের পর তাঁর নাম হয় 'ভগিনী নিবেদিতা'।

২৬৮ ১০ 'দায়রূপে প্রাপ্ত সেই মহৎকার্য'—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' এবং জগতের হিত হইবে এইরূপ কার্য ; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্বামীজী এই মহৎকার্যের সূচনা করিয়া গিয়াছেন।

২৬৮ ১৩ 'তখনকার রাজনীতিক গগন…একটা ঝড়ের সূচনা'—প্লেগ প্রতিরোধের জন্য ব্রিটিশ সৈনিক নিয়োগ এবং তাহাদের কার্যকলাপের ফলে দেশে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পুনার প্লেগ কমিশনার মিঃ র‍্যাণ্ড (Rand) ও অপর একজন মিঃ আয়ারস্ট (Lt. Ayerst) দামোদর চাপেকর নামক এক দেশপ্রেমিক তরুণের হস্তে নিহত হয়।

২৬৮ ২২ 'মহামারী দেখা দিয়েছিল এবং জনসাধারণকে সাহস দিবার জন্য

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

ব্যবস্থাও চলিতেছিল'—১৮৯৮ খৃঃ কলিকাতায় প্লেগ মহামারী দূর করিবার জন্ত স্বামীজী ও ভগিনী নিবেদিতার জনসেবামূলক প্রচেষ্টা জনসাধারণের মন হইতে আতঙ্ক দূর করিয়াছিল।

২৬৯ ৩ 'একটি বড় দল'—দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া ১১ই মে ১৮৯৮ স্বামীজী কয়েকজন গুরুভ্রাতা এবং মিসেস ওলি বুল, মিস্ ম্যাকলাউড ও নিবেদিতাসহ আলমোড়া যাত্রা করেন। সঙ্গে কলিকাতায় আমেরিকান কনসাল জেনারেলের পত্নী মিসেস প্যাটারসনও ছিলেন। দ্রষ্টব্য স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রণীত 'অতীতের স্মৃতি'—পৃঃ ১০৫।

২৭০ ২৭ 'ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের গৃহে'—সেভিয়ার দম্পতি সেই সময় আলমোড়ায় লালা বদ্রীশার বাগান-বাড়িতে কিছুদিন অবস্থান করেন। স্বামীজীও স্বাস্থ্যলাভের জন্ত ঐস্থানে কিছুদিন ছিলেন।

২৭১ ৩ 'দীক্ষিতা এক ইংরেজ মহিলা'—ভগিনী নিবেদিতাই একমাত্র দীক্ষিতা ইংরেজ মহিলা। অপর দুইজন মিসেস বুল ও মিস্ ম্যাকলাউড ছিলেন আমেরিকান।

২৭৩ ১৩ ম্যাটসিনি (১৮০৫-৭২): উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই ইতালীয় চিন্তাবীর জোসেফ ম্যাটসিনির আবির্ভাব হয়। ফরাসী লেখকগণের রচনাবলী ও রোমের অতীত ইতিহাস তাঁহার মনে স্বাধীনতাস্পৃহা উদ্দীপ্ত করে। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি একটি গুপ্ত সম্প্রদায়ে যোগ দেন এবং অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অধীনতা হইতে ইতালিকে উদ্ধার করিবার জন্ত আজীবন সংগ্রাম করেন।

২৭৩ ১৬ 'সাধুবেশে বর্ষব্যাপী ভ্রমণ'—শিবাজী ও তৎপুত্র শাহজী কৌশলে ফলের ঝুড়িতে আত্মগোপন করিয়া আগ্রা হইতে পলায়ন করেন, সাধুবেশে বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া ১৬৬৬ খৃঃ শেষভাগে গৃহে পৌঁছান।

২৭৪ ২২ 'ছাগশিশুর জন্ত প্রাণ দিতে উদ্যত'—বুদ্ধদেবের জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা, অতঃপর বিম্বিসার তাঁর রাজ্যে পশুবলি বন্ধ করিয়া দেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'বুদ্ধচরিত' নাটকে এটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

২৭৫ ৩ 'রূপসী অম্বপালী'—বৈশালীর বারবনিতা। ভগবান বুদ্ধদেব বৈশালীতে আসিলে তাঁহার অন্তান্ত ভক্তদের সহিত অম্বপালী তাঁহাকে দর্শন

পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি

করিতে আসে এবং তাহার পতিতা-জীবনের ইতিহাস ব্যক্ত করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়। ভগবান বুদ্ধ তাহাকে অভয় দিয়া নব জীবনের পথ প্রদর্শন করেন।

২৭৫ ১৩ পারস্যের বাব-পন্থিগণ (Babists): ১৮৪৪-৪৫ খৃঃ মির্জা আলি মুহম্মদ নামক এক পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবক এক নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মতাবলম্বিগণ বাবপন্থী (Babist) নামে পরিচিত। তাহারা হজরত মহম্মদকে ভগবানের আদিষ্ট ব্যক্তি ও কোরানকে ভগবানের বাণী বলিয়া স্বীকার করিলেও কোরান যে ভগবানের শেষ বাণী, তাহা মানে না। ১৮৫০ খৃঃ পারসীক সরকার তাঁহাকে সর্বসমক্ষে গুলি করিয়া নিহত করে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মতাবলম্বিগণ 'আজালি' (Azali) এবং বহাই (Bahai) এই দুই দলে বিভক্ত হয়। বহাইগণ পাশ্চাত্যদেশে এবং ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচার করে। এখনও ঐ-সব স্থানে বহু বাবপন্থী আছে।

২৭৬ ১৮ 'এই দুই ব্যক্তি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ…জন্মিয়াছেন'—রাজা রামমোহন রায় হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই তিনটি গ্রাম আরামবাগ অঞ্চলে কয়েক মাইলের মধ্যে অবস্থিত।

২৭৭ ২৬ ডেভিড হেয়ার: ১৭৭৫ খৃঃ স্কটল্যাণ্ডে হেয়ারের জন্ম হয়। ১৮০০ খৃঃ ঘড়ির ব্যবসা করিতে কলিকাতায় আসেন। ১৮২০ খৃঃ ঘড়ির ব্যবসা বিক্রয় করিয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে লোকহিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করেন। তিনি এদেশে ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম প্রবর্তক ও অদ্বিতীয় ছাত্রদরদী।

২৭৮ ১১ 'পুরাতন শিক্ষক স্কটল্যাণ্ডবাসী হেষ্টিসাহেব'—জেনারেল এসেমব্লিজ কলেজে অধ্যয়নকালে অধ্যক্ষ Rev. W. Hastie সাহেবের নিকট নরেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার নিকট তিনি শোনেন সমাধি অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকটে যাইতে হইবে।

২৮৪ ৩ 'বৈষ্ণবগণ কল্পনামূলক গীতিকাব্যের পরাকাষ্ঠা'—হিন্দীতে সুরদাস,

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

মীরাবাঈ প্রভৃতির ভজন, দাক্ষিণাত্যে আলোয়ারদের ভক্তিমূলক গান, এবং বাঙলায় বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী একযোগে ঈশ্বরপ্রীতি এবং সাহিত্যিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছে।

১৮৭ ১০ 'কাশীর সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা'—১৮৮৮ খৃঃ তীর্থপর্যটনকালে কাশীর দুর্গাবাড়ির নিকট একদল বানর স্বামীজীকে তাড়া করে। এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর নির্দেশে স্বামীজী ঘুরিয়া দাঁড়াইলে বানরগুলি পলায়ন করে। এইখানেই স্বামীজী শিক্ষালাভ করেন: 'Face the brute' —পশুশক্তির সম্মুখীন হও, পিছন ফিরিওনা।

২৮৭ ১৭ 'ইহাই বুদ্ধের জন্মভূমি'—হিমালয়ের পাদদেশ তরাই অঞ্চল, যথার্থ জন্মভূমি কপিলাবাস্তু এখান হইতে বহুদূরে।

২৮৮ ৮ চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব: আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩২২ নন্দবংশের ধ্বংস সাধন করিয়া মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন লাভ করেন। পঞ্জাব ও সিন্ধু হইতে গ্রীক বিতাড়ন, সেকেন্দার সাহের (Alexander the Great) অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি সেলিউকাসের ভারতাক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া সীমান্তের গ্রীক-বিজিত প্রদেশগুলির পুনরধিকার এবং ভারতবর্ষে এক সুদূর-প্রসারী সাম্রাজ্য স্থাপন প্রভৃতির জন্য চন্দ্রগুপ্ত ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

২৮৮ ১১ 'যেখানে বিজয়ী সেকেন্দর প্রতিহত হইয়াছিলেন'—গ্রীকবীর সেকেন্দর সাহের ভারত-অভিযান যে একেবারেই সহজসাধ্য হয় নাই, পরন্তু পদে পদে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল, ঐতিহাসিকগণ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। গ্রীক ঐতিহাসিক-বর্ণিত 'পোরাস' (Porus) অর্থাৎ পুরু ঝিলাম ও চিনাব নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী এক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। সেকেন্দর সাহের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধ ও শৌর্যবীর্যের পরিচয় সুবিদিত।

২৮৮ ১৩ গান্ধার ভাস্কর্য: তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ ও আফগানিস্থানের প্রাচীন স্থানগুলিতে এই ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধযুগের স্থাপত্যসমূহ ইহার অন্তর্গত। গান্ধার ভাস্কর্যের কলাকৌশল গ্রীক-শিল্প হইতে গৃহীত বলিয়া ইহাকে ইন্দোগ্রীক

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

ভাস্কর্যও বলা হয়। কুশানযুগে চীন, তুর্কীস্থান ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে এই শিল্প ছড়াইয়া পড়ে।

২৯৬ ১৮ বীর চেঙ্গিজ খাঁ: মোঙ্গল সর্দার চেঙ্গিজ খাঁ (১১৬২-১২২৭) নিজের আত্মবিশ্বাস, কষ্টসহিষ্ণুতা ও সাহসের বলে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেন। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি আক্রমণ করেন এবং দিল্লীতে ইলতুতমিসের রাজত্বকালে পঞ্জাব পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। চীনা ভাষায় cheng-sze শব্দের অর্থ 'শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা'। বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল তেমুচিন।

২৯৭ ৩ 'প্রবুদ্ধ ভারত' মায়াবতীতে নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমে স্থানান্তরিত—মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত ইংরেজী 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক রাজম্ আয়ারের মৃত্যু হয় ১৮৯৮ খৃঃ জুন মাসে। ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের সাহায্যে আলমোড়া জেলায় মায়াবতী অঞ্চলে এক সাহেবের চা-বাগানের জমি ও গৃহ ক্রীত হইলে ১৮৯৯ খৃঃ মার্চ মাসে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপিত হয়। তখন স্বামীজীর নির্দেশে মাদ্রাজ হইতে প্রবুদ্ধ ভারতের কার্যালয় অদ্বৈত আশ্রমে স্থানান্তরিত হয়। স্বামীজী তাঁহার শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দকে অদ্বৈত আশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক করিয়া পাঠান।

২৯৮ ২৪ 'রামরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রতারণা করিবার পরামর্শ'—তুলনীয়: 'তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ'।

৩০০ ১০ 'তাঁহার এক শিষ্যা'—এই শিষ্যা নিঃসন্দেহে নিবেদিতা স্বয়ং, কারণ তিনিই একমাত্র আমেরিকাবাসিনী নহেন।

৩০৫ ২৩ 'সুলেমানের সিংহাসন'—তখ্‌ত-ই সুলেমন পর্বত।

৩০৭ ১৪ জাস্টিনিয়ান (৪৮৩-৫৬৫): জাস্টিনিয়ান সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্য রোমক সম্রাট (Eastern Roman Emperor); তাঁহার রাজত্বকাল ৫২৮ হইতে ৫৬৫ খৃঃ। আইন সংস্কারকরূপে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

৩০৮ ৪ কার্যকলাপ ও পত্রাবলী: Acts of Apostles এবং Epistles of

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

নামানুযায়ী রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, অধুনা 'সুরেন্দ্রনাথ কলেজ' নামে পরিচিত।

৩৩৫ ২ বল্লভাচার্য সম্প্রদায় : শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, ইহারা মায়া স্বীকার করেন না।

৩৩৬ ২০ 'টমাস আ কেম্পিসের Imitation of Christ'—দ্রঃ এই গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে স্বামীজীর অনুবাদ 'ঈশানুসরণ'।

৩৪৩ ১৪ 'গণেশের আসন'—মহাভারতের লিপিকার গণেশের ভূমিকা লেখক গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ লিপিকারের আসন গ্রহণ করিলেন।

৩৪৩ ২৬ 'ডেলসার্ট ব্যায়াম'—কোন যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতিরেকে হাত-পা চালনা করিয়া ভারসাম্য (balance) বজায় রাখিয়া শারীরিক ব্যায়াম, ঐ সময় কিছুদিন আলমবাজার মঠে খুব চলিয়াছিল। দ্রঃ 'স্মৃতিকথা' (স্বামী অখণ্ডানন্দ) পৃঃ ২০২।

৩৪৭ ১২ 'দমটানা ইত্যাদি বই আর কিছু নয়'—পূরক-কুম্ভক-রেচক ইত্যাদি প্রাণায়ামের প্রাথমিক অভ্যাসকেই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

৩৪৮ ২৬ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য : শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক, ভাস্কর, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি নিজমত প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন।

৩৫২ ৯ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় : বরানগরে একটি বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৫ খৃঃ প্রথমদিকে ভারতীয় বিধবাদের অবস্থা সম্বন্ধে ব্রুকলিন রমাবাঈ সার্কেলের সহিত স্বামীজীর মতভেদ হইলে স্বামীজী ব্রুকলিনে ভারতীয় নারীদের বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন এবং সংগৃহীত অর্থ শশিপদবাবুর বিধবাশ্রমে দান করেন। দ্রঃ স্মৃতিকথা (স্বামী অখণ্ডানন্দ) পৃঃ ১৮৮।

৩৫৫ ৯ 'কলিকাতায় দুইটি মাত্র বক্তৃতা'—প্রথম বক্তৃতা রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রাঙ্গণে অভিনন্দন-সভায়, দ্বিতীয়টি স্টার থিয়েটারে প্রদত্ত।

৩৬৪ ২৩ Utilitarian (উপযোগিতাবাদী) : বেন্থাম, মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত 'Utilitarianism'-এর সমর্থক। 'Greatest good for the greatest number' অর্থাৎ সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক পরিমাণ সুখের ব্যবস্থাই এই মতের লক্ষ্য।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৩৭৩ ২৪ 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস'—গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী যুগের বৈষ্ণবভক্ত ও পদাবলীকার। তিনি শ্রীচৈতন্যের মহিমা ও রূপ কল্পনায় আস্বাদ করিয়া কবিতায় বর্ণনা করিতেন। শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ দর্শন পান নাই বলিয়া অনেক পদের শেষে গোবিন্দদাস এই ধরনের আক্ষেপ করিয়াছেন।

৩৮৪ ১৪ '৯৩টা মূল দ্রব্য (93 elements)'—স্বামীজীর এই আলোচনার পর অর্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ আরও কয়েকটি মূল দ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছেন। অবশ্য ইলেক্ট্রন-তত্ত্ব পরমাণু-তত্ত্বের ধারণা আমূল পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে।

৩৭০ ৮ 'জুল ভার্নের Scientific novels'—Jules Verne. (১৮২৮-১৯০৫)। 'Five weeks in a Balloon', 'Journey to the Centre of the Earth', 'Round the World in Eighty Days', 'Three Thousand Leagues under the Sea', প্রভৃতি বিজ্ঞানমূলক কল্পনাশ্রয়ী উপন্যাসের বিখ্যাত ফরাসী রচয়িতা।

৩৭০ ৯ কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১): স্কটল্যাণ্ডের প্রতিভাশালী লেখক। Sartor Resartus: ১৮৩৩ খৃঃ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের উপর তীব্র কটাক্ষপূর্ণ এবং দার্শনিক ও নৈতিক আদর্শবাদের পক্ষে লিখিত গ্রন্থ।

৩৮৫ ২১ জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩): অর্থনীতি, ধর্ম, ন্যায়দর্শন, রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ-প্রণেতা। ১৮৬৫ খৃঃ হইতে তিনি বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হন।

৩৮৮ ৪ 'চার্বাকের দৃশ্যসত্য মত'—চার্বাক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষকেই সত্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?'

৪০২ ২২ 'গৌরাঙ্গের পেট ভরায়'—এখানে গৌরাঙ্গ-শব্দের অর্থ শ্বেতকায় ইংরেজ।

৪০৫ ২০ 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, গোপাল অতি সুবোধ বালক'—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য 'বোধোদয়', 'বর্ণপরিচয়' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। ঐ-সকল পুস্তকে তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্য লিখিয়াছেন, 'ঈশ্বর নিরাকার

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

চৈতন্যস্বরূপ'; সুবোধ বালকের আদর্শ দ্বারাও বালকেরা নিরীহ গোবেচারী হয়। এই ধরনের শিক্ষা দ্বারা বালকবালিকাদের প্রকৃত চরিত্র গঠিত হয় না—ইহাই স্বামীজীর অভিমত।

৪১৩ ১৪ 'দ্বিতীয়বার মার্কিনে যাইবার উদ্যোগ'—৬২ পৃঃ তথ্যপঞ্জী দ্রঃ

৪২২ ৬ 'পাঁচভাবে সাধনের কথা'—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চভাবের সাধন।

৪৩০ ২১ থেরাপুত্ত: বৌদ্ধদের এক সম্প্রদায়, 'স্থবিরপুত্রের' অপভ্রংশ।

কথোপকথন

৪৩৭ ১৯ মহীশূরের রাজা: ১৮৯২ খৃঃ শেষভাগে পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী মহীশূরের রাজপ্রাসাদে কিছুকাল অবস্থান করেন।

৪৪০ ১৫ প্রাচ্যতত্ত্বানুসন্ধান: ইওরোপীয় পণ্ডিতমহলে প্রাচ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা 'Oriental research' নামে পরিচিত।

৪৫১ ২ 'সুদান যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য'—১৮৮২ খৃঃ 'আরবিপাশার' বিদ্রোহ দমন করিয়া ইংরেজগণ মিশরের প্রকৃত প্রভু হন। কিন্তু সুদান প্রদেশে মাহদি আখ্যাধারী এক মুসলমান নেতা তাহার শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তাহাকে দমন করিতে যাইয়া ব্রিটিশ সেনাপতি গর্ডন নিহত হন। অবশেষে ১৮৯৮ খৃঃ কর্নেল কিচেনার ওমদারমানের যুদ্ধে মাহদির সেনাদলকে পরাভূত করিয়া সুদানকে ইংরেজ শাসনাধীন করে। এই যুদ্ধে ভারতীয়দের সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া ভারতীয় সৈন্য ব্যবহৃত হয়।

৪৫৮ ১ মিল্টন ও হোমর: 'Paradise Lost', 'Paradise Regained' প্রভৃতি কাব্য প্রণেতা ইংরেজ কবি মিল্টন। 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' এই দুই প্রাচীন গ্রীক মহাকাব্য হোমর-রচিত।

৪৬২ ২৪ নিউ টেস্টামেণ্ট: বাইবেলের যে অংশ খ্রীষ্টশিষ্য বা প্রেরিত পুরুষদের দ্বারা রচিত, তাহাই 'নিউ টেস্টামেণ্ট' নামে পরিচিত। বাইবেলের প্রথমাংশ হিব্রুভাষায়; শেষের কিছু অংশ গ্রীকভাষায় রচিত।

৪৫৪ ১৬ যাস্কের 'নিরুক্ত': যাস্ক বৈদিক শব্দার্থবোধক শাস্ত্রকার, নিরুক্ত নামে বেদাঙ্গ গ্রন্থের প্রণেতা। নিরুক্ত সর্বপ্রাচীন প্রামাণ্য বৈদিক অভিধান।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৪৬৫ ২৯ মধ্বাচার্য : দ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্য।

৪৬৭ ১৯ কিণ্ডারগার্টেন বিত্তালয় : জার্মান ভাষায় 'কিণ্ডারগার্টেন' শব্দের অর্থ 'শিশুদের উত্তান' (Garden of children)। Fredrich Froebel (ফ্রেড্রিক ফ্রবেল) নামক জনৈক শিক্ষাবিদ্ ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিশুশিক্ষার এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। চিত্তবিনোদনকারী খেলনা, খেলা ও গান-বাজনার মধ্য দিয়া শিশুশিক্ষার এই পদ্ধতি 'কিণ্ডারগার্টেন' নামে পরিচিত।

৪৭১ ২৯ 'ইংলণ্ডে একজন ও আমেরিকায় একজন'—১৮৯৭ খৃঃ পাশ্চাত্য হইতে ভারতে ফিরিবার সময় স্বামীজী আমেরিকায় স্বামী সারদানন্দকে ও ইংলণ্ডে স্বামী অভেদানন্দকে রাখিয়া আসেন।

৪৭৪ ১৫ 'সে এমন দেশ হইতে আসিয়াছিল'—তৎকালীন পরাধীন দেশ আয়র্লণ্ডের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪৭৫ ৫ 'মহাত্মা', 'কুথুমি' প্রভৃতিতে আমি বিশ্বাসী নহি'—থিওসফিস্টগণ 'মহাত্মা' প্রভৃতিতে বিশ্বাসী।

৪৭৮ ১৮ 'হিমালয়ের একটি সুন্দর উপত্যকা'—স্বামীজী সেই সময় স্বাস্থ্যলাভের জন্ম আলমোড়ায় লালা বদ্রীশার 'টমসন হাউসে' ছিলেন।

৪৭৯ ৮ দয়ানন্দ সরস্বতী : আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

৪৮০ ২১ প্রধান প্রশ্নকর্তী—জনকের সভায় এই গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করেন। বচক্নু ঋষির কন্যা বলিয়া তাঁহাকে বলা হইত বাচক্নবী।

৪৮০ 'ফেরিস্তার মতে'—পারসীক ঐতিহাসিক ফেরিস্তা কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলস্থ আস্ত্রাবাদ শহরে আনুমানিক ১৫৭০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৫৮৯ খৃঃ বিজাপুরে যান এবং দ্বিতীয় আদিল শাহ কর্তৃক ভারতের ইতিহাস-প্রণয়নে নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রণীত ভারত-ইতিহাস জেনারেল ব্রিগস্ কর্তৃক 'History of the Rise of Mohometan Power in India' নামে ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে। ১৬১১ খৃঃ বিজাপুরে ফেরিস্তার মৃত্যু হয়।

নির্দেশিকা

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

St. Paul & others. খ্রীষ্টের জীবন ও বাণীর পর এইগুলির মাধ্যমেই খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হয়।

৩০৮ ৫ জীবনীচতুষ্টয়: বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের প্রথমাংশে যীশুখ্রীষ্টের জীবন এবং উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে। এগুলি ম্যাথ্যু, মার্ক, লুক এবং জনের রচিত, Gospel (গস্‌পেল) নামে অভিহিত। প্রথম তিনজনের রচিত গ্রন্থকে Synoptic Gospels বলা হয়।

৩০৮ ৫ সেণ্ট জন: জন গালিল প্রদেশের এক ধীবরের পুত্র। মাতা সালোমা ঈশাজননী মরিয়মের ভগ্নী ছিলেন। ঈশার মহিমা উপলব্ধি করিয়া ২৫ বৎসর বয়সে জন তাঁহার শিষ্য হন। যীশুর মৃত্যুর পর জন জেরুজালেম ও পরে মধ্য এশিয়ায় ধর্মপ্রচার করেন। তাঁহার লিখিত জীবনী ও ব্যাখ্যা 'Gospel according to St. John' নামে বিখ্যাত।

৩০৮ ৭ সেণ্ট পল (৩-৬৭ ?): খৃষ্টের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে সাইলেসিয়া প্রদেশে সলের জন্ম হয়। তিনি এক মধ্যবিত্ত কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীর পুত্র। প্রথম জীবনে তিনি খ্রীষ্টবিদ্বেষী ছিলেন এবং খ্রীষ্টের শিষ্য ও ভক্তদের উপর নির্যাতন করিতে তিনি জেরুসালেম আসিতেছিলেন। পথে অলৌকিকভাবে খ্রীষ্টের আদেশ পাইয়া তিনি পূর্ব সংকল্প পরিত্যাগ করেন এবং খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইয়া 'পল' নামে পরিচিত হন। বহু নির্যাতন সহ্য করিয়া তিনি খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন। খ্রীষ্ট-বিদ্বেষী রোমান সম্রাট নীরো তাঁহাকে ঘাতকের দ্বারা নিহত করেন। পলের এক একটি পত্র পাশ্চাত্যে প্রচারিত খ্রীষ্টধর্মের স্তম্ভস্বরূপ।

৩০৯ ১১ 'জ্ঞানবৃদ্ধ হিলেল…'—ইহুদী ধর্মোপদেষ্টা; তাঁহার জন্ম আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৭০ অব্দে, মৃত্যু আনুমানিক ১০ খৃঃ। তিনি ডেভিডের বংশজাত ছিলেন। তাঁহার উপদেশসমূহের সঙ্গে যীশুখ্রীষ্টের উপদেশাবলীর অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। যথা তিনি বলিতেন: My abasement is my exaltation. What is unpleasant to thyself, that do not do to thy neighbours. Judge not thy neighbour until thou art in his place. ইত্যাদি।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৩২৪ ২৫ শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত 'নামে রুচি জীবে দয়া'—শ্রীচৈতন্যদেব 'নামে রুচি' (ভগবানের নাম ও কীর্তনে আগ্রহ), 'জীবে দয়া' (মানুষ ও অন্যান্য জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ করা) এবং বৈষ্ণব-সেবা (বিষ্ণু-ভক্ত অর্থাৎ ভগবদনুরাগী ব্যক্তিকে শ্রদ্ধাপূর্বক পরিচর্যা)—এই আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন।

৩২৫ ১৫ 'শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষরূপে বিরাজিত'—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে মধুর-ভাবের সাধক নিজেকে প্রকৃতি বা স্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য চেষ্টা করেন। বৈষ্ণবদের মতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, আর সব প্রকৃতি।

৩২৩ ৮ 'নদীতটে একখণ্ড জমি ছিল'—ঝিলাম নদীর তীরে একখণ্ড জমি কাশ্মীরের তদানীন্তন রাজা স্বামীজীকে দিতে চাহিয়াছিলেন। উক্ত জমিতে সংস্কৃত-চর্চার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা স্বামীজীর ছিল।

৩২৪ ১৮ টডের রাজস্থান: টড সাহেবের লেখা 'Annals of Rajasthan' গ্রন্থ ১২৮০ সালে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। তারাবাঈ, মীরাবাঈ, কৃষ্ণকুমারী, চণ্ড প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের বহু গ্রন্থের কাহিনী টডের রাজস্থান হইতে গৃহীত। উনবিংশ শতাব্দীর নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীরা তাহাদের জাতীয় ভাবের প্রেরণা হিসাবে রাজপুতানার কাহিনী গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা অনেকাংশেই এই পুস্তকের সাহায্যে।

৩২৭ ৬ 'আমেরিকার রাজদূত ও তাঁহার পত্নীর আতিথ্য'—কলিকাতাস্থ আমেরিকার কনসাল জেনারেল মিঃ প্যাটারসন ও তদীয় পত্নী।

স্বামীজীর কথা

৩৩২ ১৩ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন: Indian Mirror নামক ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক; কলিকাতায় স্বামীজীর অভিনন্দনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

৩৩২ ২৬ রিপন কলেজ: ভারতের বড়লাট উদার-প্রকৃতি লর্ড রিপনের